গ্রন্থটি

.... কে

উপহার দিলাম।

উপহারদাতা: ....

তারিখ: ....

স্বত্বাধিকারী

নাম: ....

গ্রাম/মহল্লা: ....

থানা: ....

জেলা: ....

ইসলামী ভূগোল

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
গ্রন্থকার, আহকামে যিন্দেগী, ফাযায়েলে যিন্দেগী,
ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, ফিক্‌হুন নেছা,
ইসলামী মনোবিজ্ঞান, বয়ান ও খুতবা,
যদি জীবন গড়তে চান
প্রভৃতি

প্রকাশনায়:

ইতিহাস ও ভূগোল প্রকাশন

প্রাপ্তিস্থান ও পরিবেশনা

আল-কুরআন পাবলিকেশন্স
কিতাব মার্কেট, মাদরাসা রোড
(যাত্রাবাড়ি মাদরাসা সংলগ্ন)
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
মোবা: 01764-185654

মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০
মোবা: 01712_306364

ইসলামী ভূগোল
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশনায়
ইতিহাস ও ভূগোল প্রকাশন

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৯
রবিউছ ছানী ১৪৪১

দ্বিতীয় সংস্করণ
আগস্ট ২০২১

মূল্য: ৯৩০/=

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

ISLAMI BHUGOL
(Islamic Geography)
Written by : Maolana Muhammad Hemayet uddin in bengali
Published by : Itihash o Bhugol Prokashon

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : সূচনা-বিষয়াবলী
দ্বিতীয় অধ্যায় : ভূগোল ও মানচিত্রের পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী
চতুর্থ অধ্যায় : প্রাকৃতিক তত্ত্ব : পৃথিবী ও বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ বিষয়ক
পঞ্চম অধ্যায় : জ্যেতিষ ভূগোল বৃত্তান্ত
ষষ্ঠ অধ্যায় : আবহাওয়া ও সমুদ্র-তত্ত্ব
সপ্তম অধ্যায় : আঞ্চলিক ভূগোল বিষয়ক
অষ্টম অধ্যায় : বিশিষ্ট স্থান ও গোত্রসমূহের বাসস্থান প্রসঙ্গ
নবম অধ্যায় : মানচিত্রাবলি

বিস্তারিত সূচিপত্র

বিষয় ... পৃষ্ঠা নং
অবতরণিকা ... ১৯
'ইসলামী ভূগোল' নামক এ গ্রন্থটির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ... ২০
ভৌগোলিক কিছু বিষয় তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করার জন্য গঠিত উলামায়ে কেরামের টিম সম্বন্ধে কিছু কথা ... ২৩
যেসব বিষয় সরেজমিন তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করা হয় ... ২৩

প্রথম অধ্যায়
(সূচনা-বিষয়াবলি)

ভূগোলের অর্থ ও সংজ্ঞা ... ২৫
ভূগোলের আলোচ্য বিষয় ... ২৫
ভূগোলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ... ২৬
ভূগোলের শাখাসমূহ ... ২৬
ইসলামের দৃষ্টিতে ভূগোল শাস্ত্রের প্রয়োজন ও উপকারিতা ... ২৭
মানচিত্রের সংজ্ঞা ... ২৭
মানচিত্রের প্রয়োজন ও উপকারিতা ... ২৭
মানচিত্রের প্রকার ... ২৮
ভূগোল ও মানচিত্রে মুসলমানদের অবদান ... ২৮
ভূগোল ও মানচিত্র বিষয়ক মুসলিম মনীষীদের রচনাবলি ... ২৯
মক্কা মদীনার ভৌগোলিক বিষয় সম্পর্কিত বিশেষ গ্রন্থাবলি ... ২৯
এ গ্রন্থে ব্যবহৃত সূচক-এর বিবরণ ... ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
(ভূগোল ও মানচিত্রের পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলি)

মাইল, নটিক্যাল মাইল ও কিলোমিটার প্রসঙ্গ ... ৩৭
মাইল ও কিলোমিটারের একটাকে অপরটায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতি ... ৩৮
নটিক্যাল মাইল ও স্থল মাইলের একটাকে অপরটায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতি ... ৩৮
নটিক্যাল মাইলকে কিলোমিটারে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি ... ৩৮
স্কেল/মাপনী ... ৩৮
সূচক ... ৪০
মানচিত্র অঙ্কন (Map Drawing) ... ৪০
মানচিত্র অভিক্ষেপ (Map Projection) ... ৪১
বৃত্ত, উপবৃত্ত, পরিধি ও ব্যাস ইত্যাদি পরিভাষার ব্যাখ্যা ... ৪১

নিরক্ষীয় রেখা/বিষুব রেখা ৪১
ডিগ্রী ৪২
মূল মধ্যরেখা বা গ্রীনিচ রেখা ৪২
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ৪২
অক্ষ ও দ্রাঘিমার পরিমাপ ৪৪
অক্ষাংশ নির্ধারণের প্রাকৃতিক উপায় ৪৪
অক্ষ নির্ণয়ের আর একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি ৪৬
সূর্যের উন্নতি ৪৬
সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ধারণের একটি উপায় ৪৬
সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ধারণের আর একটি উপায় ৪৭
দ্রাঘিমা নির্ণয়ের পদ্ধতি ৪৭
বিশেষ কয়েকটি স্থানের অক্ষ ও দ্রাঘিমা ৪৮
কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি ৪৮
মেরু ৪৯
উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু ৪৯
সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্ত ৪৯
উত্তর গোলক ৪৯
দক্ষিণ গোলক ৪৯
উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ ৪৯
বৃত্তের প্রকারসমূহ ৫১
মহাজাগতিক অক্ষ, দ্রাঘিমা ও বিষুব ইত্যাদি প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক তারিখ ও সময় অঞ্চল

আন্তর্জাতিক তারিখ ও সময় অঞ্চল ৫৩
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ৫৪
নামাযের সময় নির্ধারণে সময়-ব্যবধানের সূত্র ৫৭
সাহ্‌রী ও ইফতারের সময় নির্ধারণে সময়-ব্যবধানের সূত্র ৫৯
নামায, রোযার ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গ ৬০
নামায, সাহ্‌রী ও ইফতারের সময়ে কিছু সতর্কতামূলক সময় রাখার আবশ্যকতার দু'টো কারণ ৬০
পর্যালোচনা ৬১
পর্যালোচনা: (নমুনা: ১) ৬২
ঢাকা-টেকনাফের মধ্যকার সময়ের পর্যালোচনা ৬২
ঢাকা- তেতুলিয়ার মধ্যকার সময়ের পর্যালোচনা ৬৩

পর্যালোচনা: (নমুনা: ২) ৬৩
ঢাকা–টেকনাফের মধ্যকার সময়ের পর্যালোচনা ৬৩
ঢাকা–তেতুলিয়ার মধ্যকার সময়ের পর্যালোচনা ৬৩
সব অঞ্চলের জন্য একটি স্থায়ী ক্যালেন্ডার করা সম্ভব কি না ৬৩
আমাদের ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা ৬৪
ছায়া মাপার প্লাটফরম ৬৬
নামায ও রোযার চিরস্থায়ী কালেন্ডার ৬৮
পৃথিবীর দিকসমূহ ৮০
দিক নির্ণয়ের উপায় ৮১
প্রকৃত উত্তর-দক্ষিণ ও চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ প্রসঙ্গ ৮১
কম্পাস (البوصلة)–এর সাহায্যে দিক নির্ণয় প্রসঙ্গ ৮২
বিভিন্ন সনে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান ৮২
কম্পাস–এর সাহায্যে কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি ৮৩
২০১৮ সালের জন্য প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান
ও কেবলার দিক নির্ণয়ের সহযোগী একটি চিত্র ৮৬
নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় প্রসঙ্গ ৮৮
ধ্রুবতারা চেনার উপায় ৯০
সাউদার্ণ ক্রস চেনার উপায় ৯২
দিক ও কেবলা প্রসঙ্গ ৯২

চতুর্থ অধ্যায়

(প্রাকৃতিক তত্ত্ব : পৃথিবী ও বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ বিষয়ক)

পৃথিবী ও বিশ্ব-এর সংজ্ঞা ৯৫
মহা বিশ্ব-এর সংজ্ঞা ৯৫
দেশ (Country/بلد)-এর সংজ্ঞা ৯৬
মহাদেশ (Continent/قارّة) -এর সংজ্ঞা ৯৬
উপমহাদেশ (sub continent/شبه القارّة) -এর সংজ্ঞা ৯৬
মহাদেশসমূহের আয়তন ৯৬
দ্বীপ (جزيرة)-এর সংজ্ঞা ৯৬
উপদ্বীপ (شبه الجزيرة) -এর সংজ্ঞা ৯৬
পাহাড়/পর্বত (جَبَل) -এর সংজ্ঞা ৯৭
পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গসমূহ ৯৭
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ ৯৮
বহুসংখ্যক মুসলিম (২০%-এর অধিক) অধ্যুষিত দেশসমূহ ১০০

পৃথিবীর দেশসমূহ : নাম, রাজধানী, মুদ্রার নাম, প্রধান ভাষা ও পতাকাসমূহ ১০১
এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহ ১০১
ইউরোপ মহাদেশের দেশসমূহ ১০৬
আফ্রিকা মহাদেশের দেশসমূহ ১১১
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশসমূহ ১১৭
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশসমূহ ১২০
ওশেনিয়া/অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দেশসমূহ ১২১
বিভিন্ন দেশের সাবেক ও বর্তমান নাম ১২৩
বিশ্ব ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি ১২৪
কুরআন হাদীছে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে বক্তব্য ১২৬
১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একসময় রুদ্ধ ছিল, পরে খুলে দেয়া হয় ১২৬
২. বর্তমান আকারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে সেগুলো ধুম্রবৎ উপকরণ রূপে ছিল ১২৭
৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ৬ দিনে সৃষ্টি করা হয় ১২৭
৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গ ১২৮
মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব এবং কুরআন-হাদীছে বর্ণিত তথ্যাবলি: একটি পর্যালোচনা ১২৯
পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন ১৩০
পৃথিবীর গতি ও ঘুর্ণন তত্ত্ব ১৩০
পৃথিবীর ঘুর্ণন সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছের বক্তব্য ১৩২
দিন ও রাত ছোট/বড় কেন হয় ১৩৩
ঋতু, অয়নান্ত ও বিষুব সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ১৩৫
দুটো পর্যালোচনা ১৩৫
শীত-গ্রীষ্ম ও মৌসুমের পরিবর্তন-তত্ত্ব ১৩৭
ইল্‌মুন্‌ নুজূম আত-তাবীয়ী শিক্ষা করার হুকুম ১৩৯
সপ্ত একলীম (الأقاليم السبعة)-এর বিবরণ ১৪০
পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ মণ্ডলীকরণ ১৪১
সাত তবক জমিন প্রসঙ্গ ১৪২
সাত জমিন প্রসঙ্গ ১৪৪
জাহান্নাম কোথায় অবস্থিত? ১৪৬
জান্নাত কোথায় অবস্থিত? ১৪৭
আরশ ও কুরছী কোথায় অবস্থিত? ১৪৯
ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস ১৫০
ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছের কিছু কথা ১৫১
আগ্নেয়গিরী ১৫২
দ্বীপ (جزيرة)-এর সংজ্ঞা ১৫৩

www.maktabulabrar.com

উপদ্বীপ (شبه الجزيرة) -এর সংজ্ঞা ১৫৩
পাহাড়/পর্বত (جَبَل) -এর সংজ্ঞা ১৫৩
পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গসমূহ ১৫৩
পাহাড়-পর্বত সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছের বিশেষ দু'টো তথ্য ১৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

(জ্যোতিষ ভূগোল বৃত্তান্ত)

জ্যোতিষ্ক (الكوكب)-এর সংজ্ঞা ১৫৫
নক্ষত্র (النجم)-এর সংজ্ঞা ১৫৫
উত্তর গোলার্ধের নক্ষত্রপুঞ্জ ১৫৬
দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রপুঞ্জ ১৫৭
রাশিচক্রের নক্ষত্রপুঞ্জ ১৬০
গ্রহ (الكوكب السيار)-এর সংজ্ঞা ১৬০
উপগ্রহ (قَمر)-এর সংজ্ঞা ১৬০
ছায়াপথ ১৬০
ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর ১৬৪
গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আকাশকে সজ্জিত করা হয়েছে ১৬৬
সৌরজগত (النظام الشمسي)-এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি ১৬৬
সৌরজগত সম্পর্কে একটি নোট ১৬৭
সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য ১৬৮
সূর্য (الشمس/Sun) ১৬৮
বুধ গ্রহ (عُطارِد/Mercury) ১৬৯
শুক্র গ্রহ (زهره/Venus) ১৭০
পৃথিবী (الأرض/Earth) ১৭১
চাঁদ (قمر/Moon) ১৭২
মঙ্গল গ্রহ (مريخ/Mars) ১৭৩
বৃহস্পতি গ্রহ (مشتري/Jupiter) ১৭৪
শনি গ্রহ (زُحَل/Saturn) ১৭৫
ইউরেনাস গ্রহ (أورانوس/Uranus) ১৭৬
নেপচুন গ্রহ (نِبتون/Neptune) ১৭৭
প্লুটো বামন গ্রহ (أفلوطُن/Pluto) ১৭৮
সিরেস বামন গ্রহ (سيريس/Ceres) ১৭৯
এরিস বামন গ্রহ (إيريس/Eris) ১৮২
মেইকমেইক বামন গ্রহ (ميكميك/Makemake) ১৮০

হৌমিয়া বামন গ্রহ (هاوميا/Haumea) ১৮১
রাশিচক্র ১৮২
রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ১৮৯
জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ইসলাম ১৮৯
আকাশ ও মহাকাশ প্রসঙ্গ ১৯৪
জান্নাত ও আরশের অবস্থান ১৯৬
তাপবলয় ১৯৬
সূর্যগ্রহণ ১৯৬
সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে ইসলামের কিছু তথ্য ১৯৭
সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধান ২০১
১. সুব্হে কাযেব প্রসঙ্গ ২০১
২. সুবহে সাদেক প্রসঙ্গ ২০১
সুবহে কাযেব প্রসঙ্গে বিশেষ কয়েকটি কথা ২০২
সুবহে কাযেব বিষয়ে মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী-র তাহকীক প্রসঙ্গ ২০৪
Zodiacal Light 2018 ...... ২০৫
পর্যালোচনা ২০৯
৩. সূর্য উদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় ২০৯
৪. সূর্য উদয়ের পর মাকরূহ সময় ২০৯
৫. ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু ২১০
৬. সূর্য মধ্যাহ্ন রেখায় অবস্থানকালীন নিষিদ্ধ সময় ২১০
৭. দ্বিপ্রহর ২১০
৮. সূর্য মধ্যাহ্ন রেখা পার হওয়ার পর যাওয়াল ২১১
৯. জোহরের ওয়াক্ত ২১১
১০. প্রতিটি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আসর ২১১
১১. সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পর মাকরূহ সময় ২১১
১২. সূর্য অস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় ২১১
১৩. সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মাগরিবের ওয়াক্ত ২১১
১৪. ইশতিবাকুন্নুজূম ২১১
১৫. শাফাকে আহমার ২১২
১৬. শাফাকে আবইয়ায ২১২
চন্দ্রগ্রহণ ২১২
সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ তথ্য ২১৩
চন্দ্রকলাসমূহ ২১৩
চাঁদের ২৮ মনযিল প্রসঙ্গ ২১৫

চান্দ্রমাসের বিবরণ ২১৬
চাঁদ পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখায় কেন? ২১৯
চাঁদ পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে আগে দেখায় কেন? ২১৯
চান্দ্রমাস ২৯ বা ৩০ দিনে কেন হয় এবং পরপর কয়মাস ২৯ ও কয়মাস ৩০ দিনের হতে পারে? ২১৯
অমাবশ্যা-এর বয়স কতটুকু হলে চন্দ্র খালি চোখে দেখার যোগ্য হয় ২২১
চান্দ্র ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গ ২২২
চাঁদ প্রতিরাতে কতটুকু সময় দর্শনীয় হয়? ২২৩
শাবান/১৪৩৯ হিজরির চাঁদ উদয় ও অস্ত যাওয়ার হিসাব ২২৪
রমজান/১৪৩৯ হিজরির চাঁদ উদয় ও অস্ত যাওয়ার হিসাব ২২৫
চন্দ্রের ৫২ মিনিট প্রসঙ্গে একটা কথা ২২৬

ষষ্ট অধ্যায়

(আবহাওয়া ও সমুদ্র তত্ত্ব)

আবহাওয়া ও জলবায়ুর সংজ্ঞা ২২৮
বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন ও উপকারিতা ২২৯
মৌসুমের ভিন্নতায় বায়ুর দিক পরিবর্তন ২২৯
মৌসুমী বায়ু (জুলাই) ২৩০
মৌসুমী বায়ু (জানুয়ারী) ২৩০
চাপবলয় ২৩১
মেঘ, বৃষ্টি ও শিলা প্রসঙ্গ ২৩২
বজ্রপাত কি ও কেন? ২৩৩
বজ্রপাত বিষয়ে কুরআন-হাদীছের কিছু কথা ২৩৪
তাপবলয় ২৩৫
নদী (نهر)-এর সংজ্ঞা ২৩৬
কয়েকটা দীর্ঘতম নদী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য ২৩৭
সাগর (البحر)-এর সংজ্ঞা ২৩৭
উপসাগর (الخليج) -এর সংজ্ঞা ২৩৭
মহাসাগর (المحيط) -এর সংজ্ঞা ২৩৮
হ্রদ (بُحَيرة) -এর সংজ্ঞা ২৩৮
পৃথিবীর প্রধান কয়েকটা হ্রদ ২৩৮
প্রণালী (مُضِيق) -এর সংজ্ঞা ২৩৯
জোয়ার-ভাটা তত্ত্ব ২৩৯
জোয়ার-ভাটার উপকারিতা ২৪০

স্রোতের কারণসমূহ ২৪১
লবণাক্ততার তারতম্যে পানির স্রোতের গতিভিন্নতা ২৪১
সমুদ্র সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত বিশেষ তথ্যাবলি ২৪২

সপ্তম অধ্যায়

(আঞ্চলিক ভূগোল বিষয়ক)

মক্কা মুকাররমা-র ভূগোল-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

হরমের সীমানা (হুদূদে হারাম) ২৪৫
হজ্জের মীকাতসমূহ ২৪৭

মক্কা মুকাররমার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

১. মাওলিদুন্নবী ২৪৮
২. হযরত খাদীজা (রা.)-এর গৃহ ২৪৮
৩. মসজিদুর রায়াহ ২৪৯
৪. মাক্ববারাতুল মুআল্লাত/জান্নাতুল মুআল্লা ২৫০
৫. মসজিদে জিন ২৫২
৬. জাবালে আবী কুবায়ছ ২৫২
৭. জাবালে কুআইকিআন ২৫৩
৮. শি‘আবে আবী তালিব ২৫৪
৯. দারে আরকাম ২৫৫
১০. দারুন্নাদ্ওয়া ২৫৫
১১. সাফা, মারওয়া ও মাসআ ২৫৬
১২. কা’বা শরীফ ও কা’বা শরীফ সংলগ্ন কিছু জিনিস ২৫৮
১৩. জাবালে ছওর ও গারে ছওর ২৬৮
১৪. জাবালে নূর ও গারে হেরা ২৬৯
১৫. আরাফার ময়দান ২৭০
১৬. মসজিদে নামিরা ২৭১
১৭. জাবালে রহমত ২৭২
১৮. নহ্রে যুবাইদা ২৭৩
১৯. মুযদালিফার ময়দান ২৭৪
২০. মুযদালিফার মসজিদ ২৭৫
২১. মিনা ২৭৫
২২. মসজিদে খায়ফ ২৭৬

২৩. জামারাত ২৭৭
২৪. মসজিদে বাই‘আতে আক্বাবা ২৭৮
২৫. ওয়াদী মুহাছ্ছার ২৭৯
২৬. মুহাস্সাব ২৭৯
২৭. মসজিদে তানঈম/মসজিদে আয়েশা ২৮০
২৮. হযরত খুবায়ব (রা.)-এর শাহাদাতের স্থান ২৮১
২৯. মসজিদে ফাতাহ ২৮১
৩০. সারিফ ২৮২
গোল্ডেন রেশিও এবং কা’বা শরীফ পৃথিবীর নাভি কি না– এ প্রসঙ্গ ২৮৩
কা’বা শরীফ বা মক্কা মুকাররমা পৃথিবীর কেন্দ্র কি না ২৮৯
১. কুরআন-হাদীছের আলোকে কা’বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র কি না ২৯০
২. ভৌগোলিক বিচারে কা’বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র কি না ২৯৩

মদীনা মুনাওওয়ারা-র ভূগোল-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

১. মসজিদে নববী ২৯৫
১. মসজিদে নববী সংলগ্ন কিছু জিনিস ২৯৬

মদীনার কয়েকটি ঐতিহাসিক মসজিদ

১. মসজিদে কুবা ৩০৮
মসজিদে যিরার-এর স্থান ৩০৯
২. মসজিদে জুমুআ ৩০৯
৩. মসজিদে ইত্বান ইবনে মালিক ৩১০
৪. মসজিদুল ফাযীখ ৩১০
৫. মসজিদে বনূ কুরাইযা ৩১১
৬. মসজিদে কেবলাতাইন ৩১১
৭. মাসাজিদে ফাতাহ/মাসাজিদে সাবআ ৩১৩
খন্দক প্রসঙ্গ ৩১৩
৮. মসজিদে বনী হারাম ৩১৬
৯. মসজিদুর রায়া ৩১৭
১. মসজিদুল ফাছ্হ ৩১৭
১১. মসজিদুল মুস্তারাহ/ মসজিদে বনূ হারেছা ৩১৮
১২. মসজিদুশ শায়খাইন ৩১৯
১৩. মসজিদে হাম্যা ৩১৯
১৪. মসজিদে গামামাহ ৩২০

১৫. মসজিদে আবূ বকর ৩২০
১৬. মসজিদে ওমর ৩২১
১৭. মসজিদে আলী ৩২৩
১৮. মসজিদুস সাজদাহ ৩২৩
১৯. মসজিদুল-ইজাবাহ ৩২৪
২০. মসজিদে বনু জফর ৩২৫
২১. মসজিদুস্ সাবাক্ব ৩২৬
২২. মসজিদুস্ সুক্বয়া ৩২৬
২৩. মসজিদুল মীক্বাত ৩২৭

মদীনার কয়েকটা ঐতিহাসিক কবরস্তান

১. জান্নাতুল বাকী' ৩২৮
২. মাক্ববারাতুশ শুহাদা ৩২৯
৩. মাশরবাহ উম্মে ইব্রাহীম ৩২৯

মদীনার কয়েকটা ঐতিহাসিক পাহাড়

১. জাবালে উহুদ ৩৩০
২. জাবালে রুমাত ৩৩১
৩. জাবালে ছওর ৩৩২
৪. জাবালে 'আইর ৩৩২
৫. জাবালে সাল্' ৩৩২
৬. জাবালে যুবাব/জাবালুর রায়াহ ৩৩৩

মদীনার কয়েকটা ঐতিহাসিক কুয়া

১. বীরে রূমা/বীরে উছমান ৩৩৩
২. বীরে বুযাআ ৩৩৪
৩. বীরে আরীছ ৩৩৪
৪. বীরে আযাক্ব ৩৩৫
৫. বীরু হা/বাইরু হা ৩৩৬
৬. বীরে সুক্বয়া ৩৩৬
৭. বীরে গার্ছ ৩৩৬
৮. বীরে বুস্সা ৩৩৭

মদীনার আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান

১. ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' ৩৩৭
২. কা'ব ইবনে আশরাফের দূর্গ ৩৩৭
৩. সালমান ফার্সির খেজুর বাগান ও বীরুল ফকীর ৩৩৯

অষ্টম অধ্যায়

(বিশিষ্ট স্থান ও গোত্রসমূহের বাসস্থান প্রসঙ্গ)

হিজায ৩৪০
আল-জাযীরা ৩৪০
আহকাফ ৩৪১
ওয়াদিল কুরা ও হিজ্‌র ৩৪১
শাম দেশ ৩৪১
উর ও আল-খালীল ৩৪১
কিনআন ৩৪২
সাদূম ৩৪২
বুস্‌রা ও হাওরান ৩৪৩
মিসর ও ইউনান ৩৪৩
মাদইয়ান ৩৪৪
দাওয়ারদান ৩৪৪
নীনাওয়া ৩৪৪
বা'লবেক ৩৪৪
ফিলিস্তীন (فلسطين/ Palestine) ৩৪৫
জেরুজালেম (jerusalem) ৩৪৫
বাবেল ৩৪৫
এক নজরে বিভিন্ন নবীর নাম, তাঁদের গোত্র ও গোত্রের বাসস্থান ৩৪৫

নবম অধ্যায়

(কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহের পরিচিতি প্রসঙ্গ)

কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহের পরিচিত

মক্কা ও বাক্কা ৩৪৭
ইয়াছরিব ৩৪৭
মিস্‌র ৩৪৭
হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলের সমুদ্র পার হওয়ার স্থান ৩৪৮
সিনাই ও তূর ৩৫০
পবিত্র তুওয়া উপত্যকা ও উল্লিকা বৃক্ষ ৩৫২
মাজমাউল বাহরাইন ৩৫৪
জূদী (الجودي/ Mount Judi) ৩৫৬

রাকীম ও আসহাবে কাহাফের গুহা ৩৫৭
যুলকারনাইনের ঘটনায় বর্ণিত عين حمئة (পঙ্কিল জলধি) ৩৬০
যুলকারনাইনের প্রাচীর ৩৬১
বাবেল ৩৬৩
হযরত উযায়র আ.-এর ঘটনায় বর্ণিত নগরী ৩৬৩
হযরত হিযকীল আ.-এর ঘটনায় বর্ণিত নগরী ৩৬৩
তালূতের ঘটনায় বর্ণিত নহর/নদী (জর্ডান নদী) ৩৬৪
أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ-এর 'কারইয়াহ' (আন্তাকিয়া) ৩৬৪
বুস্‌রা ও আযরুআত ৩৬৫
আহকাফ ৩৬৫
মাদইয়ান ৩৬৫
ওয়াদিল কুরা ৩৬৫
হুনায়ন ৩৬৫

দশম অধ্যায়
(মানচিত্রাবলি)

সৌদি আরব ৩৬৮
মক্কা মুকাররমাহ ৩৬৯
মিনা ও মুযদালিফা ৩৭০
আরাফাত ৩৭১
ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদীনা মুনাওওয়ারাহ ৩৭২
বর্তমান মদীনা মুনাওওয়ারাহ ৩৭৩
ইয়ামান ও ওমান ৩৭৪
ইরিত্রিয়া ৩৭৫
মিসর ৩৭৬
আলজেরিয়া ৩৭৭
মরক্কো ৩৭৮
স্পেন ৩৭৯
জর্দান ও ফিলিস্তীন ৩৮০
সিরিয়া ৩৮১
তুরস্ক ৩৮২
লেবানন ৩৮৩
ইরাক ৩৮৪
ইরান ৩৮৫

আফগানিস্তান ৩৮৬
উজবেকিস্তান ৩৮৭
পাকিস্তান ৩৮৮
ইন্ডিয়া ৩৮৯
উত্তর প্রদেশ (ইউ পি) ৩৯০
সাহারানপুর ৩৯১
দেওবন্দ ৩৯২
বাংলাদেশ ৩৯৩
গ্রন্থপঞ্জী ৩৯৪
পাঠকের নোট-এর পাতা ৩৯৭

অবতরণিকা (المقدمة)

بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ـ فقد قال الله تعالى : ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.﴾ وقال تعالى : ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.﴾

কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো ভূগোল ও মানচিত্র বুঝার অপেক্ষা রাখে, যেগুলো ভূগোল ও মানচিত্র বুঝা ব্যতীত স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভব নয়। যারা ভূগোল ও মানচিত্র বোঝেন তাদের কাছে বিষয়টা স্পষ্ট। বিভিন্ন নামাযের সময়, সুবহে কাযেব, সুবহে সাদেক, শাফাকে আহমার, শাফাকে আবইয়ায, যাওয়াল, আসলী ছায়া, মিছলে আউয়াল, মিছলে ছানী, সাহরী ও ইফতারের সময়, বিভিন্ন এলাকায় নামায, সাহরী ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য, কেবলার দিক (আইনে কেবলা, জেহাতে কেবলা) নির্ণয় করা, চন্দ্রের মানযিল, সূর্যের অবস্থানস্থল (مستقر), চান্দ্রমাস কীভাবে শুরু হয়, দেশে দেশে চান্দ্রমাসের সূচনার পার্থক্য কেন হয়, চান্দ্রমাস ২৯শে কেন হয়, ৩০শে কেন হয়, আবার পরপর ২৯ বা ৩০ দিনে কেন হয় ইত্যাদি অনেক বিষয়ই এমন রয়েছে যেগুলো ভালভাবে বুঝার জন্য ভূগোল ও মানচিত্র বুঝার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই প্রয়োজন দ্বীনী প্রয়োজন। এ ছাড়া কুরআনে কারীমের এমন শতাধিক আয়াত ও বহুসংখ্যক হাদীছ রয়েছে যেগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে ভূগোল শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় কম-বেশ জড়িত, সেগুলো সুন্দরভাবে বুঝার জন্য ভূগোল শাস্ত্র ভালভাবে জানার প্রয়োজন রয়েছে[১]। এই প্রয়োজনও দ্বীনী প্রয়োজন। এসব দ্বীনী প্রয়োজন পূরণার্থে পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম একটা গ্রন্থে না হলেও বিভিন্ন গ্রন্থে ভূগোল ও মানচিত্রের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের এসব আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুস্তক-পুস্তিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যা আমাদের জন্য আকর তথ্যাবলির মর্যাদা রাখে।

কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের যে বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট, সেগুলোর সমন্বিত রূপকে 'ইসলামী ভূগোল' আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এরূপ ইসলামী ভূগোলকে একই গ্রন্থে পূর্ণ শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়ার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আরবি ও উর্দূ ভাষায় এ জাতীয় তথ্য সম্বলিত বেশ কিছু গ্রন্থ থাকলেও সেগুলোর কোন একটিতেও পূর্ণ শাস্ত্র সন্নিবেশিত হয়নি। বাংলা ভাষায় তো ইসলামী ভূগোলের উল্লেখযোগ্য কোন বই নেই বললেই চলে। তবে ইসলামী ভূগোলকে একই গ্রন্থে পূর্ণ শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন-বোধের প্রেক্ষিতেই আমার মধ্যে বক্ষমান এই গ্রন্থ 'ইসলামী ভূগোল" রচনা ও সংকলনের আগ্রহ তৈরি হয়। দীর্ঘ তিন যুগ ধরে মনের মধ্যে এই আগ্রহ লালন করে আসছিলাম। অবশেষে আমার জ্ঞান ও যোগ্যতার দৈন্য সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে কাজটি যেভাবেই হোক একটি সমাপ্তিতে উপনীত হয়ে সূর্যের মুখ দেখতে যাচ্ছে। আল-হামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আল-হামদু লিল্লাহ!!

আমাদের দেশে কি তালাবা কি উলামা অনেকের মধ্যেই ভূগোল ও মানচিত্র বুঝার আগ্রহ তেমন একটা ছিল না। এই আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০০ সালের পর থেকে আমি জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া, তাঁতীবাজার, ঢাকা ও জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা– এই দুই প্রতিষ্ঠানে

---

[১] এরকম বহু আয়াত ও হাদীছ আমাদের বক্ষমান গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে।১. এরকম বহু আয়াত ও হাদীছ আমাদের বক্ষমান গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে।

বেশ কয়েকবার ভূগোল ও মানচিত্রের প্রশিক্ষণ দেই। বলা বাহুল্য, এ দেশে এ ধরনের প্রশিক্ষণের সিলসিলা এটাই ছিল প্রথম। এ প্রশিক্ষণগুলোতে অংশ নেয়া শহস্রাধিক তালিবে ইলম ও আলেম-উলামার মাঝে এ শাস্ত্র বিস্তারিতভাবে বুঝার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। প্রশিক্ষণে অংশ নেয়া অনেকেও আবার বহু স্থানে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন এবং এখনও দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে এ শাস্ত্র বুঝার আগ্রহ এখন বেশ কিছুটা বিস্তৃত হয়েছে। এখন এ শাস্ত্র জানতে আগ্রহীদের সংখ্যা বলা যায় একেবারে কম নয়। এরকম আগ্রহীদের অনেকেরই জানা ছিল আমি 'ইসলামী ভূগোল' নামক একটি গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজে হাত দিয়েছি। তাদের বারবার তলব ও তাগিদ সত্ত্বেও অন্যান্য বেশ কিছু গ্রন্থের কাজে লিপ্ততা এ কাজের সমাপ্তিকে বিলম্বিত করেছে। আমি তাদের কাছে অপেক্ষার কষ্টের জন্য ক্ষমা প্রার্থী। সকলের কাছে দুআ প্রার্থী।

'ইসলামী ভূগোল' নামক এ গ্রন্থটির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট

১. এ গ্রন্থটিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে একজন সাধারণ পাঠকও এ শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত মোটামুটি বুঝে নিতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ছাত্রদের জন্য ক্লাসে পাঠদানের উপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটিকে ক্লাসিক্যাল রূপ দেয়ারও অভিপ্রায় ছিল। তাই গ্রন্থটিতে শাস্ত্রীয় প্রাথমিক বিষয়াদিও সংযোজন করা হয়েছে। গ্রন্থটি ক্লাসে পাঠদান করতে চাইলে ১ম অধ্যায় থেকে ৬ষ্ট অধ্যায় পর্যন্ত পাঠদান করলেই যথেষ্ট হবে। অবশিষ্ট চারটি অধ্যায় ছাত্ররা নিজেরাই অনায়াসে বুঝে নিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

২. বাংলার পাশাপাশি বিভিন্ন পরিভাষা এবং বিভিন্ন নামের আরবি, উর্দূ ও ইংরেজিও যথাসম্ভব উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, যাতে এ গ্রন্থটি পাঠ করার পর এ শাস্ত্রের আরবি, উর্দূ ও ইংরেজি গ্রন্থাদি পাঠেও সহযোগিতা লাভ হয়। বিশেষ বিশেষ স্থানে ইংরেজি শব্দাবলির উচ্চারণও টীকায় দিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩. কোন বিষয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোন শাস্ত্রীয় পারিভাষিক শব্দ (যেমন: ভর, ওজন, মহাকর্ষ, অভিকর্ষ, বল ইত্যাদি) এসে গেলে মূল পাঠের মধ্যেই কিংবা টীকায় তার ব্যাখ্যা সংযোজন করে দেয়া হয়েছে, যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠকগণের নিকটও বিষয়টা অস্পষ্ট না থাকে।

৪. প্রাচীন কিতাবপত্রে বিভিন্ন স্থানের যে অক্ষ ও দ্রাঘিমা বর্ণিত রয়েছে এ গ্রন্থে সে বর্ণনাগুলোর অনেক জায়গায়ই কিছু পরিবর্তন এসেছে। স্যাটেলাইটের সুবাদে এখন সারা পৃথিবীর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশগুলো নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। এবং যেকোনো স্থানের অক্ষ ও দ্রাঘিমা জানার জন্য স্যাটেলাইট নির্ভর বিভিন্ন ধরনের latitude longitude Finder সফটওয়ারও বের হয়েছে। এ গ্রন্থে এ জাতীয় সফটওয়ারের ভিত্তিতে যাবতীয় অক্ষ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়েছে।

৫. আগের যুগে ভূগোলের অনেক কিছুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে। এখন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নানান রকম যন্ত্রপাতি ও ডিজিটাল পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, অনেক রকম সফ্টওয়ারও বের হয়েছে। এ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট স্থানে এ জাতীয় যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়ার-এর নামও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। অনেক কিছু নেটে কি শিরোনামে সার্চ করলে পাওয়া যাবে তারও দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৬. আমার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থেও যথাসম্ভব সহজ-সাবলীল ভাষায় সবকিছু উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের পাঠক সহজে উপস্থাপিত বিষয়াদি উপলব্ধি করতে পারে। তবে অনেক শাস্ত্রেই কিছু বিষয় এমন থাকে, যা বিষয় হিসেবেই কমবেশ গভীর, সে রকম বিষয়াদির আত্মস্থকরণ কিছুটা মেধা ও চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগের দাবি তো রাখেই।

৭. অনেক বিষয় বুঝানোর জন্য ভূগোলবিদগণ বেশ জঠিলসব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, আমি সেগুলোকে যথাসম্ভব সহজ পদ্ধতিতে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। তবে ভূগোলবিদদের উপস্থাপিত সেসব জটিল পদ্ধতি কোন্ কোন্ গ্রন্থে রয়েছে তার দিকে কিছু ইংগিত দিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আগ্রহীগণ প্রয়োজনে সেগুলো দেখে নিতে পারেন।

৮. ভূগোলের যেসব বিষয় আমাদের পক্ষে সরেজমিনে তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করা সম্ভব, সেগুলো আমরা যথাসম্ভব সরেজমিনে তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হয়ে সেসব বিষয়ের তথ্যাবলি সমন্বিত করেছি। যেমন: সুবহে কাযেব, সুবহে সাদেক, সূর্যের উদয় অস্তের সময়, চাশতের সময়, যাওয়াল, আসলী ছায়া, মিছলে আউয়াল, মিছলে ছানী, ইস্ফিরারে শাম্স, শাফাকে আহমার, শাফাকে আবইয়ায, কেবলার দিক নির্ণয়, প্রতি পরবর্তী রাতে পূর্বের রাতের চেয়ে কতসময় পর চাঁদ অস্ত যায় ইত্যাদি বহু বিষয়। গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোতে প্রয়োজনে ফাঁকে ফাঁকে আমাদের এই তদন্ত ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু বিষয়ের তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করার জন্য বিশিষ্ট কয়েকজন আলেমের সমন্বয়ে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, যার বিবরণ সামনে পেশ করা হয়েছে।

৯. ভূগোলের একটি শাখা হচ্ছে জ্যোতিষ ভূগোল। ভূগোলের এ শাখায় গ্রহ-নক্ষত্র, বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ, সৌরজগত, ছায়াপথ, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যেগুলো সাধারণ বিজ্ঞান গ্রন্থাদিতে সচরাচর পাওয়া যায়, এ গ্রন্থে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। এগুলোর মধ্যে যার সঙ্গে কোন ইসলামী বিষয় বুঝার সম্পর্ক রয়েছে শুধু সেগুলোকেই যৎকিঞ্চিত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আনা হয়েছে যেন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তি হয়ে যায়। ভূ-ভাগের পাহাড়-পর্বত, শিলা, খনিজদ্রব্য, জলরাশি, বায়ু ইত্যাদির মধ্যে যেগুলোর সঙ্গে ইসলামী বিষয়াদির খুব একটা সংস্পর্শ নেই সেগুলো সম্বন্ধেও তেমন একটা আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়নি। সেগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীগণ সাধারণ ভূগোল গ্রন্থ দেখে নিতে পারবেন, যা সচরাচর পাওয়া যায়।

১০. শুরুতে চিন্তা ছিল এ গ্রন্থে প্রয়োজনীয় মানচিত্রাবলীও সংযোজন করব এবং তাতে কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত স্থানগুলোর সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক বর্ণনাও কিছুটা বিস্তারিত আকারে সংযুক্ত করব। কিন্তু তাতে এ গ্রন্থের কলেবর অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে বিধায় পরবর্তীতে সে চিন্তা বর্জন করে শুধু ইসলামী ভূগোলের বিষয়াদিতেই গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছি। শুধু নিতান্ত প্রয়োজনীয় মানচিত্রের সংযোজন ঘটানো হয়েছে, যাতে কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ স্থানের বর্ণনা পাওয়া যাবে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য ইয়াকুত হামাবী-র মু'জামুল বুলদান-এর ন্যায় ভিন্ন একটি গ্রন্থ তৈরি করার পরিকল্পনা রেখে এ গ্রন্থটিকে অতি দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত রইলাম।

পরিশেষে দু'টো বিষয় আরয করছি। (১) পাঠকবৃন্দ আমার এ গ্রন্থ (ইসলামী ভূগোল)কে এ শাস্ত্রের চূড়ান্ত গ্রন্থ হিসেবে মূল্যায়ন না করে প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্যোগ হিসেবেই গ্রহণ করবেন। এবং বাস্তবেও তেমনই। সেমতে কেউ ইসলামী বিষয়াদি বুঝার জন্য ভূগোল শাস্ত্রের অতি জরুরি কোন বিষয় সংযোজনের প্রয়োজন রয়ে গেছে মনে করলে আমাকে তা অবহিত করবেন। সংগত বিবেচিত হলে এবং আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে পরবর্তীতে তা সংযোজন করা হবে। (২) কেউ গ্রন্থটির কোথাও কোন ভুল-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অবগত হলে আমাকে তা অবহিত করার অনুরোধ রইল, তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমার এই মেহনতকে দ্বীনী মেহনত হিসেবে কবূল করুন এবং এ গ্রন্থটি দ্বারা দ্বীনী ফায়দা মুরাত্তাব করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ইতি বিনীত
(মাওলানা) মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
১৪ নভেম্বর ২০১৯
১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪১

ভৌগোলিক কিছু বিষয় তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করার জন্য গঠিত উলামায়ে কেরামের টিম সম্বন্ধে কিছু কথা

আমাদের এই 'ইসলামী ভূগোল' নামক গ্রন্থের তথ্যাবলী অধিকতর বাস্তবানুগ করার স্বার্থে ভূগোলের যেসব বিষয় আমাদের পক্ষে সরেজমিনে তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করা সম্ভব, সেগুলো যথাসম্ভব সরেজমিনে তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করে নেয়ার জন্য বিশিষ্ট কয়েকজন আলেমের সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করা হয়। এই তদন্ত টিমে আমার (লেখকের) সঙ্গে যারা ছিলেন, তাঁদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং কি কি বিষয়ে তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করা হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

তদন্ত টিমের সদস্য উলামায়ে কেরাম:

১. হযরত মাওলানা আহমদ ঈসা (বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, [যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসা] ঢাকা)।
২. হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদুল হাসান জামশেদ (বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও তাখাস্‌সুল ফিল ফিক্‌হ ওয়াল হাদীছের মুশরিফ, জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, [যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসা] ঢাকা)।
৩. হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কালাম আনছারী (ইফতা বিভাগের দায়িত্বশীল, জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, [যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসা] ঢাকা)।
৪. হযরত মাওলানা মুফতী মুহিউদ্দীন মাসূম (মুফতী ও শাইখুল হাদীছ জামেয়া সুবহানিয়া, উত্তরা, ঢাকা)।
৫. হযরম মাওলানা রেজাউল করীম (মুহাদ্দিস, আলহাজ্জ মুফিজুদ্দী জামেয়া ইসলামিয়া, গাজিপূর)।
৬. হযরত মাওলানা সাঈদুল হক (মারকাযুদ্দাওয়া-এর মুশরিফ হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের প্রতিনিধি)। প্রমুখ।

যে যে বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত ও যাচাই-বাছাই করা হয়ঃ

১ সূর্যাস্তের পূর্বে الشمس لا تحار فيها العين অবস্থা কখন থেকে শুরু হয়।
২ اصفرار الشمس কখন থেকে শুরু হয়।
৩ অস্ত যাওয়ার পূর্বে সূর্যের চাকতির ব্যাস কত ইঞ্চি মনে হয়।
৪ সূর্যের চাকতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দিগন্তের নিচে যেতে কত সময় লাগে।
৫ সূর্যাস্ত (সূর্যের চাকতি দিগন্তের নিচে যাওয়া সমাপ্ত)।
৬ اشتباك النجوم কখন হয়।
৭ شفق احمر সমাপ্ত হওয়ার সময়।
৮ সূর্য ১৬–১৮ ডিগ্রী নিচে থাকা অবস্থায় আকাশের আলো থাকে طولا/عرضا حمرة/بياضا
৯ شفق احمر ও Astronomocal Twilight এক না ভিন্ন।
১০ شفق ابيض শুরু।
১১ شفق ابيض সমাপ্ত।
১২ شفق احمر ও شفق ابيض –এর মাঝে অন্ধকারের ব্যবধান আছে কি না।

১৩ شفق ابيض ও Zodiacal Light এক না ভিন্ন।
১৪ صبح كاذب শুরু (روشنی مستطیل ہو اور سرخی کی آمیزش نہ ہو)।
১৫ صبح كاذب শেষ।
১৬ صبح كاذب ও صبح صادق –এর মাঝে অন্ধকারের ব্যবধান আছে কি না।
১৭ صبح كاذب ও Zodiacal Light এক না ভিন্ন।
১৮ সূর্য ১৮–১৫ ডিগ্রী নিচে থাকা অবস্থায় আকাশের আলো থাকে طولا/عرضا حمرة/بياضا
১৯ صبح صادق শুরু (روشنی مستطیر ہو اور سرخی کی آمیزش ہو)।
২০ সূর্যোদয় (সূর্যের চাকতি দিগন্তের উপরে ওঠা শুরু)।
২১ সূর্যের চাকতি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দিগন্তের উপর উঠতে সময় লাগে।
২২ উদয়ের পর সূর্যের চাকতির ব্যাস কত ইঞ্চি মনে হয়।
২৩ সূর্যোদয়ের পর الشمس لا تحار فيها العين অবস্থা কখন থেকে শুরু হয়।
২৪ সূর্যের ১ নেযা (৬ হাত) পরিমাণ উপরে ওঠার সময়।

প্রথম অধ্যায়

(সূচনা-বিষয়াবলি)

ভূগোলের অর্থ ও সংজ্ঞা (تعريف الجغرافيا)

'ভূগোল' শব্দটি 'ভূ' ও 'গোল' এ দু'টো শব্দ থেকে গঠিত, যার আভিধানিক অর্থ হয় পৃথিবী গোল। ইংরেজিতে বলা হয় Geography (জিয়োগ্রাফী)। শব্দটি Geo এবং graphia[১] নামক দুটি গ্রীক শব্দ দ্বারা গঠিত। Geo অর্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ থেকে গঠিত পৃথিবী এবং graphia বলতে উক্ত পৃথিবীর বর্ণনা। সুতরাং Geography-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মানুষের এই পৃথিবীর বর্ণনা। আরবিতে ব্যবহৃত الجغرافيا শব্দটি Geography থেকেই গৃহীত হয়েছে।

ভূগোলের পারিভাষিক অর্থ বলতে গিয়ে বিভিন্ন যুগে ভূগোলবিদগণ বিভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে মধ্যযুগের পর ভূগোলবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনেকটা সহজবোধ্য ও শাস্ত্রীয় বিষয়াবলী পরিজ্ঞাপক। তা হল- ভূগোল ঐই শাস্ত্র, যাতে পৃথিবীর অবস্থা ও পৃথিবীর অবয়ব, স্থান, বিশালতা, গতি, গাগণিক বৈচিত্র প্রভৃতির গুণগত বিভিন্ন অংশের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। (তথ্যসূত্র: প্রাকৃতিক পরিবেশ)

ভূগোলের আলোচ্য বিষয় (موضوع الجغرافيا)

ভূগোলের আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে- মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক, মানসিক প্রক্রিয়া ও আচরণ, অবস্থান, আঞ্চলিক পৃথকীকরণ, পৃথিবীর বিভিন্ন ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা ইত্যাদি। (তথ্যসূত্র: প্রাকৃতিক পরিবেশ)

---

[১] উচ্চারণ: গ্রাফিয়া।

ভূগোলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (غرض الجغرافيا)

ভূগোলের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি, বিশালতা ও বিস্তার, ভূ-পৃষ্ঠের সাগর মহাসাগরগুলোর অবস্থান, জোয়ার-ভাঁটার প্রকৃতি, স্থান ভেদে উদ্ভিদ বৈচিত্র, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য, বিভিন্ন জায়গার নদী, পাহাড়-পর্বত, উপকূল রেখা প্রভৃতির অবস্থান ভেদে বৈচিত্র ও বৈশিষ্টের কারণ সম্পর্কে জানা, বুঝা ও সে সম্বন্ধে গবেষণা করা। (তথ্যসূত্র: প্রাকৃতিক পরিবেশ) এ হচ্ছে সাধারণ ভূগোলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ইসলামী ভূগোল জানার উদ্দেশ্য হচ্ছে এর সঙ্গে সঙ্গে (১) পৃথিবীর প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে কুরআন সুন্নাহ বর্ণিত তথ্যাবলী বাস্তবতার আলোকে অনুধাবন, (২) সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার কুদরত অনুধাবন এবং (৩) মানব কল্যাণে ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করা।

ভূগোলের শাখাসমূহ (شعب الجغرافيا)

ভূগোলকে প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (ক) সাধারণ ভূগোল বা রীতিবদ্ধ ভূগোল। (খ) বিশেষ ভূগোল। কোন নির্দিষ্ট এলাকার প্রতি লক্ষ না দিয়ে ভূগোলে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলোর ব্যাখ্যাই সাধারণ ভূগোল বা রীতিবদ্ধ ভূগোল।

সাধারণ ভূগোল বা রীতিবদ্ধ ভূগোল দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) প্রাকৃতিক ভূগোল (الجغرافيا الطبيعية)।

(খ) মানবীয় ভূগোল (الجغرافيا البشرية)।

প্রাকৃতিক ভূগোলে ভূত্বকের উপরিভাগের ভৌত পরিবেশ এবং এর বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা থাকে। পৃথিবীর জন্ম, বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ, বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া, শীত-উষ্ণতা ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা প্রাকৃতিক ভূগোলেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক ভূগোলেরও রয়েছে বিভিন্ন উপশাখা। তার মধ্যে একটি শাখায় জ্যোতিষ ভূগোল তথা গ্রহ-উপগ্রহ, নক্ষত্র ও মহাকাশ বিষয়ক আরও বহু বিষয়ের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভূগোলের এ শাখাকে আরবিতে বলা হয় الجغرافيا الفلكية। আর মানবীয় ভূগোলে মানুষের জীবন-প্রণালী, সামাজিক রীতি নীতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আলোচনা থাকে। সাংস্কৃতিক ভূগোল, রাজনৈতিক ভূগোল, জনসংখ্যা ভূগোল, নগর ভূগোল, অর্থনৈতিক ভূগোল ইত্যাদি এ শাখারই অন্তর্ভূক্ত।

বিশেষ ভূগোল দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) বিষয় ভিত্তিক ভূগোল

(খ) আঞ্চলিক ভূগোল। কোন এলাকার অঞ্চল ভিত্তিক সমীক্ষাই আঞ্চলিক ভূগোল।

একটি ছকের মাধ্যমে সংক্ষেপে ভূগোলের শাখাসমূহ দেখানো হল।

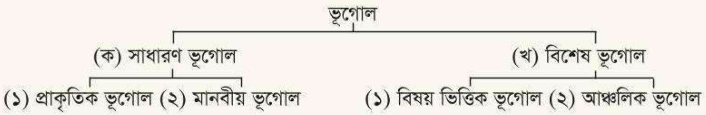

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূগোল শাস্ত্রের প্রয়োজন ও উপকারিতা

১. যেসব আয়াত ও হাদীছের বক্তব্যের সঙ্গে ভূগোল শাস্ত্রের কোন বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো ভাল করে বুঝা।
২. কুরআন হাদীছের ভৌগোলিক তথ্যাদি ভাল করে বুঝা।
৩. আল্লাহর কুদরত অনুধাবন।
৪. পূর্বসূরীদের বিভিন্ন অবদান সম্বন্ধে অবগত হয়ে অনুরূপ অবদান রাখার চেতনা লাভ করা।
৫. বিভিন্ন দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া। এটা নিজেদের মধ্যে উন্নত মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সহায়ক হয়।
৬. বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করার চেতনা সৃষ্টি হয়। যা দ্বারা বহু শিক্ষা লাভ হতে পারে।
৭. প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে গবেষণার মনোভাব সৃষ্টি হয়, যে গবেষণার ফল মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

মানচিত্রের সংজ্ঞা (تعريف الخريطة)

বড় আকারের কোন এলাকার প্রতিকৃতিকে মানচিত্র বলে। মানচিত্রে সমগ্র পৃথিবী কিংবা তার কোন অংশের প্রতিকৃতি সঠিক দিক অনুসারে নির্দিষ্ট স্কেলে সমতল কাগজের উপর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা দ্বারা সৃষ্ট ছকের মধ্যে অঙ্কন করা হয়ে থাকে।

মানচিত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় Map[১]। শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ম্যাপ্পা (Mappa) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ এক খণ্ড কাপড়। ম্যাপ্পা (Mappa) শব্দটি ক্রমে অপভ্রংশ হয়ে ম্যাপ (Map) শব্দে পরিণত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট মান তথা পরিমাপ অনুযায়ী ম্যাপের চিত্র অঙ্কন করা হয় বলে বাংলাতে ম্যাপকে 'মানচিত্র' বলা হয়।

আরবিতে মানচিত্রকে বলা হয় خريطة বা خارطة। এর সংজ্ঞা আরবিতে এভাবে দেয়া হয়–

ما ترسم عليه هيئة الأرض أو إقليم منها.

অর্থাৎ, যার উপর সমগ্র পৃথিবী বা কোন ভূ-ভাগের প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হয়।

উল্লেখ্য, মানচিত্রের সংকলনকে বলা হয় মানচিত্রাবলি। অর্থাৎ, বহুসংখ্যক মানচিত্রের সমন্বয়ে যে বই তৈরি করা হয়, তাকে বলে মানচিত্রাবলি বা ভূচিত্রাবলি। ইংরেজিতে বলা হয় Atlas[২]। এশব্দটিরই আরবি করা হয়েছে أطلس।

মানচিত্রের প্রয়োজন ও উপকারিতা

মানচিত্র ভূগোল পঠন-পাঠনের জন্য এক প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। ভূগোলে বর্ণিত বিষয়াদি মানচিত্রের সাথে মিলিয়ে পড়লে সহজেই সেগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাতে করে পাঠকের পক্ষে ভূগোলে বর্ণিত বিষয়াদি বুঝা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু ভূগোলে বর্ণিত বিষয়াদিই নয়, মানচিত্র দ্বারা ইতিহাসে বর্ণিত বিভিন্ন স্থান সম্পর্কেও ধারণা স্পষ্ট করে নেয়া সহজ হয়। ইতিহাসে বর্ণিত বহু বিষয় মানচিত্রের সহযোগিতায় স্পষ্ট হয়ে থাকে। অতএব মানচিত্রকে ইতিহাস ও ভূগোল উভয় শাস্ত্রের সহযোগী আখ্যায়িত করা যায়।

---

[১] উচ্চারণ: ম্যাপ্।
[২] উচ্চারণ: অ্যাট্ল্যাস্।

মানচিত্রের প্রকার

মানচিত্রের প্রকার বলে শেষ করা যায় না। একই মানচিত্রে সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত পরিবেশন করতে গেলে মানচিত্র দুর্বোধ্য হয়ে যায়। তাই বিভিন্ন ধরনের তথ্য-উপাত্ত পরিবেশন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র তৈরি করা হয়। কোন মানচিত্রে প্রাকৃতিক বিষয় দেখানো হয়, সেগুলোকে বলে 'প্রাকৃতিক মানচিত্র'। কোন মানচিত্রে সাংস্কৃতিক বিষয় দেখানো হয়, সেগুলোকে বলে 'সাংস্কৃতিক মানচিত্র'। প্রাকৃতিক মানচিত্রের মধ্যে আবার কোনটাতে ভূ-তাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত দেখানো হয়, কোনটাতে আবহাওয়া বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত দেখানো হয়, কোনটাতে উদ্ভিদ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত দেখানো হয়, কোনটাতে মৃত্তিকা বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত দেখানো হয়। এমনিভাবে সাংস্কৃতিক মানচিত্রের মধ্যে কোনটাতে রাজনৈতিক তথ্য-উপাত্ত দেখানো হয়, কোনটাতে অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত দেখানো হয়, কোনটাতে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত দেখানো হয় প্রভৃতি। এভাবে মানচিত্রের রয়েছে বা হতে পারে বহু প্রকার।

ভূগোল ও মানচিত্রে মুসলমানদের অবদান

অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের ন্যায় ভূগোল ও মানচিত্রেও মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। ভূগোল ও মানচিত্রের সঙ্গে মুসলমানদের চর্চা বিজড়িত হওয়ার পশ্চাতে অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান-প্রীতির পাশাপাশি কুরআনে কারীমের নির্দেশনাও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কুরআনে কারীমে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পরিণাম স্বচক্ষে দেখে উপদেশ লাভ করার জন্য পৃথিবী ভ্রমণের নির্দেশনা এসেছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.

অর্থাৎ, (হে নবী!) তুমি বল, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখ মিথ্যাচারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। (সূরা আনআম : ১১)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ.

অর্থাৎ, (হে নবী!) তুমি বল, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখ কীভাবে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তারপর তিনি পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। (সূরা আনকাবূত: ২০)

এ জাতীয় নির্দেশনা কুরআনে কারীমের আরও কয়েকটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এসব নির্দেশনা থেকেই মুসলমানদের মাঝে পৃথিবী ভ্রমনের মানসিক আনুকূল্য ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বহু মুসলিম মনীষী তাদের জীবনের বিরাট অংশ পৃথিবী ভ্রমণের জন্য উৎসর্গ করেছেন। এরূপ পর্যটক মুসলিম মনীষীর সংখ্যা অনেক ভারি। এসব পর্যটক মুসলিম মনীষীগণ তাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তারা তাদের লেখায় বহু এলাকার ভৌগোলিক বর্ণনা, সীমানা, জলবায়ুর অবস্থা, নদ-নদী, সাগর, হ্রদ, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির বর্ণনা ইত্যাদি ভূগোল শাস্ত্রের

বহু রকম তথ্য-উপাত্তের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অনেকে তাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানের মানচিত্রও এঁকে দেখিয়েছেন। সাগর ও নদ-নদীর মানচিত্র এঁকে দেখিয়েছেন। অনেকে তাদের দেখা অনুসারে গোটা পৃথিবীর মানচিত্রও এঁকে দেখিয়েছেন। এভাবে তাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুধু ভ্রমণ-বৃত্তান্তই থাকেনি, বরং সেগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূগোল ও মানচিত্রের তথ্য-উপাত্তের আকর। পরবর্তীতে সেসব তথ্য-উপাত্তই পরিমার্জিত হয়ে এবং তার সঙ্গে আরও সংযোজন ও পরিবর্ধন ঘটে ভূগোল ও মানচিত্র সাম্প্রতিক উৎকর্ষের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

ভ্রমণের জন্য কুরআনী নির্দেশনার পাশাপাশি আরব মুসলিমদের দেশ বিজয়, জেহাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে গমন আর বিশেষ করে আরব বণিকদের বাণিজ্য উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে গমন– এসব বিষয়ও বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল সম্বন্ধে তাদের জানার ঔৎসুক্য বৃদ্ধির কারণ ঘটায়। এভাবে মুসলমানদের ভৌগোলিক তথ্যভাণ্ডারে সমৃদ্ধি ঘটে।

এসবের পাশাপাশি আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে বাগদাদে 'বাইতুল হিক্‌মাহ' (এর অনুবাদ করা যায় 'বিজ্ঞানাগার') প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ফালসাফায়ে ইউনানী (গ্রীকদর্শন/গ্রীক-বিজ্ঞান)ও আরবিতে অনুবাদ করা হয়। আর গ্রীক বিজ্ঞান তখন বিভিন্ন শাখায় বিভাজিত ছিল না। বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখাই তাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। ভূবিজ্ঞান বা ভূগোল শাস্ত্রও তাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। ফলে ভূবিজ্ঞান বা ভূগোল শাস্ত্রও অনূদীত হয়ে মুসলমানদের গোচরে আসে এবং তা মুসলমানদের চিন্তাধারায় রেখাপাত করে। এভাবেও মুসলমানদের ভূগোল চর্চা এবং ভূগোল শাস্ত্রের অনুরাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

নিম্নে আমরা প্রাথমিক যুগ ও মধ্যযুগের মুসলিম পর্যটক ও ভূগোল-বিদ্যায় অনুরাগী মুসলিম মনীষীদের ভৌগোলিক তথ্যসমৃদ্ধ কিছু গ্রন্থের বিবরণ ও পরিচিতি পেশ করছি। এসব গ্রন্থের বিবরণ ও পরিচিতি থেকে প্রতীয়মান হবে যে, ভূগোল ও মানচিত্রে মুসলমানদের অবদান সূচনা-লগ্ন থেকে সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত কীভাবে গতিশীল ছিল।

ভূগোল ও মানচিত্র বিষয়ক মুসলিম মনীষীদের রচনাবলী

ভূগোল ও মানচিত্র বিষয়ে মুসলমানদের প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে। নিম্নে তার মধ্যে প্রাথমিক ও মধ্য যুগের বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরা হল।

- আহসানুত্তাক্বাসীম (أحسن التقاسيم)। পূরো নাম– আহসানুত্তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) গ্রন্থকার: মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-মাকদিসী (৩৩৬–৩৮০ হি.)। 'আল-মাকদিসী' নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থে জলবায়ু বিষয়ক আলোচনা তথা নদ-নদী, সাগর,হ্রদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। জনবসতী, আবাদী সম্বন্ধেও আলোচনা রয়েছে।
- আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক (المسالك والممالك)। গ্রন্থকার: স্পেনের কর্ডোভার অধিবাসী আবূ উবায়দ আল-বিক্‌রী (৪০১/৪৩২–৪৮৭ হি.)। এ গ্রন্থে সাধারণ ও আঞ্চলিক ভূগোল বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এটি আঞ্চলিক ভূগোল বিষয়ক পথনির্দেশক গ্রন্থ।

- আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক (المسالك والممالك)। গ্রন্থকার: আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দিল্লাহ। 'ইবনে খুর্‌দাযবাহ' উপনামে তিনি পরিচিত (মৃত. আনু. ২৮০ হি.)। তিনি খ্রিস্টীয় ৮৪৪–৮৪৮ সময়কালে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের বিবরণ লিখে আঞ্চলিক ভূগোলে সর্বোচ্চ পাণ্ডিত্বের স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি পেশাগতভাবে জিবাল প্রদেশে[১] ডাক-প্রধান পদে নিয়োজিত থাকার কারণে চীন, কোরিয়া এবং জাপানের মত দূরবর্তী অঞ্চল সম্বন্ধেও ভৌগোলিক তথ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার গ্রন্থে বিশ্বের বাণিজ্য পথগুলোর সারসংক্ষেপ ছিল। তাই পরবর্তীকালে আরব ভূগোলবিদদের কাছে এ গ্রন্থটি একটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে।
- সূরাতুল আর্‌দ/আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক (صورة الأرض/المسالك والممالك) গ্রন্থকার: মুহাম্মাদ ইবনে হাওকাল আল-বাগদাদী আল-মাওসিলী (মৃত. ৩৬৭ হি. পরবর্তী)।
- কিতাবুল বুল্‌দান (كتاب البلدان) গ্রন্থকার: আহমদ ইবনে ইসহাক (আবী ইয়া'কূব) ইবনে জাফর (মৃত. ২৮২/২৮৪/২৭৮ হি.)। 'ইয়া'কূবী' নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি বাগদাদের অধিবাসী একজন পর্যটক ভূগোলবিদ ছিলেন। পূর্বে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমে মরক্কো পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। কিছুকাল আর্মেনিয়াতেও অবস্থান করেছেন। এ গ্রন্থটি মূলত আঞ্চলিক ভূগোলের অন্তর্ভূক্ত পথনির্দেশক গ্রন্থ। গ্রন্থকার তার এই চমৎকার কিতাবের জন্য বিখ্যাত ভূগোলবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।
- মু'জামুল বুলদান (معجم البلدان) গ্রন্থকার: ইয়াকূত আল-হামাবী (৫৭৪–৬২৬ হি.)। তিনি মূলত রূমী ছিলেন। পরবর্তীতে মৃত্যু পর্যন্ত বাগদাদেই অবস্থান করেছেন। মু'জামুল বুলদান গ্রন্থটি ভূগোলে মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট অবদানগুলোর একটি। এতে অভিধান ভিত্তিক ধারাবাহিকতায় ভৌগোলিক প্রায় সমস্ত স্থান, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।
- তাক্বউয়ীমুল বুলদান (تقويم البلدان) গ্রন্থকার: ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ। আবুল ফিদা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ। এ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন দেশ ও তার ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তার এ গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং সুনাম অর্জন করেছিল।
- মু'জামু মা ইস্তা'জামা (معجم ما استعجم) পুরো নাম মু'জামু মা ইস্তা'জামা মিন আসমাইল বিলাদি ওয়াল মাওয়াজিয়ি (معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع) গ্রন্থকার: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দিল আযীয আল-বিক্‌রী আল-আন্দালূসী। তার জন্ম ৪০১ মতান্তরে ৪৩২ হিজরিতে। মৃত ৪৮৭ হিজরী। গ্রন্থকার গ্রন্থটিতে হাদীছ ও ইতিহাসে বর্ণিত স্থান, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর, কূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি আভিধানিক বিন্যাসে বিন্যস্ত।
- কিতাবুল আশ্‌কাল (كتاب الأشكال) গ্রন্থকার: আহমদ ইবনে সাহ্‌ল আবূ যায়েদ আল-বালাখী (৮৪৯– ৯৩৪ খৃ.)। তিনি একাধারে চিকিৎসা, গণিত ও ভূগোল শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কিতাবুল আশকাল মূলত একটি মানচিত্রাবলী গ্রন্থ। এ গ্রন্থের জন্যই তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

---

[১] উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি প্রদেশের নাম ছিল 'জিবাল'।

- আখবারুস-সীন ওয়াল হিন্দ (أخبار الصين والهند) গ্রন্থকার: সুলাইমান আত-তাজির ও আবূ যায়েদ হাসান আস-সাইরাফী। আবূ যায়েদ হাসান আস-সাইরাফী (মৃত ৯২০ খৃ.) ২৫৭ হিজরী মোতাবেক ৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত মহাসাগর হয়ে চীনে সফর করেছিলেন। তার এ গ্রন্থে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর প্রভৃতি সামুদ্রিক পথের বিবরণ রয়েছে। ভারতবর্ষ ও চীনের প্রাকৃতিক ভৌগোলিক অবস্থা এবং চীনের ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। এতে আরও বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধেও আলোচনা রয়েছে। এটি ভৌগোলিক বিবরণের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

- আজাইবুল হিন্দ (عجائب الهند) গ্রন্থকার: বুযুর্ক ইবনে শাহরিয়ার (মৃত: ৯৫৩/৫৪ খৃ.)। তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। আব্বাসী খলীফা মুক্তাদির বিল্লাহর শাসনামলে ওমানের গভর্ণর ছিলেন। আরব বণিকদের ভারত মহাসাগর ভ্রমণের সোনালী যুগে তিনি তার আজাইবুল হিন্দ (যার অর্থ: ভারত বিচিত্রা) নামক এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

- আজাইবুল মাখলূকাত (عجائب المخلوقات) পুরো নাম– আজাইবুল মাখলূকাত ওয়া গারাইবুল মাওজূদাত (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) গ্রন্থকার: যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাযবীনী (১২০৩–১২৮৩ খৃ.)। এ গ্রন্থটি কেবল মধ্যযুগেই নয় আধুনিক যুগেও জনপ্রীয়। গ্রন্থটি কস্‌মোগ্রাফি বা সৃষ্টিতত্ত্ব-এর গ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এর প্রথম খণ্ডে আকাশ সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ভূ-ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে।

- মুরূজুয্-যাহাব (مروج الذهب) পুরো নাম– মুরূজুয্-যাহাব ও মাআদিনুল জাওহার (مروج الذهب ومعادن الجوهر) গ্রন্থকার: আবুল হাসান ইবনে আলী আল-মাসঊদী (মৃত্যু: ৩৪৬ হি. ৯৫৬ খৃ.)। গ্রন্থকার মাসঊদী ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক এবং পর্যটক। তিনি আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, এবং চীন সাগরে নৌ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ভূ-পর্যটনও করেছেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, মাকরান উপকূল, উত্তর ভারত, শ্রীলংকা, কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। গ্রন্থকার ৪ খণ্ডের এই বিশাল গ্রন্থে ইতিহাসের সাথে সাথে ভূগোল শাস্ত্রের ভূমিকম্প, বৈচিত্রময় ভূতাত্ত্বিক প্রপঞ্চ, জোয়ার-ভাটা সংক্রান্ত নৌ চলাচল বিষয়ক সমস্যা, সমুদ্রের উৎপত্তি, নদীর ক্ষয়চক্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকারের এ গ্রন্থ একটি ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক বিশ্বকোষ।

- নুয্হাতুল মুশ্তাক্ব (نزهة المشتاق) পুরো নাম– নুয্হাতুল মুশ্তাক্ব ফী ইখতিরাক্বিল আফাক (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) গ্রন্থকার: মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-ইদ্রীছী (আনু. ১১০০–১১৬৬ খৃ.)। 'আশ-শরীফ আল-ইদ্রীছী' নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। কর্ডোবাতে লেখাপড়া করেন। এ গ্রন্থটিকে বৈজ্ঞানিক ভূগোল গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটি মধ্যযুগীয় ভূগোল-গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। গ্রন্থকার এতে পৃথিবীর মানচিত্রও অঙ্কন করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় পৃথিবীর আকৃতি, সমুদ্রসমূহের উৎপত্তি, উপকূলীয় বিভিন্ন দেশ ও জাতির অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

- আর-রওযুল মু'তার ফী খাবরিল আক্বতার (الروض المعطار في خبر الأقطار) গ্রন্থকার: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে আব্দিল মুন্ইম আল-হিম্য়ারী। তার জন্ম ও মৃত্যু সন সম্বন্ধে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। একমতে তার মৃত্যু সন ৭২৭ হি. মোতাবেক ১৩২৭ খৃ.। আর-রওযুল মু'তার গ্রন্থটি ভৌগোলিক অভিধান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। অভিধানের বিন্যাসেই এটি রচিত।

- হুদূদুল আলামি (حدود العالم) পুরো নাম– হুদূদুল আলামি মিনাল মাশরিকি ইলাল মাগরিবি (حدود العالم من المشرق إلى المغرب) এ গ্রন্থটি ফার্সি ভাষায় আঞ্চলিক বিন্যাসের ভিত্তিতে লিখিত বিশ্ব-ভূগোলের অনুরূপ একটি গ্রন্থ। ৩৭২ হিজরিতে গ্রন্থটি লেখা হয়। লেখক উত্তর আফগানিস্তানের একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। মূল গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। তবে রাশিয়ান প্রাচ্যবিদ তোমানস্কির মাধ্যমে গ্রন্থটি সম্বন্ধে জানা যায়। এটি ইংরেজি ও আরবিতে অনূদিত হয়েছে। ইউসুফ আল-হাদী ফার্সী থেকে আরবিতে গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন, যা ১৪১৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে।

- নুযহাতুল কুলূব (نزهة القلوب) গ্রন্থকার: হামদুল্লাহ মুস্তাওফী কাযবীনী। গ্রন্থটি ফার্সী ভাষায় রচিত। এ গ্রন্থটিও ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ। মুহাদ্দিস মীর হাশেম কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে।

- রিহ্লাতু ইবনে বাতূতা (رحلة ابن بطوطة) গ্রন্থের মূল নাম– تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار। গ্রন্থকার: আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে বাতূতা (মৃত. ১৩৭৭ খৃ.)। 'ইবনে বাতূতা' নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম পর্যটক। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'মুসলিম পর্যটকদের আমীর' উপাধি প্রদান করেছে। তিনি মরক্কো থেকে মিসর, শাম, ইরাক, পারস্য, হেজায, ইয়ামান পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। গুণগত মানের দিক থেকে তার ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলো অতুলনীয়। তিনি তার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভৌগোলিক তথ্যের খনি রেখে গেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্যারিসে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ফরাশি ভাষায় অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৭ খৃ. মোতাবেক ১৪০৭ হিজরিতে বৈরূতের দারু ইহ্ইয়াউল উলূম লাইব্রেরি প্রকাশ করে। গ্রন্থটি পৃথিবীর আরও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

- সূরাতুল আর্‌দ্ (صورة الأرض) গ্রন্থকার: আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-খুওয়ারিয্মী (মৃত. ৮৩৫ খৃ.)। তিনি তার গ্রন্থে বাতলীমূস (بطليموس/টলেমি)–এর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থাদির তথ্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি মানচিত্র তৈরির কাজও করেছিলেন।

- রস্মুল মা'মূরি মিনাল আর্দ্ (رسم المعمور من الأرض) গ্রন্থকার: আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব আল-কিন্দী (মৃত. ৮৩৭)। গ্রন্থের নাম থেকেই স্পষ্ট যে, এতে পৃথিবীর আবাসিক অংশের মানচিত্রাবলী ছিল। যে সমস্ত গ্রন্থ দ্বারা বিখ্যাত ভৌগোলিক মানচিত্রাবলির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এ গ্রন্থটিকে তার একটি গণ্য করা হয়।

উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর লেখকগণ ছাড়াও মুসলিম মনীষীদের মধ্যে বহু ভূগোলবিদ অতিবাহিত হয়েছেন। যাদের অনেকে ভূগোলগ্রন্থের সাথে মানচিত্রও সংযোজন করেছেন। যেমন: হিজরী ৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ আলেম আবূ ইসহাক আল-ইস্তাখ্রী তার বর্ণনামূলক ভূগোল গ্রন্থের সঙ্গে ব্যাখ্যামূলক মানচিত্রও জুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভূগোল ও মানচিত্র বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আরব থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর ও পূর্বদিকে ভারত মহাসাগর হয়ে ভারতের কাশ্মির পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। আবুল কাসেম ইবনে হাওকাল (৯৭৭ খৃ.)ও তার বর্ণনামূলক ভূগোল গ্রন্থের সঙ্গে ব্যাখ্যামূলক মানচিত্র জুড়ে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আব্দুর রাজ্জাক সমরকন্দী, আমীন আহমদ রাজী, আবুল ফজল প্রমুখ অনেকেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তসহ ভৌগোলিক বিবরণী লেখক হিসেবে অতিবাহিত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, এতক্ষণ ইসলামের প্রথম ও মধ্যযুগের লেখা কিছু ভৌগোলিক গ্রন্থের পরিচয় তুলে ধরা হল। এর পরবর্তীতে এবং নিকট অতীতে ইসলামী ভূগোল সম্বন্ধে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার মধ্যে যেগুলোতে ভূগোল সম্পর্কিত ইসলামী বিষয়াদি কম-বেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার কয়েকটি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

- আল-হাইআতুল কুবরা (الهيئة الكبرى) গ্রন্থকার: আল্লামা মুহাম্মাদ মূসা রূহানী বাযী পাকিস্তানী। মৃত: ১৪১৯ হি. মোতাবেক ১৯৯৮ খৃ.। গ্রন্থটিতে ভূগোল শাস্ত্রের সাধারণ সব ধরনের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীতে উল্লেখিত গ্রন্থদ্বয়– 'আল-হাইআতুল উস্‌তা' ও 'আল-হাইআতুস্‌ সুগ্‌রা' মূলত এ গ্রন্থেরই ২য় ও ৩য় খণ্ড। গ্রন্থগুলো আরবি ভাষায় রচিত। তবে উর্দূ তর্জমাও সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।
- আল-হাইআতুল উস্‌তা (الهيئة الوسطى)
- আল-হাইআতুস্‌ সুগ্‌রা (الهيئة الصغرى)
- ফালাকিয়্যাতে জাদীদাহ (فلکیات جدیدہ) গ্রন্থকার : আল্লামা মুহাম্মাদ মূসা রূহানী বাযী পাকিস্তানী (মৃত: ১৪১৯ হি. মোতাবেক ১৯৯৮ খৃ.)। উর্দূ ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি জ্যোতিষ ভূগোলের আলোচনায় সমৃদ্ধ।
- ফাহ্‌মুল ফালাকিয়্যাত (فہم الفلکیات) গ্রন্থকার : সাইয়্যেদ শাব্বীর আহমদ সাহেব কাকাখীল। উর্দূ ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটিতে শুধু জ্যোতিষ ভূগোলের আলোচনা রয়েছে।
- তাস্‌হীলুল ফালাকিয়্যাত (تسہیل الفلکیات) গ্রন্থকার: প্রফেসর আব্দুল লতীফ পাকিস্তানী ও ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ খালেদ পাকিস্তানী। উর্দূ ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটিতে শুধু জ্যোতিষ ভূগোলের আলোচনা রয়েছে।
- আল-জুগ্‌রাফিয়া আল-ফালাকিয়্যাহ (الجغرافيا الفلكية) গ্রন্থকার : বিশিষ্ট ভূগোলবিদ সৌদি আরবের جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -এর উস্তাদ আনওয়ার আব্দুল গনী আল-আক্কাদ। আরবি ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটিতে শুধু জ্যোতিষ ভূগোলের আলোচনা রয়েছে।
- ইলমুল ফালাক ফিত্তুরাছিল আরাবী (علم الفلك في التراث العربي) গ্রন্থকার: ডক্টর আলী হাসান মূসা। ২০০১ সালে গ্রন্থটি দারুল ফিক্‌র দামেশ্‌ক থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি জ্যোতিষ ভূগোল বিষয়ক।

- আর্‌দুল কুরআন (ارض القرآن) গ্রন্থকার : দারুল মুসান্নিফীন, লাখনু-র প্রধান মুহাক্কিক আলেম সাইয়্যেদ সুলাইমান নদবী (মৃত: ১৩৭৩ হি.)। উর্দূ ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটি কুরআনে উল্লেখিত জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের বাসস্থানসমূহের ভৌগোলিক তথ্যবহুল আলোচনায় সমৃদ্ধ এক অনন্য গ্রন্থ।

মক্কা মদীনার ভৌগোলিক বিষয় সম্পর্কিত বিশেষ গ্রন্থাবলী

পূর্বের পরিচ্ছেদে ভূগোল বিষয়ক মুসলিম মনীষীদের রচিত কয়েকটি গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু আঞ্চলিক ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থও রয়েছে। আঞ্চলিক ভূগোলের মধ্যে মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারা সম্পর্কিত প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে। মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার সঙ্গে হজ্জ, উমরা ও যিয়ারতের সম্পর্ক থাকায় এ দুই অঞ্চলের ভৌগোলিক বর্ণনার প্রতি মুসলিম মনীষীদের মনোযোগ অধিক আকর্ষিত হয়েছে এবং এরই ফলে এ দুই অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনার প্রতি অনেকের বিশেষ আবেগও জড়িত রয়েছে। মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রচুর। নিম্নে তার মধ্যে কয়েকটির পরিচিতি তুলে ধরা হল।

- আখবারু মক্কাতা (أخبار مكة) গ্রন্থকার: আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-আযরাক্বী, আল-গাসসানী, আল-মক্কী (মৃত. ২৫০ হি.)। সংক্ষেপে তিনি 'আল-আযরক্বী' নামে পরিচিত। গ্রন্থটিতে মক্কার ইতিহাসসহ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল ও তার নিদর্শনাবলী, মক্কায় পৌছার পথঘাট ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি মক্কার ভৌগোলিক বিষয়াদির এক ব্যাপক দলীল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
- আখবারু মক্কাতা (أخبار مكة) পুরো নাম– আখবারু মক্কাতা ফী ক্বাদীমিদ্দাহ্‌রি ওয়া হাদীছিহী (□خبار مكة في قديم الدهر وحديثه) গ্রন্থকার: আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনুল আব্বাস আল-মক্কী আল-ফাকিহী (মৃত. ২৭২ হি.)। সংক্ষেপে তিনি 'আল-ফাকিহী' নামে পরিচিত। এ গ্রন্থে মক্কা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল-আযরাক্বী-র আখবারু মক্কাতা গ্রন্থ থেকে অধিকতর তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।
- তারীখু মক্কা আল-মুকাররমাহ (تاريخ مكة المكرمة) গ্রন্থকার: ডক্টর ইলিয়াছ আব্দুল গনী পাকিস্তানী মুদ্দা জিল্লুহু। এ গ্রন্থে মক্কা মুকাররমার ঐতিহাসিক পাহাড়-পর্বত, ঐতিহাসিক মসজিদসমূহ, বিশেষত হজ্জ ও উমরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থান ও স্থাপনা সম্বন্ধে এবং বাইতুল্লাহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় ও স্থাপনা সম্বন্ধে সাবলীল ও সর্বশেষ তাহকীকী আলোচনা পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সচিত্র।
- ওয়াফাউল ওয়াফা (وفاء الوفاء) পুরো নাম ওয়াফাউল ওয়াফা বিআখ্‌বারি দারিল মুস্তফা (□□□□ الوفاء بأخبار دار المصطفى)। রচয়িতা : নূরুদ্দীন আলী ইব্‌নে আহমদ আস-সাম্‌হূদী (মৃত. ৯১১ হি.)। গ্রন্থটি মদীনা মুনাওওয়ারার সীমানা, ঘর-বাড়ী, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, কূপ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যাবলীতে সমৃদ্ধ। এ গ্রন্থটি রচয়িতারই আরেকটি গ্রন্থ –ইক্বতিফাউল ওয়াফা বিআখ্‌বারি দারিল মুস্তফা-র সংক্ষিপ্তসার। গ্রন্থটি ২ ভলিউমে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।
- মাআলিমু দারিল হিজ্‌রাহ (معالم دار الهجرة) গ্রন্থকার: জামেয়া আযহারের 'উসূলুদ্দীন' বিভাগের উস্তায ইউসুফ আব্দুর রাজ্জাক। গ্রন্থকার এ গ্রন্থে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে মদীনা মুনাওওয়ারার বহু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক

বিষয়েও বিজ্ঞ আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটি (২য় মুদ্রণ ১৪০১ হি. মোতাবেক ১৯৮১ খৃ.) মদীনা মুনাওওয়ারার 'আল-মাকতাবাতুল ইল্‌মিয়্যা' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

- আছারুল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ (آثار المدينة المنورة) গ্রন্থকার আব্দুল কুদ্দূস আল-আনসারী (عبد القدوس الأنصاري)। গ্রন্থকার মদীনার অলি-গলি, পাহাড়-পর্বত, টিলা, কূপ, উপত্যকা, বাজার, কবরস্তান সবকিছু সরেজমিনে ঘুরে ঘুরে দেখে সেগুলোর ভৌগোলিক অবস্থা ও ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। মদীনার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে যারা গবেষণা করতে চান তাদের জন্য এটি একটি আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে মদীনার আল-মাকতাবাতুল ইল্‌মিয়্যা আত-তিজারিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত হয়।
- তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ (تاريخ المدينة المنورة) গ্রন্থটির মূল নাম– আদ্দুর্‌রাতুছ ছামীনাহ ফী আখবারিল মাদীনাহ (الدرة الثمينة في أخبار المدينة)। গ্রন্থকার: আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মাহমূদ আল-বাগদাদী। তিনি ৫৭৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৪৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। 'ইবনুন্নাজ্জার' নামে তিনি সুপরিচিত। গ্রন্থকার এ গ্রন্থে মদীনা মুনাওওয়ারার বিভিন্ন গোত্র, তাদের বাসস্থান, পাহাড়-পর্বত, কূপ, বিভিন্ন ঐতিহাসিক মসজিদ, বাকী' কবরস্থান, মসজিদে নববীর অভ্যন্তরীণ যাবতীয় বিষয়ের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটি মদীনা মুনাওওয়ারার 'মাকতাবাহ দারুয যামান' থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
- তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ (تاريخ المدينة المنورة) গ্রন্থকার: আবূ যায়দ উমার ইবনে শাব্বাহ আন-নামীরী আল-বসরী (মৃত. ২৬২ হি.)। এ গ্রন্থে মদীনায় বিভিন্ন গোত্রের বাসস্থান, সাহাবীদের গৃহ, সাহাবীদের কবর, মদীনার কূপ ও মদীনার বিভিন্ন সাহাবীর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। যাবতীয় বর্ণনা সনদসহ রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। রেওয়ায়েতসমূহের তাখরীজ ও তা'লীকের কাজ করেছেন আলী মুহাম্মাদ দান্‌দাল ও ইয়াসীন সা'দুদ্দীন বয়ান। গ্রন্থটি ২ খণ্ডে 'দারুল কুতুবিল ইল্‌মিয়্যা' বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।
- তারীখুল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ (تاريخ المدينة المنورة) গ্রন্থকার: ডক্টর ইলিয়াছ আব্দুল গনী পাকিস্তানী মুদ্দা জিল্লুহু। এ গ্রন্থে মদীনা মুনাওওয়ারার ঐতিহাসিক পাহাড়-পর্বত, তৎকালীন বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির বাসস্থান, কূপ, উপত্যকা ও ঐতিহাসিক মসজিদসমূহ সম্বন্ধে বিশেষত মসজিদে নববী সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে সাবলীল ও সর্বশেষ তাহকীকী আলোচনা পেশ করা হয়েছে।
- তারিখে মদীনা মুনাওওয়ারাহ (تاریخ مدینہ منورہ) গ্রন্থকার: মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বূদ। গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত। এ গ্রন্থে মদীনা মুনাওওয়ারার ঐতিহাসিক মসজিদসমূহ সম্বন্ধে বিশেষত মসজিদে নববী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের আলোচনায় ভৌগোলিক তথ্যের তুলনায় ঐতিহাসিক তথ্যবলী প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রন্থটি বিংশ শতাব্দির শেষ দিকে রচিত। এটি 'পারভেজ বুক ডিপো' দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।
- আদ-দুররুছ ছামীন (الدر الثمين) পুরো নাম– আদ-দুররুছ ছামীন ফী মাআলিমি দারির রসূলিল আমীন (الدر الثمين في مَعالم دار الرسول الأمين) গ্রন্থকার: গালী মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীত্বী (غالي محمد الأمين الشنقيطي)। গ্রন্থটি আধুনিক যুগের রচনা। গ্রন্থকার এতে মদীনার যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিষয় (মসজিদ, বাড়ি-ঘর, কূপ, পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ইত্যাদি)–এর নিদর্শন অবশিষ্ট রয়েছে শুধু সেগুলো নিয়েই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করেছেন।

গ্রন্থটি 'মুআস্‌সাসাতু উলূমিল কুরআন' বৈরূত ও "দারুল ক্বিবলা লিছছাক্বাফাতিল ইসলামিয়্যা" জেদ্দা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

- মাআলিমুল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ (معالم المدينة المنورة) পুরো নাম– মাআলিমুল মাদীনাতিল মুনাওওয়ারাহ বাইনাল ইমারাতি ওয়াত-তারীখ (معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ)। গ্রন্থকার: ইঞ্জিনিয়ার (স্থাপত্যবিষয়ক) আব্দুল আযীয ইবনে আব্দির রহমান ইবনে ইব্রাহীম কা'কী। সু-বৃহৎ দুই খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে মদীনার প্রাকৃতিক বিষয়াদির বর্ণনা ও ২য় খণ্ডে মদীনার হাররা এলাকাসমূহ এবং উপত্যকাসমূহের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থে মদীনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও স্থাপত্য বিষয়ক প্রচুর মানচিত্র সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটিকে মদীনার নিদর্শন বিষয়ক সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আখ্যায়িত করা যায়। গ্রন্থটির ১ম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ১৪১৯ হি. মোতাবেক ১৯৯৮ খৃ.।
- আল-মাসাজিদুল আছারিয়্যাহ (المساجد الأثرية) পুরো নাম– আল-মাসাজিদুল আছারিয়্যাহ ফিল মাদীনাতিন নাবাউইয়্যাহ (المساجد الأثرية في المدينة النبوية)। গ্রন্থকার: ডক্টর ইলিয়াছ আব্দুল গনী পাকিস্তানী মুদ্দা জিল্লুহু। এ গ্রন্থে মদীনা মুনাওওয়ারার শুধু ঐতিহাসিক মসজিদসমূহ সম্বন্ধে বিশেষত মসজিদে নববী সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত তাহকীকী আলোচনা পেশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সচিত্র।
- বুয়ূতুস সাহাবা (بيوت الصحابة) পুরো নাম– বুয়ূতুস সাহাবাহ হাওলাল মাসজিদিন নাবাউয়ী আশ-শারীফ (بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف)। গ্রন্থকার: ডক্টর ইলিয়াছ আব্দুল গনী পাকিস্তানী মুদ্দা জিল্লুহু। এ গ্রন্থে মদীনা মুনাওওয়ারায় উম্মাহাতুল মুমিনীনের গৃহাদি এবং সাহাবায়ে কেরামের গৃহাদির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
- জাযীরাতুল আরব (جزیرۃ العرب)। গ্রন্থকার: মাওলানা রাবে' নদভী। গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত। গ্রন্থে আরব উপদ্বীপে গত হওয়া বিভিন্ন জাতির বিশেষত মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওওয়ারার তৎককালীন বিভিন্ন গোত্রের ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি (২য় মুদ্রণ ১৪০৩ হি. ১৯৮৩ খৃ.) مجلس تحقیقات ونشریات اسلام لکھنو থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত সূচক-এর বিবরণ

− · − · −	আন্তর্জাতিক সীমানা
·······	অভ্যন্তরীণ সীমানা
-----	পথ/রাস্তা
●	বিশেষ কোন স্থান
⊡	রাজধানী/কেন্দ্রীয় স্থান
★	কুরআনে বর্ণিত স্থান
(...)	কোন স্থানের প্রাচীন নাম
〰	নদী
🌊	সাগর/হ্রদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ভূগোল ও মানচিত্রের পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী)

মানচিত্র বুঝার জন্য মানচিত্রে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এগুলো ব্যবহারিক ভূগোলের একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয়। তবুও এগুলো লিখে দেয়া হল শুধু এ জন্য, যাতে ভূগোল ও মানচিত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠকবর্গও সহজে মানচিত্রের এ বিষয়গুলো বুঝতে সক্ষম হয়।

মাইল, নটিক্যাল মাইল, শর্‌য়ী মাইল ও কিলোমিটার প্রসঙ্গ

- ১ মাইল= ১,৭৬০ গজ বা ৬৩,৩৬০ ইঞ্চি বা ১.৬০৯৩৪৭২১৮৭ কিলোমিটার (সংক্ষেপে বলা হয় ১ মাইল= ১.৬০৯ কিলোমিটার)।
- ১ কিলোমিটার= ৩৯,৩৭০ ইঞ্চি বা ১০০০ মিটার।
- ১ মিটার= ৩৯.৩৭ ইঞ্চি।
- ১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫১ স্থল মাইল ও ১.৮৫২ কিলোমিটার।
- ১ শরয়ী মাইল = ১.৮২৮৮= কিলোমিটার (উল্লেখ্য, ১ শরয়ী মাইল ২০০০ গজ।[১] আর প্রতি গজ ৩৬ ইঞ্চি। আর প্রতি ৩৯.৩৭ ইঞ্চিতে ১ মিটার এবং ১০০০ মিটারে ১ কিলোমিটার। অতএব ১ শরয়ী মাইল হল− ২০০০×৩৬=৭২০০০ ইঞ্চি ÷৩৯.৩৭= ১.৮২৮.৮০ মিটার ÷ ১০০০= ১.৮২৮৮ কিলোমটার। সুতরাং উদাহরণ স্বরূপ ৪৮ শরঈ মাইলে (৪৮×১.৮২৮৮=) ৮৭.৭৮ কিলোমিটার।

---

১. শামী: ২/১২৩।

মাইল ও কিলোমিটারের একটাকে অপরটায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

মাইলকে কিলোমিটারে রূপান্তরিত করতে হলে মনে রাখতে হবে ১ মাইল = ১.৬০৯৩৪৭২১৮৭ (সংক্ষেপে বলা হয় ১.৬০৯) কিলোমিটার। অতএব মাইলের সংখ্যাকে ১.৬০৯৩৪৭২১৮৭ দিয়ে গুণ দিলে কিলোমিটার বের হয়ে আসবে। সুতরাং কেউ যদি উদাহরণ স্বরূপ ৪৮ মাইলকে কিলোমিটারে রূপান্তরিত করতে চায় তাহলে এভাবে করতে হবে− ৪৮×১.৬০৯৩৪৭২১৮৭= ৭৭.২৪৮৬৬৬৪৯৭৬ (অর্থাৎ, প্রায় সোয়া সাতাত্তর) কিলোমিটার।

কিলোমিটারকে মাইলে রূপান্তরিত করতে হলে কিলোমিটারের সংখ্যাকে ১.৬০৯৩৪৭২১৮৭ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। যেমন− মক্কা মুকাররমার মসজিদে হারাম থেকে মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববী পর্যন্ত ৪৩৭ কিলোমিটার। এটাকে মাইলে রূপান্তরিত করুন। ৪৩৭÷১.৬০৯৩৪৭২১৮৭ = ২৭১.৫৩ মাইল।

নটিক্যাল মাইল ও স্থল মাইলের একটাকে অপরটায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

উল্লেখ্য যে, সমুদ্র পথে মাইলের পরিমাপকে সামুদ্রিক মাইল বা নটিক্যাল মাইল বলে। অনেক মানচিত্রে নটিক্যাল মাইল প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। নটিক্যাল মাইল স্থল মাইল থেকে বড়। ১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫১ স্থল মাইল। এ হিসাবটি মনে রাখলে নটিক্যাল মাইলকে স্থল মাইলে রূপান্তরিত করা যাবে।

নটিক্যাল মাইলকে স্থল মাইলে রূপান্তরিত করতে হলে নটিক্যাল মাইলের সংখ্যাকে ১.১৫১ দিয়ে গুণ দিতে হবে। যেমন ১০০ নটিক্যাল মাইল (১০০×১.১৫১)= ১১৫.১ স্থল মাইল।

এর বিপরীত স্থল মাইলকে নটিক্যাল মাইলে রূপান্তরিত করলে হলে স্থল মাইলের সংখ্যাকে ১.১৫১ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। যেমন: ১০০ স্থল মাইল (১০০÷১.১৫১)= ৮৬.৮৮ নটিক্যাল মাইল।

নটিক্যাল মাইলকে কিলোমিটারে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

নটিক্যাল মাইলকে কিলোমিটারে রূপান্তরিত করতে হলে মনে রাখতে হবে ১ নটিক্যাল মাইল= ১.৮৫২ কিলোমিটার। অতএব নটিক্যাল মাইলের সংখ্যাকে ১.৮৫২ দিয়ে গুণ দিলে কিলোমিটার বের হয়ে আসবে। যেমন: ১০০ নটিক্যাল মাইল (১০০×১.৮৫২)=১৮৫.২ কিলোমিটার। এর বিপরীত কিলোমিটারকে নটিক্যাল মাইলে রূপান্তরিত করলে হলে কিলোমিটারের সংখ্যাকে ১.৮৫২ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। অতএব ১০০ কিলোমিটারকে নটিক্যাল মাইলে রূপান্তরিত করলে হলে ১০০÷১.৮৫২= ৫৩.৯৯ নটিক্যাল মাইল।

স্কেল/মাপনী (مقياس الرسم)

স্কেল (Scales) বা মাপনী বলতে মানচিত্রের দুটো স্থানের দূরত্ব বা ভূভাগের উপরিস্থ সে দুটো স্থানের প্রকৃত দূরত্বের সম্পর্ককে বোঝায়। সংক্ষেপে দুটো স্থানের দূরত্বের সম্পর্ক বা অনুপাতকে স্কেল বলে। মানচিত্রে সাধারণত ৩টি উপায়ে স্কেল নির্দেশ করা হয়। যথা−

(১) বর্ণনার মাধ্যমে। যেমন: উদাহরণ স্বরূপ ১ ইঞ্চি = ১ কিলোমিটার বা ১ ইঞ্চি = ১০০ কিলোমটার প্রভৃতি বলে কথার মাধ্যমে স্কেল বর্ণনা করা। এটাকে বলে বর্ণনাজাত স্কেল। স্কেল নির্দেশের

এই পদ্ধতি সবচেয়ে সহজবোধ্য। তবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে পরবর্তীতে সেই মানচিত্র ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট (Reduced)[১] বা বৃহদাকৃতি বিশিষ্ট (Enlarged)[২] করা হলে তার ক্ষেত্রে বর্ণিত এই পদ্ধতি অকোজে হয়ে পড়ে।

(২) রেখাচিত্র অংকনের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে একটি রেখা টেনে সেই রেখাকে কয়েকভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের উপর লিখে দেয়া হয় যে, এতটুকু পরিমাণ সমান সমান কত দূরত্ব। অপেক্ষাকৃত স্বল্প দূরত্ব বুঝানোর জন্য এক দিকের একটা ঘরকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রতিভাগের দূরত্ব কত তা নির্দেশ করা হয়। এটাকে বলে রৈখিক স্কেল। যেমন–

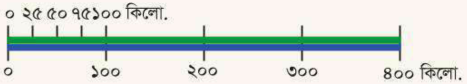

চিত্র নং ১– রৈখিক স্কেল

এই পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে পরবর্তীতে সেই মানচিত্র ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট (Reduced) বা বৃহদাকৃতি বিশিষ্ট (Enlarged) করা হলেও তার ক্ষেত্রে বর্ণিত এই পদ্ধতি অকোজে হয়ে পড়ে না। বরং মানচিত্রটি ক্ষুদ্রাকৃতি বা বৃহদাকৃতি করার সাথে সাথে রৈখিক মাপনীটিও আনুপাতিক হারে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয়ে যায়।

(৩) প্রতিভূ অনুপাতের মাধ্যমে। প্রতিভূ অনুপাতকে ‘সংখ্যাসূচক ভগ্নাংশ’ও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দুটি অংশ থাকে। প্রথম অংশকে ‘লব’ এবং দ্বিতীয় অংশকে ‘হর’ বলে। লব অংশে ১ এবং হর অংশে একটি বৃহৎ অংক লেখা থাকে। উভয় অংশের মধ্যে আনুপাতিক চিহ্ন– ‘:’ থাকে। এই পদ্ধতিতে লব অংশে উল্লেখিত একক হর অংশে উল্লেখিত সংখ্যার প্রতিভূ হয়ে থাকে। যেমন প্রতিভূ অনুপাতে ১" = ১ মাইল দেখাতে হলে যেহেতু ৬৩,৩৬০ ইঞ্চিতে এক মাইল হয়, তাই দেখাতে হবে– ১: ৬৩,৩৬০। অর্থাৎ, ১ ইঞ্চি = ৬৩,৩৬০ ইঞ্চি তথা এক মাইল। অতএব উদাহরণ স্বরূপ যদি প্রতিভূ অনুপাতে দেখানো হয়– ১: ৮.০০০.০০০ তাহলে এর অর্থ হবে, এ মানচিত্রের ১ ইঞ্চি = প্রকৃত দূরত্ব ৮.০০০.০০০ ইঞ্চি বা এ মানচিত্রের ১ সেন্টিমিটার = প্রকৃত দূরত্ব ৮.০০০.০০০ সেন্টিমিটার বা এ মানচিত্রের ১ মিটার = প্রকৃত দূরত্ব ৮.০০০.০০০ মিটার প্রভৃতি। এভাবে প্রতিভূ অনুপাত দেখানো হলে কিলোমিটার, সেন্টিমিটার, গজ, ফুট, ইঞ্চি ইত্যাদি কিছু লিখতে হয় না, শুধু লব ও হর দেখেই যেটাই ধরা হবে তাই যথার্থ হবে। প্রতিভূ অনুপাতকে ইংরেজিতে বলা হয় Representative Fraction ।[৩]

---

[১] উচ্চারণ: রিডিউস্ড্।

[২] উচ্চারণ: ইন্লার্জ্ড্।

[৩] উচ্চারণ: রেপ্রিজেন্ট্যাটিভ্ ফ্রাক্শন্।

প্রতিভূ অনুপাতকে ৩ ভাবে লেখা যায়। যথা: (১) ১: ৬৩৩৬০, (২) ১/৬৩৩৬০, (৩) $\frac{১}{৬৩৩৬০}$।

প্রতিভূ অনুপাত পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন মানচিত্রে প্রতিভূ অনুপাত ব্যবহৃত হলে তা যে কোন দেশে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই অধিকাংশ মানচিত্রে প্রতিভূ অনুপাত ব্যবহৃত হয়। সেই সাথে সাথে আরও সহজে মাপ বের করার জন্য রৈখিক স্কেলও ব্যবহৃত হয়।

সূচক (دليل الناظر)

প্রত্যেকটা মানচিত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন স্থানের ধরন বুঝানোর জন্য বিভিন্ন রকমের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন সীমানার ধরন বুঝানোর জন্য বিভিন্ন রকমের রেখা ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের রঙ ব্যবহার করেও বিভিন্ন জিনিস বুঝানো হয়। যেমন রাজধানী বুঝানোর জন্য ◘ চিহ্ন ব্যবহার করা হল, বিশেষ কোন স্থান বুঝানোর জন্য ● চিহ্ন ব্যবহার করা হল, আন্তর্জাতিক সীমারেখা বুঝানোর জন্য – · – · – রেখা ব্যবহার করা হল, অভ্যন্তরীণ সীমানা বুঝানোর জন্য ······· রেখা ব্যবহার করা হল ইত্যাদি। এগুলো হল মানচিত্র পাঠকের জন্য গাইড স্বরূপ। একে বলা হয় সূচক (খবমবহফ)। আরবিতে এর জন্য دليل الناظر সংক্ষেপে دليل শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মানচিত্র অঙ্কন (Map Drawing[১১])

সম্প্রতি কম্পিউটার আবিষ্কৃত হওয়ায় যে কোন মানচিত্র অঙ্কন ও তার আঁকার ছোট বা বড় করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছে। যদি কেউ হাতে কোন মানচিত্র অঙ্কন করতে চায়, তাহলে তাকে মূল মানচিত্রের উপর একটা স্বচ্ছ কাগজ রেখে তাতে মানচিত্র এঁকে নিতে হবে। সেই মানচিত্রের চতুর্দিকে একটু দূরত্ব রেখে একটা আয়তাকার খোপ এঁকে নিতে হবে। তারপর সেই খোপটিকে কতগুলো সমান্তরাল ও লম্বালম্বি রেখা দিয়ে ভাগ করে নিতে হবে। একইভাবে সেটাকে আড়াআড়িও ভাগ করে নিতে হবে। এরূপ করলে পুরো আয়তাকার ছকটি ছোট ছোট বর্গাকার ছকে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এরপর অন্য একটি কাগজে অনুরূপ মাপের আর একটি ছক বিশিষ্ট খোপ হালকা দাগে আঁকতে হবে। এবার স্বচ্ছ কাগজে আঁকা মানচিত্রটির যে অংশ যেভাবে যে ছকের ভিতর দিয়ে গিয়েছে সেভাবে সেই কাগজে আঁকা ছকের ভিতর আঁকতে হবে। আঁকা শেষ হলে লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে আঁকা সব দাগ মুছে ফেলতে হবে। মূল মানচিত্র অনুসরণ করে ডিগ্রীগুলো এবং স্কেল/মাপনীও বসিয়ে নিতে হবে। বর্গক্ষেত্রের আঁকার ছোট বড় করে মানচিত্রের আঁকারও ছোট বড় করা যাবে। উল্লেখ্য, বর্তমান ফটোস্ট্যাট মেশিনের সাহায্যে মূল মানচিত্রের কপি করে নিয়ে সেই কপির উপর আয়তাকার খোপ এঁকে নিলে মূল মানচিত্রের উপর স্বচ্ছ কাগজ রেখে তার উপর আয়তাকার খোপ আকার ঝামেলা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। ফটোস্ট্যাট মেশিনের সাহায্যেও মানচিত্র প্রয়োজনমত ছোড়/বড় করে নেয়া যায়। কম্পিউটারের সাহায্যেও (স্কান করে সেই স্কানকৃত কপি) প্রয়োজনমত ছোড়/বড় করে নেয়া যায়।

---

[১] উচ্চারণ: ম্যাপ ড্রয়িং।

মানচিত্র অভিক্ষেপ (Map Projection[1])

পৃথিবীর উপরিভাগ সমতল নয় বরং বক্র। তাই বক্রতল বিশিষ্ট কোন গোলকের উপরই সঠিকভাবে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করে দেখানো সম্ভব। কাগজ বা অন্য কোন সমতল উপরিভাগের উপর সমগ্র পৃথিবী বা তার অংশ বিশেষের মানচিত্র সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে অঙ্কন করে দেখানো সম্ভব নয়। কাগজ বা অন্য কোন সমতল উপরিভাগের উপর সমগ্র পৃথিবী বা তার অংশ বিশেষের যে মানচিত্র অঙ্কন করে দেখানো হয় তা আপেক্ষিক নির্ভুল হলেও সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। তবুও কেউ কোন সমতল উপরিভাগের উপর মানচিত্র অঙ্কন করতে চাইলে তাকে কিছু নিয়মনীতি অনুসারে গ্লোব (ভূ-গোলক)-এর উপরিস্থিত বক্র অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখাগুলোকে সমতলে স্থানান্তরিত করতে হবে। গ্লোব বা ভূ-গোলকের উপরিস্থিত বক্র অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখাগুলোকে সমতলে স্থানান্তরিত করার পদ্ধতিগুলোকে বলা হয় 'মানচিত্র অভিক্ষেপ'। বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র অভিক্ষেপ রয়েছে। যারা মানচিত্র অঙ্কন করতে চান তাদের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানচিত্র পাঠকের জন্য বিষয়টির ততটা প্রয়োজন না থাকায় তার বিশদ বিবরণ প্রদান করা থেকে বিরত থাকা গেল।

বৃত্ত, উপবৃত্ত, পরিধি ও ব্যাস ইত্যাদি পরিভাষার ব্যাখ্যা

একই সমতলে অবস্থিত একটি বিন্দু অন্য একটি বিন্দু থেকে সর্বদা সমান দূরে থেকে যে গোলাকার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তাকে বলে বৃত্ত (Circle[2] /الدائِرة)। আর পূর্ণ বৃত্ত না হলে সেটাকে বলে উপবৃত্ত। আর বৃত্তের বেষ্টনরেখা তথা চতুর্দিকের সীমারেখাকে বলা হয় বৃত্তের পরিধি; প্রান্ত; বেড় (Circumference[3]/محيط الدائرة)। আর কোন বাঁকা রেখার অংশ বিশেষকে বলা হয় বৃত্তচাপ (Arc[4] /قوس)। আর বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করে যে সরলরেখা উভয় পাশের পরিধিকে স্পর্শ করে তাকে বলা হয় ব্যাস বা ব্যাসরেখা (قُطْر বা قطر الدائرة)। ইংরেজিতে বলা হয় Diameter[5]। আর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ব্যাসের অর্ধাংশ অর্থাৎ, বৃত্তের পরিধি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত সরলরেখাকে বলে ব্যাসার্ধ (نصف القُطر)।

নিরক্ষীয় রেখা/বিষুব রেখা (خط الاستواء)

পৃথিবীর মানচিত্রে উত্তর দক্ষিণের মধ্যস্থান বুঝানোর জন্য যে রেখা অংকন করা হয়, তাকে বলে নিরক্ষীয় রেখা বা নিরক্ষ রেখা বা বিষুব রেখা বা ভূ-বিষুব রেখা। আরবিতে নিরক্ষীয় রেখা বা বিষুব রেখাকে বলা হয়ে থাকে خط الاستواء/خط الاعتدال। ইংরেজিতে বলা হয় Equator[6]। নিরক্ষীয় রেখা/বিষুব রেখার মান ০° (শূন্য ডিগ্রী)। মানচিত্রে নিরক্ষীয় রেখাকে ৩৬০ ভাগে ভাগ না করে পাঠ ও অঙ্কনের সুবিধার জন্য ৫°, ১০°, ১৫°, ২০° এরূপ ব্যবধানে (পূর্ব-পশ্চিমে) ভাগ করা হয়।

---

[1] উচ্চারণ: ম্যাপ্ প্রোজেক্শন্।

[2] উচ্চারণ: সার্ক্ল্।

[3] উচ্চারণ: সার্কাম্ফারেন্স।

[4] উচ্চারণ: আর্ক্।

[5] উচ্চারণ: ডায়্যামিটার্।

[6] উচ্চারণ: ইকোয়েটর।

ডিগ্রী (درجة)

ডিগ্রী (Degree) বলতে বুঝায় একটা পরিমাণকে। মানচিত্রে ডিগ্রী বলতে ৩৬০ ভাগের এক ভাগ পরিমাণকে বুঝায়। সমস্ত পৃথিবীকে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়েছে। দ্রাঘিমা রেখাগুলো অর্ধবৃত্ত হওয়ায় মূল মধ্যরেখা (গ্রীনিচ রেখা, পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) থেকে পূর্ব দিকে ১৮০ ডিগ্রী এবং পশ্চিম দিকে ১৮০ ডিগ্রী হিসেবে বিভক্ত। এ হিসেবে গ্রীনিচের ঠিক বিপরীত দিকে ১৮০ দ্রাঘিমা রেখা অবস্থিত। আর অক্ষরেখাগুলো পূর্ণবৃত্ত হওয়ায় নিরক্ষীয় রেখা/বিষুব রেখা থেকে উত্তর দিকে ৯০ ডিগ্রী এবং দক্ষিণ দিকে ৯০ ডিগ্রী হিসেবে বিভক্ত। প্রতিটি ডিগ্রীকে আবার ৬০ মিনিটে এবং প্রতিটি মিনিটকে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করা হয়। প্রয়োজনে প্রতি সেকেন্ডকে ৬০ থার্ডে, এমনিভাবে প্রতি থার্ডকে ৬০ ফোর্থে ভাগ করা যায়। ডিগ্রী লিখতে সংখ্যার পর উপরে ছোট্ট একটা শূন্যের মত লেখা হয়। যেমন ৯০°, ৮০° ইত্যাদি। আর ডিগ্রীর সাথে মিনিট লিখতে হলে একসঙ্গে এভাবে লেখা হয় (উদাহরণ স্বরূপ ৯০ ডিগ্রী ২৪ মিনিট লিখতে) ৯০° ২৪′ (৯০ ডিগ্রী ২৪ মিনিট)।

ডিগ্রী ও মিনিটকে দুই পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। (১) ডিগ্রী-দশমিক পদ্ধতিতে (২) ডিগ্রী-মিনিট পদ্ধতিতে। যেমন আড়াই ডিগ্রীকে ডিগ্রী-দশমিক পদ্ধতিতে লিখলে হবে ২.৫০° (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী)। আর ডিগ্রী-মিনিট পদ্ধতিতে লিখলে হবে ২°৩০′ (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট)।

ডিগ্রী-দশমিক পদ্ধতিকে ডিগ্রী-মিনিট পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে হলে দশমিকের পরের সংখ্যাকে ১০০ দিয়ে ভাগ করে ফলাফলকে ৬০ দিয়ে গুন দিতে হবে। যেমন: ২.৫০°কে ডিগ্রী-মিনিটে পরিবর্তন করতে হলে ৫০÷১০০ = ০.৫×৬০ = ৩০। অতএব ২.৫০° হচ্ছে ২°৩০′। এর বিপরীত ডিগ্রী-মিনিট পদ্ধতিকে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে হলে মিনিটের অংককে ১০০ দিয়ে গুন দিতে হবে। তারপর ফলাফলকে ৬০ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। যেমন: ২°৩০′ কে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে হলে ৩০×১০০ = ৩০০০÷৬০ = ৫০। অতএব ২°৩০′ হচ্ছে ২.৫০°।

মূল মধ্যরেখা বা গ্রীনিচ রেখা (خط الطول الرئيسي)

পৃথিবীর মানচিত্রে পূর্ব পশ্চিমের মধ্যস্থান বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত রেখা হল মধ্যরেখা। লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে রাজকীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রবিশিষ্ট গ্রীনিচ নামক স্থানকে মধ্যবর্তী ধরে নিয়ে সেই স্থানের উপর দিয়ে যে কল্পিত অর্ধ বৃত্তাকার দ্রাঘিমা রেখা অংকিত হয়, তাকে বলা হয় মূল মধ্যরেখা বা গ্রীনিচ রেখা। আরবিতে এ রেখাকে বলা হয় خط الزوال অথবা خط الطول الرئيسي। ইংরেজিতে বলা হয় Prime Meridiam[1]। মূল মধ্যরেখার মান ০° (শূন্য ডিগ্রী)।

অক্ষাংশ (درجة العرض) ও দ্রাঘিমাংশ (درجة الطول)

গোলাকার পৃথিবীর উপর কোন স্থানের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করতে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ অপরিহার্য। নিরক্ষ রেখা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের অক্ষাংশ (درجة العرض/ Latitude[2]) বলে। নিরক্ষ রেখার উত্তরে অবস্থিত স্থান উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণে অবস্থিত স্থান দক্ষিণ অক্ষাংশ। অক্ষাংশ বুঝানোর জন্য নিরক্ষীয় বৃত্তের সমান্তরাল করে উত্তরে ও

---

[1] উচ্চারণ: প্রাইম্ মেরিডিয়াম।

[2] উচ্চারণ: ল্যাটিটিউড্।

দক্ষিণে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত যেসব বৃত্ত বা রেখা (خط) অংকন করা হয় তাকে বলে অক্ষরেখা। ইংরেজিতে বলে parallels[১] of Latitude। অক্ষরেখা পূর্ণ বৃত্ত হয়ে থাকে। আর মূল মধ্য রেখা থেকে পূর্বে বা পশ্চিমের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমাংশ বলে (درجة الطول)। ইংরেজিতে বলা হয় Longitude[২]। মূল মধ্য রেখার পূর্বে অবস্থিত স্থান পূর্ব দ্রাঘিমা এবং পশ্চিমে অবস্থিত স্থান পশ্চিম দ্রাঘিমা। দ্রাঘিমাংশ বুঝানোর জন্য উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদকারী যে রেখা (خط) অংকন করা হয় তাকে বলে দ্রাঘিমা রেখা বা দেশান্তর রেখা বা মধ্যরেখা (خط الطول/Line of longitude)। দ্রাঘিমা রেখা অর্ধবৃত্ত হয়ে থাকে। সমস্ত দ্রাঘিমা রেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বিন্দুতে এসে মিলিত হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, উর্দূ কিতাবাদিতে অক্ষাংশ বুঝানোর জন্য عرض البلد শব্দ এবং দ্রাঘিমাংশ বুঝানোর জন্য طول البلد শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

অক্ষ ও দ্রাঘিমার ডিগ্রী দুই পদ্ধতিতে লেখা হয়: (১) পূর্ব দ্রাঘিমা বুঝানোর জন্য ডিগ্রীর অংকের সাথে সংক্ষেপে ‘পূ:’ (ইংরেজিতে E) এবং পশ্চিম দ্রাঘিমা বুঝানোর জন্য ‘প:’ (ইংরেজিতে W) লেখা হয়। আর উত্তর অক্ষাংশ বুঝানোর জন্য ডিগ্রীর অংকের সাথে ‘উ:’ (ইংরেজিতে N) এবং দক্ষিণ অক্ষাংশ বুঝানোর জন্য ‘দ:’ (ইংরেজিতে S) লেখা হয়। কখনও কখনও পশ্চিম দ্রাঘিমা এবং দক্ষিণ অক্ষাংশ বুঝানোর জন্য ডিগ্রীর অংকের পূর্বে বিয়োগ চিহ্ন (−) যোগ করা হয়। যেমন: −৩০°। আর পূর্ব দ্রাঘিমা ও উত্তর অক্ষাংশের সঙ্গে বিয়োগ চিহ্ন যোগ না করে শুধু অংকটাই লেখা হয়। যেমন: ৩০°।

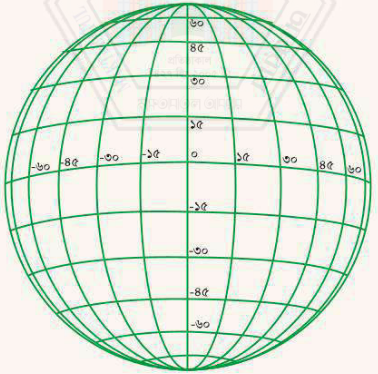

চিত্র নং ২ − অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখা সম্বলিত চিত্র

---

[১] উচ্চারণ: প্যারালেল্‌স।

[২] উচ্চারণ: লন্‌জিটিউড্‌।

অক্ষ ও দ্রাঘিমার পরিমাপ

প্রত্যেকটি অক্ষরেখা সমান দূরে অঙ্কিত হয়। তবে উভয় মেরুর কাছে কিছুটা চাপা হওয়ায় সেখানে এক ডিগ্রী অক্ষাংশের পরিমাণে কিছু পার্থক্য ঘটে। তবে এই সামান্য পার্থক্য গণনায় না এনে মোটামুটিভাবে ১ ডিগ্রী অক্ষাংশ পরিমাণ = ৬৯ মাইল। মধ্যরেখাগুলোর প্রকৃত পরিধি ২৪,৮৬০ মাইল।

দ্রাঘিমা রেখাগুলো ক্রমশ মেরুদ্বয়ের দিকে চাপা হতে থাকে। দ্রাঘিমায় দূরত্বের পরিমাণও নিরক্ষ রেখা থেকে মেরুদ্বয়ের দিকে ক্রমশ কমতে থাকে। এমনকি মেরুদ্বয়ে গিয়ে যখন দ্রাঘিমা রেখা মেরু বিন্দুতে মিলিত হয়ে যায়, তখন দ্রাঘিমার মান হয় ০° (শূন্য ডিগ্রী)। সারকথা অক্ষাংশ হিসেবে প্রতি ডিগ্রী দ্রাঘিমার দূরত্বে পার্থক্য হয়। নিরক্ষরেখায় প্রতি ডিগ্রী দ্রাঘিমার দূরত্ব পৃথিবীর পরিধি (২৪,৯০২ মাইল)−এর ৩৬০ ভাগ অর্থাৎ, প্রায় ৬৯.১৭২ মাইল। তারপর ক্রমান্বয়ে মেরুদ্বয়ের দিকে প্রতি ডিগ্রী দ্রাঘিমার দূরত্বের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। নিম্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির একটি তালিকা পেশ করা হল।

০° নিরক্ষরেখায় প্রায় ৬৯.৬৫ মাইল	৫০° অক্ষাংশে প্রায় ৪৪.৫৭৬ মাইল
১০° অক্ষাংশে প্রায় ৬৮.২৫৭ মাইল	৬০° অক্ষাংশে প্রায় ৩৪.৮২৫ মাইল
২০° অক্ষাংশে প্রায় ৬৪.৭৭৪ মাইল	৭০° অক্ষাংশে প্রায় ২৩.৬৮১ মাইল
৩০° অক্ষাংশে প্রায় ৫৯.৮৯৯ মাইল	৮০° অক্ষাংশে প্রায় ১১.৮৪০ মাইল
৪০° অক্ষাংশে প্রায় ৫২.৯৩৪ মাইল	৯০° অক্ষাংশে ০ মাইল

(তথ্যসূত্র : ফলিত ও ব্যবহারিক ভূগোল।)

অবশ্য কোন কোন ভূগোলের বইয়ের বর্ণনায় উপরোক্ত বর্ণনা থেকে সামান্য কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন আর একটি বর্ণনা পেশ করা হল −

০° নিরক্ষরেখায় প্রায় ৬৯.১৭২ মাইল	৫০° অক্ষাংশে প্রায় ৪৪.৫৫২ মাইল
১০° অক্ষাংশে প্রায় ৬৮.১২৯ মাইল	৬০° অক্ষাংশে প্রায় ৩৪.৬৭৪ মাইল
২০° অক্ষাংশে প্রায় ৬৫.০২৬ মাইল	৭০° অক্ষাংশে প্রায় ২৩.৭২৯ মাইল
৩০° অক্ষাংশে প্রায় ৫৯.৯৫৬ মাইল	৮০° অক্ষাংশে প্রায় ১২.০৫১ মাইল
৪০° অক্ষাংশে প্রায় ৫৩.০৬৩ মাইল	৯০° অক্ষাংশে ০ মাইল

(তথ্যসূত্র: প্রাকৃতিক ভূগোল পরিচিতি। বরাত− Mcknight, Tom L. 1984 Physical Geography Page- 12)

অক্ষাংশ নির্ধারণের প্রাকৃতিক উপায়

অক্ষাংশ (درجة العرض) নির্ধারণের একটি প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে ধ্রুবতারার উন্নতির[১] মাধ্যমে অক্ষাংশ নির্ধারণ করা। উত্তর গোলার্ধে ধ্রুবতারা দেখা যায় এমন যেকোনো স্থানে ফাঁকা জায়গায় একটি সোজা খুঁটি গাড়তে হবে। তার কিছু দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি সোজা খুঁটি গাড়তে হবে।

---

[১] তারার উন্নতি বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে একটু পরই পেশকৃত ‘সূর্যের উন্নতি’ শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

খুঁটি দুটো এতটুকু উঁচু হতে হবে যেন উভয় খুঁটির দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলে এদের অগ্রভাগ ও ধ্রুবতারাকে একই কল্পিত সরলরেখায় দেখা যায়। যেমন:

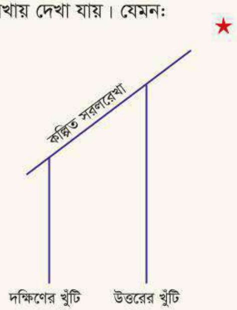

চিত্র নং ৩ – কল্পিত সরলরেখা ও ধ্রুবতারা

এরপর খুঁটি দুটোর মধ্যবর্তী প্রকৃত দূরত্ব মেপে কোন একটি নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী কাগজে একটি ভূমিরেখা আঁকতে হবে।[1] দুটো খুঁটির প্রকৃত দৈর্ঘ মেপে আগের স্কেল অনুযায়ী ভূমিরেখার উপর দুটো লম্ব রেখা অঙ্কন করতে হবে। এই লম্ব রেখাদ্বয়ের (খুঁটির রেখাদ্বয়ের) উপরে একটি শীর্ষ রেখা আঁকতে হবে। এবার শীর্ষ রেখা ও ভূমিরেখাকে বর্ধিত করে একটি বিন্দুতে মিলাতে হবে। এই বিন্দু এবং উত্তরের খুঁটির তলা ও মাথা মিলে যে কোণ তৈরি করবে সেটাই হচ্ছে ধ্রুবতারার উন্নতি = ঐ স্থানের অক্ষাংশ। চাঁদার সাহায্যে কোণটি মাপতে হবে। যেমন:

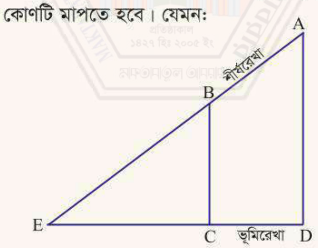

চিত্র নং ৪ – শীর্ষরেখা ও ভূমিরেখা সম্বলিত চিত্র

নোট: এখানে AD একটি লম্ব রেখা, BC আর একটি লম্ব রেখা। আর AB শীর্ষ রেখা। অতএব A , E ও D মিলে যত ডিগ্রী কোণ তৈরি হয়েছে সেটাই ধ্রুবতারার উন্নতি ও ঐ স্থানের অক্ষাংশ।[2]

---

[1] উদাহরণ স্বরূপ : খুঁটি দু'টোর মধ্যবর্তী প্রকৃত দূরত্ব ৩ গজ। এখন প্রতি গজকে এক ইঞ্চি ধরে কাগজে ৩ ইঞ্চি একটি ভূমিরেখা অঙ্কন করা হল।

[2] 'ফলিত ও ব্যবহারিক ভূগোল' গ্রন্থ অবলম্বনে।

অক্ষ নির্ণয়ের আর একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি

অক্ষ নির্ণয়ের প্রাকৃতিক আর একটি উপায় হল নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যের উচ্চতা (ارتفاع الشمس/Altitude[1] of sun) দিয়ে অক্ষ নির্ণয় করা। ২১ মার্চ কিংবা ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা (ارتفاع نصف النهار/أعظم ارتفاعات الشمس) কে ৯০ থেকে বিয়োগ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই ঐ স্থানের অক্ষ। যেমন: ২১ মার্চ কা'বা শরীফে দুপুরে সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৬৮.৫৯ ডিগ্রী। অতএব ৯০-৬৮.৫৯ = ২১.৪১° (২১ দশমিক ৪১ ডিগ্রী তথা ২১ ডিগ্রী ২৪ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড) হচ্ছে কা'বা শরীফের অক্ষ।[2]

এখন 'ক্রোনোমিটার' (Cronometer) নামক এক ধরনের যন্ত্র পাওয়া যায়। তার সাহায্যেও অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। তা ছাড়া AndLocation বা latitude longitude Finder প্রভৃতি সফ্টওয়ারের মাধ্যমেও যেকোনো স্থানের অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ বের করা যায়।

সূর্যের উন্নতি

সূর্য যখন যে অক্ষ বরাবর থকে সেটাকেই সূর্যের উন্নতি (ميل الشمس) বলা হয়। সূর্য ২১ মার্চ থাকে বিষুবরেখা বরাবর, আর বিষুবরেখা দুই অক্ষের মাঝে অবস্থিত তথা বিষুবরেখার কোন অক্ষ নেই, সেমতে ২১ মার্চ বিষুবরেখায় সূর্যের উন্নতি প্রায় ০ ডিগ্রী। সূর্য ২১ জুন আসে কর্কটক্রান্তিতে তথা ২৩.৫০ উত্তর অক্ষরেখা বরাবর। সেমতে ২১ জুন কর্কটক্রান্তিতে সূর্যের উন্নতি ২৩.৫০ ডিগ্রী। উত্তর অক্ষাংশের উন্নতি বুঝানোর জন্য + চিহ্ন যোগ করে লেখা হয় ২৩.৫০+ অর্থাৎ, সাড়ে তেইশ ডিগ্রী প্লাস। সূর্য ২৩ সেপ্টেম্বর আবার বিষুবরেখা বরাবর আসে। তাই ২৩ সেপ্টেম্বরও সূর্যের উন্নতি প্রায় ০ ডিগ্রী। তারপর ২২ ডিসেম্বর সূর্য থাকে মকরক্রান্তিতে তথা ২৩.৫০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর। এদিন মকরক্রান্তিতে সূর্যের উন্নতি ২৩.৫০ ডিগ্রী। দক্ষিণ অক্ষাংশের উন্নতি বুঝানোর জন্য - চিহ্ন যোগ করে লেখা হয় ২৩.৫০- অর্থাৎ, সাড়ে তেইশ ডিগ্রী মাইনাস।

সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা (ارتفاع نصف النهار/أعظم ارتفاعات الشمس) নির্ধারণের একটি উপায়

সমতল স্থানে একটা লম্বা শলাকা সোজা করে গাড়তে হবে। ঠিক দুপুরের সময়[3] শলাকার ছায়া উত্তর বা দক্ষিণ দিকে সর্বোচ্চ ছোট থাকবে। এই ছায়াটুকু মাপুন। একটা ত্রিভূজ আঁকুন, যার এক বাহু ছায়ার সমপরিমাণ এবং আর এক বাহু শলাকার সমপরিমাণ। উভয় বাহু একটা সমকোণে মিলিত হবে। তারপর শলাকা নির্দেশক বাহুর অপর মাথা থেকে একটি বাহু টেনে ছায়ার বাহুর অপর প্রান্তে সমকোণে মিলিত করুন। এই তৃতীয় বাহু সূর্যরশ্মি নির্দেশক। এবার ছায়ার বাহু ও সূর্যরশ্মি নির্দেশক তৃতীয় বাহুর মধ্যকার কোণ সমপরিমাণ হবে ঐ স্থানের সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা। কত ডিগ্রী কোণ হল তা চাঁদার মাধ্যমে সহজে বের করা যায়।

উল্লেখ্য, যে কোনো সময় সূর্যের উচ্চতা জানার জন্য Altitude of sun calculator -এর

---

[1] উচ্চারণ: অ্যাল্‌টিটিউড্।

[2] فلكيات جديده অবলম্বনে।

[3] সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা ঠিক দুপুরের সময় হয়ে থাকে, এজন্য ঠিক দুপুরের সময়ের কথা বলা হয়েছে। সকাল বা বিকালের অন্য যে কোন সময় তখনকার উচ্চতা (যদিও তা সর্বোচ্চ উচ্চতা নয়) পরিমাপ করার জন্যও এ পদ্ধতি প্রযোজ্য।

সাহায্য নেয়া যায়। নেটে এ সফটওয়ার পাওয়া যায়।

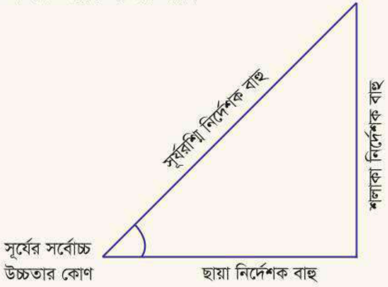

চিত্র নং ৫ – সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা মাপার ত্রিভূজ

সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা (ارتفاع نصف النهار/أعظم ارتفاعات الشمس) নির্ধারণের আর একটি উপায়

যেদিন কোন স্থানে সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা জানতে হবে সেই দিন সূর্যের কক্ষপথ থেকে ঐ স্থানটি কতদূরে আছে তা বের করুন। তারপর সেই পরিমাণকে ৯০ ডিগ্রী থেকে বিয়োগ করুন যা অবশিষ্ট থাকবে সেটাই ঐ স্থানে সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা। যেমন ২১ জুন তেতুলিয়ায় সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা জানতে হবে। ২১ জুন সূর্য থাকে কর্কটক্রান্তিতে তথা ২৩.৫০ অক্ষে। আর তেতুলিয়া হচ্ছে ২৬.৫১ অক্ষে। তাহলে তেতুলিয়া সূর্যের কক্ষ থেকে (২৬.৫১-২৩.৫০=) ৩.০১ ডিগ্রী দূরে। এবার ৯০ থেকে ৩.০১ বিয়োগ করুন (৯০-৩.০১=) ৮৬.৯৯ ডিগ্রী হবে। অতএব ২১ জুন তেতুলিয়ায় সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৮৬.৯৯ তথা প্রায় ৮৭ ডিগ্রী। এভাবে হিসাব করে দেখুন ২১ মার্চ ঢাকায় সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা হবে ৬৬.১৯ ডিগ্রী। এবং ২২ ডিসেম্বর ঢাকায় সূর্যের সর্বোচ্চ উচ্চতা হবে ৪২.৬৯ ডিগ্রী। মনে রাখতে হবে ঢাকার অক্ষ ২৩.৮১ আর ২১ মার্চ সূর্য থাকে বিষুব রেখা তথা ০ ডিগ্রীতে আর ২২ ডিসেম্বর থাকে ২৩.৫০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে।

দ্রাঘিমা নির্ণয়ের পদ্ধতি

যেকোন স্থানের দ্রাঘিমা জানা যায় ঐ স্থানের ঘড়ির সময় দ্বারা। শুধু জানতে হবে গ্রীনিচের সময়ের সাথে ঐ স্থানের ঘড়ির সময়ের কতটুকু ব্যবধান রয়েছে। মোট যত মিনিটের ব্যবধান রয়েছে সেটাকে ৪ দিয়ে ভাগ দিলে[1] যে ফল দাঁড়াবে সেটাই ঐ স্থানের দ্রাঘিমা। যেমন গ্রীনিচের সঙ্গে ঢাকার সময়ের ব্যবধান ৬ ঘণ্টা অর্থাৎ, (৬×৬০=) ৩৬০ মিনিট। এবার ৩৬০কে ৪ দিয়ে ভাগ দিলে হবে (৩৬০÷৪=) ৯০। এই ৯০ হচ্ছে ঢাকার দ্রাঘিমা। উল্লেখ্য, মোবাইলের ডিজিটাল ঘড়ি থেকে গ্রীনিচের সময়ের সাথে যে কোনো স্থানের ঘড়ির সময়ের কতটুকু ব্যবধান তা জেনে নেয়া যায়। নেটে greenwich mean time সার্চ করেও দেখে নেয়া যায়।

এখন 'সেক্সট্যান্ট' (Sextant) নামক এক ধরনের যন্ত্র পাওয়া যায়। তার সাহায্যেও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা যায়। তা ছাড়া AndLocation বা latitude longitude Finder প্রভৃতি সফ্‌ট্ওয়ারের মাধ্যমেও যেকোনো স্থানের অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ বের করা যায়।

---

[1] ৪ দিয়ে ভাগ দেয়ার কারণ হল প্রতি ১ ডিগ্রী সমান ৪ মিনিট। সূর্য প্রতি ৪ মিনিটে ১ ডিগ্রী পরিমাণ স্থান অতিক্রম করে থাকে।

বিশেষ কয়েকটি স্থানের অক্ষ ও দ্রাঘিমা

ঢাকা– দ্রাঘিমা: ৯০°২৪′, অক্ষ: ২৩°৪৮′

ঢাকার পূর্ব সীমানা– ৯০°২৭′, পশ্চিম সীমানা– ৯০°

খুলনা– দ্রাঘিমা: ৮৯°৩২′, অক্ষ: ২২°৫০′

খুলনার পূর্ব সীমানা– ৮৯°৪৫′, পশ্চিম সীমানা– ৮৯°

চট্টগ্রাম– দ্রাঘিমা: ৯১°৪৮′, অক্ষ: ২২°২০′

চট্টগ্রামের পূর্ব সীমানা– ৯২°, পশ্চিম সীমানা– ৯১°৩০′

মক্কা মুকাররমাহ– দ্রাঘিমা: ৩৯°৫১′, অক্ষ: ২১°২৩′

বাইতুল্লাহ (কা'বা শরীফ)– দ্রাঘিমা: ৩৯°৪৯′, অক্ষ: ২১°২৫′

মদীনা মুনাওয়ারাহ– দ্রাঘিমা: ৩৯°৩৪′, অক্ষ: ২৪°৩১′

মসজিদে নববী– দ্রাঘিমা: ৩৯°৩৬′, অক্ষ: ২৪°২৭′

মসজিদে আকসা– দ্রাঘিমা: ৩৫°১৪′, অক্ষ: ৩১°৪৬′

মসজিদে কেবলাতাইন– দ্রাঘিমা: ৩৯°৩৪′ অক্ষ: ২৪°২৯′

ইয়ালামলাম– দ্রাঘিমা: ৪০°৮′, অক্ষ: ২০°৫০′

আস-সা'দিয়া– দ্রাঘিমা: ৩৯°৫৪′, অক্ষ: ২০°৪২′

আস-সাইলুল কাবীর– দ্রাঘিমা: ৪০°২৪′, অক্ষ: ২১°৩৭′

আল-জুহ্‌ফা– দ্রাঘিমা: ৩৯°৮′, অক্ষ: ২২°৪২′

রাবেগ– দ্রাঘিমা: ৩৯°, অক্ষ: ২২°৪৭′

যুল হুলাইফা– দ্রাঘিমা: ৩৯°৩৩′, অক্ষ: ২৪°২৫′

যাতে ইর্‌ক– মক্কা থেকে ৯২ কিলোমিটার উত্তরে। বর্তমান নাম "আজ-জরীবা" (الضريبة)।

জিদ্দা– দ্রাঘিমা: ৩৯°১৪′, অক্ষ: ২১°১৭′

কর্কট ক্রান্তি (مَدار السَّرْطان) ও মকর ক্রান্তি (مَدار الجَدْي)

বিষুব রেখা থেকে ২৩.৫০° (সাড়ে ২৩ ডিগ্রী) উত্তরে অবস্থিত একটি রেখা কর্কট ক্রান্তি (مَدار السَّرْطان) নামে পরিচিত। ইংরেজিতে বলা হয় Tropic of Cancar[1]। আর বিষুব রেখা থেকে ২৩ .৫০° (সাড়ে ২৩ ডিগ্রী) দক্ষিণে অবস্থিত একটি রেখা মকর ক্রান্তি (مَدار الجَدْي) নামে পরিচিত। ইংরেজিতে বলা হয় Tropic of Capricorn[2]।

---

[1] উচ্চারণ: ট্রপিক্ অভ্ ক্যান্সার।

[2] উচ্চারণ: ট্রপিক্ অভ্ ক্যাপ্রিকর্ন।

মেরু (القُطب)

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রান্তের শেষ বিন্দুকে মেরু বলা হয়। উত্তর প্রান্তের শেষ বিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু (North Pole[১]) এবং দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু (South Pole[২]) বলা হয়। উত্তর ও দক্ষিণের মেরু অঞ্চলকে যথাক্রমে উত্তর মেরু অঞ্চল (قارَّة القطب الشمالية) ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল (قارَّة القطب الجنوبية) বলা হয়।

উত্তর মেরু (القُطب الشمالي) ও দক্ষিণ মেরু (القُطب الجنوبي)

নিরক্ষীয় রেখা/বিষুব রেখা থেকে উত্তরে ৬৬.৫০° (৬৬°৩০′)–এর পর থেকে উত্তর দিকে শেষ পর্যন্ত অঞ্চল হল উত্তর মেরু (North pole)। উত্তর মেরুকে "সুমেরু"ও বলা হয়। আর নিরক্ষীয় রেখা/বিষুব রেখা থেকে দক্ষিণে ৬৬.৫০° (৬৬°৩০′)–এর পর থেকে দক্ষিণ দিকে শেষ পর্যন্ত অঞ্চল হল দক্ষিণ মেরু (South pole)। দক্ষিণ মেরুকে "কুমেরু"ও বলা হয়।

সুমেরু বৃত্ত (دائرة القُطب الشمالية) ও কুমেরু বৃত্ত (دائرة القُطب الجنوبية)

নিরক্ষীয় রেখা/বিষুব রেখা থেকে উত্তর দিকে ৬৬.৫০° (৬৬°৩০′)–এর পর উত্তর মেরু/সুমেরুর বৃত্তরেখা (Arctic Circle[৩]) আর দক্ষিণ দিকে ৬৬.৫০° (৬৬°৩০′)–এর পর দক্ষিণ মেরু/ কুমেরুর বৃত্তরেখা (Antarctic Circle[৪]) অবস্থিত।

উত্তর গোলক (الكرة الشمالية)

বিষুব রেখা বরাবর থেকে উত্তর মেরু পর্যন্ত অঞ্চল হল উত্তর গোলক।

দক্ষিণ গোলক (الكرة الجنوبية)

বিষুব রেখা বরাবর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অঞ্চল হল দক্ষিণ গোলক।

উত্তর গোলার্ধ (نصف الكُرَّة الشمالي) ও দক্ষিণ গোলার্ধ (نصف الكرة الجنوبي)

নিরক্ষ রেখা পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণে দুইটি সমান ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর ভাগের নাম হচ্ছে উত্তর গোলার্ধ (Northern Hemisphere[৫]) আর দক্ষিণ ভাগের নাম হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধ (Southern Hemisphere[৬])।

---

[১] উচ্চারণ: নর্থ পোল্।

[২] উচ্চারণ: সাউথ পোল্।

[৩] উচ্চারণ: আর্কটিক্ সার্কল্।

[৪] উচ্চারণ: এন্টার্কটিক্ সার্কল্।

[৫] উচ্চারণ: নর্দার্ন হেমিস্‌ফীয়ার। হেমিস্‌ফীয়ার (Hemisphere) শব্দের অর্থ গোলার্ধ।

[৬] উচ্চারণ: সাউদার্ন হেমিস্‌ফীয়ার।

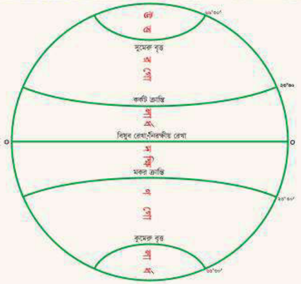

চিত্র নং ৬ – বিভিন্ন রেখা ও মেরু সম্বলিত চিত্র

চিত্র নং ৭ – উত্তর মেরুর চিত্র

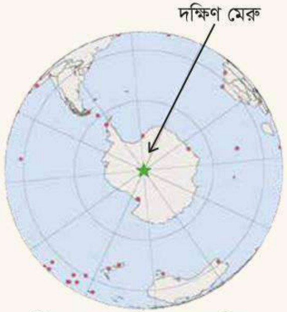

চিত্র নং ৮– দক্ষিণ মেরুর চিত্র

বৃত্তের প্রকারসমূহ

বৃত্ত (Circle/دائرة) রয়েছে কয়েক প্রকার। যথা:

১. বিষুববৃত্ত (Equator[১]/دائرة خط الاستواء): বিষুবরেখার বৃত্তকে বলা হয় বিষুববৃত্ত বা নিরক্ষবৃত্ত।

২. খ-বিষুববৃত্ত (Celestial Equator[২]/خط الاستواء السماوي): আরবিতে একে دائرة معدل النهار ও বলা হয়। এই খ-বিষুববৃত্ত বা আসমানী বিষুববৃত্ত বলতে বুঝানো হয় পৃথিবীর বিষুব রেখা বরাবর উপরে শূন্যে পৃথিবীর চতুর্দিকে কল্পিত একটি বৃত্ত, যে বৃত্ত দিয়ে সূর্যের চলাচলের সময় পৃথিবীর রাত দিন সমান হয়। এই খ-বিষুবরেখার ডানে বামে সমান্তরাল করে টানা বৃত্তগুলোকে বলা হয় খ-অক্ষরেখা। পৃথিবীপৃষ্ঠে যে কোনো বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করতে যেমন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনি আকাশে যে কোনো জ্যোতিষ্কের অবস্থান নির্দেশ করা জন্য খ-গোলককে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। তবে পৃথিবীর দ্রাঘিমার মত খ-গোলকের দ্রাঘিমা আঁকা যায় না। কেননা পৃথিবীর দ্রাঘিমারেখা তার সঙ্গে ঘূর্ণায়মান।

৩. রাশিবৃত্ত বা রাশিচক্র (Zodiac[৩]/دائرة البروج): পৃথিবী তার কক্ষপথে বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য নিজ জায়গায় থাকে, কিন্তু পৃথিবীর পরিক্রমণের ফলে মনে হয় সূর্য সরে যাচ্ছে। এভাবে মনে হয় সূর্য একটা লাইনে বৃত্তাকারে ঘুরছে এবং বার মাসে একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসছে। এইযে সূর্যের চলার লাইন বা বৃত্ত একে বলে ক্রান্তিবৃত্ত। এটাই হচ্ছে রাশিবৃত্ত বা রাশিচক্র। এটা প্রকৃতপক্ষে সূর্যের চলার পথ নয়, তবে বাহ্যত এমনই মনে হয়। তাই আরবিতে একে مَسَار الشمس الظاهري (অর্থাৎ, দৃশ্যত সূর্যের চলার পথ)ও বলা হয়।

রাশিচক্রকে সমান ১২ ভাগে বা ১২ মাসে ভাগ করা হয়, সূর্য এক এক মাসে এক একটি ভাগ পার হয়। সবগুলোর অঞ্চলকে একত্রে বলা হয় منطقة البروج বা অয়নমণ্ডল/অয়নবৃত্ত। এ হিসেবে منطقة البروج বা অয়নমণ্ডল হচ্ছে রাশির গোটা অঞ্চল আর دائرة البروج হচে রাশির বৃত্ত।

উল্লেখ্য, রাশি সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

৪. মধ্যরেখা (Meridian[৪]/دائرة نصف النهار): এটা আমাদের মাথার উপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে যে রেখা প্রলম্বিত। এই রেখা দিয়েই সূর্যের যাওয়াল, নক্ষত্রমালার উচ্চতা ও অবনতি জানা যায়। মধ্যরেখাকে মধ্যাহ্নরেখাও বলা যেতে পারে।

৫. অয়নান্তরেখা (Equinoctial line[৫], Solstice[৬]/دائرة معدل النهار) : অয়নান্ত সূর্যের পথের যে বিন্দু বিষুবরেখা থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত। সূর্যের এই রেখায় থাকার সময় রাত দিন সমান হয়। আরবিতে একে فلك معدل النهار , دائرة الاستواء والاعتدال এবং الفلك الاعظم ও বলা হয়। অয়নান্ত আবার দুই প্রকার। সামনে চতুর্থ অধ্যায়ে 'ঋতু, অয়নান্ত ও বিষুব সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী' শিরোনামের আলোচনা দেখুন।

---

[১] উচ্চারণ: ইকোয়েটর্।

[২] উচ্চারণ: সেলেস্‌চিয়্যাল ইকোয়েটর্।

[৩] উচ্চারণ: জোডিয়্যাক্।

[৪] উচ্চারণ: মিরিডিয়ান্।

[৫] ইকুয়িনক্‌শ্যাল্ লাইন।

[৬] উচ্চারণ: সল্‌স্‌টিস্।

৬. দিগন্তরেখা (Horizon[১]/دائرة الأفق): যে রেখায় আকাশ ও পৃথিবী মিলিত হয়েছে বলে মনে হয়। এই রেখাও বৃত্তাকারের। এই বৃত্ত পৃথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে। একভাগ উপরের আর এক ভাগ নিচের। গ্রহ নক্ষত্রের উদয় অস্ত এই বৃত্তের সাথে সম্পর্কিত। দিগন্তরেখা পার হয়ে উপরে আসার নাম হল উদয় হওয়া, আর দিগন্তরেখার নিচে চলে যাওয়া হচ্ছে অস্ত যাওয়া। দিগন্তরেখাকে দিগন্ত বা চক্রবালও বলা হয়।

৭. মেরুবৃত্ত : এ সম্বন্ধে পূর্বে 'সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্ত' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

মহাজাগতিক অক্ষ, দ্রাঘিমা ও বিষুব ইত্যাদি প্রসঙ্গ

পৃথিবীপৃষ্ঠে যে কোনো বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করতে যেমন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনি আকাশে যে কোনোর জ্যোতিষ্কের অবস্থান নির্দেশ করা জন্য খ-গোলককে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা দিয়ে চিহ্নিত করা যায়।[২] বস্তুত এই পৃথিবীর গোলকে যেমন অক্ষ, দ্রাঘিমা ও বিষুব ইত্যাদি রয়েছে, এই পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্যেও তেমনি এগুলো কল্পনা করা হয়। যেন এই পৃথিবীকে চতুর্দিকে দূর থেকে বেষ্টন করে আছে এই পৃথিবীর গোলকের ন্যায় অক্ষ, দ্রাঘিমা ও বিষুব ইত্যাদি সবকিছু বিশিষ্ট একটি আসমানী গোলক, যাকে বলা হয় খ-গোলক (Celestial sphere[৩]/القبة السماوية) আর এই পৃথিবী রয়েছে তার পেটের মধ্যে। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ, অবস্থান ইত্যাদি বুঝাতে মহাজাগতিক এসব অক্ষ, দ্রাঘিমা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। সেই খ-গোলকের বিষুব রেখাকে বলা হয় খ-বিষুবরেখা। তাকে আসমানী বিষুব রেখা বা মহাজাগতিক বিষুবরেখাও[৪] (Celestial Equator/خط الاستواء السماوي) বলা যেতে পারে। তার দ্রাঘিমা রেখাকে বলে ক্রান্ত্যংশ (Celestial longitude/خط الطول السماوي)। তার অক্ষ রেখাকে বলে ক্রান্তিলম্ব (Celestial latitude/خط العرض السماوي)। তার মেরুকে বলে মহাজাগতিক মেরু (Celestial pole/القطب السماوي)। তার উত্তরমেরু বিন্দুকে বলা হয় খ-বিন্দু, খ-মধ্য, সুবিন্দু (Zenith[৫]) আরবিতে বলে سمت الرأس। সংক্ষেপে السمتও বলা হয়। (আকাশের যে বিন্দু মাথার ঠিক উপরে অবস্থিত, তাকেও খ-বিন্দু বলা হয়।) তার দক্ষিণমেরু বিন্দুকে বলা হয় অধোবিন্দু (Nadir[৬]/النظير)। (নভোমণ্ডলের যে স্থল আমাদের পদতলের ঠিক নিম্নে অবস্থিত, তাকেও অধোবিন্দু বলা হয়।) বিষুববৃত্ত থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের কৌণিক দূরত্বকে বলা হয় বিষুবলম্ব। অধোবিন্দু থেকে দিগন্ত পর্যন্ত লম্বভাবে অবস্থিত বৃত্তচাপকে বলে দিগংশ (Azimuth[৭]/زاوية سمت الرأس)।

---

[১] উচ্চারণ: হরাইজন্।

[২] পূর্বে বলা হয়েছে, পৃথিবী তার অক্ষে ঘূর্ণায়মান বিধায় প্রকৃতপক্ষে তার বরাবর উর্দ্ধে খ-গোলাকে দ্রাঘিমা আঁকা যায় না, তবে খ-গোলক আঁকার সময় আনুপাতিক হিসেবে তাতে দ্রাঘিমারেখা দেখানো যায় বৈ কি।

[৩] উচ্চারণ: সেলেস্‌চিয়্যাল স্ফীয়ার্।

[৪] কেউ কেউ Celestial Equator এর অর্থ করে থাকে স্বর্গীয় বিষুবরেখা।

[৫] উচ্চারণ: জেনিথ্, জিনিথ্।

[৬] উচ্চারণ: নেডির্।

[৭] উচ্চারণ: অ্যাজিমাথ্।

তৃতীয় অধ্যায়

(তারিখ, সময় ও নামায-রোযার ওয়াক্ত বিষয়ক)

আন্তর্জাতিক তারিখ ও সময় অঞ্চল

উল্লেখ্য– ইংল্যান্ডের গ্রীনিচ শহরের স্থানীয় সময়কে 'গ্রীনিচ সময়' (Greenwich mean time) বলে। এটাই সারা পৃথিবীর প্রমাণ সময়। আর প্রত্যেক দেশের 'প্রমাণ সময়' বলতে বুঝায় প্রত্যেক দেশের মধ্যবর্তী কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা গুরুত্বপূর্ণ শহরের স্থানীয় সময়কে ঐ দেশের সকল অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট সময় ধরে যে সময় গণনা করা হয়। আর 'স্থানীয় সময়' বলতে বুঝায় কোন স্থানে সূর্য যখন মাথার উপরে থাকে অর্থাৎ, মধ্য রেখার ঠিক উপরে থাকে, তখন সেখানে মধ্যাহ্ন বেলা ১১টা ধরে যে সময় গণনা করা হয়।

আরও উল্লেখ্য যে, গ্রীনিচ রেখা থেকে পূর্ব দিকে প্রতি ১৫ ডিগ্রী অন্তর ১ ঘণ্টা সময় বেশি এবং পশ্চিম দিকে প্রতি ১৫ ডিগ্রী অন্তর ১ ঘণ্টা সময় কম হিসাব করা হবে। সে হিসেবে বাংলাদেশের কেন্দ্রস্থানীয় শহর ঢাকা যেহেতু ৯০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাই গ্রীনিচ সময় থেকে বাংলাদেশের সময় ৬ ঘণ্টা বেশি। যদিও প্রকৃতপক্ষে ঢাকা ৯০°২৬′ (৯০ ডিগ্রী ২৬ মিনিট) পূর্ব দ্রাঘিমায় হওয়াতে ঢাকার স্থানীয় সময় গ্রীনিচ সময় থেকে ৬ ঘণ্টা ১ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড অগ্রগামী, কিন্তু ৯০ ডিগ্রীকে মূল ধরে হিসেব করা হয়েছে।

গ্রীনিচ সময় জানা থাকলে যে কোন দেশের কেন্দ্রস্থানীয় শহরের দ্রাঘিমা (পূর্ব দ্রাঘিমা/পশ্চিম দ্রাঘিমা) দেখে সে দেশের প্রমাণ সময় বের করা যায় এবং অন্য যে কোন দেশ থেকে সে দেশের সময়ের পার্থক্যও বের করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সৌদী আরবের কেন্দ্রস্থানীয় শহর রিয়াদ ৪৫ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাই সে দেশের প্রমাণ সময় গ্রীনিচ সময় থেকে ৩ ঘণ্টা বেশি এবং বাংলাদেশের কেন্দ্রস্থানীয় শহর ঢাকা যেহেতু ৯০ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাই বাংলাদেশের সময় থেকে সৌদী আরবের সময় ৩ ঘণ্টা কম।

নিম্নের একটি চিত্রে পূর্ণ ৩৬০ ডিগ্রী এলাকায় সময়ের পার্থক্য হওয়ার একটা নমুনা তুলে ধরা হল।

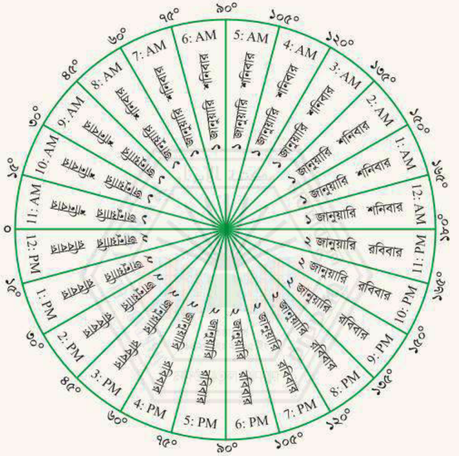
৯০°
১০৫°
১২০°
১৩৫°
১৫০°
১৬৫°
১৮০°
১৬৫°
১৫০°
১৩৫°
১২০°
১০৫°
৯০°
৭৫°
৬০°
৪৫°
৩০°
১৫°
০
১৫°
৩০°
৪৫°
৬০°
৭৫°
5: AM
4: AM
3: AM
2: AM
1: AM
12: AM
11: PM
10: PM
9: PM
8: PM
7: PM
6: PM
5: PM
4: PM
3: PM
2: PM
1: PM
12: PM
11: AM
10: AM
9: AM
8: AM
7: AM
6: AM
১ জানুয়ারি
শনিবার
২ জানুয়ারি
রবিবার

চিত্র নং ৯ – পূর্ণ পৃথিবীর সময়ের পার্থক্যের একটা নমুনা

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (خط التاريخ الدولي)

পূর্বে বলা হয়েছে যে, সমস্ত পৃথিবীকে ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সূর্যের আলো পূর্ব দিক থেকে পশ্চিক দিকে প্রতি ঘণ্টায় ১৫ ডিগ্রী স্থান অতিক্রম করে। এ হিসেবে ১৮০ ডিগ্রী অতিক্রম করতে সময় লাগে ১২ (১৮০÷১৫ = ১২) ঘণ্টা। সুতরাং কোন ব্যক্তি গ্রীনিচ থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকলে আর প্রতি ১৫ ডিগ্রী স্থান অগ্রসর হয়ে তার ঘড়ির সময় এক ঘণ্টা করে বৃদ্ধি করতে থাকলে এভাবে অগ্রসর হয়ে ১৮০ দ্রাঘিমায় পৌঁছলে সেই স্থানের স্থানীয় সময় ও দিনের চেয়ে তার কাছে ১২ ঘণ্টা বেশি এবং এভাবে পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে ১৮০ দ্রাঘিমায় পৌঁছলে ১২ ঘণ্টা কম মনে হবে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ ১৮০ তে ঐ সময় গ্রীনিচ সময় হিসেবে শুক্রবার সকাল ৮টা

হলে পূর্ব দিক থেকে অগ্রসরশীল ব্যক্তির নিকট মনে হবে ঐ দিন (শুক্রবার) রাত ৮টা আর পশ্চিম দিকে থেকে অগ্রসরশীল ব্যক্তির নিকট মনে হবে আগের দিন (বৃহস্পতিবার) দিবাগত রাত ৮টা। এভাবে একই স্থানে দুইটি বার ও দুইটি তারিখ হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্যা দূর করার জন্য পৃথিবীর সব জাতি একমত হয়ে স্থির করে নিয়েছে যে, পূর্ব দিক থেকে যাওয়া ব্যাক্তিরা দ্রাঘিমা রেখা ১৮০ অতিক্রম করে ১ দিন কমিয়ে নিবে এবং পশ্চিম দিক থেকে যাওয়া ব্যাক্তিরা ১৮০ অতিক্রম করে ১ দিন বাড়িয়ে নিবে। এভাবে ১৮০ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হিসেবে ডিগ্রী গড়ে উঠেছে।

তবে উল্লেখ্য যে, ১৮০ দ্রাঘিমা রেখা অনেকগুলো দ্বীপের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। ফলে ঐ রেখাকে সোজা অংকন করতে গেলে একই দেশের ঐ রেখার উভয় দিকে দিন ও তারিখের গড়মিল হয়। এই অসুবিধাকে দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে সোজা অংকন করা সম্ভব হয়নি। বরং ১৮০ ডিগ্রী মধ্যরেখাকে (আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে) কখনো পূর্ব দিকে কখনও পশ্চিম দিকে একটু বাঁকিয়ে স্থলভাগকে এড়িয়ে অংকন করা হয়েছে। একারণেই ১৮০ দ্রাঘিমা রেখা সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ এবং এ্যালুউশিয়ান, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপূঞ্জের উপর দিয়ে অতিক্রম করায় এ তারিখ রেখা এ্যালুউশিয়ান দ্বীপপূঞ্জের কাছে ৭° পশ্চিমে এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপূঞ্জের কাছে ১১° পূর্বে বাঁকিয়ে অংকন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তারিখ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় বলে ১৮০ ডিগ্রী মধ্যরেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date line[1]) বলা হয়।

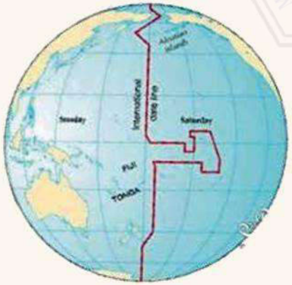

চিত্র নং ১০ – আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (ক)

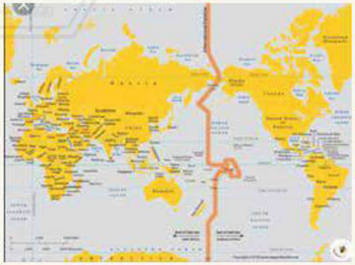

চিত্র নং ১১ – আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (খ)

---

[1] উচ্চারণ: ইন্টারন্যাশনাল ডেট্ লাইন।

এখানে একটি বিশেষ কথা উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা এবং তার ভিত্তিতে পৃথিবীর সময়, তারিখ ও বার বণ্টন– এটা শুধু একই স্থানে একাধিক তারিখ ও বার যেন না হয়ে যায়– এপ্রয়োজনে। অন্যথায় আন্তর্জাতিক তারিখ ও বার রেখা–র অর্থ এই নয় যে, গ্রীনিচ রেখা ও ১৮০ ডিগ্রীর মধ্যবর্তী পূর্ব দ্রাঘিমার অঞ্চলে সবসময় তারিখ ও বার এক থাকবে, এমনিভাবে গ্রীনিচ রেখা ও পশ্চিমের ১৮০ অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সবসময় তারিখ ও বার এক থাকবে এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ছাড়া অন্য কোন অঞ্চলের মাঝে তারিখ ও বার-এর পরিবর্তন ঘটবে না। যেমন ধরুন পাকিস্তানের অবস্থান বাংলাদেশ থেকে ১৫ ডিগ্রী পরিমাণ পশ্চিমে হওয়ায় পাকিস্তানের সময় বাংলাদেশের সময় থেকে ১ ঘণ্টা কম। অতএব উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের সময় যদি রাত ১২টা ১০ মিনিট হয়, তাহলে বাংলাদেশে তারিখ এবং বারে পরিবর্তন এসে যাবে। কিন্তু পাকিস্তানে তখন রাত ১১টা ১০ মিনিট হওয়ায় তাদের তারিখ ও বারে পরিবর্তন আসবে না। ফলে এ সময় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের তারিখ ও বার দুই হয়ে যাবে। আবার এরও ১ ঘণ্টা পর বাংলাদেশের সময় হবে রাত ১টা ১০ মিনিট এবং পাকিস্তানের সময় হবে ১২টা ১০ মিনিট তখন উভয় দেশের তারিখ ও বার এক হয়ে যাবে। এমনিভাবে আন্তর্জাতিক তারিখ ও বার রেখা–র অর্থ এও নয় যে, সারা পৃথিবীতে একই সাথে পূর্ণ দুটো তারিখ এবং পূর্ণ দুটো বার থাকবে, একটা গ্রীনিচ রেখা থেকে পূর্ব দিকে ১৮০ ডিগ্রী পর্যন্ত এবং আরেকটা গ্রীনিচ রেখা থেকে পশ্চিমে ১৮০ ডিগ্রী পর্যন্ত। কেননা পূর্ণ দুটো তারিখ ও পূর্ণ দুটো বার থাকতে হলে ২৪+২৪=৪৮ ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন। অথচ পৃথিবীর ৩৬০ ডিগ্রীতে রয়েছে সর্বমোট ২৪ ঘণ্টা। পূর্বে 'পূর্ণ পৃথিবীর সময়ের পার্থক্যের একটা নমুনা' শীর্ষক যে চিত্র (চিত্র নং ৯) দেয়া হয়েছে তাতেও লক্ষ করুন পূর্ব দ্রাঘিমার অঞ্চলে PM ১২ ঘণ্টা রয়েছে, AM ১২ ঘণ্টা নেই। এমনিভাবে পশ্চিম দ্রাঘিমা অঞ্চলে AM ১২ ঘণ্টা রয়েছে PM ১২ ঘণ্টা নেই। আরও একটা বিষয় ভেবে দেখুন পূর্ব দ্রাঘিমা অঞ্চলে পূর্ণ একটি তারিখ এবং পশ্চিম দ্রাঘিমা অঞ্চলে পূর্ণ একটি তারিখ থাকলে ইংল্যান্ডের গ্রীনিচ রেখার দুই পাশে দুই তারিখ হত, অথচ তা হয় না বরং পূর্ণ ইংল্যান্ডে (গ্রীনিচ রেখার পূর্বেও পশ্চিমেও) ১টা তারিখই থাকে।

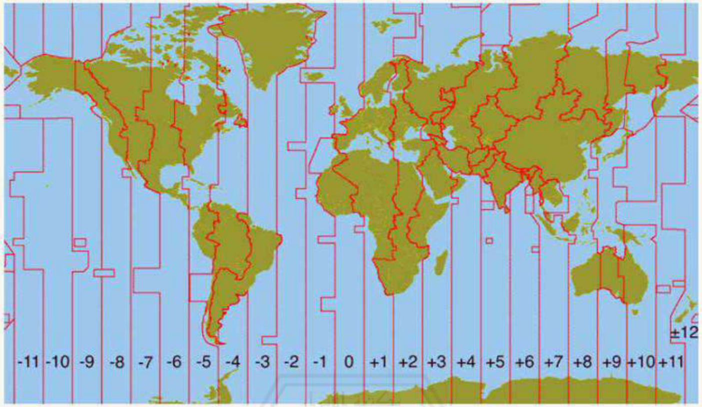

চিত্র নং ১২ – আন্তর্জাতিক সময় অঞ্চল

নামাযের সময় নির্ধারণে সময় ব্যবধানের সূত্র

পূর্বে বলা হয়েছে, দ্রাঘিমা রেখায় পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রতি ১৫ ডিগ্রী অন্তর ১ ঘন্টা সময়ের ব্যবধান হয়। অতএব প্রতি ১৫ ডিগ্রী= ১ ঘণ্টা হলে প্রতি ১ ডিগ্রী= ৪ মিনিট (ঘড়ির মিনিট)। আর প্রতি ডিগ্রী যেহেতু ৬০ মিনিটে (মানচিত্রের মিনিটে) এবং প্রতি মিনিট (মানচিত্রের মিনিট) ৬০ সেকেন্ডে (মানচিত্রের সেকেন্ডে) বিভক্ত, তাই মানচিত্রের ১ মিনিট= ঘড়ির ৪ সেকেন্ড এবং মানচিত্রের ১৫ সেকেন্ড= ঘড়ির ১ সেকেন্ড। এক অঞ্চলের নামায, সাহরী ও ইফতারের সময় থেকে অন্য অঞ্চলের নামায, সাহ্‌রী ও ইফতারের সময়ের পার্থক্য বের করতে হলে এই সূত্রগুলো খুব খেয়াল রাখতে হবে। সূত্রগুলো আবারও সংক্ষেপে পেশ করা হল।

- ১৫ ডিগ্রী = ১ ঘণ্টা।
- ১ ডিগ্রী = ঘড়ির ৪ মিনিট।
- মানচিত্রের ১ মিনিট = ঘড়ির ৪ সেকেন্ড।
- মানচিত্রের ১৫ সেকেন্ড = ঘড়ির ১ সেকেন্ড।

এবার আমরা আলোচনায় আসছি কেউ দুই এলাকার নামাযের সময়ে পার্থক্য বের করতে চাইলে যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার নামাযের সময়ে পার্থক্য বের করতে চাইলে তিনি কীভাবে কাজটি করবেন। আলোচনার পূর্বে নিম্নোক্ত ডাটাগুলো সামনে রাখুন। আলোচনায় এ ডাটাগুলোর উল্লেখ আসবে।

ঢাকার দ্রাঘিমা: ৯০°২৪′

ঢাকার পূর্ব সীমানা: ৯০°২৭′, পশ্চিম সীমানা– ৯০°

চট্টগ্রামের দ্রাঘিমা: ৯১°৪৮′

চট্টগ্রামের পূর্ব সীমানা: ৯২°, পশ্চিম সীমানা– ৯১°৩০′

খুলনার দ্রাঘিমা: ৮৯°৩২′

খুলনার পূর্ব সীমানা: ৮৯°৪৫′, পশ্চিম সীমানা– ৮৯°

এবার আসুন কেউ ঢাকার নামাযের সময় থেকে চট্টগ্রামের নামাযের সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে চাইলে তাকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দ্রাঘিমা বের করতে হবে। আর ঢাকার দ্রাঘিমা: ৯০°২৪′ আর চট্টগ্রামের দ্রাঘিমা: ৯১°৪৮′। অতএব ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দ্রাঘিমার পার্থক্য ১ ডিগ্রী ২৪ মিনিট। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ১ ডিগ্রী ২৪ মিনিট পূর্বে। অতএব সময়ের পার্থক্য হবে ১ ডিগ্রী = ৪ মিনিট + ২৪ মিনিট = (২৪×৪=) ৯৬ সেকেন্ড। তাহলে ৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের সময়ের পার্থক্য ৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড। আর মনে রাখতে হবে দ্রাঘিমায় যে অঞ্চল পূর্বে সেখানের সময় আগে এবং যে অঞ্চল পশ্চিমে হয় সেখানের সময় পরে আসে। অতএব চট্টগ্রাম ঢাকা থেকে পূর্বে হওয়ায় চট্টগ্রামে যেকোনো নামাযের সময় ঢাকার সংশ্লিষ্ট সময় থেকে ৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড পূর্বে হবে অর্থাৎ, ঢাকার সময় থেকে চট্টগ্রামের সময় ৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড কমাতে হবে। এমনিভাবে ঢাকার দ্রাঘিমা: ৯০°২৪′ আর খুলনার দ্রাঘিমা: ৮৯°৩২′। অতএব দুই জেলায় দ্রাঘিমার পার্থক্য ৫২′। অতএব সময়ের পার্থক্য ৫২×৪=২০৮ মিনিট তথা ঘড়ির ৩ মিনিট ২৮ সেকেন্ড। আর খুলনা ঢাকা থেকে পশ্চিমে হওয়ায় ঢাকার সময় থেকে খুলনার সময় ৩ মিনিট ২৮ সেকেন্ড পরে হবে অর্থাৎ, ঢাকার সময় থেকে খুলনার সময় ৩ মিনিট ২৮ সেকেন্ড বাড়াতে হবে। তবে কোন নামাযের সময় শুরুর ক্ষেত্র হলে সতর্কতা হল অপূর্ণ মিনিটের স্থলে পূর্ণ ১ মিনিট ধরে নিয়ে সময় নির্ধারণ করা, যাতে সময় হওয়ার আগেই কেউ নামায শুরু না করে। যেমন ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের সময়ের পার্থক্য ৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড। এস্থলে পার্থক্য পূর্ণ ৬ মিনিট বলা। এমনিভাবে ঢাকা থেকে খুলনার সময়ের পার্থক্য ৩ মিনিট ২৮ সেকেন্ড–এর স্থলে পূর্ণ ৪ মিনিট বলা। আর কোন নামায শেষের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপূর্ণ মিনিটকে বাদ দিয়ে সময় বলা, যাতে সময় শেষ হওয়ার পরও কেউ নামায পড়তে না থাকে। তাই কোন নামাযের শেষ সময় বলার ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের সময়ের পার্থক্য ৫ মিনিট আর ঢাকা থেকে খুলনার সময়ের পার্থক্য ৩ মিনিট বলাই হবে সতর্কতা। অবশ্য সতর্কতার জন্য এক দুই মিনিট আরও বেশি ধরলেও ধরা যেতে পারে। অপূর্ণ মিনিটকে পূর্ণ মিনিট ধরে নেয়া বা বাদ দেয়ার কারণ এটাও যে, সাধারণত কেউ ঘড়ির সেকেন্ড দেখে না বরং ঘণ্টা ও মিনিটই দেখে থাকে।

সতর্কতার আরও একটা দিক রয়েছে। তা হল একটি স্থানের সময়ের ভিত্তিতে অন্য যে এলাকার সময়ের পার্থক্য বের করতে চাওয়া হবে সেই অন্য এলাকার পূর্ব সীমানা বিচার করা হবে না কি পশ্চিম সীমানা। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা হল ফজরের নামাযের শেষ সময় হলে তার পূর্বের সীমানা বিবেচ্য।

পশ্চিমের সীমানা বিবেচ্য হবে না এ কারণে যে, তাতে পূর্বের সীমানার লোকেরা নামাযের সময় শেষ হওয়ার পরও নামায পড়তে থাকবে। আর মাগরিবের নামাযের শুরুর সময় হলে তার পশ্চিমের সীমানা বিবেচ্য। পূর্বের সীমানা বিবেচ্য হবে না এ কারণে যে, তাতে সময় হওয়ার পূর্বেই পশ্চিম সীমানার লোকেরা নামায পড়া শুরু করতে পারে। অতএব উদাহরণ স্বরূপ ফজরের নামাযের শেষ সময়ের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের পূর্বের সীমানা (৯২°) বিবেচনা করে দেখুন তাতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের সময়ের পার্থক্য হবে ১ ডিগ্রী ৩৬ মিনিট। অতএব এ হিসেবে সময়ের পার্থক্য হবে ৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড। সতর্কতার জন্য ৭ মিনিট ধরা হবে। আর মাগরিবের নামাযের শুরুর সময়ের ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের পশ্চিমের সীমানা (৯১°৩০′) বিবেচনা করে দেখুন তাতে ঢাকা থেকে সময়ের পার্থক্য হবে ১ ডিগ্রী ৬ মিনিট। তাতে ঢাকা থেকে সময়ের পার্থক্য হবে ৪ মিনিটি ২৪ সেকেন্ড, সতর্কতার জন্য ৫ মিনিট ধরা হবে। দেখা গেল ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের সময়ের পার্থক্য এক বিবেচনায় ৫ মিনিট, এক বিবেচনায় ৬ মিনিট ও এক বিবেচনায় ৭ মিনিট। এভাবে ঢাকা থেকে খুলনার সময়ের পার্থক্যও একেক বিবেচনায় একেক রকম হবে। যেমন: খুলনার পূর্বের সীমানা হচ্ছে ৮৯°৪৫′। তাহলে ঢাকা (৯০°২৪′) থেকে তার দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় ৩৯′। তাহলে সময়ের পার্থক্য হয় ২ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড, সতর্কতার জন্য ৩ মিনিট ধরা হবে। আর খুলনার পশ্চিমের সীমানা হচ্ছে ৮৯′। তাহলে ঢাকা থেকে তার দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় ১°২৪′। তাতে সময়ের পার্থক্য দাঁড়ায় ৫ মিনিট ৩৬ সেকেন্ড। সতর্কতার জন্য ৬ মিনিট ধরা হবে। দেখা গেল ঢাকা থেকে খুলনার সময়ের পার্থক্য এক বিবেচনায় ৩ মিনিট, এক বিবেচনায় ৪ মিনিট, এক বিবেচনায় ৬ মিনিট।

সাহ্‌রী ও ইফতারের সময় নির্ধারণে সময় ব্যবধানের সূত্র

পূর্বের পরিচ্ছেদে এক এলাকার নামাযের সময়ের ভিত্তিতে অন্য এলাকার নামাযের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের দ্রাঘিমার পার্থক্য বিবেচনার যে পদ্ধতি বলা হয়েছে, সাহরী ও ইফতারের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি প্রযোজ্য। তবে সাহরীর সময়ের পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে এলাকার সময়ের ভিত্তিতে অন্য এলাকার সময় নির্ধারণ করা হবে সেই অন্য এলাকার পূর্বের সীমানা বিবেচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমের সীমানা (যাতে সাহরীর শেষ সময় পূর্বের সীমানার তুলনায় পরে হবে।) বিবেচনা করলে হতে পারে পূর্বের সীমানায় সাহ্‌রীর সময় শেষ হওয়ার পরও সেখানকার লোকেরা সাহরী গ্রহণ করবে। আর ইফতারের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেই অন্য এলাকার পশ্চিম দিকের সীমানা (যাতে ইফতারের সময় পূর্বের সীমানার তুলনায় পরে হবে।) বিবেচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পূর্বের সীমানা (যেখানে ইফতারের সময় পশ্চিমের সীমানার তুলনায় আগে হবে।) বিবেচনা করলে হতে পারে তার পশ্চিম সীমানায় ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বেই সেখানকার লোকেরা ইফতার গ্রহণ করে নিবে।

উল্লেখ্য, নিম্নে আমরা ঢাকার জন্য নামায, সাহরী ও ইফতারের সময় নির্ধারণী একটি ক্যালেন্ডার পেশ করছি। আমরা ক্যালেন্ডার তৈরির কাজটি নামাযের সময় এবং সাহ্‌রী ও ইফতারের সময় নির্ধারণে পূর্বে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করেই সম্পন্ন করেছি। ঢাকা ব্যতীত অন্য যে কোনো এলাকার ক্যালেন্ডার পূর্ববর্ণিত নিয়মাবলি অনুসরণ করে তৈরি করে নিতে হবে।

নামায, রোযার ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গ

নামায, সাহরী ও ইফতারের সময়ে কিছু সতর্কতামূলক সময় রাখার আবশ্যকতার দু'টো কারণ

১. পৃথিবী তার অক্ষে ২৩.৫০ ডিগ্রী কোণ করে অর্থাৎ, ২৩.৫০ ডিগ্রী বক্র হয়ে আবর্তন করে থাকে। এই বক্রতায়ও প্রতিদিন অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে পার্থক্য ঘটতে থাকে। এই পার্থক্য এত কম যে, প্রায় ১০০ বছরে তা একটু উল্লেখের পর্যায়ে আসে। অর্থাৎ, ১০০ বছরে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬ সেকেন্ড (মানচিত্রের সেকেন্ড)। এ কারণেই প্রতি বছর নামাযের সময়ে একটু হলেও পার্থক্য ঘটে। প্রতি বছরের সেই পার্থক্য উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের না হলেও প্রায় ২০/৩০ বছরে তা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। (فهم الفلكيات صفحہ/٧٤-٧٣) উল্লেখ্য, পৃথিবী তার অক্ষে বেঁকে থাকার কারণেই দেশে দেশে মৌসুম ও রাত্র-দিনের সময়ের তারতম্য ঘটে থাকে। অতএব ক্যালেন্ডারে কিছুটা সতর্কতামূলক সময় না রাখা হলে সারাদেশের জন্য তো নয়ই একটা অঞ্চলের জন্যই স্থায়ী কোন ক্যালেন্ডার করা সম্ভব নয়। কেননা একটা অঞ্চলেই প্রতি বছর নামাযের সময়ে একটু হলেও পার্থক্য ঘটে।

২. স্থায়ী ক্যালেন্ডারে পূর্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সময়ের যে পার্থক্য করা হয় তা দ্রাঘিমার ভিত্তিতে করা হয়। (১ ডিগ্রী = ৪ মিনিট ...- হিসেবে পূর্বদিকে সময় যোগ হয় এবং পশ্চিমদিকে সময় বিয়োগ হয়।) প্রমাণ সময় ও স্থানীয় সময় নির্ধারণ ও পার্থক্যের ক্ষেত্রে এটার হিসেবে তেমন একটা ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু একই দ্রাঘিমায় যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া হবে অর্থাৎ, অক্ষের যতই পার্থক্য হবে ততই নামায, সাহরী, ইফতার ইত্যাদির সময়ে অতি সামান্য হলেও পার্থক্য ঘটবে। অনেকেই জানেন বিষুব রেখার আশপাশের অঞ্চলসমূহের তুলনায় মেরুর দিকের অঞ্চলসমূহের রাত দিনের সময়ে প্রচুর পার্থক্য হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আইসল্যান্ডে সময় ভেদে ২০-২২ ঘণ্টা দিন হয়ে থাকে। একেবারে মেরুসংলগ্ন এলাকায় ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত হয়ে থাকে। সূর্যের উন্নতি (میل الشمس)-এর পার্থক্য হওয়ায় এই পার্থক্য ঘটে থাকে। (পরবর্তী পর্যালোচনা নম্বর ২য়ে ব্যখ্যা দেখুন।) অতএব একই দেশের উত্তর-দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলকেও সমন্বিত করে তার জন্য একই সঙ্গে প্রযোজ্য ক্যালেন্ডার তৈরি করলে চাইলে তাতে সতর্কতামূলক সময় রাখতেই হবে, অন্যথায় অক্ষের পার্থক্যে নামায, সাহরী, ইফতার ইত্যাদির সময়ে যে পার্থক্য ঘটে তার সঙ্গে ক্যালেন্ডারকে খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। অক্ষের পার্থক্য মোটেই বিবেচনায় না রেখে শুধু দ্রাঘিমার পার্থক্যের ভিত্তিতে উত্তর-দক্ষিণের দুই বা ততোধিক অঞ্চলের সময়ে পার্থক্য নির্ণয় করে সতর্কতামূলক সময় ছাড়া দ্ব্যর্থহীন সময় নির্ধারণ করা হবে একটা বড় ভুল।

দ্রাঘিমা এক থাকা সত্ত্বেও শুধু অক্ষের পার্থক্যের কারণে সময়ের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য দেখা দেয় তার একটা নমুনা তুলে ধরছি। নমুনায় ঢাকা বরাবর (ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০.৪১°[১] ঠিক রেখে) সোজা উত্তর বা সোজা দক্ষিণ দিকে যেতে থাকলে অর্থাৎ, দ্রাঘিমা ঠিক রেখে শুধু অক্ষের পার্থক্য ঘটতে থাকলে কীভাবে সময়ের পার্থক্য হয় তা দেখানো হয়েছে।

---

[১] উল্লেখ্য. ৯০.৪১° ই হচ্ছে ৯০°২৪′।

(উল্লেখ্য, তালিকায় প্রদত্ত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় Sunrise, Sunset ক্যালকুলেটরে choose location অপশনে গিয়ে দ্রাঘিমা ও অক্ষ লিখে বের করা যাবে।)

এবার ঢাকা বরাবর উত্তর-দক্ষিণের কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র অক্ষের পার্থক্যে কীভাবে সময়ের পার্থক্য হয় তা দেখানো হচ্ছে। ঢাকার উত্তরে গাজিপূর, তার উত্তরে ময়মনসিংহের ভালুকা, তার উত্তরে ময়মনসিংহের ত্রিশাল, তার উত্তরে শেরপুরের ধোবাউরা এলাকা। আর ঢাকা বরাবর দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং, শরীয়তপুরের গোসাইরহাট ও পটুয়াখালির গলাচিপা এলাকা– এই কয়েকটি এলাকার একই তারিখের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের পাথ্যক্য দেখানো হচ্ছে। সবগুলো এলাকার দ্রাঘিমা প্রায় একই।

নমুনা: ১ (তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০১৮)

এলাকার নাম	অক্ষ	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ধোবাউড়া	২৫.১১°	৬: ৪৩	৫: ২০
ত্রিশাল	২৪.৫৮°	৬: ৪২	৫: ২১
ভালুকা	২৪.৪০°	৬: ৪১	৫: ২২
গাজিপুর	২৪.০৯°	৬: ৪১	৫: ২২
ঢাকা	২৩.৮১°	৬: ৪০	৫: ২৩
লৌহজং	২৩.৪৭°	৬: ৩৯	৫: ২৪
গোসাইরহাট	২৩.১০°	৬: ৩৯	৫: ২৪
গলাচিপা	২২.১৬°	৬: ৩৭	৫: ২৬

পর্যালোচনা:

১. নমুনা ১ য়ে ঢাকা বরাবর উত্তর দক্ষিণে কয়েকটি এলাকা নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে একই তারিখে শুধু অক্ষের পার্থক্যের কারণে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে কীভাবে পার্থক্য ঘটে থাকে। আর বলা বাহুল্য, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে পার্থক্য ঘটলে সুবহে সাদেক, যাওয়াল, ছায়ার মিছলে আউয়াল, মিছলে ছানী, শাফাকে আহমার, শাফাকে আবইয়ায় ইত্যাদিতেও অবশ্যই পার্থক্য ঘটবে। অর্থাৎ, সব নামাযের সময়েই এর প্রভাব পড়বে।

২. দ্রাঘিমা এক থাকা সত্ত্বেও শুধু অক্ষের পার্থক্যের কারণে সময়ের মধ্যে পার্থক্য ঘটার বিশেষ কারণ হচ্ছে সূর্যের উন্নতির তারতম্য (فرق ميل الشمس)। নমুনা: ১ য়ে তারিখ ছিল ২২ ডিসেম্বর, যখন সূর্যের উন্নতি ছিল মাইনাসের শেষ পর্যায়ে। তাই তখন সূর্য থেকে উত্তর দিকে যত দূরের এলাকা সেখানে সূর্যাস্ত কিছু আগে হয়েছে, কারণ সেদিকে সূর্যের আলো তীর্যকভাবে পতিত হওয়ায় সেদিকে আগেই সূর্যাস্ত অনুভূত হয়েছে। একারণেই ২২ ডিসেম্বর তেতুলিয়ার সূর্যাস্ত ঢাকার তুলনায় আগে এবং টেকনাফের সূর্যাস্ত ঢাকার তুলনায় পরে হয়েছে। পক্ষান্তরে ২১ জুন সূর্যের উন্নতি সর্বোচ্চ থাকায় তথা ঢাকার মাথার উপরে এবং টেকনাফ থেকে দূরে থাকার কারণে টেকনাফের সূর্যাস্ত ঢাকার তুলনায় আগে হয়েছে। উল্লেখ্য, ২২ ডিসেম্বর আমাদের দেশে শীতকাল আর ২১ জুন গ্রীষ্মকাল। শীত ও গ্রীষ্মকালে যেমন পার্থক্য ঘটছে, বসন্ত ও শরৎকালেও পার্থক্য থাকবে। তবে বসন্ত ও শরৎকালের পার্থক্যটা একটু কম হবে, কারণ তখন সূর্যের উন্নতি (ميل الشمس) মাঝামাঝি থাকায় অক্ষের সময়ের উপর তার প্রভাব কম থাকবে।

এতক্ষণ দ্রাঘিমা এক শুধু অক্ষের ভিন্নতা ঘটলে সময়ের পার্থক্য কীভাবে হয় তা দেখানো হয়েছে। এবার দ্রাঘিমা ভিন্ন হওয়ার সময় অক্ষের পার্থক্যের সাথে সাথে সূর্যের উন্নতির পার্থক্য দুটো মিলিয়ে সময়ের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য দেখা দেয় তারও একটা নমুনা তুলে ধরছি। যেমন ধরুন ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের দক্ষিণের একটি এলাকা কক্সবাজারের টেকনাফ আর উত্তরের একটি এলাকা রংপুরের তেতুলিয়ার মধ্যে অক্ষের পার্থক্যের কারণে কীভাবে সময়ের পার্থক্য ঘটে লক্ষ করুন। (উল্লেখ্য, তালিকায় প্রদত্ত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় Sunrise, Sunset ক্যালকুলেটর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।)

নমুনা: ১ (তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০১৮)

স্থান	দ্রাঘিমা	অক্ষ	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ঢাকা	৯০°২৪′	২৩°৪৮′	৬: ৩৬	৫: ১৭
টেকনাফ	৯২°১২′	২১°৩′	৬: ২৩	৫: ১৫
তেতুলিয়া	৮৮°২৫′	২৬°৩০′	৬: ৪৭	৫: ১৯

নমুনা: ২ (তারিখ: ২১ জুন ২০১৮)

স্থান	দ্রাঘিমা	অক্ষ	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ঢাকা	৯০°২৪′	২৩°৪৮′	৫: ১২	৬: ৪৮
টেকনাফ	৯২°১২′	২১°৩′	৫: ১০	৬: ৩৪
তেতুলিয়া	৮৮°২৫′	২৬°৩০′	৫: ১৪	৬: ৫৯

পর্যালোচনা: (নমুনা: ১)

ঢাকা–টেকনাফের মধ্যকার সময়ের পর্যালোচনা: ঢাকা থেকে টেকনাফের দ্রাঘিমার পার্থক্য (১°৪৮′) হিসেবে সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে ৭ মিনিটের মত। সে হিসেবে ঢাকায় সূর্যোদয় ৬টা ৩৬ মিনিটে হলে টেকনাফে তার ৭ মিনিট পূর্বে (টেকনাফ ঢাকা থেকে পূর্বে হওয়ার কারণে) তথা ৬টা ২৯ মিনিটে হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে হচ্ছে আরও ৬ মিনিট পূর্বে তথা ৬টা ২৩ মিনিটে। এই যে পার্থক্য– এটা অক্ষের পার্থক্য ও সূর্যের উন্নতির পার্থক্যের কারণে হচ্ছে। আবার দেখুন ঢাকার সূর্যাস্ত ৫টা ১৭ মিনিটে। সে হিসেবে টেকনাফের সূর্যাস্ত হওয়ার কথা তার ৭ মিনিট পূর্বে ৫ টা ১০ মিনিটে, কিন্তু হচ্ছে ৫টা ১৫ মিনিটে তথা ৫ মিনিট পরে।

ঢাকা-তেতুলিয়ার মধ্যকার সময়ের পর্যালোচনা: ঢাকা থেকে তেতুলিয়ার দ্রাঘিমার পার্থক্য (১°৫৯′) হিসেবে সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে প্রায় ৮ মিনিট। সে হিসেবে ঢাকায় সূর্যোদয় ৬টা ৩৬ মিনিটে হলে তেতুলিয়ায় তার ৮ মিনিট পরে (তেতুলিয়া ঢাকা থেকে পশ্চিমে হওয়ার কারণে) ৬টা ৪৪ মিনিটে হওয়ার কথা। সেখানে হচ্ছে আরও ৩ মিনিট পরে তথা ৬টা ৪৭ মিনিটে। এই যে পার্থক্য- এটা অক্ষের পার্থক্য ও সূর্যের উন্নতির পার্থক্যের কারণে হচ্ছে। আবার দেখুন ঢাকার সূর্যাস্ত ৫টা ১৭ মিনিটে। সে হিসেবে তেতুলিয়ার সূর্যাস্ত হওয়ার কথা তার ৮ মিনিট পরে ৫ টা ২৫ মিনিটে কিন্তু হচ্ছে ৫টা ১৯ মিনিটে তথা ৬ মিনিট পূর্বে।

পর্যালোচনা: (নমুনা: ২)

ঢাকা-টেকনাফের মধ্যকার সময়ের পর্যালোচনা: ঢাকা থেকে টেকনাফের দ্রাঘিমার পার্থক্য (১°৪৮′) হিসেবে সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে ৭ মিনিটের মত। সে হিসেবে ঢাকায় সূর্যোদয় ৫টা ১২ মিনিটে হলে টেকনাফে তার ৭ মিনিট পূর্বে (টেকনাফ ঢাকা থেকে পূর্বে হওয়ার কারণে) তথা ৫টা ৫ মিনিটে হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে হচ্ছে আরও ৫ মিনিট পরে তথা ৫টা ১০ মিনিটে। এই যে পার্থক্য- এটা অক্ষের পার্থক্যের কারণে হচ্ছে। আবার দেখুন ঢাকার সূর্যাস্ত ৬টা ৪৮ মিনিটে। সে হিসেবে টেকনাফের সূর্যাস্ত হওয়ার কথা তার ৭ মিনিট পূর্বে ৬ টা ৪১ মিনিটে কিন্তু হচ্ছে ৬টা ৩৪ মিনিটে তথা ৭ মিনিট পূর্বে।

ঢাকা-তেতুলিয়ার মধ্যকার সময়ের পর্যালোচনা: ঢাকা থেকে তেতুলিয়ার দ্রাঘিমার পার্থক্য (১°৫৯′) হিসেবে সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে প্রায় ৮ মিনিট। সে হিসেবে ঢাকায় সূর্যোদয় ৫টা ১২ মিনিটে হলে তেতুলিয়ায় তার ৮ মিনিট পরে (তেতুলিয়া ঢাকা থেকে পশ্চিমে হওয়ার কারণে) ৫টা ২০ মিনিটে হওয়ার কথা। সেখানে হচ্ছে আরও ৬ মিনিট পূর্বে তথা ৫টা ১৪ মিনিটে। এই যে পার্থক্য- এটা অক্ষের পার্থক্যের কারণে হচ্ছে। আবার দেখুন ঢাকার সূর্যাস্ত ৬টা ৪৮ মিনিটে। সে হিসেবে তেতুলিয়ার সূর্যাস্ত হওয়ার কথা তার ৮ মিনিট পরে ৬ টা ৫৬ মিনিটে, কিন্তু হচ্ছে ৬টা ৫৯ মিনিটে তথা ৩ মিনিট পরে।

সারকথা- দু'টো অঞ্চলের মাঝে সময়ের পার্থক্য শুধু দ্রাঘিমার ভিত্তিতে নয় বরং অক্ষের ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। আবার সূর্যের উন্নতির ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। অতএব যদি একই অঞ্চল তথা একই জেলার জন্য একটি ক্যালেন্ডার করে তার ভিত্তিতে অন্য জেলাগুলোর সময় শুধু দ্রাঘিমার পার্থক্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে চাওয়া হয়, তাহলে সতর্কতামূলক কিছু সময় অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তারপরও এই পদ্ধতি লামছাম পদ্ধতি, নিখুঁত বা সঠিক পদ্ধতি নয়। নিখুঁত ও সঠিক পদ্ধতি হল সব অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্যালেন্ডার তৈরি করা। বস্তুত সব অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য একটি স্থায়ী ক্যালেন্ডার তৈরি করা সম্ভব নয়। সামনের আলোচনা দেখুন।

সব অঞ্চলের জন্য একটি স্থায়ী ক্যালেন্ডার করা সম্ভব কি না

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, দু'টো অঞ্চলের মাঝে সময়ের পার্থক্য শুধু দ্রাঘিমার ভিত্তিতে নয় বরং অক্ষের ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। আবার সূর্যের উন্নতির ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। অতএব সতর্কতামূলক কিছু সময় রাখা হলেও দ্রাঘিমার ভিত্তিতে কতটুকু পার্থক্য ঘটল, অক্ষের ভিত্তিতে কতটুকু পার্থক্য ঘটল, সূর্যের উন্নতির ভিত্তিতে কতটুকু পাথ্যক্য ঘটল সবগুলো পার্থক্যের মাঝে সমন্বয় করে দু'টো অঞ্চলের মাঝে সময়ের ব্যবধান একবাক্যে বলে দেয়া সম্ভব নয়। যেমন ঢাকার জন্য একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করে বলে দেয়া হল যে, ঢাকার সময় থেকে চট্টগ্রামে এত মিনিট কমানো হবে খুলনায় এত মিনিট বাড়ানো হবে ইত্যাদি। অতএব একটি এলাকার ক্যালেন্ডার তৈরি করে অন্য সব এলাকার জন্য শুধু দ্রাঘিমার ভিত্তিতে সময়ের পার্থক্য লিখে সেটিকে সব এলাকার জন্য স্থায়ী ক্যালেন্ডার হিসেবে গ্রহণ করার কোনো উপায় নেই। সঠিক ও নিখুঁত পন্থা হল সব এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্যালেন্ডার তৈরি করা। প্রত্যেক এলাকার উলামায়ে কেরাম তাদের এলাকার জন্য স্বতন্ত্র কালেন্ডার তৈরি করে নিলেই সত্যিকারের সমাধান দাঁড় হবে। এ ব্যাপারে কোন এলাকার উলামায়ে কেরাম উদ্যোগ নিলে তাদেরকে সাধ্য মোতাবেক তাত্ত্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি অধম প্রস্তুত রয়েছি।

সামনে প্রদত্ত আমাদের ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

১. আমাদের ক্যালেন্ডারে সুবহে কাযেব, সুবহে সাদেক-এর সময় জুমহুরের মত ও উম্মতের তাআমুল অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে। আমাদের তাহকীকী টীম (যার বর্ণনা গ্রন্থের শুরুতে প্রদান করা হয়েছে।) এটিকেই সঠিক পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী (রহ.) যে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তা যে সঠিক নয় তা পঞ্চম অধ্যায়ে 'সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধান' শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত করা হয়েছে।

২. আমাদের ক্যালেন্ডারে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় প্রদান করা হয়েছে ঢাকার পশ্চিম সীমানার ভিত্তিতে। এতেই সতর্কতা। কেননা, ঢাকার পূর্ব সীমানা হল ৯০°২৭′ (৯০.৪৫°) আর পশ্চিম সীমানা ৯০°। অতএব পূর্ব ও পশ্চিমের সীমানার মধ্যে সময়ের পার্থক্য পৌনে দুই মিনিটের মত (১ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড)। এখন পূর্বের সীমানার ভিত্তিতে সময় দেয়া হলে পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা প্রায় দুই মিনিট পূর্বেই মাগরিবের নামায শুরু করে দিবে বা ইফতার করে নিবে। তাই পশ্চিম সীমানার ভিত্তিতেই সময় দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বের করার জন্য Sunrise Sunset প্রভৃতি সফ্টওয়ার রয়েছে। এ সফ্টওয়ারগুলোতে ঢাকার সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দেখানো হয় ঢাকার পূর্ব সীমানার ভিত্তিতে। আবার নেটে Sunrise & Sunset time in Dhaka-য় সময় দেখানো হয় ঢাকার মধ্যের অঞ্চলের ভিত্তিতে। তাই উপরোক্ত সফ্টওয়ার বা নেট থেকে সময় বের করলে পার্থক্যটা মাথায় রেখে নিতে হবে। নতুবা মাগরিবের নামায, ইফতার ইত্যাদিতে সমস্যা সৃষ্টি হবে।

৩. আমাদের ক্যালেন্ডারে জোহরের ওয়াক্ত, মিছলে আওয়াল, আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী আমাদের সরেজমিন তাহকীক অনুসারে দেখানো হয়েছে। যাত্রাবাড়ি মাদরাসা ঢাকায় দায়েরায়ে হিন্দিয়া তৈরি করে তার মাধ্যমে বছরের ৪ দিন (২১ মার্চ, ২১ জুন, ২৩ সেপ্টেম্বর ও ২২ ডিসেম্বর) ছায়া মেপে যাচাইপূর্বক উপরোক্ত সময়গুলো নির্ণয় করা হয়েছে। (সামনে দায়েরায়ে হিন্দিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।) উপরোক্ত ৪ দিন আমি এবং আমাদের তাহকীকী টীমের মধ্যে হযরত মাওলানা আহমদ ঈসা, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান জামশেদ ও হযরত মাওলানা আবুল কালাম আনসারী- এই মোট চার জন উপস্থিত থেকে সতর্কতার সঙ্গে উপরোক্ত সময়গুলো নির্ণিত করেছি। উল্লেখ্য, আমাদের সামনে পেশকৃত ক্যালেন্ডারে জোহরের ওয়াক্ত, মিছলে আওয়াল, আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী- এগুলো ঢাকার ৯০ ডিগ্রীর সময়কে মূল ধরে সে অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে। আমরা যেখানে দায়েরায়ে হিন্দিয়া বানিয়েছিলাম, সেখানকার দ্রাঘিমা ছিল ৯০ ডিগ্রী ২৬ মিনিট। অতএব এখানে আমরা যে সময় পেয়েছি তার সঙ্গে ১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড যোগ করে ৯০ ডিগ্রীর সময় বের করা হয়েছে।

৪. আমাদের দেশে হযরত মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী (রহ.) তার হাদিয়াতুল মুসল্লীন (هدية المصلين) গ্রন্থে নামাযের যে সময় বর্ণনা করে গেছেন এবং তার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নামাযের যে চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে, তার থেকে আমাদের ক্যালেন্ডারে প্রদত্ত ইসতিওয়ায়ে শাম্‌স ও মিছলে ছানী তথা আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সময়ে সারা বছরের কিছু দিনে সামান্য কিছু পার্থক্য রয়েছে। আমরা পূর্বে বর্ণিত তাহকীক অনুসারে আমাদের ক্যালেন্ডারে সময় প্রদান করেছি। তবে আমাদের প্রদত্ত সময়ে আল-হামদু লিল্লাহ সতর্কতাই রক্ষিত হয়েছে।

৫. আমাদের ক্যালেন্ডারে আসরের মাকরুহ ওয়াক্ত এবং মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত আমাদের টীমের তাহকীক মোতাবেক প্রদান করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে 'সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্‌য়ী বিধি-বিধান' শিরোনামের অধীনে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

৬. আমাদের ক্যালেন্ডারে মাগরিব ও ইফতারের সময়ে ২ মিনিট সতর্কতামূলক সময় (যোগ করে) রাখা হয়েছে, কেননা ঢাকার পশ্চিম সীমান্ত কিছু এঁকেবেঁকেও রয়েছে বৈকি। তদুপরি ঘড়ির সময়েও উনিশ বিশ হতে পারে। এই ২ মিনিট যোগ করার ফলে ঢাকার পূর্ব সীমান্তের লোকদের জন্য সতর্কতামূলক সময় হয়ে দাঁড়াবে ৪ মিনিট-এর মত। এর চেয়ে বেশি সতর্কতামূলক সময়ের প্রয়োজন নেই এ কারণে যে, আমরা পশ্চিম সীমান্তের সূর্যাস্তের ভিত্তিতেই পূরো ঢাকার সময় ধরেছি। আর সাহরির শেষ সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ব সীমানার সময়কে মূল ধরে তার থেকে ২ মিনিট কম করে দেখানো হয়েছে। এতে করে ঢাকার পশ্চিম সীমান্তের লোকদের জন্য সতর্কতামূলক সময় হয়ে দাঁড়াবে ৪ মিনিটের মত। ফজরের ওয়াক্ত দেখানো হয়েছে সাহরির শেষ সময় হিসেবে দেখানো সময় থেকে ৪ মিনিট (অর্থাৎ, মূল সময় থেকে ২ মিনিট) পরে।

৭. আমাদের ক্যালেন্ডারে সূর্যোদয়ের সময় দেখানো হয়েছে পশ্চিম সীমানার ভিত্তিতে। পূর্বের সীমানার ভিত্তিতে দেখানো হলে পশ্চিম সীমানার লোকদের হাতে সময় থাকা সত্ত্বেও সূর্য উদয় হয়ে গেছে মনে করে ফজরের নামায কাযা করে বসত। পশ্চিম সীমানার ভিত্তিতে সূর্যোদয় দেখানোর ফলে এমন হতে পারে যে, পূর্বের সীমানার লোকদের ফজরের নামাযে শেষের কিছু অংশ সূর্যোদয়ের পরে হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে তেমন সমস্যা নেই। কেননা ফজরের নামায পড়তে পড়তে সূর্যোদয় ঘটে গেলেও সহীহ হাদীছের ভিত্তিতে নামায হয়ে যাওয়ার ফতওয়া রয়েছে। তবে বিষয়টি বিতর্কিত হওয়ার কারণে এমন নামায কাযা করে নেয়াই উত্তম হবে।

৮. আমাদের ক্যালেন্ডারে যাওয়ালের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ঢাকার পশ্চিম সীমানার ভিত্তিতে। তাতে ঢাকার পূর্বের অঞ্চলে আরও ২ মিনিট আগে যাওয়াল হওয়া শুরু হবে, এবং মধ্যের অঞ্চলে ১ মিনিট পূর্বে যাওয়াল শুরু হবে। এতে করে পূর্বের অঞ্চলের লোকেরা এবং মধ্যের অঞ্চলের লোকেরা যেন বিভ্রান্তির শিকার না হয় তাই মূল যাওয়ালের সময়ের আরও ২ মিনিট আগ থেকে যাওয়াল দেখানো হয়েছে এবং যাওয়ালকালীন সময় দেখানো হয়েছে মোট ৫ মিনিট, যদিও যাওয়ালকালীন মূল সময় ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড এবং সাধারণত ক্যালেন্ডারে সতর্কতামূলক ৩ মিনিট লেখা হয়ে থাকে।

৯. ইশার ওয়াক্ত ধরা হয়েছে পশ্চিম সীমান্তের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, ৯০ ডিগ্রীর ভিত্তিতে।

১০. আমাদের ক্যালেন্ডারে মোট ৮টি বিষয় অতিরিক্ত রয়েছে। যথা: (১) সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত যে পর্যন্ত। (২) ইশরাক/চাশত-এর ওয়াক্ত শুরু। (৩) শরয়ী দ্বিপ্রহর (الضحوة الكبرى/نصف النهار الشرعي)। শরয়ী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়। শুধুমাত্র কোন দিন নির্দিষ্ট না করে রোযা রাখার মানত করলে এবং যে কোন একদিন সেই মানতের রোযা রাখতে চাইলে সে ক্ষেত্রে সুবহে সাদেকের পূর্বেই নিয়ত করে নিতে হয়। (৪) মিছলে আউয়াল। উল্লেখ্য, মিছলে ছানী হওয়ার পর থেকে হানাফীদের মতে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। মিছলে আউয়ালের পর মাজূর ও মুসাফিরগণ আসর পড়ে নিতে পারেন। (৫) আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু। (৬) মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু। (৭) ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু। আজ উম্মত থেকে মুস্তাহাব ওয়াক্তে ইশার নামায পড়ার আমল প্রায় উঠেই গেছে, তাই আশা করছি আমাদের ক্যালেন্ডারের এই অংশ দেখলে অনেকেই এর প্রতি আমলে উদ্বুদ্ধ হবে।। (৮) ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু। অনেকেই শরয়ী ওজর ছাড়াই ইশাকে মাকরূহ ওয়াক্তে নিয়ে যায়। বিশেষত মা বোনগণ –যারা ঘরে নামায পড়েন– তারা কখন ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত তা জানেনও না। এ দিকে লক্ষ করে আমাদের ক্যালেন্ডারে ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত যোগ করে দেয়া হয়েছে।

ছায়া মাপার প্লাটফরম

ইসতিওয়ায়ে শামস, যাওয়ালের সময়, জোহরের সময় ও আসরের সময় বের করার জন্য ছায়া মাপার প্রয়োজন হয়। মধ্যাহ্নে প্রতিটি বস্তুর ছায়া যখন ঠিক সোজা উপরে থাকে, তখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া সবচেয়ে ছোট থাকে, এটা হচ্ছে ঐ বস্তুর মূল ছায়া বা ছায়ায়ে আসলী। আর এটাই হচ্ছে ইসতিওয়ায়ে শামস-এর সময়। এরপর ছায়া একটু বাড়লেই যাওয়ালের শুরু। আর প্রতিটি বস্তুর মূল ছায়া বাদে ঐ বস্তুর দিগুণ পরিমাণ ছায়া হলে (একে বলা হয় মিছলে ছানী) তখন হানাফী মাযহাব অনুসারে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এখন কোন বস্তুর ছায়া কখন সবচেয়ে ছোট হয়, সেটা বের করতে পারলেই কখন তার মূল ছায়া বা ছায়ায়ে আসলী বাদে সেই বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হয় তা বের করা যাবে। এজন্য ছায়া মাপার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে একটি সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে দায়েরায়ে হিন্দিয়া[1] (الدائرة الهندية)–এর মাধ্যমে ছায়া মাপা।

'দায়েরায়ে হিন্দিয়া' তৈরি করার জন্য সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সূর্যের আলো পড়ে এমন কোন স্থানে একটি সমতল জায়গা তৈরি করতে হবে। সমতল হল কি না তা ওয়াটার লেবেলের মাধ্যমে নিশ্চিত করে নিতে হবে। জায়গাটি অন্তত এতটুকু বড় তৈরি করতে হবে, যাতে ছায়ায়ে আসলী বাদেও দণ্ডের (যে সম্বন্ধে পরে বলা হচ্ছে) দিগুণ পরিমাণ ছায়া উক্ত জায়গার মধ্য এসে যায়। উক্ত সমতল জায়গায় একটি বৃত্ত আঁকতে হবে। বৃত্তের মাঝখানে একটি দণ্ড উপর-নিচ খাড়া করে গাড়তে হবে। দণ্ডটি যেন ঠিকমত সোজা হয়। কোন একটা রশি দিয়ে দণ্ডের মাথা থেকে বৃত্তের রেখা পর্যন্ত চতুর্দিকে সমান পেলেই বুঝা যাবে দণ্ডটি সোজা গাড়া হয়েছে। কোন একটা রশির মাথায় ভারী কিছু একটা বেঁধে

---

[1] ১. 'দায়েরায়ে হিন্দিয়া' অর্থ হিন্দুস্তানী বৃত্ত। সম্ভবত এই বৃত্ত হিন্দুস্তানী পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রবর্তিত হওয়ার কারণে তার এমন নামকরণ হয়েছে।

দণ্ডের পাশে ধরেও নিশ্চিত হওয়া যায় যে, দণ্ডটা সোজা হয়েছে কি না। তারপর সকালের ছায়া পশ্চিম দিকে বৃত্তের বাইরে পাওয়া যাবে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে ছায়া ছোট হতে থাকবে। এক পর্যায়ে ছায়া ছোট হতে হতে বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে। বৃত্তের যেখান থেকে ছায়া বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করবে সেখানে একটি চিহ্ন দিন। এটা হচ্ছে ছায়া প্রবেশের স্থান (مدخل الظل)। বিকালে ছায়া বড় হতে হতে বৃত্তের যেখান দিয়ে বের হবে সেখানেও একটি চিহ্ন দিন। এটা হচ্ছে ছায়া বের হওয়ার স্থান (مخرج الظل)। এই ছায়া প্রবেশের স্থান ও ছায়া বের হওয়ার স্থানের মাঝে দণ্ড থেকে একটি রেখা বৃত্ত পর্যন্ত টেনে নিন। এই রেখা হল মধ্যাহ্ন রেখা (خط نصف النهار) এই রেখার উপর যখন ছায়া আসবে তখন হবে ঠিক দুপুর, এবং তখন ঐ দণ্ডের ছায়া সবচেয়ে ছোট থাকবে। এই সবচেয়ে ছোট পরিমাণ ছায়া হচ্ছে ছায়ায়ে আসলী বা মূল ছায়া। এই পরিমাণ ছায়া বাদ দিয়ে দণ্ডের ছায়া যখন একগুণ হবে তখন হল মিছলে আউয়াল এবং যখন দিগুণ হবে তখন হবে মিছলে ছানী তথা জোহরের ওয়াক্ত শেষ ও আসরের ওয়াক্ত শুরুর সময়।

উল্লেখ্য, এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য দু'দিন কাজ করার প্রয়োজন পড়বে। প্রথম দিন ছায়া বের হওয়ার স্থান (مخرج الظل) নির্ধারণ করুন, পরের দিন ছায়া প্রবেশের স্থান নির্ধারণ করে ঠিক দুপুর (استواء الشمس), যাওয়াল ও মিছলে আউয়াল, মিছলে ছানী ইত্যাদি বের করুন।

আমরা জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া (যাত্রাবাড়ি বড় মাদরাসা)–য় ছায়া মাপার জন্য যে প্লাটফরম তৈরি করে 'দায়েরায়ে হিন্দিয়া' বানিয়েছিলাম তার ছবিটি নিচে লক্ষ করুন।

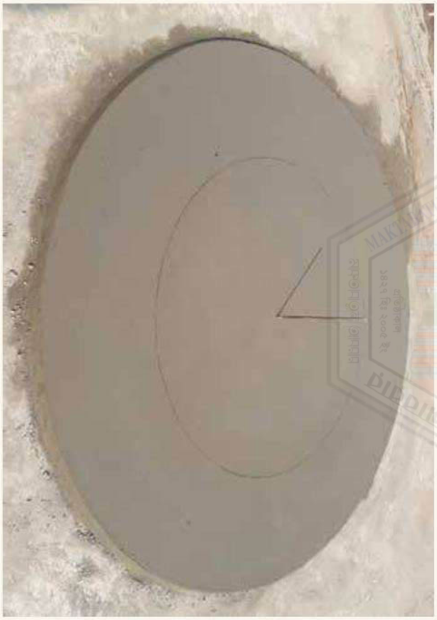

ছবি নং ১৩ – দায়েরায়ে হিন্দিয়া

নামায ও রোযার চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডার

জানুয়ারি

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৫:১৮	৫:২০	৫:২১	৫:২২	৫:২২	৫:২১
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৫:২২	৫:২৪	৫:২৫	৫:২৬	৫:২৬	৫:২৫
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৬:৪৩	৬:৪৪	৬:৪৫	৬:৪৫	৬:৪৫	৬:৪৪
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:৪৩–৬:৪৬	৬:৪৪–৬:৪৭	৬:৪৫–৬:৪৮	৬:৪৫–৬:৪৮	৬:৪৫–৬:৪৮	৬:৪৪–৬:৪৭
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৬:৫৫	৬:৫৬	৬:৫৭	৬:৫৭	৬:৫৭	৬:৫৬
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৬:৫৫	৬:৫৬	৬:৫৭	৬:৫৭	৬:৫৭	৬:৫৬
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:২২	১১:২৪	১১:২৭	১১:২৯	১১:৩১	১১:৩২
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৫৮–১২:৩	১২:০০–১২:৫	১২:৩–১২:৮	১২:৪–১২:৯	১২:৬–১২:১১	১২:৮–১২:১৩
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১২:৪	১২:৬	১২:৯	১২:১০	১২:১২	১২:১৪
মিছলে আউয়াল	৩:৯	৩:১২	৩:১৫	৩:১৮	৩:২১	৩:২৪
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৩:৪৯	৩:৫২	৩:৫২	৩:৫৭	৪:৩	৪:৬
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৫:১০	৫:১২	৫:১৬	৫:১৯	৫:২৩	৫:২৭
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:২৫–৫:২৮	৫:২৭–৫:৩০	৫:৩১–৫:৩৪	৫:৩৪–৫:৩৭	৫:৩৮–৫:৪১	৫:৪২–৫:৪৫
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৫:৩০	৫:৩২	৫:৩৬	৫:৩৯	৫:৪৩	৫:৪৭
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:৫	৬:৭	৬:১১	৬:১৪	৬:১৮	৬:২২
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৬:৪৫	৬:৪৮	৬:৫১	৬:৫৪	৬:৫৭	৭:০০
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:২৫	৯:২৭	৯:৩০	৯:৩৩	৯:৩৫	৯:৩৮
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:২৩	১১:২৫	১১:২৬	১১:২৯	১১:৩১	১১:৩৩

ফেব্রুয়ারি

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৫:২০	৫:১৯	৫:১৭	৫:১৪	৫:১১	৫:৭
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৫:২৪	৫:২৩	৫:২১	৫:১৮	৫:১৫	৫:১১
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৬:৪১	৬:৪০	৬:৩৭	৬:৩৪	৬:৩০	৬:২৬
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:৪১–৬:৪৪	৬:৪০–৬:৪৩	৬:৩৭–৬:৪০	৬:৩৪–৬:৩৭	৬:৩০–৬:৩৩	৬:২৬–৬:২৯
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৬:৫৩	৬:৫২	৬:৪৯	৬:৪৬	৬:৪২	৬:৩৮
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৬:৫৩	৬:৫২	৬:৪৯	৬:৪৬	৬:৪২	৬:৩৮
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:৩৪	১১:৩৫	১১:৩৬	১১:৩৬	১১:৩৫	১১:৩৫
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১২:৯–১২:১৪	১২:৯–১২:১৪	১২:৯–১২:১৪	১২:৯–১২:১৪	১২:৯–১২:১৪	১২:৯–১২:১৪
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১২:১৫	১২:১৫	১২:১৫	১২:১৫	১২:১৫	১২:১৫
মিছলে আউয়াল	৩:২৭	৩:২৯	৩:৩১	৩:৩৩	৩:৩৫	৩:৩৬
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:১১	৪:১৩	৪:১৬	৪:১৮	৪:২০	৪:২৩
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৫:৩২	৫:৩৪	৫:৩৮	৫:৪১	৫:৪৩	৫:৪৬
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:৪৭–৫:৫০	৫:৪৯–৫:৫২	৫:৫৩–৫:৫৬	৫:৫৬–৫:৫৯	৫:৫৮–৬:১	৬:১–৬:৪
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৫:৫২	৫:৫৪	৫:৫৮	৬:১	৬:৩	৬:৬
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:২৭	৬:২৯	৬:৩৩	৬:৩৬	৬:৩৮	৬:৩৯
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৭:৪	৭:৬	৭:৯	৭:১২	৭:১৪	৭:১৭
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:৪১	৯:৪২	৯:৪৪	৯:৪৫	৯:৪৫	৯:৪৬
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:৩৫	১১:৩৫	১১:৩৬	১১:৩৬	১১:৩৬	১১:৩৫

মার্চ

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৫:৪	৫:১	৪:৫৬	৪:৫১	৪:৪৬	৪:৪১
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৫:৮	৫:৫	৫:০০	৪:৫৫	৪:৫০	৪:৪৫
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৬:২৩	৬:১৯	৬:১৫	৬:১০	৬:৫	৬:০০
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:২৩–৬:২৬	৬:১৯–৬:২২	৬:১৫–৬:১৮	৬:১০–৬:১৩	৬:৫–৬:৮	৬:০০–৬:৩
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৬:৩৫	৬:৩১	৬:২৭	৬:২২	৬:১৭	৬:১২
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৬:৩৫	৬:৩১	৬:২৭	৬:২২	৬:১৭	৬:১২
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:৩৪	১১:৩৪	১১:৩২	১১:৩১	১১:২৯	১১:২৮
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১২:৮–১২:১৩	১২:৭–১২:১২	১২:৬–১২:১১	১২:৪–১২:৯	১২:৩–১২:৮	১২:১–১২:৬
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১২:১৪	১২:১৩	১২:১২	১২:১০	১২:৯	১২:৭
মিছলে আউয়াল	৩:৩৭	৩:৩৭	৩:৩৭	৩:৩৪	৩:৩২	৩:৩০
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:২৫	৪:২৭	৪:২৮	৪:২৮	৪:৩০	৪:৩০
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৫:৪৮	৫:৫০	৫:৫২	৫:৫৪	৫:৫৬	৫:৫৮
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:৩–৬:৬	৬:৫–৬:৮	৬:৭–৬:১০	৬:৯–৬:১২	৬:১১–৬:১৪	৬:১৩–৬:১৬
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৬:৮	৬:১০	৬:১২	৬:১৪	৬:১৬	৬:১৮
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:৪৩	৬:৪৫	৬:৪৭	৬:৪৯	৬:৫১	৬:৫৩
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৭:১৮	৭:২০	৭:২২	৭:২৪	৭:২৭	৭:২৯
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:৪৬	৯:৪৬	৯:৪৫	৯:৪৫	৯:৪৫	৯:৪৫
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:৩৫	১১:৩৪	১১:৩৩	১১: ৩১	১১:৩০	১১:২৮

এপ্রিল

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৪:৩৪	৪:২৯	৪:২৪	৪:১৯	৪:১৩	৪:৮
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৪:৩৮	৪:৩৩	৪:২৮	৪:২৩	৪:১৭	৪:১২
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৫:৫৩	৫:৪৯	৫:৪৪	৫:৪০	৫:৩৫	৫:৩১
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:৫৩–৫:৫৬	৫:৪৯–৫:৫২	৫:৪৪–৫:৪৭	৫:৪০–৫:৪৩	৫:৩৫–৫:৩৮	৫:৩১–৫:৩৪
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৬:৫	৬:১	৫:৫৬	৫:৫২	৫:৪৭	৫:৪৩
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৬:৫	৬:১	৫:৫৬	৫:৫২	৫:৪৭	৫:৪৩
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:২৬	১১:২৪	১১:২৩	১১:২২	১১:২০	১১:১৮
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৫৯–১২:৪	১১:৫৮–১২:৩	১১:৫৭–১২:২	১১:৫৬–১২:১	১১:৫৪–১১:৫৯	১১:৫৩–১১:৫৮
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১২:৫	১২:৪	১২:৩	১২:২	১২:০০	১১:৫৯
মিছলে আউয়াল	৩:২৯	৩:২৭	৩:২৬	৩:২৪	৩:২২	৩:২০
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:৩১	৪:৩১	৪:৩২	৪:৩২	৪:৩৩	৪:৩৩
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:১	৬:৩	৬:৫	৬:৭	৬:৯	৬:১১
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:১৬–৬:১৯	৬:১৮–৬:২১	৬:২০–৬:২৩	৬:২২–৬:২৫	৬:২৪–৬:২৭	৬:২৬–৬:২৯
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৬:২১	৬:২৩	৬:২৫	৬:২৭	৬:২৯	৬:৩১
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:৫৬	৬:৫৮	৭:০০	৭:২	৭:৪	৭:৬
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৭:৩২	৭:৩৪	৭:৩৭	৭:৪০	৭:৪২	৭:৪৫
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:৪৪	৯:৪৪	৯:৪৪	৯:৪৩	৯:৪৩	৯:৪২
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:২৬	১১:২৫	১১:২৩	১১:২২	১১:২০	১১:১৮

মে

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৪:৩	৩:৫৯	৩:৫৫	৩:৫২	৩:৪৮	৩:৪৬
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৪:৭	৪:৩	৩:৫৯	৩:৫৬	৩:৫২	৩:৫০
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৫:২৭	৫:২৪	৫:২১	৫:১৮	৫:১৬	৫:১৪
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:২৭–৫:৩০	৫:২৪–৫:২৭	৫:২১–৫:২৪	৫:১৮–৫:২১	৫:১৬–৫:১৯	৫:১৪–৫:১৭
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৫:৩৯	৫:৩৬	৫:৩৩	৫:৩০	৫:২৮	৫:২৬
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৫:৩৯	৫:৩৬	৫:৩৩	৫:৩০	৫:২৮	৫:২৬
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:১৭	১১:১৬	১১:১৫	১১:১৫	১১:১৪	১১:১২
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৫৩–১১:৫৮	১১:৫২–১১:৫৭	১১:৫২–১১:৫৭	১১:৫২–১১:৫৭	১১:৫২–১১:৫৭	১১:৫২–১১:৫৭
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১১:৫৯	১১:৫৮	১১:৫৮	১১:৫৮	১১:৫৮	১১:৫৮
মিছলে আউয়াল	৩:১৮	৩:১৬	৩:১৫	৩:১৪	৩:১৩	৩:১২
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:৩৩	৪:৩৪	৪:৩৪	৪:৩৪	৪:৩৫	৪:৩৬
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:১৪	৬:১৫	৬:১৮	৬:২০	৬:২৩	৬:২৫
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:২৯–৬:৩২	৬:৩০–৬:৩৩	৬:৩৩–৬:৩৬	৬:৩৫–৬:৩৮	৬:৩৮–৬:৪১	৬:৪০–৬:৪৩
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৬:৩৪	৬:৩৫	৬:৩৮	৬:৪০	৬:৪৩	৬:৪৫
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৭:৯	৭:১০	৭:১৩	৭:১৫	৭:১৮	৭:২০
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৭:৪৯	৭:৫২	৭:৫৫	৭:৫৯	৮:২	৮:৫
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:৪২	৯:৪২	৯:৪২	৯:৪৩	৯:৪৪	৯:৪৪
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:১৭	১১:১৬	১১:১৫	১১:১৫	১১:১৪	১১:১৪

জুন

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৩:৪৩	৩:৪২	৩:৪২	৩:৪১	৩:৪২	৩:৪৩
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৩:৪৭	৩:৪৬	৩:৪৬	৩:৪৫	৩:৪৬	৩:৪৭
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৫:১৩	৫:১২	৫:১২	৫:১২	৫:১৩	৫:১৪
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:১৩–৫:১৬	৫:১২–৫:১৫	৫:১২–৫:১৫	৫:১২–৫:১৫	৫:১৩–৫:১৬	৫:১৪–৫:১৭
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৫:২৫	৫:২৪	৫:২৪	৫:২৪	৫:২৫	৫:২৬
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৫:২৫	৫:২৪	৫:২৪	৫:২৪	৫:২৫	৫:২৬
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:১৪	১১:১৫	১১:১৬	১১:১৬	১১:১৭	১১:১৮
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৫৩–১১:৫৮	১১:৫৩–১১:৫৮	১১:৫৪–১১:৫৯	১১:৫৫–১২:০০	১১:৫৬–১২:১	১১:৫৭–১২:২
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১১:৫৯	১১:৫৯	১২:০০	১২:১	১২:২	১২:৩
মিছলে আউয়াল	৩:১৪	৩:১৬	৩:১৮	৩:২০	৩:২২	৩:২৩
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:৩৭	৪:৩৮	৪:৩৯	৪:৩৯	৪:৪০	৪:৪১
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:২৮	৬:৩০	৬:৩২	৬:৩৩	৬:৩৫	৬:৩৬
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:৪৩–৬:৪৬	৬:৪৫–৬:৪৮	৬:৪৭–৬:৫০	৬:৪৮–৬:৫১	৬:৫০–৬:৫৩	৬:৫১–৬:৫৪
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৬:৪৮	৬:৫০	৬:৫২	৬:৫৩	৬:৫৫	৬:৫৬
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৭:২৩	৭:২৫	৭:২৭	৭:২৮	৭:৩০	৭:৩১
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৮:৯	৮:১২	৮:১৪	৮:১৬	৮:১৭	৮:১৮
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:৪৬	৯:৪৭	৯:৪৮	৯:৪৮	৯:৫০	৯:৫১
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:১৪	১১:১৫	১১:১৬	১১:১৬	১১:১৭	১১:১৯

জুলাই

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৩:৪৫	৩:৪৭	৩:৪৯	৩:৫২	৩:৫৫	৩:৫৮
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৩:৪৯	৩:৫১	৩:৫৩	৩:৫৬	৩:৫৯	৪:২
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৫:১৬	৫:১৭	৫:১৯	৫:২১	৫:২৪	৫:২৬
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:১৬–৫:১৯	৫:১৭–৫:২০	৫:১৯–৫:২২	৫:২১–৫:২৪	৫:২৪–৫:২৭	৫:২৬–৫:২৯
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৫:২৮	৫:২৯	৫:৩১	৫:৩৩	৫:৩৬	৫:৩৮
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৫:২৮	৫:২৯	৫:৩১	৫:৩৩	৫:৩৬	৫:৩৮
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:১৯	১১:২০	১১:২০	১১:২২	১১:২৩	১১:২৩
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৫৮–১২:৩	১১:৫৯–১২:৪	১২:০০–১২:৫	১২:০০–১২:৫	১২:১–১২:৬	১২:১–১২:৬
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১২:৪	১২:৫	১২:৬	১২:৬	১২:৭	১২:৭
মিছলে আউয়াল	৩:২৪	৩:২৪	৩:২৩	৩:২১	৩:২৩	৩:২৪
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:৪২	৪:৪৪	৪:৪৬	৪:৪৬	৪:৪৬	৪:৪৬
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:৩৬	৬:৩৬	৬:৩৬	৬:৩৫	৬:৩৩	৬:৩১
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:৫১–৬:৫৪	৬:৫১–৬:৫৪	৬:৫১–৬:৫৪	৬:৫০–৬:৫৩	৬:৪৮–৬:৫১	৬:৪৬–৬:৪৯
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৬:৫৬	৬:৫৬	৬:৫৬	৬:৫৫	৬:৫৩	৬:৫১
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৭:৩১	৭:৩১	৭:৩১	৭:৩০	৭:২৮	৭:২৬
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৮:১৯	৮:১৮	৮:১৭	৮:১৫	৮:১৩	৮:১০
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:৫২	৯:৫২	৯:৫৩	৯:৫৩	৯:৫৩	৯:৫৩
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:১৯	১১:২০	১১:২১	১১:২২	১১:২৩	১১:২৪

আগস্ট

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৪:৩	৪:৫	৪:৮	৪:১১	৪:১৪	৪:১৭
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৪:৭	৪:৯	৪:১২	৪:১৫	৪:১৮	৪:২১
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৫:২৯	৫:৩১	৫:৩৩	৫:৩৫	৫:৩৭	৫:৩৯
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:২৯–৫:৩২	৫:৩১–৫:৩৪	৫:৩৩–৫:৩৬	৫:৩৫–৫:৩৮	৫:৩৭–৫:৪০	৫:৩৯–৫:৪২
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৫:৪১	৫:৪৩	৫:৪৫	৫:৪৭	৫:৪৯	৫:৫১
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৫:৪১	৫:৪৩	৫:৪৫	৫:৪৭	৫:৪৯	৫:৫১
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:২৪	১১:২৪	১১:২৭	১১:২৩	১১:২৩	১১:২২
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১২:১–১২:৬	১২:০০–১২:৫	১২:০০–১২:৫	১১:৫৯–১২:৪	১১:৫৮–১২:৩	১১:৫৭–১২:২
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১২:৭	১২:৬	১২:৬	১২:৫	১২:৪	১২:৩
মিছলে আউয়াল	৩:২৬	৩:২৭	৩:২৮	৩:২৮	৩:২৮	৩:২৭
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:৪৩	৪:৪২	৪:৪১	৪:৩৯	৪:৩৭	৪:৩৪
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:২৮	৬:২৫	৬:২২	৬:১৮	৬:১৪	৬:১০
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:৪৩–৬:৪৬	৬:৪০–৬:৪৩	৬:৩৭–৬:৪০	৬:৩৩–৬:৩৬	৬:২৯–৬:৩২	৬:২৫–৬:২৮
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৬:৪৮	৬:৪৫	৬:৪২	৬:৩৮	৬:৩৪	৬:৩০
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৭:২৩	৭:২০	৭:১৭	৭:১৩	৭:৯	৭:৫
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৮:৫	৮:২	৭:৫৮	৭:৫৩	৭:৪৮	৭:৪৩
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:৫৬	৯:৫১	৯:৫০	৯:৪৯	৯:৪৭	৯:৪৫
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:২৫	১১:২৪	১১:২৪	১১:২৪	১১:২৩	১১:২৩

সেপ্টেম্বর

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৪:২০	৪:২২	৪:২৪	৪:২৬	৪:২৮	৪:৩০
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৪:২৪	৪:২৬	৪:২৮	৪:৩০	৪:৩২	৪:৩৪
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৫:৪১	৫:৪২	৫:৪৪	৫:৪৬	৫:৪৭	৫:৪৯
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:৪১–৫:৪৪	৫:৪২–৫:৪৫	৫:৪৪–৫:৪৭	৫:৪৬–৫:৪৯	৫:৪৭–৫:৫০	৫:৪৯–৫:৫২
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৫:৫৩	৫:৫৪	৫:৫৬	৫:৫৮	৫:৫৯	৬:১
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৫:৫৩	৫:৫৪	৫:৫৬	৫:৫৮	৫:৫৯	৬:১
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:২০	১১:১৯	১১:১৮	১১:১৬	১১:১৫	১১:১৩
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৫৪–১১:৫৯	১১:৫৩–১১:৫৮	১১:৫১–১১:৫৬	১১:৫০–১১:৫৫	১১:৪৮–১১:৫৩	১:৪৬–১১:৫১
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১২:০০	১১:৫৯	১১:৫৭	১১:৫৬	১১:৫৪	১১:৫২
মিছলে আউয়াল	৩:২৬	৩:২৫	৩:২৪	৩:২২	৩:২০	৩:১৮
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:৩১	৪:২৯	৪:২৫	৪:২১	৪:১৮	৪:১৪
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:৩	৫:৫৯	৫:৫৪	৫:৪৯	৫:৪৪	৫:৩৮
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:১৮–৬:২১	৬:১৪–৬:১৭	৬:৯–৬:১২	৬:৪–৬:৭	৫:৫৯–৬:২	৫:৫৩–৫:৫৬
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৬:২৩	৬:১৯	৬:১৪	৬:৯	৬:৪	৫:৫৮
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:৫৮	৬:৫৪	৬:৪৯	৬:৪৪	৬:৩৯	৬:৩৩
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৭:৩৫	৭:৩১	৭:২৫	৭:২০	৭:১৪	৭:৯
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:৪১	৯:৩৯	৯:৩৭	৯:৩৩	৯:৩১	৯:২৮
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:২০	১১:১৯	১১:১৮	১১: ১৬	১১:১৫	১১:১৩

অক্টোবর

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৪:৩২	৪:৩৪	৪:৩৬	৪:৩৮	৪:৪০	৪:৪২
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৪:৩৬	৪:৩৮	৪:৪০	৪:৪২	৪:৪৪	৪:৪৬
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৫:৫১	৫:৫৩	৫:৫৫	৫:৫৭	৫:৫৯	৬:১
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:৫১–৫:৫৪	৫:৫৩–৫:৫৬	৫:৫৫–৫:৫৮	৫:৫৭–৬:০০	৫:৫৯–৬:২	৬:১–৬:৪
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৬:৩	৬:৫	৬:৭	৬:৯	৬:১১	৬:১৩
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৬:৩	৬:৫	৬:৭	৬:৯	৬:১১	৬:১৩
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:১১	১১:১০	১১:৯	১১:৭	১১:৬	১১:৫
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৪৪–১১:৪৯	১১:৪৩–১১:৪৮	১১:৪২–১১:৪৭	১১:৪০–১১:৪৫	১১:৩৯–১১:৪৪	১১:৩৮–১১:৪৩
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১১:৫০	১১:৪৯	১১:৪৮	১১:৪৬	১১:৪৫	১১:৪৪
মিছলে আউয়াল	৩:১৫	৩:১৩	৩:১০	৩:৮	৩:৫	৩:৩
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৪:৯	৪:৪	৪:৪	৩:৫৮	৩:৫৪	৩:৫০
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৫:৩২	৫:২৮	৫:২৪	৫:১৯	৫:১৫	৫:১১
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:৪৭–৫:৫০	৫:৪৩–৫:৪৬	৫:৩৯–৫:৪২	৫:৩৪–৫:৩৭	৫:৩০–৫:৩৩	৫:২৬–৫:২৯
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৫:৫২	৫:৪৮	৫:৪৪	৫:৩৯	৫:৩৫	৫:৩১
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:২৭	৬:২৩	৬:১৯	৬:১৪	৬:১০	৬:৬
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৭:২	৬:৫৮	৬:৫৪	৬:৪৯	৬:৪৫	৬:৪২
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:২৫	৯:২৩	৯:২১	৯:১৮	৯:১৬	৯:১৪
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:১১	১১:১০	১১:৯	১১:৭	১১:৬	১১:৫

নভেম্বর

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৪:৪৫	৪:৪৭	৪:৪৯	৪:৫২	৪:৫৫	৪:৫৮
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৪:৪৯	৪:৫১	৪:৫৩	৪:৫৬	৪:৫৯	৫:২
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৬:৫	৬:৮	৬:১১	৬:১৪	৬:১৭	৬:২১
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:৫–৬:৮	৬:৮–৬:১১	৬ :১১–৬:১৪	৬:১৪–৬:১৭	৬:১৭–৬:২০	৬:২১–৬:২৪
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৬:১৭	৬:২০	৬:২৩	৬:২৬	৬:২৯	৬:৩৩
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৬:১৭	৬:২০	৬:২৩	৬:২৬	৬:২৯	৬:৩৩
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:৪	১১:৪	১১:৪	১১:৪	১১:৫	১১:৬
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৩৮–১১:৪৩	১১:৩৮–১১:৪৩	১১:৩৮–১১:৪৩	১১:৩৯–১১:৪৪	১১:৪০–১১:৪৫	১১:৪১–১১:৪৬
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১১:৪৪	১১:৪৪	১১:৪৪	১১:৪৫	১১:৪৬	১১:৪৭
মিছলে আউয়াল	৩:০০	২:৫৯	২:৫৭	২:৫৬	২:৫৬	২:৫৬
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৩:৪৭	৩:৪৫	৩:৪২	৩:৪১	৩:৩৯	৩:৩৮
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৫:৬	৫:৪	৫:১	৪:৫৯	৪:৫৮	৪:৫৭
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:২১–৫:২৪	৫:১৯–৫:২২	৫:১৬–৫:১৯	৫:১৪–৫:১৭	৫:১৩–৫:১৬	৫:১২–৫:১৫
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৫:২৬	৫:২৪	৫:২১	৫:১৯	৫:১৮	৫:১৭
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৬:১	৫:৫৯	৫:৫৬	৫:৫৪	৫:৫৩	৫:৫২
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৬:৩৮	৬:৩৬	৬:৩৪	৬:৩৩	৬:৩২	৬:৩২
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:১২	৯:১১	৯:১০	৯:১০	৯:১০	৯:১০
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:৪	১১:৪	১১:৪	১১:৪	১১:৫	১১:৬

ডিসেম্বর

তারিখ	১	৫	১০	১৫	২০	২৫
সুবহে সাদেক/সাহরীর শেষ সময়	৫:২	৫:৪	৫:৭	৫:১০	৫:১৩	৫:১৫
ফজরের ওয়াক্ত শুরু	৫:৬	৫:৮	৫:১১	৫:১৪	৫:১৭	৫:১৯
সূর্যোদয় শুরু/ফজরের শেষ সময়	৬:২৫	৬:২৮	৬:৩১	৬:৩৪	৬:৩৭	৬:৪০
সূর্যোদয়কালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৬:২৫–৬:২৮	৬:২৮–৬:৩১	৬ :৩১–৬:৩৪	৬:৩৪–৬:৩৭	৬:৩৭–৬:৪০	৬:৪০–৬:৪৩
সূর্যোদয়ের পর মাকরূহ ওয়াক্ত (যে পর্যন্ত)	৬:৩৭	৬:৪০	৬:৪৩	৬:৪৬	৬:৪৯	৬:৫২
ইশরাক/চাশতের ওয়াক্ত শুরু	৬:৩৭	৬:৪০	৬:৪৩	৬:৪৬	৬:৪৯	৬:৫২
শরয়ী দ্বিপ্রহর (যে পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা যায়)	১১:৮	১১:১০	১১:১২	১১:১৪	১১:১৬	১১:১৯
প্রচলিত দ্বিপ্রহর বা যাওয়ালকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	১১:৪৩–১১:৪৮	১১:৪৫–১১:৫০	১১:৪৭–১১:৫২	১১:৪৯–১১:৫৪	১১:৫২–১১:৫৭	১১:৫৫–১২:০০
যাওয়ালের নামায ও জোহরের নামায-এর ওয়াক্ত শুরু	১১:৪৯	১১:৫১	১১:৫৩	১১:৫৫	১১:৫৮	১২:১
মিছলে আউয়াল	২:৫৬	২:৫৭	২:৫৯	৩:০০	৩:৩	৩:৫
আসরের ওয়াক্ত/মিছলে ছানী শুরু	৩:৩৮	৩:৩৮	৩:৩৯	৩:৪১	৩:৪৩	৩:৪৬
আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৪:৫৭	৪:৫৮	৪:৫৯	৫:০০	৫:২	৫:৫
সূর্যাস্তকালীন নিষিদ্ধ সময় (৩ মিনিট)	৫:১২–৫:১৫	৫:১৩–৫:১৬	৫:১৪–৫:১৭	৫:১৫–৫:১৮	৫:১৭–৫:২০	৫:২০–৫:২৩
মাগরিব/ইফতার-এর সময় শুরু	৫:১৭	৫:১৮	৫:১৯	৫:২০	৫:২২	৫:২৫
মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	৫:৫২	৫:৫৩	৫:৫৪	৫:৫৫	৫:৫৭	৬:০০
ইশার ওয়াক্ত শুরু	৬:৩২	৬:৩৩	৬:৩৪	৬:৩৬	৬:৩৮	৬:৪১
ইশার মুস্তাহাব ওয়াক্ত শুরু	৯:১১	৯:১৩	৯:১৪	৯:১৬	৯:১৮	৯:২১
ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু	১১:৮	১১:১০	১১:১২	১১:১৪	১১:১৬	১১:১৯

পৃথিবীর দিকসমূহ (اتجاهات الأرض)

পৃথিবীর মূল দিক হল ৪টি। যথা: উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। উত্তরপূর্ব, উত্তরপশ্চিম, দক্ষিণপূর্ব, দক্ষিণপশ্চিম ইত্যাদি দিকগুলো মৌলিক দিকগুলোর অনুবর্তী।

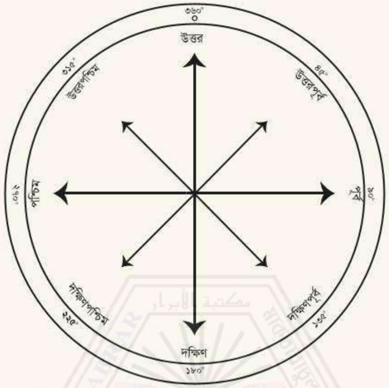
৩৬০°
উত্তর
৩১৫°
উত্তরপশ্চিম
৪৫°
উত্তরপূর্ব
২৭০°
পশ্চিম
পূর্ব
৯০°
দক্ষিণপশ্চিম
২২৫°
দক্ষিণপূর্ব
১৩৫°
দক্ষিণ
১৮০°

চিত্র নং ১৪ – দিকসমূহের চিত্র (৮ দিক বিশিষ্ট)

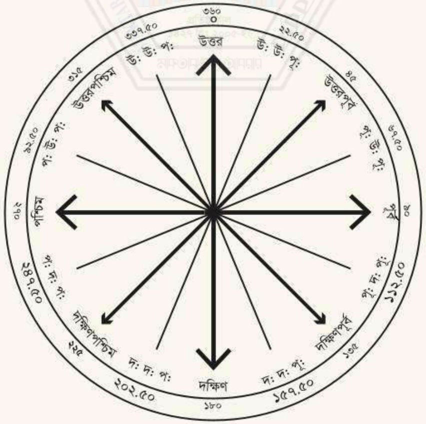
৩৬০
৩৩৭.৫০
উ: উ: প:
উত্তর
উ: উ: পূ:
২২.৫০
৩১৫
উত্তরপশ্চিম
৪৫
উত্তরপূর্ব
২৯২.৫০
প: উ: প:
পূ: উ: পূ:
৬৭.৫০
২৭০
পশ্চিম
পূর্ব
৯০
প: দ: প:
২৪৭.৫০
পূ: দ: পূ:
১১২.৫০
দক্ষিণপশ্চিম
২২৫
দক্ষিণপূর্ব
১৩৫
দ: দ: প:
২০২.৫০
দক্ষিণ
১৮০
দ: দ: পূ:
১৫৭.৫০

চিত্র নং ১৫ – দিকসমূহের চিত্র (১৬ দিক বিশিষ্ট)

দিক নির্ণয়ের উপায়

একটি হল মানচিত্রের দিক নির্ণয় করা। এটি অতি সহজ। যদি মানচিত্র সঠিকভাবে স্থাপন করা হয় তাহলে মানচিত্রের সামনে কেউ অবস্থান করলে মানচিত্রের উপরের দিক হল উত্তর দিক। অবশিষ্ট দিকগুলো এ থেকেই নির্ণয় করে নিতে হবে। আর পৃথিবীর যে কোন স্থানে থেকে ভৌগোলিক দিক নির্ণয় করতে চাইলে দিনের বেলায় আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে সূর্যোদয় দেখে পূর্ব দিক নির্ণয় করা যায় আর তা থেকে অবশিষ্ট দিকগুলো নির্ণয় করা যায়। আর রাতের বেলায় আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে উত্তর গোলার্ধে অবস্থানকারী লোকেরা উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা নামক স্থির নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করতে পারে। ধ্রুবতারাকে আরবিতে বলা হয় النجم القطبي। আর ইংরেজিতে বলা হয় Pole Star[১] যার অর্থ হল মেরু তারা। ধ্রুব অর্থ স্থির। এ তারাটি স্থির বিধায় একে ধ্রুবতারা বলা হয়। আর দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থানকারী লোকেরা 'সাউদার্ণ ক্রস' (Southern Cross[২]/صليب الجنوب) বা ত্রিশঙ্কু নামক দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করতে পারে। ত্রিশঙ্কুকে 'বিশ্বামিত্র'ও বলা হয়। এছাড়া দিক নির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস–এর সাহায্যেও দিক নির্ণয় করা যায়। ছায়ার সাহায্যেও মোটামুটি দিক নির্ণয় করা যায়।

এখন আমরা কম্পাস ও নক্ষত্রের মাধ্যমে দিক নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। তার পূর্বে প্রকৃত উত্তর-দক্ষিণ ও চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ প্রসঙ্গে কিছু কথা জেনে নেয়া প্রয়োজন।

প্রকৃত উত্তর-দক্ষিণ ও চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ প্রসঙ্গ

উত্তর-দক্ষিণ রয়েছে দুই ধরনের। এক হল ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ বা প্রকৃত উত্তর-দক্ষিণ। আর এক হল চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ। সমস্ত দ্রাঘিমার রেখাগুলো উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর যে বিন্দুতে এসে মিলিত হয়, সেটা হল প্রকৃত উত্তর-দক্ষিণ। মানচিত্রে প্রকৃত উত্তর-দক্ষিণ দেখানো হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, কম্পাস বা দিক নির্ণয়যন্ত্র প্রকৃত উত্তর নির্দেশ করে না। কম্পাস বা দিক নির্ণয়যন্ত্র যে উত্তর দিক নির্দেশ করে তাকে বলে চৌম্বক উত্তর, সেটা প্রকৃত উত্তর তথা ভৌগোলিক উত্তর থেকে একটু পশ্চিমে বা পূর্বে সরে অবস্থিত থাকে। এমনিভাবে কম্পাস বা দিক নির্ণয়যন্ত্র যে দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে তাকে বলে চৌম্বক দক্ষিণ, সেটা প্রকৃত দক্ষিণ তথা ভৌগোলিক দক্ষিণ থেকে একটু পূর্বে বা পশ্চিমে সরে অবস্থিত থাকে। (এ সম্বন্ধে সামনের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।)। সুতরাং চৌম্বক উত্তর ও চৌম্বক দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী রেখা কখনই ভৌগোলিক উত্তর ও ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী রেখার সাথে সম্পূর্ণ সমান্তরাল হবে না। আরও উল্লেখ্য যে, চৌম্বক উত্তর স্থান পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনের পরিমাণ স্থান ভেদে ২ থেকে ৫ ডিগ্রী পরিমাণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে সেটি দেখানো হল। চৌম্বক উত্তরের স্থান পরিবর্তনের বিশদ বর্ণনা সামনের পরিচ্ছেদে রয়েছে।

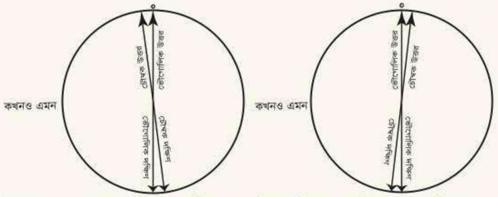

চিত্র নং ১৬– প্রকৃত উত্তর–দক্ষিণ ও চৌম্বক উত্তর–দক্ষিণ–এর চিত্র ক ও খ

---

[১] উচ্চারণ: পোল্ স্টার্।

[২] উচ্চারণ: সাউদার্ন ক্রস্।

কম্পাস (البوصلة)–এর সাহায্যে দিক নির্ণয় প্রসঙ্গ

এনালগ বা ডিজিটাল যে কম্পাসই হোক না কেন তা হুবহু সঠিক দিক দেখায় না। এ বিষয়টা বুঝার জন্য জানতে হবে কম্পাসের মাধ্যমে প্রথমে উত্তর দিক নির্ণিত হয় এবং তা থেকে অবশিষ্ট দিকগুলো নির্ণিত হয়। আরও জানতে হবে উত্তর রয়েছে দুই ধরনের। একটি হল ভৌগোলিক উত্তর (Geographical North[১]) তথা প্রকৃত উত্তর (যেদিকে উত্তর আকাশের ধ্রুব তারা অবস্থিত)। আর অপরটি হল চৌম্বক উত্তর (Magnetic North[২])। আর কম্পাস যে উত্তর প্রদর্শন করে তা হচ্ছে চৌম্বক উত্তর। শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল শিপে ব্যবহৃত জাইরো কম্পাস (Gyro compass) নন ম্যাগনেটিক হওয়ার কারণে ভূগর্ভস্থ চুম্বকের কারণে সে কম্পাস প্রভাবিত হয় না। ফলে তা উত্তরসহ অন্য সব দিক সঠিক প্রদর্শন করে।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, চৌম্বক উত্তর ও ভৌগোলিক উত্তর এক নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ও ভৌগোলিক উত্তর মেরুর অবস্থান এক জায়গাতে নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে ডানে/বাঁয়ে অবস্থান করে। চৌম্বক উত্তর পরিবর্তনশীল অর্থাৎ, চৌম্বক উত্তর স্থান পরিবর্তন করে। প্রকৃত উত্তর থেকে কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে সরে থাকে। প্রকৃতপক্ষে চৌম্বক উত্তরমেরুর অবস্থান উত্তর আমেরিকার বুথনিয়া উপদ্বীপের উত্তর উত্তর পশ্চিম (NNW) য়ে এবং চৌম্বক দক্ষিণমেরুর প্রকৃত অবস্থান দক্ষিণমেরুর এন্টার্কটিকার ভিক্টোরিয়া ভূমিতে। এই প্রকৃত অবস্থান থেকে তার পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন: নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে বিভিন্ন সময়ে চৌম্বক উত্তরের অবস্থানে পার্থক্য হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

বিভিন্ন সনে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান

সন	উত্তর অক্ষাংশের যেখানে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান	যে দ্রাঘিমায় চৌম্বক উত্তরের অবস্থান
১৯০০	৭০.৫° উত্তর অক্ষাংশ	৯৬.২° পশ্চিম দ্রাঘিমা
১৯৫০	৭৪.৬° উত্তর অক্ষাংশ	১০০.৯° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০০০	৮১.০° উত্তর অক্ষাংশ	১০৯.৬° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০০৫	৮৩.২° উত্তর অক্ষাংশ	১১৮.২° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১০	৮৫.০° উত্তর অক্ষাংশ	১৩২.৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১৫	৮৬.৩° উত্তর অক্ষাংশ	১৬০.০° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১৬	৮৬.৪° উত্তর অক্ষাংশ	১৬৬.৩° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১৭	৮৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ	১৭২.৬°(বর্ণনাভিন্নে ১৭২.৫°) প. দ্রা.
২০১৮	৮৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ	১৭৮.৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা
২০১৮-এর পর থেকে আবার উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করবে।		
২০১৯	৮৬.৪° উত্তর অক্ষাংশ	১৭৫.৩° পূর্ব দ্রাঘিমা
২০২০	৮৬.৪° উত্তর অক্ষাংশ	১৬৯.৮° পূর্ব দ্রাঘিমা

নেটে Magnetic North, geomagnetic and magnetic poles অথবা Where is the magnetic north pole right now? শিরোনামে চৌম্বক উত্তরের এই স্থান পরিবর্তনের ডাটা দেখে নেয়া যেতে পারে।)

---

[১] উচ্চারণ: জিয়োগ্র্যাফিক্যাল্ নর্থ।

[২] উচ্চারণ: ম্যাগ্নেটিক্ নর্থ।

অতএব কম্পাস প্রদর্শিত উত্তর থেকে প্রকৃত উত্তর বের করতে হলে প্রথমে জানতে হবে চৌম্বক উত্তরের বর্তমান অবস্থান প্রকৃত উত্তর থেকে কত ডিগ্রী কোন্ দিকে রয়েছে। আমরা একটি চিত্র প্রদর্শন করেছি। (চিত্রটি সামনে আসছে।) চিত্রটি কম্পিউটারে যথাসাধ্য সুক্ষ্মভাবেই আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে ২০১৮ সালে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তর ২.৫০° (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২°৩০′ (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট) পূর্বে অবস্থিত। অতএব ২০১৮ সনে কম্পাস যে উত্তর দেখাবে তা থেকে এই পরিমাণ পশ্চিমে হবে প্রকৃত উত্তর। এই প্রকৃত উত্তরের ভিত্তিতে অন্যান্য দিক নির্ণিত হবে।

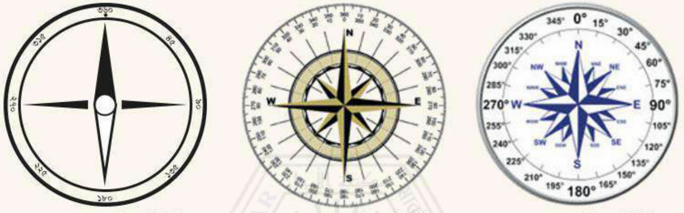

কম্পাস–ক (৪দিক বিশিষ্ট) কম্পাস–খ (৮দিক বিশিষ্ট) কম্পাস–গ (১৬দিক বিশিষ্ট)

চিত্র নং ১৭ দিকনির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস–এর চিত্র (ক, খ ও গ)

কম্পাস–এর সাহায্যে কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি

নামাযে কেবলামুখী হওয়া (তথা বাইতুল্লাহমুখী বা কাবামুখী হওয়া) নামাযের অন্যতম ফরয। যারা বাইতুল্লাহ দেখতে পাওয়া যায় এমন স্থানে নামায পড়েন তাদেরকে হুবহু বাইতুল্লাহ বা হুবহু কাবা শরীফ বরাবর মুখ করে নামায আদায় করতে হয়। এটাকে বলা যায় 'আইনে কেবলা' (একেবারে সোজা কেবলা)। তাদের জন্য সোজা কেবলামুখী হওয়া জরুরী। আর যেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখতে পাওয়া যায় না এমন কোন স্থানে কেউ নামায পড়লে (চাই বিশ্বের যেখানেই হোক না কেন) তার মুখ হুবহু বাইতুল্লাহ বরাবর না হলেও চলে, তবে বাইতুল্লাহর বা কেবলার দিকের মধ্যে থাকতে হবে। একে বলা হয় 'জেহাতে কেবলা'। জেহাতে কেবলা অর্থ কেবলার দিক বা বাইতুল্লাহর দিক। এই 'কেবলার দিক' বা 'বাইতুল্লাহর দিক' বলতে বুঝায় বাইতুল্লাহ যে বরাবর অবস্থিত তার থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী– এই সর্বমোট ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে। নামাযীকে অবশ্যই এই ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে অভিমুখী থাকতে হবে। এর বাইরে অভিমুখী হয়ে গেলে নামায হবে না। কেননা পৃথিবীর বৃত্ত হচ্ছে ৩৬০ ডিগ্রী, আর মৌলিক দিক হচ্ছে ৪টি। অতএব একটা দিক বলতে বুঝায় (৩৬০÷৪=) ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে। সুতরাং কেবলার দিক বলতেও ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকেই বুঝাবে। তাই কাবা শরীফ বা বাইতুল্লাহ শরীফ যে বরাবর অবস্থিত (৩৯°৩৯′ পূর্ব দাঘিমা ও ২১°২৫′ উত্তর অক্ষাংশ) তার থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী– এই সর্বমোট ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে রুখ (অভিমুখিতা) থাকলেও নামায হয়ে যাবে। এই 'আইনে কেবলা' ও 'জেহাতে কেবলা' সম্বন্ধে সামনে এই অধ্যায়েই 'দিক ও কেবলা প্রসঙ্গ' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

আমাদের দেশে যেসব মসজিদ রয়েছে তা নির্মাণের সময় অনেকেই কম্পাস ধরে হুবহু বরাবর কেবলা ঠিক রেখে মেহরাব তৈরি করেননি। বরং আশপাশের মসজিদ দেখেই কেবলা নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এতে করে সেগুলোর অনেকটাতে হয়তো সোজা কেবলা রক্ষা হয়নি। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে প্রায়শই দেখা যায় সেগুলোর কেবলা পূর্বোল্লিখিত ৯০ ডিগ্রীর মধ্যেই রয়েছে। অতএব এসব মসজিদে নামাযে কেবলা বিষয়ক কোনো সমস্যা নেই। তবে কোন মসজিদের কেবলা প্রকৃতই ৯০ ডিগ্রীর বাইরে থাকলে তা অবশ্যই সংশোধন করে নেয়া চাই। কিন্তু ইদানিং মানুষের হাতে হাতে মোবাইল থাকে। আর অনেক মোবাইলে থাকে ডিজিটাল সাধারণ কম্পাস বা কেবলা কম্পাস। এ সুবাদে অনেকেই মোবাইলে সাধারণ কম্পাস বা কেবলা কম্পাস দেখে মসজিদের কেবলা সোজা বরাবর না পেলেই এবং একটু ডানে বামে বাঁকানো থাকলেই হৈ চৈ শুরু করেন যে, এই মসজিদের কেবলা ঠিক নেই, এতে নামায হবে না। এরূপ লোকদের অনেকেই সোজা কেবলার ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী– সর্বমোট এই ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে মুখ থাকলেও নামায হয়ে যায়– এ মাসআলাটি জানেন না। তদুপরি শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল শিপে ব্যবহৃত জাইরো কম্পাস (Gyro compass) নন ম্যাগনেটিক হওয়ার কারণে ভূগর্ভস্থ চুম্বকের কারণে সে কম্পাস প্রভাবিত হয় না। ফলে তা উত্তরসহ অন্য সব দিক সঠিক প্রদর্শন করে। কিন্তু অন্য যেকোনো ধরনের কম্পাস (এনালগ হোক বা ডিজিটাল) ম্যাগনেটিক কম্পাস হওয়ার কারণে হুবহু দিক দেখায় না– এ বিষয়টাও জানা থাকা দরকার। তাহলেই সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে যে, সোজা কেবলা কোন্ দিকে এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের অভিমুখিতা ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে রয়েছে কি না।

এনালগ বা ডিজিটাল যে কম্পাসই হোক না কেন তা যে হুবহু দিক দেখায় না– এ বিষয়টা বুঝার জন্য জানতে হবে কম্পাসের মাধ্যমে প্রথমে উত্তর দিক নির্ণিত হয় এবং তা থেকে অবশিষ্ট দিকগুলো নির্ণিত হয়। আরও জানতে হবে উত্তর রয়েছে দুই ধরনের। একটি হল ভৌগোলিক উত্তর (Geographical North) তথা প্রকৃত উত্তর (যেদিকে উত্তর আকাশের ধ্রুব তারা অবস্থিত)। আর অপরটি হল চৌম্বক উত্তর (Magnetic North)। আর কম্পাস যে উত্তর প্রদর্শন করে তা হচ্ছে চৌম্বক উত্তর। চৌম্বক উত্তর ও ভৌগোলিক উত্তর এক নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ও ভৌগোলিক উত্তর মেরুর অবস্থান এক জায়গাতে নয়। চৌম্বক উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে ডানে/বাঁয়ে অবস্থান করে। চৌম্বক উত্তর স্থির থাকে না বরং কখনো ডানে কখনো বাঁয়ে সরে থাকে। পূর্বের পরিচ্ছেদে বিভিন্ন সময়ে চৌম্বক উত্তরের অবস্থানে পার্থক্য হওয়ার একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে, যা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে থাকবে।

অতএব কম্পাস প্রদর্শিত উত্তর থেকে প্রকৃত উত্তর বের করতে হলে প্রথমে জানতে হবে চৌম্বক উত্তরের বর্তমান অবস্থান প্রকৃত উত্তর থেকে কত ডিগ্রী কোন্ দিকে রয়েছে। আমরা একটি চিত্র প্রদর্শন

করেছি। (চিত্রটি সামনে আসছে।) চিত্রটি কম্পিউটারে যথাসাধ্য নিখুঁতভাবেই আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয়েছে ২০১৮ সালে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তর ২.৫০° (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২°৩০′ (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট) পূর্বে অবস্থিত। অতএব কম্পাস যে উত্তর দেখাবে তা থেকে এই পরিমাণ পশ্চিমে হবে প্রকৃত উত্তর। এই প্রকৃত উত্তরের ভিত্তিতে অন্যান্য দিক নির্ণিত হবে। তারপর যেখান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে জায়গার দ্রাঘিমা অক্ষ ও বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা অক্ষ নির্ণয় করে বায়তুল্লাহ কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করতে হবে।

আমাদের প্রদত্ত চিত্রের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করা সহজ। চিত্রটি ঢাকার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ চিত্রের আলোকে অন্য যে কেউ তার স্থানের জন্য চিত্র অংকন করে নিতে পারবেন। (তবে অবশ্যই চিত্র তৈরির কাজটি দক্ষ হাতে সম্পন্ন হতে হবে। বর্তমানে কম্পিউটারে মোটামুটি এরূপ নিখুঁত চিত্র তৈরি করা যায়।) প্রথমে একটি বৃত্ত আঁকুন। বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝে একটি দ্রাঘিমা রেখা টানুন। এটা হবে যে স্থান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে স্থানের দ্রাঘিমা। তারপর বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা রেখা (৩৯°৩৯′ পূর্ব দাঘিমা) টানুন। বায়তুল্লাহর অক্ষ রেখা (২১°২৫′ উত্তর অক্ষাংশ) টানুন। তারপর যে স্থান থেকে কেবলার দিক বের করতে চাওয়া হবে সে স্থানের দ্রাঘিমা ও অক্ষ রেখা টানুন। পূর্বে বলা হয়েছে বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝে উত্তর দক্ষিণে যে রেখা হবে সেটা হবে সেই স্থানের দ্রাঘিমা রেখা। যেমন ঢাকা থেকে কেবলা বের করতে চাওয়া হলে ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০°২৪′ এবং অক্ষ ২৩°৪৮′। এভাবে ঢাকার দ্রাঘিমা ও অক্ষ রেখা টানুন। এবার বৃত্তের পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানের রেখা তথা ঢাকার দ্রাঘিমা রেখা ঢাকার অক্ষরেখাকে যে স্থানে ক্রস করবে সেই ক্রসিং পয়েন্ট হল ঢাকার অবস্থান। এবার ঢাকার অক্ষ রেখা বরাবর পূর্ব পশ্চিমে একটি সোজা রেখা টানুন। এটা হবে ঢাকা থেকে সোজা পূর্ব পশ্চিমের দিক বরাবর রেখা। সবশেষে ঢাকার অবস্থান থেকে একটি রেখা বায়তুল্লাহর অবস্থানকে (বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা ও অক্ষ রেখার ক্রসিং পয়েন্টকে) ক্রস করে বৃত্তের দিকে নিয়ে যান। এই রেখা বৃত্তের যেখানে গিয়ে মিলিত হবে সেটা সোজা পশ্চিমের রেখা যেখানে বৃত্তে মিলিত হয়েছে সেখান থেকে যতটুকু যে দিকে সরে থাকবে সেই পরিমাণই হবে ঢাকা থেকে বায়তুল্লাহর অবস্থান কোন্ দিকে কত ডিগ্রী সরে অবস্থিত তার নির্ণয়। নিম্নে এমন আমাদের প্রদত্ত চিত্রটি দেখুন। এতে দেখা যাচ্ছে বায়তুল্লাহ ঢাকা থেকে .৯০° (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪′ (৫৪ মিনিট) উত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ মনে করতে পারেন বায়তুল্লাহর অবস্থান যখন ২১°২৫′ উত্তর অক্ষাংশে আর ঢাকার অবস্থান ২৩°৪৮′ অক্ষাংশে, তাহলে ঢাকা থেকে বায়তুল্লাহ (২৩°৪৮′ - ২১°২৫′=) ২°২৩′ (২ ডিগ্রী ২৩ মিনিট) দক্ষিণ দিতে হওয়ার কথা। এরূপ মনে করা ভুল। কারণ অক্ষরেখা সামনের দিকে ক্রমান্বয়ে মেরুর দিকে বেঁকে গিয়ে থাকে। সব অক্ষরেখাই যেকোনো স্থান থেকে আগে পিছের দিকে ক্রমান্বয়ে মেরুর দিকে বেঁকে যায়। আমাদের প্রদত্ত চিত্রেও বিষয়টি লক্ষ করা যাবে।

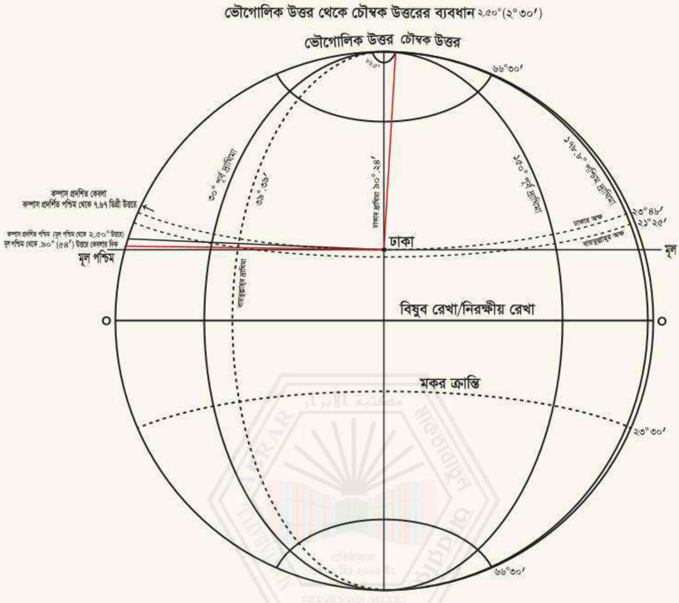
ভৌগোলিক উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান ২.৫০°(২°৩০′)
ভৌগোলিক উত্তর
চৌম্বক উত্তর
৬৬°৩০′
৩০° পূর্ব দ্রাঘিমা
৩৯°৩৯′
ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০°২৪′
১২০° পূর্ব দ্রাঘিমা
কম্পাস প্রদর্শিত কেবলা
কম্পাস প্রদর্শিত পশ্চিম থেকে ৭.৬৭ ডিগ্রী উত্তরে
কম্পাস প্রদর্শিত পশ্চিম (মূল পশ্চিম থেকে ২.৫০° উত্তরে)
মূল পশ্চিম থেকে .৯০° (৫৪′) উত্তরে কেবলার দিক
মূল পশ্চিম
ঢাকা
ঢাকার অক্ষ
বায়তুল্লাহর অক্ষ
২৩°৪৮′
২১°২৫′
মূল পূর্ব
বায়তুল্লাহর দ্রাঘিমা
বিষুব রেখা/নিরক্ষীয় রেখা
০
০
মকর ক্রান্তি
২৩°৩০′
৬৬°৩০′

চিত্র নং ১৮ – ২০১৮ সালের জন্য প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান ও কেবলার দিক নির্ণয়ের সহযোগী একটি চিত্র

পূর্বোক্ত বিষয়টা সামনে রেখে আমরা উদাহরণ স্বরূপ ঢাকা থেকে সোজা কেবলার দিক নির্ণয় করার ৪টা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। (ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানের বিষয়টাও এর উপর ভিত্তি করে বুঝে নেয়া যাবে।)

১. ধ্রুবতারার সাহায্যে কেবলা নির্ণয়: উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা চিহ্নিত করুন। (সপ্তর্ষীমণ্ডলের সাহায্যে ধ্রুবতারা চিহ্নিত করা যায়।) ধ্রুবতারা প্রকৃত উত্তর দিকে অবস্থিত। এটা স্থির তারা, কখনও তার স্থান পরিবর্তন হয় না। অতএব ধ্রুবতারার দিক হচ্ছে প্রকৃত উত্তর দিক। এর ভিত্তিতে প্রকৃত পশ্চিম দিক নির্ণয় করুন। সেই পশ্চিম দিক থেকে .৯০° (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪′ (৫৪ মিনিট) উত্তরে সোজা কেবলার দিক।

২. এনালগ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়: এনালগ কম্পাস দিয়ে প্রকৃত উত্তর বের করুন। উল্লেখ্য, সব কম্পাসই চৌম্বক উত্তর নির্ণয় করে থাকে প্রকৃত উত্তর নয় –যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি–। তাই কম্পাস প্রদর্শিত চৌম্বক উত্তর প্রকৃত উত্তর থেকে কত ডিগ্রী কোন্ দিকে

অবস্থিত তা বের করুন। এটা বের করার পদ্ধতি হল চৌম্বক উত্তর কত দ্রাঘিমা ও অক্ষে অবস্থিত তা বের করুন। তারপর ঢাকার (অর্থাৎ যেখান থেকে দিক নির্ণয় করতে চান এবং যে স্থানটিকে চিত্রে বৃত্তের দ্রাঘিমা [মধ্যরেখা] ও অক্ষের ক্রসিং পয়েন্টে চিহ্নিত করেছেন।) অবস্থান থেকে একটি রেখা উক্ত চৌম্বক উত্তরের দ্রাঘিমা ও অক্ষের ক্রসিং পয়েন্ট ভেদ করে বৃত্তে নিয়ে সংযুক্ত করুন। তারপর প্রকৃত উত্তর থেকে এই সংযুক্তির পয়েন্টের দূরত্ব মাপুন। সেটাই হবে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের দূরত্ব। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী ২০১৮ সালে চৌম্বক উত্তরের অবস্থান হচ্ছে ৮৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৭৮.৮° পশ্চিম দ্রাঘিমা। এবার উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আঁকা আমাদের প্রদত্ত চিত্রে দেখুন ২০১৮ সালে প্রকৃত উত্তর থেকে চৌম্বক উত্তরের ব্যবধান হয় ২.৫০° (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২°৩০′ (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট)। অতএব কম্পাস প্রদর্শিত উত্তর থেকে ২.৫০° পশ্চিমে হবে প্রকৃত উত্তর। এর ভিত্তিতে প্রকৃত পশ্চিম নির্ণয় করুন। সেই পশ্চিম দিক থেকে .৯০° (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪′ (৫৪ মিনিট) উত্তরে সোজা কেবলার দিক। (উল্লেখ্য, যেকোনো কম্পাস ব্যবহারের সময় কম্পাসের অবস্থানের আশেপাশে যেন লোহা জাতীয় কোন কিছু না থাকে। কেননা তাতে কম্পাস প্রভাবিত হবে।) অথবা কম্পাস যে পশ্চিম দেখাবে তা যেহেতু প্রকৃত পশ্চিম থেকে ২.৫০° উত্তরে। তাই কম্পাস প্রদর্শিত পশ্চিম থেকে ১.৬০° (২.৫০° - .৯০° = ১.৬০°) পরিমাণ দক্ষিণে হবে সোজা কেবলা।

৩. ডিজিটাল সাধারণ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়: ডিজিটাল সাধারণ কম্পাস দিয়ে কেবলা বের করতে চাইলে এনালগ কম্পাস দিয়ে কেবলা বের করার যে পদ্ধতি পূর্বে বলা হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে।

৪. ডিজিটাল কেবলা কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়: ডিজিটাল কেবলা কম্পাস দিয়ে কেবলা নির্ধারণ করতে হলে জানতে হবে ডিজিটাল কেবলা কম্পাস কেবলা দেখায় ২৭৭.৬৭°। কোন কোনটায় দেখায় ২৭৭.৬৮°। কোন কোনটায় দেখায় ২৭৮°। এটা বুঝতে হলে আগে কম্পাসের ডিগ্রী বুঝতে হবে। কম্পাসে মোট ৩৬০ ডিগ্রী থাকে। উত্তরদিকে থাকে ০ ডিগ্রী। পূর্বদিকে থাকে ৯০ ডিগ্রী। দক্ষিণে ১৮০ ডিগ্রী। পশ্চিমে ২৭০ ডিগ্রী। অতএব যেকোনো স্থানে কম্পাস ধরলে ২৭০ ডিগ্রী (কম্পাসের) হল সেই স্থানের প্রকৃত পশ্চিম। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকার সোজা কেবলা হচ্ছে প্রকৃত পশ্চিম থেকে .৯০° (দশমিক ৯০ ডিগ্রী) বা ৫৪′ (৫৪ মিনিট) উত্তরে। অতএব কেবলা কম্পাস যখন ২৭৭.৬৭ ডিগ্রীকে কেবলা দেখাচ্ছে তার অর্থ হল কম্পাসের পশ্চিম থেকে ৭.৬৭ ডিগ্রী উত্তরে কেবলা দেখাচ্ছে। আর কম্পাসের পশ্চিম যেহেতু প্রকৃত পশ্চিম থেকে ২.৫০° (দুই দশমিক পঞ্চাশ ডিগ্রী) বা ২°৩০′ (দুই ডিগ্রী ত্রিশ মিনিট) উত্তরে, তাহলে সারকথা এই দাঁড়াল যে, কেবলা কম্পাস প্রকৃত পশ্চিম থেকে (৭.৬৭+২.৫০=) ১০.১৭ ডিগ্রী উত্তরে এবং প্রকৃত কেবলা থেকে (১০.১৭−.৯০=) ৯.২৭ ডিগ্রী উত্তরে কেবলা দেখাচ্ছে। তাই কেবলা কম্পাস যে কেবলা দেখায় তার থেকে ৯.২৭ ডিগ্রী দক্ষিণে হবে প্রকৃত সোজা কেবলা। উল্লেখ্য, এক ধরনের কেবলা ডাইরেকশন (Qibla direction) এ্যাপ রয়েছে, তাতে কেবলার দিকে সোজা রেখা টেনে দেখানো হয়। তাতেও ২৭৭.৬৭ ডিগ্রীর দিকে কেবলা দেখানো হয়ে থাকে। নিচের ছবি লক্ষ করুন।

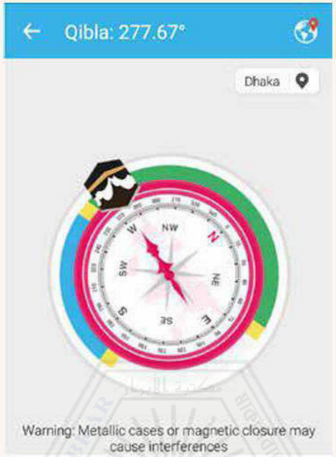

Warning: Metallic cases or magnetic closure may cause interferences

চিত্র নং ১৯ – কেবলা ডাইরেকশন এ্যাপ-এর কেবলা প্রদর্শনের একটি স্ক্রিন্‌শট

আরও উল্লেখ্য, কেবলা নির্ণয়ের উপরোক্ত পদ্ধতি চতুষ্ঠয়ের মধ্যে ১ম পদ্ধতিই সবচেয়ে উত্তম। তারপর ২য় পদ্ধতি তথা এনালগ কম্পাসের সাহায্যে কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি। ডিজিটাল কম্পাসের সেন্সর অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে থাকে বিধায় সামান্য অসমতল অবস্থানে রাখলে বা ধরার মধ্যে সামান্য উনিশ বিশ হলে কিংবা আরও বিবিধ কারণে রেজাল্ট পাল্টে যায়। এনালগ কম্পাসে তেমনটা হয় না।

সবশেষে আর একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে এ আলোচনা শেষ করছি। তাহল– কোন মসজিদের কেবলার রুখ মূল সোজা কেবলা থেকে ৪৫ ডিগ্রী ডানে বা ৪৫ ডিগ্রী বামের মধ্যে থাকলেও নামায হয়ে যায়– কথাটি যেন সর্বদা স্মরণে রাখা হয়। আমাদের এতক্ষণের আলোচনার উদ্দেশ্য হল কোন মসজিদের কেবলা এর বাইরে থাকলে তারা সংশোধন করে নিবেন, কিংবা নতুনভাবে কোথাও মসজিদ নির্মাণ করতে চাইলে বা কোন স্থানের কেবলার দিক সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে চাইলে এই পদ্ধতিগুলোর সহযোগিতা নিতে পারবেন।

নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয় প্রসঙ্গ

নক্ষত্রের সাহায্যে দিক নির্ণয়ের কথা কুরআন হাদীছেও বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

অর্থাৎ, তারকারাজি দ্বারাও তারা পথের (দিকের) পরিচয় লাভ করে থাকে। (সূরা নাহ্‌ল: ১৬)

এ বক্তব্য দ্বারা এদিকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, পথের (দিকের) পরিচয় লাভ এবং দিক নির্ণয় করতে পারাও তারকারাজি সৃষ্টি করার অন্যতম উদ্দেশ্য। সহীহ্ বোখারীতে হযরত কাতাদাহ্ কর্তৃক { وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ } এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে,

خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا. (صحيح البخاري بَاب فِي النُّجُوم)

অর্থাৎ, আল্লাহ এই নক্ষত্রগুলো তিন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন– তিনি এগুলোকে আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রবৎ এবং পথ লাভ করার নিদর্শন বানিয়েছেন।

সারকথা, নক্ষত্র দ্বারা দিক নির্ণয়ের বিষয়টি কুরআন হাদীছে সমর্থিত ও উৎসাহিত। পূর্বে বলা হয়েছে, ধ্রুবতারা দ্বারা দিক চেনা যায়, সাউদার্ণ ক্রস দ্বারাও দিক চেনা যায়। শুধু দিক নয় নক্ষত্র দ্বারা সময়ও চেনা যায়। যেমন কোন কোন মওসুমে রাত কতটা গভীর হল তা বুঝা যায় 'কালপুরুষ' (Orion[1]) নামক তারকামণ্ডলের অবস্থান দেখে। আরবিতে এই নক্ষত্রমণ্ডলকে বলা হয় الجَوْزاء।

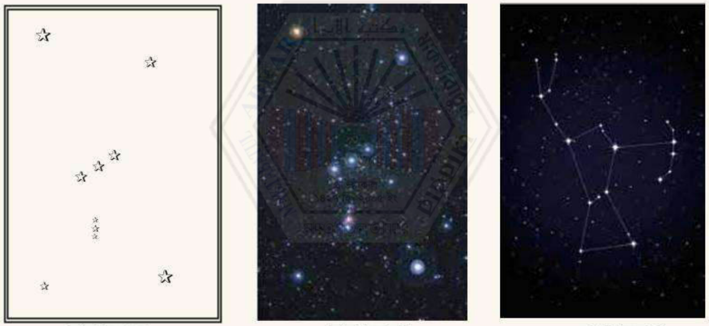
কালপুরুষ–ক কালপুরুষ–খ কালপুরুষ–গ

চিত্র নং ২০ কালপুরুষ, খ ও গ)

চিত্রের বর্ণনা: কালপুরুষ–ক তে কালপুরুষ নামক নক্ষত্রমণ্ডলের নক্ষত্রগুলোর অবস্থান হাতে এঁকে দেখানো হয়েছে। কালপুরুষ–খ তে রাতের আকাশ থেকে গ্রহণ করা কালপুরুষের চিত্র দেখানো হয়েছে। আর কালপুরুষ–গ তে দেখানো হয়েছে কালপুরুষের নক্ষত্রগুলোকে এবং আশপাশের আর কিছু নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করার ফলে কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলকে একজন বাহাদুর পুরুষের ন্যায় দেখা যায় –যার এক হাতে রয়েছে ধনুক আর এক হাত তলোয়ার নিয়ে উঁচু অবস্থায় রয়েছে।

নিম্নে ধ্রুবতারা ও সাউদার্ণ ক্রস চেনার উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

---

১. উচ্চারণ: ওরাইয়ন্।

ধ্রুবতারা চেনার উপায়

ধ্রবতারা চেনার ৩টি উপায় রয়েছে। যথা:–

(১) ধ্রবতারা চেনার এক নম্বর উপায় হল বৃহৎ সপ্তর্ষীমণ্ডল দ্বারা ধ্রুবতারা চেনা। ধ্রুবতারা উত্তর আকাশের একটি স্থির নক্ষত্র। এর কোন গতি নেই। একে সারা বছর একই স্থানে দেখা যায়। একে কেন্দ্র করে সপ্তর্ষীমণ্ডল আবর্তিত হয়, তা থেকেই ধ্রুবতারা চেনা যায়। গ্রীক দার্শনিকেরা এই সপ্তর্ষীমণ্ডলের নাম দিয়েছেন Ursa Major[1] যার ইংরেজি নাম হচ্ছে Great Bear[2] (অর্থ: বড় ভল্লুক) আরবিতে বলা হয় الدُّب الأكبر। এই সাতটি নক্ষত্রকে ভল্লুকের মত আকৃতি বিশিষ্ট কল্পনা করা যায় বিধায় ইংরেজিতে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এই সাতটি নক্ষত্রকে একটি প্রশ্ন চিহ্নের মত দেখায়। যে সাতটি নক্ষত্র নিয়ে সপ্তর্ষীমণ্ডল গঠিত হয়েছে, ভারতীয় পণ্ডিতরা সাত ঋষির নাম অনুসারে এগুলোর নাম দিয়েছেন মরীচি, বশিষ্ট, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু। মরিচি হচ্ছে প্রশ্ন চিহ্নের শেষ নক্ষত্র আর ক্রতু হচ্ছে প্রশ্ন চিহ্নের শুরুর নক্ষত্র। ইংরেজি ও আরবিতে যথাক্রমে এগুলোর নাম হল– Alkaid/القائد , Mizar/المزار , Alioth/الجون , Megrez/المغرز , Phecda/الفخذ , Merak/المراق , Dubhe/الدب।

সপ্তর্ষীমণ্ডলের শেষ দুটি নক্ষত্র (পুলহ ও ক্রতু)কে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করে বর্ধিত করলে ধ্রুবতারায় গিয়ে মিলিত হয়। এভাবেই ধ্রুবতারা চেনা যায়। ঢাকার দিগন্ত রেখা থেকে ধ্রুবতারাটি ২৩ ডিগ্রী উপরে দেখা যায়। যতই উত্তরে যাওয়া হবে ততই ধ্রুবতারাটি আরও উপরে দেখা যাবে। একেবারে উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারাটি সম্পূর্ণ মাথার উপরে দেখা যায়।

সপ্তর্ষীমণ্ডলকে চৈত্র–বৈশাখ মাসের সন্ধায় উত্তর আকাশে খুব উপরে দেখা যায়। প্রতিদিন ক্রমশ পশ্চিমে হেলে উদিত হতে থাকে। এভাবে জৈষ্ঠ–আষাঢ়–শ্রাবণে এটি উত্তর পশ্চিম দিকে দেখা যায়। ভাদ্র–আশ্বিন মাসে সম্পূর্ণ উত্তর পশ্চিমে হেলে পড়ে। ফলে ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ৪ মাসে সপ্তর্ষীমণ্ডল আকাশে অদৃশ্য থাকে। আবার পৌষ–মাঘ মাসে এটি আকাশের উত্তরপূর্ব অংশে দেখা যায় এবং ক্রমেই ধ্রুবতারার উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে সরে যায়।

(২) ধ্রবতারা চেনার দুই নম্বর উপায় ক্যাসিওপিয়া নামক নক্ষত্রমণ্ডল দ্বারা ধ্রুবতারা চেনা। যে মাসগুলোতে (বৃহৎ) সপ্তর্ষীমণ্ডল দেখা যায় না, তখন যে স্থানে সপ্তর্ষীমণ্ডল থাকার কথা তার বিপরীত দিকে কিছু দূরে পাঁচটি উজ্জ্বল তারকা রয়েছে যা দেখতে আকারে অনেকটা W বা M –এর মত, তা দেখে ধ্রুবতারা চেনা যায়। এই পাঁচটি তারকার নাম ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia/জমদগ্নি)। আরবিতে বলা হয় ذات الكرسي (অর্থ: চেয়ারওয়ালা)। অনেকটা হেলান দেয়া চেয়ারের ন্যায় দেখায় বলে এমন নামকরণ হয়ে থাকবে। যে মাসগুলোতে সপ্তর্ষীমণ্ডল দেখা যায়, তখনও ক্যাসিওপিয়া দিয়ে ধ্রুবতারা চেনা যায়।

(৩) ধ্রবতারা চেনার তিন নম্বর উপায় হল লঘু সপ্তর্ষীমণ্ডল দ্বারা ধ্রুবতারা চেনা। পূর্বে যে সপ্তর্ষীমণ্ডলের কথা বলা হয়েছে সেটি হল বৃহৎ সপ্তর্ষীমণ্ডল। আর একটি রয়েছে লঘু সপ্তর্ষীমণ্ডল। ইংরেজিতে একে বলা হয় Little Bear যার অর্থ ছোট ভল্লুক। আরবিতে বলা হয় الدُّب الأصغر।

---

১. উচ্চারণ: আর্স্যা মেজর্।

২. উচ্চারণ: গ্রেট্ বেয়ার্।

এই লঘু সপ্তর্ষীমণ্ডল দ্বারাও ধ্রুবতারা চেনা যায়। লঘু সপ্তর্ষীমণ্ডলও বৃহৎ সপ্তর্ষীমণ্ডলের ন্যায় প্রশ্ন চিহ্নের মতই দেখায়। তবে বৃহৎ সপ্তর্ষীমণ্ডলের চেয়ে আকারে ছোট। এর লেজের মাথাটি উপর দিকে বাঁকানো। এর লেজের দিকের শেষ নক্ষত্রটি হচ্ছে ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারাকে লঘু সপ্তর্ষীমণ্ডলের অংশ ধরা হয়। ধ্রুবতারাসহ লঘু সপ্তর্ষীমণ্ডলের তারার সংখ্যা হয় ৭টি। পক্ষান্তরে ধ্রুবতারা ছাড়াই বৃহৎ সপ্তর্ষীমণ্ডলের তারার সংখ্যা ৭টি। লঘু সপ্তর্ষীমণ্ডল সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না।

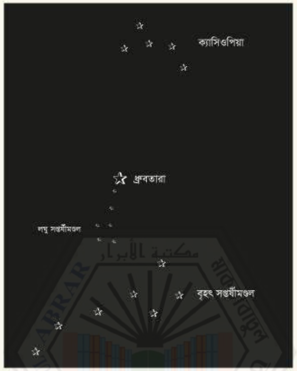

চিত্র নং ২১ – ধ্রুবতারা, ক্যাসিওপিয়া ও সপ্তর্ষীমণ্ডল

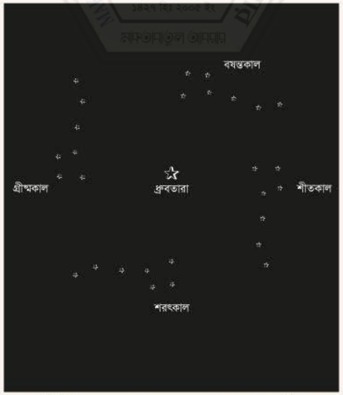

চিত্র নং ২২ – বিভিন্ন ঋতুতে সন্ধাকাশে বৃহৎ সপ্তর্ষীমণ্ডলের অবস্থান

সাউদার্ণ ক্রস চেনার উপায়

দক্ষিণ মেরুর অনতিদূরে কাছাকাছি চারটি নক্ষত্র দেখা যায়। সে নক্ষত্র চতুষ্টয়কে কাল্পনিক দুটো রেখা দ্বারা যোগ করলে ক্রুশ আকৃতিবিশিষ্ট দেখায়। এই দুটো রেখার মধ্যে বড় বাহুটিকে ৪১২ গুণ বর্ধিত করলে তা প্রায় দক্ষিণ মেরুর নিকট পৌঁছে। এই নক্ষত্রপুঞ্জের নাম ত্রিশঙ্কু বা বিশ্বামিত্র। ইংরেজিতে বলা হয় Southern Cross (সাউদার্ণ ক্রস)। আর আরবিতে বলা হয় صَلِيب الجنوب (যার অর্থ হয় দক্ষিণের ক্রুশ।)। আকৃতিটি কিছুটা ক্রুশের মত হওয়ায় এরূপ নামকরণ করা হয়ে থাকবে। সাউদার্ণ ক্রস নক্ষত্রমণ্ডল দিক চেনার জন্য দক্ষিণ গোলার্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডল।

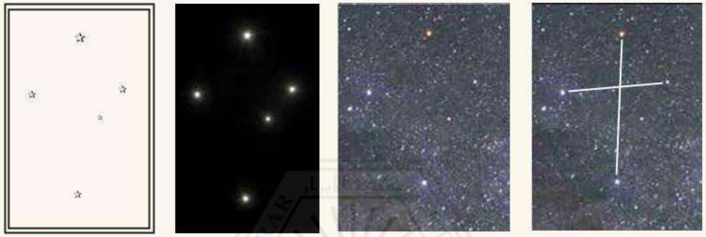
সাউদার্ণ ক্রস–ক সাউদার্ণ ক্রস–খ সাউদার্ণ ক্রস–গ সাউদার্ণ ক্রস–ঘ

চিত্র নং ২৩ – সাউদার্ণ ক্রসের চিত্র (ক, খ, গ ও ঘ)

চিত্রসমূহের বর্ণনা: সাউদার্ণ ক্রস–ক য়ে হাতে তৈরি সাউদার্ণ ক্রসের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। সাউদার্ণ ক্রস–খ য়ে রাতের আঁধারে শুধু সাউদার্ণ ক্রস–এর নক্ষত্রমণ্ডলী কেমন জ্বলজ্বল করে তা দেখানো হয়েছে। সাউদার্ণ ক্রস–গ য়ে আশপাশের নক্ষত্রসমূহের মাঝে সাউদার্ণ ক্রস-এর অবস্থানের প্রাকৃতিক ছবি দেখানো হয়েছে। আর সাউদার্ণ ক্রস–ঘ য়ে সাউদার্ণ ক্রস-এর ৪টি নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করার পর যে চিত্র (ক্রূশের চিত্র) দাঁড় হয় তা দেখানো হয়েছে।

দিক ও কেবলা প্রসঙ্গ

মৌলিক দিক হচ্ছে ৪টি। যথা: উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। সমগ্র পৃথিবীর রয়েছে ৩৬০ ডিগ্রী। অতএব প্রত্যেক দিকের রয়েছে (৩৬০÷৪=৯০) ডিগ্রী।

দিকের সাথে শরীয়তের বিশেষ একটা বিষয় জড়িত রয়েছে। তা হল নামাযের কেবলার বিষয়। নামাযে কেবলার দিকে মুখ করা শর্ত। যারা মসজিদে হারামে নামায আদায় করেন তথা এমন স্থানে নামায আদায় করেন যেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখা যায় তাদের জন্য হুবহু কেবলা (عَين قبلہ) শর্ত অর্থাৎ, হুবহু বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করা শর্ত। আর যারা পৃথিবীর অন্যত্র নামায আদায় করবেন তাদের জন্য হুবহু কেবলা নয় বরং জেহাতে কেবলা (جہت قبلہ) তথা কেবলার দিক হওয়াই যথেষ্ট।

জেহাতে কেবলার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত থেকে– আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

অর্থাৎ, তোমার মুখমণ্ডল মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও। (সূরা বাকারা: ১৪৯)

এখানে 'মসজিদে হারাম' বলে বাইতুল্লাহর দিক বুঝানো হয়েছে। বাইতুল্লাহর দিককে পরিভাষায় বলা হয় জেহাতে কেবলা বা কেবলার দিক। পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে, যারা বাইতুল্লাহ দেখতে পাওয়া যায় এমন স্থানে নামায পড়েন তাদেরকে হুবহু বাইতুল্লাহ বা হুবহু কাবা শরীফ বরাবর মুখ করে নামায আদায় করতে হয়। এটাকে বলা যায় 'আইনে কেবলা' (একেবারে সোজা কেবলা)। তাদের জন্য সোজা কেবলামুখী হওয়া জরুরী। আর যেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখতে পাওয়া যায় না এমন কোন স্থানে কেউ নামায পড়লে (চাই বিশ্বের যেখানেই হোক না কেন) তার মুখ হুবহু বাইতুল্লাহ বরাবর না হলেও চলে, তবে বাইতুল্লাহর বা কেবলার দিকের মধ্যে থাকতে হবে। একে বলা হয় 'জেহাতে কেবলা'।

জেহাতে কেবলা অর্থ কেবলার দিক বা বাইতুল্লাহর দিক। এই 'কেবলার দিক' বা 'বাইতুল্লাহর দিক' বলতে বুঝায় বাইতুল্লাহ যে বরাবর অবস্থিত তার থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী– এই সর্বমোট ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে। কেননা, পৃথিবীর বৃত্ত হচ্ছে ৩৬০ ডিগ্রী, আর মৌলিক দিক হচ্ছে ৪টি। অতএব একটা দিক বলতে বুঝায় (৩৬০÷৪=) ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে। সুতরাং কেবলার দিক বলতেও ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকেই বুঝাবে। হাদীছ থেকেও এই ৯০ ডিগ্রীর ধারণা লাভ হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ما بين المشرق والمغرب قبلة. (رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে কেবলা। ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত ইবনে উমার রা.-এর বরাতে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন যে, إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ، وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ، إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ অর্থাৎ, যখন তুমি কেবলামুখী হবে তখন পশ্চিম দিককে তোমার ডানে এবং পূর্ব দিককে তোমার বামে রাখবে এ দুইয়ের মাঝে যে অঞ্চল সেটাই কেবলা (-র দিক)। (এটা মদীনার হিসাব যেখান থেকে কা'বা দক্ষিণে) আর পশ্চিম ও পূর্ব যেহেতু ১৮০ ডিগ্রী সম্পন্ন, তাই তার মাঝে বলতে ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকেই বুঝাবে।

নামাযীকে অবশ্যই এই ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে অভিমুখী থাকতে হবে। এর বাইরে অভিমুখী হয়ে গেলে নামায হবে না। তাই কাবা শরীফ বা বাইতুল্লাহ শরীফ যে বরাবর অবস্থিত (৩৯°৩৯′ পূর্ব দাঘিমা ও ২১°২৫′ উত্তর অক্ষাংশ) তার থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রী এবং বাম দিকে ৪৫ ডিগ্রী এই সর্বমোট ৯০ ডিগ্রীর মধ্যে রুখ (অভিমুখিতা) থাকলেও নামায হয়ে যাবে।

কোন মসজিদের মেহরাব বা কোন নামাযীর মুখ জেহাতে কেবলার মধ্যে আছে কি না তা বের করার উপায় পূর্বে 'কম্পাস দ্বারা কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে সোজা কেবলা কত ডিগ্রী কোন্ দিকে অবস্থিত তা বের করুন এবং তা থেকে ডানে ৪৫ ডিগ্রী এবং বামে ৪৫ ডিগ্রী-এর মধ্যে অভিমুখ থাকলেই জেহাতে কেবলার মধ্যে রয়েছে ধরা হবে। মেহরাবের মধ্যখান বা নামাযীর দাঁড়ানোর স্থানকে মূল কেন্দ্র বানিয়ে একটা গোল বৃত্ত আকুন। বৃত্তের মধ্যখানে প্রকৃত কেবলার বরাবর সামনে পিছনে একটা রেখা টানুন এবং ডানে বামেও মধ্যখানে একটা রেখা টানুন। এরপর সামনের দিকে প্রথম রেখা ও ডানে বামের রেখার মাঝে মূলকেন্দ্র থেকে বৃত্ত রেখা পর্যন্ত দুই দিকে (ডানে বামে) আরও দুটো কৌণিক রেখা টানুন। মূল

কেন্দ্র থেকে বের হয়ে এই কৌণিক রেখাটি ডানে বৃত্তরেখার যেখানে স্পর্শ করেছে সেটা হল মূল কেবলার ৪৫ ডিগ্রী ডান। এমনিভাবে বামে বৃত্তরেখার যেখানে স্পর্শ করেছে সেটা হল মূল কেবলার ৪৫ ডিগ্রী বাম। এবার দেখুন মসজিদের মেহরাব বা নামাযীর মুখ ডানে বা বামে ৪৫ ডিগ্রীর মধ্যে আছে কি না। উদাহরণ স্বরূপ ঢাকা থেকে সোজা কেবলা হচ্ছে সোজা পশ্চিম থেকে .৯০ ডিগ্রী (৫৪ মিনিট) উত্তরে (যা পূর্বে 'কম্পাস দ্বারা কেবলা নির্ণয়ের পদ্ধতি' শিরোনামে আলোচনায় দেখানো হয়েছে।) অতএব ঢাকার সোজা পশ্চিম থেকে ৪৫.৯০ ডিগ্রী (৪৫ ডিগ্রী ৫৪ মিনিট) উত্তর পর্যন্ত এবং ৪৪.১০ ডিগ্রী (৪৪ ডিগ্রী ৬ মিনিট) দক্ষিণ পর্যন্ত অঞ্চল হচ্ছে ঢাকার জন্য জেহাতে কেবলার অঞ্চল। চিত্রের সাহায্যে বুঝতে চাইলে ঢাকাকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আকুন। বৃত্তের সোজা পশ্চিম বরাবর ০ ডিগ্রী বসান। এরপর তা থেকে ডানে উত্তরের দিকে ৪৫.৯০ ডিগ্রী (৪৫ ডিগ্রী ৫৪ মিনিট) পর একটি চিহ্ন দিন। কেন্দ্র থেকে এই চিহ্ন বরাবর একটি রেখা টানুন। এভাবে সোজা পশ্চিম থেকে ৪৪.১০ ডিগ্রী (৪৪ ডিগ্রী ৬ মিনিট) পর একটি চিহ্ন দিন এবং কেন্দ্র থেকে এই চিহ্ন বরাবরও একটি রেখা টানুন। এবার উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই রেখার মধ্যে হবে ঢাকার জেহাতে কেবলার অঞ্চল। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হল। চিত্রে কোন্ কোন্ নামাযীর মুখ জেহাতে কেবলার মধ্যে রয়েছে, আর কোন্ কোন্ নামাযীর মুখ জেহাতে কেবলার বাইরে চলে গেছে তা নম্বর দিয়ে দেখানো হয়েছে।

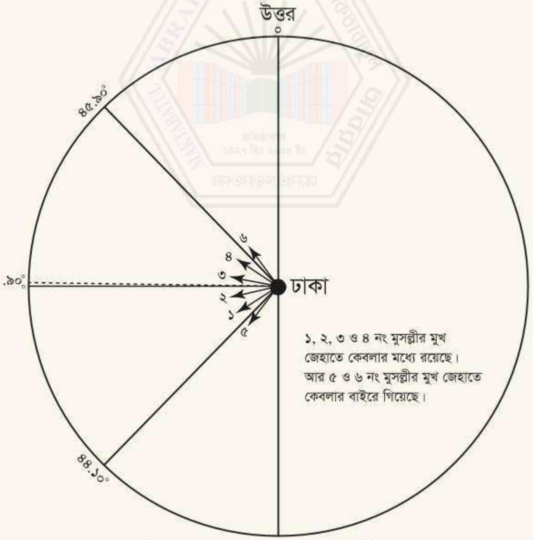
উত্তর
০
৪৫.৯০°
.৯০°
৪৪.১০°
ঢাকা
৬
৪
৩
২
১
৫
১, ২, ৩ ও ৪ নং মুসল্লীর মুখ জেহাতে কেবলার মধ্যে রয়েছে। আর ৫ ও ৬ নং মুসল্লীর মুখ জেহাতে কেবলার বাইরে গিয়েছে।

চিত্র নং ২৪– জেহাতে কেবলার চিত্র

চতুর্থ অধ্যায়

(প্রাকৃতিক তত্ত্ব : পৃথিবী ও বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ বিষয়ক)

পৃথিবী ও বিশ্ব-এর সংজ্ঞা

আমাদের এই জগৎকেই পৃথিবী বা বিশ্ব বলা হয়। পৃথিবী একটি গ্রহ, যে গ্রহে মানুষসহ অন্য অনেক প্রাণীর বসবাস রয়েছে। আপাতত কেবল এ গ্রহেই প্রাণী রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। পৃথিবী-কে ভূমণ্ডল, ধরণী, বসুন্ধরা প্রভৃতিও বলা হয়। (العالم/World[১])। পৃথিবী হচ্ছে সৌরজগতের জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে সূর্য থেকে দূরত্বের বিচারে তৃতীয় জ্যোতিষ্ক, যেখানে মানুষের বসবাস রয়েছে। আরবিতে পৃথিবীকে الكرة الأرضية ، اليابس ، العالم ، الأرض ইত্যাদি বলা হয়।

মহা বিশ্ব-এর সংজ্ঞা

আমাদের বিশ্বের বাইরে রয়েছে আরও কোটি কোটি বিশ্ব। এই কোটি কোটি বিশ্ব নিয়ে যে মহা জগৎ গড়ে উঠেছে, সেটাই হল "মহাবিশ্ব" (The Universe[২])। শত কোটিতে এক বিলিয়ন। এরূপ প্রায় ২০ হাজার বিলিয়ন আলোকবর্ষ[৩] দূরত্ব পরিমাণ স্থান নিয়ে বিস্তৃত এই মহাবিশ্ব। এরূপ মহা বিস্তৃত স্থানের কল্পনা করাও কঠিন। মহা বিশ্বের সামনে আমাদের সৌরজগৎ এক ক্ষুদ্র বালুকণার মত স্থান লাভ করেছে। (তথ্যসূত্র: প্রাকৃতিক পরিবেশ)

---

[১] উচ্চারণ: ওয়ার্ল্ড্।

[২] উচ্চারণ: দ্যা ইউনিভার্স্।

[৩] এক আলোকবর্ষ বলতে বোঝায় আলো এক বছরে যত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। উল্লেখ্য, আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল (২ লক্ষ ৯৯.৩৩৮ কিলোমিটার অর্থাৎ, প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার।)।

দেশ (Country[১]/بلد)-এর সংজ্ঞা

দেশ অর্থ রাষ্ট্র। একটি দেশ হচ্ছে একটি মহাদেশের ভৌগোলিক অংশ বিশেষ।

মহাদেশ (Continent[২]/قارّة)-এর সংজ্ঞা

অনেকগুলো দেশযুক্ত বৃহত্তম ভৌগোলিক বিভাগকে বলা হয় মহাদেশ। এভাবেও বলা যায়, একই অঞ্চলে অবস্থিত কতগুলো দেশ নিয়ে মহাদেশ গঠিত। পৃথিবীতে মহাদেশ ৭টি। যথা: এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া ও এন্টার্কটিকা।

উপমহাদেশ (sub continent[৩]/شبه القارّة)-এর সংজ্ঞা

একটি মহাদেশের বড় কোন অংশকে উপমহাদেশ বলা হয়।

মহাদেশসমূহের আয়তন

মহাদেশ-এর নাম	আয়তন (বর্গ কি. মি.)
এশিয়া (Asia/آسيا)	৪৪০,৩০,০০০
ইউরোপ (Europe/أوربا)	১০৪,৯৮,০০০
আফ্রিকা (Africa/افريقية)	২৯৭,৮৫,০০০
উত্তর আমেরিকা (North America/أمريكا الشمالية)	২৪২,৫৫,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা (South America/أمريكا الجنوبية)	১৭৭,৯৮,০০০
অস্ট্রেলিয়া (Australia/أستراليا)	৭৬,৮৬,০০০
এন্টার্কটিকা (Antarctica/آنتاركتيكا)	১৪,১০০,০০

দ্বীপ (جزيرة)-এর সংজ্ঞা

চারদিকে পানিবেষ্টিত স্থলভাগকে দ্বীপ বলে। অর্থাৎ, যে ভূমির চারদিকে পানি তা হল দ্বীপ। যেমন বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার সেন্ট মার্টিন একটা দ্বীপ, চট্টগ্রামের সন্দীপ উপজেলা একটা দ্বীপ, কাঠগড় একটা দ্বীপ।

উপদ্বীপ (شبه الجزيرة) -এর সংজ্ঞা

যে ভূমির চারদিকে নয় তবে প্রায় চারদিকে পানি তা হল উপদ্বীপ। যেমন আরব উপদ্বীপ (شبه جزيرة العرب)।

---

[১] উচ্চারণ: কান্ট্রি।

[২] উচ্চারণ: কন্টিনেন্ট্।

[৩] উচ্চারণ: সাব কন্টিনেন্ট্।

পাহাড়/পর্বত (جَبَل)-এর সংজ্ঞা

সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চে অবস্থিত ঢাল বিশিষ্ট স্বল্পদূর বিস্তৃত শিলাস্তুপকে বলে পাহাড় (Hill[১])। আর সমুদ্র সমতল থেকে অতি উচ্চে অবস্থিত খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তুপকে বলে পর্বত (Mountain[২])। সাধারণত পাহাড় আর পর্বতের মাঝে উচ্চতা আর অতি উচ্চতা এবং ঢাল খাড়া হওয়া না হওয়ার পার্থক্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে।[৩] আরবিতে পাহাড় ও পর্বত উভয়টিকেই সাধারণত জাবাল (جَبَل) বলা হয়। তবে পাহাড় বা পর্বতের জন্য ন্যূনতম কতটুকু উঁচু হতে হবে সে সম্বন্ধে আধুনিক এক তাহকীকে বলা হয়েছে, ৫০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ভূমিকে সাহ্‌ল (سَهْل) তথা সমতলভূমি/সমভূমি বলে। ৫০১–৯৯৯ ফুট উঁচু হলে তাকে তাল্ল (تَل) তথা উচ্চভূমি বা টিলা বলে এবং ১০০০ ফুট বা তার চেয়ে উঁচু হলে তাকে জাবাল (جَبَل) তথা পাহাড়/পর্বত বলে।

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গসমূহ

পর্বতের নাম	দেশ/স্থান	উচ্চতা (মিটার)
এভারেস্ট (Mount Everest/إبرست)	নেপাল, চীন	৮৮৪৮
কারাকোরাম (Kara koram/كره كورم)	জম্মু–কাশ্মির	৮৬১১
কাঞ্চনজঙ্গা (Kanchenjunga/ كنتشنجنغا)	নেপাল	৮৫৮৬
ধবলগিরি (Dhaulagiri/ دهاولاغيري)	নেপাল	৮১৭২
নাঙ্গা পর্বত (Nanga Parbat/ نانكا بربت)	জম্মু–কাশ্মির	৮১২৬
অন্নপূর্ণা (Annapurna/ أنابورنا)	নেপাল	৮০৭৮
গ্যাসেরব্রাম (Gasherbrum/جاشيربروم)	জম্মু–কাশ্মির	৮০৮৬
গোসাইনথান (Gosainthan/ شيشابانغما)	তিব্বত	৮০১৩
নন্দাদেবী (Nanda Devi/نائدا ديبي)	ভারত	৭৮১৬

সূত্র: গ্রাফোসম্যানের নতুন ভূচিত্রাবলী, The Oxford school Atlas, গুগল ম্যাপ ও أطلس المملكة العربية السعودية

---

[১] উচ্চারণ: হিল্।

[২] উচ্চারণ: মাউন্টেন্।

[৩] উইকিপিডিয়া-য় কমপক্ষে ৬০০ মিটার বা ২০০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট না হলে তাকে পর্বত বলা হয় না বরং তাকে পাহাড় বলা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বক্তব্যের কোন সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহ

(২০১১ সালের জরিপ মোতাবেক)

ক্র. নং	দেশের নাম	মহাদেশ	মুসলিম সংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা মুসলিম হার (%)	বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার (%)
১	ইন্দোনেশিয়া	এশিয়া	২০৪,৮৪৭,০০০	৮৮.১	১২.৭
২	পাকিস্তান	এশিয়া	১৭৮,০৯৭,০০০	৯৬.৪	১১.০
৩	বাংলাদেশ	এশিয়া	১৪৮,৬০৭,০০০	৯০.৪	৯.২
৪	মিশর	আফ্রিকা	৮০,০২৪,০০০	৯৪.৭	৪.৯
৫	নাইজেরিয়া	আফ্রিকা	৭৫,৭২৮,০০০	৪৭.৯	৪.৭
৬	ইরান	এশিয়া	৭৪,৮১৯,০০০	৯৯.৬	৪.৬
৭	তুরস্ক	এশিয়া	৭৪,৬৬০,০০০	৯৮.৬	৪.৬
৮	মরক্কো	আফ্রিকা	৩২,৩৮১,০০০	৯৯.৯	২.০
৯	ইরাক	এশিয়া	৩১,১০৮,০০০	৯৮.৯	১.৯
১০	সুদান	আফ্রিকা	৩০,৮৫৫,০০০	৭১.৪	১.৯
১১	উজবেকিস্তান	এশিয়া	২৬,৮৩৩,০০০	৯৬.৫	১.৭
১২	সৌদি আরব	এশিয়া	২৫,৪৯৩,০০০	৯৭.১	১.৬
১৩	ইয়েমেন	এশিয়া	২৪,০২৩,০০০	৯৯.০	১.৫
১৪	সিরিয়া	এশিয়া	২০,৮৯৫,০০০	৯২.৮	১.৩
১৫	মালোয়েশিয়া	এশিয়া	১৭,১৩৯,০০০	৬১.৪	১.১
১৬	নাইজার	আফ্রিকা	১৫,৬২৭,০০০	৯৮.৩	১.০
১৭	সেনেগাল	আফ্রিকা	১২,৩৩৩,০০০	৯৫.৯	০.৮
১৮	মালি	আফ্রিকা	১২,৩১৬,০০০	৯২.৪	০.৮
১৯	তিউনিসিয়া	আফ্রিকা	১০,৩৪৯,০০০	৯৯.৮	০.৬
২০	বুরকিনা ফাসো	আফ্রিকা	৯,৬০০,০০০	৫৮.৯	০.৬
২১	সোমালিয়া	আফ্রিকা	৯,২৩১,০০০	৯৮.৬	০.৬
২২	কাজাখিস্তান	এশিয়া	৮,৮৮৭,০০০	৫৬.৪	০.৫

২৩	আজারবাইজান	এশিয়া	৮,৭৯৫,০০০	৯৮.৪	০.৫
২৪	গিনি	আফ্রিকা	৮,৬৯৩,০০০	৮৪.২	০.৫
২৫	তাজিকিস্তান	এশিয়া	৭,০০৬,০০০	৯৯.০	০.৪
২৬	চাদ	আফ্রিকা	৬,৪০৪,০০০	৫৫.৭	০.৪
২৭	লিবিয়া	আফ্রিকা	৬,৩২৫,০০০	৯৬.৬	০.৪
২৮	কিরগিজস্তান	এশিয়া	৪,৯২৭,০০০	৮৮.৮	০.৩
২৯	তুর্কমেনিস্তান	এশিয়া	৪,৮৩০,০০০	৯৩.৩	০.৩
৩০	ফিলিস্তীন	এশিয়া	৪,২৯৮,০০০	৯৭.৫	০.৩
৩১	সিয়েরা লিয়োন	আফ্রিকা	৪,১৭১,০০০	৭১.৫	০.৩
৩২	সংযুক্ত আরব আমিরাত	এশিয়া	৩,৫৭৭,০০০	৭৬.০	০.২
৩৩	মৌরিতানিয়া	আফ্রিকা	৩,৩৩৮,০০০	৯৯.২	০.২
৩৪	কুয়েত	এশিয়া	২,৬৩৬,০০০	৮৬.৪	০.২
৩৫	ওমান	এশিয়া	২,৫৪৭,০০০	৮৭.৭	০.২
৩৬	লেবানন	এশিয়া	২,৫৪২,০০০	৫৯.৭	০.২
৩৭	কসভো	ইউরোপ	২,১০৪,০০০	৯১.৭	০.১
৩৮	গাম্বিয়া	আফ্রিকা	১,৬৬৯,০০০	৯৫.৩	০.১
৩৯	কাতার	এশিয়া	১,১৬৮,০০০	৭৭.৫	০.১
৪০	জিবুতি	আফ্রিকা	৮৫৩,০০০	৯৭.০	০.১
৪১	কমোরোস	আফ্রিকা	৬৭৯,০০০	৯৮.৩	< ০.১
৪২	বাহরাইন	এশিয়া	৬৫৫,০০০	৮১.২	< ০.১
৪৩	পশ্চিম সাহারা	আফ্রিকা	৫২৮,০০০	৯৯.৬	< ০.১
৪৪	মালদ্বীপ	এশিয়া	৩০৯,০০০	৯৮.৪	< ০.১
৪৫	ব্রুনাই	এশিয়া	২১১,০০০	৫১.৯	< ০.১
৪৬	মায়ুতী[১]	আফ্রিকা	১৯৭,০০০	৯৮.৮	< ০.১

---

[১] আফ্রিকার মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার-এর মধ্যবর্তী একটি দ্বীপদেশ। দেশটি ফ্রান্সের অধীনস্থ।

বহুসংখ্যক মুসলিম (২০%-এর অধিক) অধ্যুষিত দেশসমূহ

(২০১১ সালের জরিপ মোতাবেক)

ক্র. নং	দেশের নাম	মহাদেশ	মুসলিম সংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতকরা মুসলিম হার (%)	বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার (%)
১	নাইজেরিয়া	আফ্রিকা	৭৫,৭২৮,০০০	৪৭.৯	৪.৭
২	ইথিউপিয়া	আফ্রিকা	২৮,৭২১,০০০	৩৩.৮	১.৮
৩	তাঞ্জানিয়া	আফ্রিকা	১৩,৪৫০,০০০	২৯.৯	০.৮
৪	আইভরি কোস্ট	আফ্রিকা	৭,৯৬০,০০০	৩৬.৯	০.৫
৫	মোজাম্বিক	আফ্রিকা	৫,৩৪০,০০০	২২.৮	০.৩
৬	বেনিন	ইউরোপ	২,২৫৯,০০০	২৪.৫	০.১
৭	ইরিত্রিয়া	আফ্রিকা	১,৯০৯,০০০	৩৬.৫	০.১
৮	বসনিয়া-হার্জেগোভিনা	ইউরোপ	১,৫৬৪,০০০	৪১.৬	০.১
৯	গিনি বিসাউ	আফ্রিকা	৭০৫,০০০	৪২.৮	< ০.১
১০	সাইপ্রাস	ইউরোপ	২০০,০০০	২২.৭	< ০.১

পৃথিবীর দেশসমূহ : নাম, রাজধানী, মুদ্রার নাম, প্রধান ভাষা ও পতাকাসমূহ

এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহ

ক্র. নং	দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম	ভাষা/প্রধান ভাষা	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা (২০১৭) (মিলিয়ন)	পতাকা
১	বাংলাদেশ (Bangladesh/بنغلاديش)	ঢাকা	টাকা	বাংলা	১৪৭,৫৯৮	১৬৭.৭	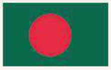
২	ভারত (India/الهند)	নয়াদিল্লী	রুপি	গুজরাটি, হিন্দী, পাঞ্জাবী, আসামী, বাংলা প্রভৃতি	৩,২৮৭,০০০	১,৩৩৯	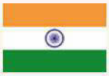
৩	পাকিস্তান (Pakistan/باكستان)	ইসলামাবাদ	রুপি	উর্দু, পশতু, সিন্ধী, বেলুচী প্রভৃতি	৮৮১,৯১৩	১৯৭	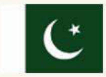
৪	শ্রীলংকা (Sri Lanka/سري لانكا)	কলম্বো	রুপি	সিংহলী, তামিল	৬৫,৬১০	২১.৪৪	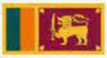
৫	নেপাল (Nepal/نيبال)	কাঠমুন্ডু	রুপি	নেপালী	১৪৭,১৮১	২৯.৩	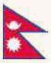
৬	ভুটান (Bhutan/بوتان)	থিম্পু	গুলড্রাম	দুজুঙ্খা	৩৮,৩৯৪	০.৮০৭৬১	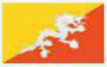
৭	মালদ্বীপ (Maldives/مالديف)	মালে	রুপিয়া	ধিভেহী	২৯৭.৮	০.৪৩৬৩৩	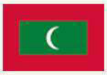
৮	মায়ানমার (Myanmar/ميانمار)	নাইপিদো	কিয়াত	বার্মিজ	৬৭৬,৫৭৫	৫৩.৩৭	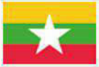
৯	আফগানিস্তান (Afghanistan/ أفغان)	কাবুল	আফগানি	দারি, পশতু	৬৫২,৮৬৪	৩৫.৫৩	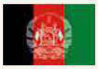
১০	ইন্দোনেশিয়া (Indonesia/إندونيسيا)	জাকার্তা	রুপিয়া	ইন্দোনেশিয়ান	১,৯০৫,০০০	২৬৪	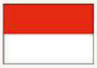
১১	মালয়েশিয়া (Malaysia/ماليزيا)	কুয়ালালামপুর	রিঙ্গিত	মালয়	৩৩০,৮০৩	৩১.৬২	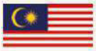
১২	সিঙ্গাপুর (Singapore/سنغافوره)	সিঙ্গাপুর সিটি	ডলার	ইংরেজি, মালয়, তামিল প্রভৃতি	৭২১.৫	৫.৬১২	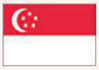
১৩	থাইল্যান্ড (Thailand/تايلاند)	ব্যাংকক	বাথ	থাই	৫১৩,১২০	৬৯.০৪	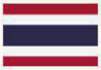
১৪	ভিয়েতনাম (Vietnam/ فيتنام)	হ্যানয়	ডং	ভিয়েতনামিজ	৩৩১,২১০	৯৫.৫৪	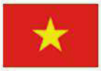
১৫	লাওস (Laos/لاوس)	ভিয়েনতিয়েন	কিপ	লাও	২৩৬,৮০০	৬. ৮৫৮	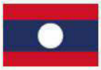
১৬	কম্বোডিয়া (Cambodia/كمبوديا)	নমপেন	রিয়েল	খামের	১৮১,০৩৫	১৬.০১	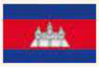

১৭	ব্রুনেই (Brunei/بروناي)	বন্দরসেরী	ডলার	মালয়, ইন্দোনেশিয়ান, ভিয়েতনামিজ	৫,৭৬৫	০.৪২৮৬৯৭	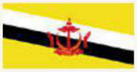
১৮	পূর্ব তিমুর (Timor-Leste/تيمور الشرقية)	দিলি	রুপাইয়া	পর্তুগিজ, তেতুম	১৫,৪১০	১.২৯৬	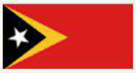
১৯	ফিলিপাইন (Philippines/الفلبين)	ম্যানিলা	পেসো	ইংরেজি, ফিলিপিনো	৩০০,০০০	১০৪.৯	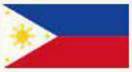
২০	কাজাখিস্তান (Kazakhstan/كازاكستان)	আলমাআতা	টেঙ্গোর টেঙ্গে	কাজাখ, রাশিয়ান প্রভৃতি	২,৭২৫,০০০	১৮.০৪	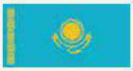
২১	কিরগিজিস্তান (Kyrgyzstan/كرغيزيا)	বিশবেক	সোম	কিরগিজ, রাশিয়ান	১৯৯,৯০০	৬.২০২	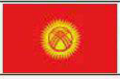
২২	তাজিকিস্তান (Tajikistan/تاجيكستان)	দুশানবে	রুবল	তাজিক, রাশিয়ান, ফার্সি	১৪৩,১০০	৮.৯২১	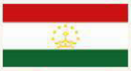
২৩	তুর্কমেনিস্তান (Turkmenistan/تركمانستان)	আশাখাবাদ	মানাত	তুর্কমান, রাশিয়ান	৪৯১,২১০	৫.৭৫৮	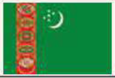
২৪	উজবেকিস্তান (Uzbekistan/أوزبكستان)	তাশখন্দ	সোম	উজবেক	৪৪৭,৪০০	৩২.৩৯	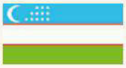
২৫	আজারবাইজান (Azerbaijan/آذربيجان)	বাকু	মানাত	আজারি	৮৬,৬০০	৯.৮৬২	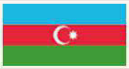

২৬	চীন (China/الصين)	বেইজিং	উয়ান	ম্যান্ডারিন	৯,৫৯৭,০০০	১,৩৮৬	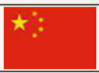
২৭	জাপান (Japan/اليابان)	টোকিও	ইয়েন	জাপানিজ	৩৭৭,৯৭২	১২৬.৮	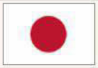
২৮	উত্তর কোরিয়া (North Korea/كوريا الشمالية)	পিয়ংইয়ং	ওয়োন	কোরিয়ান	১২০,৫৩৮	২৫.৪৯	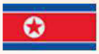
২৯	দক্ষিণ কোরিয়া (South Korea/كوريا الجنوبية)	সিউল	ওয়োন	কোরিয়ান	১০০,২১০	৫১.৪৭	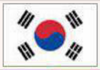
৩০	তাইওয়ান (Taiwan/تايوان) তাইপে	তাইওয়ান	ডলার	ম্যান্ডারিন	৩৬,১৯৩	২৩.৫৮	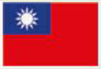
৩১	মঙ্গোলিয়া (Mongolia/منغوليا)	উলান বাটর	তুঘরিক	ম্যান্ডারিন	১,৫৬৪,০০০	৩.০৭৬	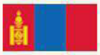
৩২	বাহরাইন (Bahrain/البحرين)	মানামা	দিনার	আরবি	৭৬৫.৩	১.৪৯৩	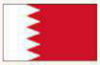
৩৩	ইরান (Iran/إيران)	তেহরান	রিয়াল	ফার্সি, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানি	১,৬৪৮,০০০	৮১.১৬	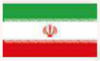
৩৪	ইরাক (Iraq/العراق)	বাগদাদ	দিনার	আরবি, কুর্দিশ	৪৩৭,০৭২	৩৮.২৭	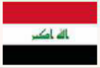
৩৫	ইসরাইল (Israel/إسرائيل)	জেরুজালেম	শেকেল	হিব্রু, আরবি	২০,৭৭০	৮.৭১২	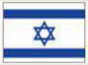

৩৬	জর্ডান (Jordan/أردن)	আম্মান	দিনার	আরবি	৮৯,৩৪২	৯.৭০২	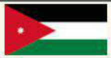
৩৭	কুয়েত (Kuwait/كويت)	কুয়েত সিটি	দিনার	আরবি	১৭,৮১৮	৪.১৩৭	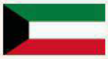
৩৮	লেবানন (Lebanon/لبنان)	বৈরুত	পাউন্ড	আরবি	১০,৪৫২	৬.০৮২	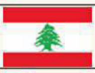
৩৯	ওমান (Oman/عُمان)	মাসকাট	ওমানি রিয়াল	আরবি	৩০৯,৫০১	৪.৬৩৬	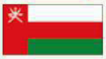
৪০	কাতার (Qatar/قطر)	দোহা	রিয়াল	আরবি	১১,৫৭১	২.৬৩৯	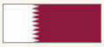
৪১	সৌদি আরব (Saudi Arabia/السعودية)	রিয়াদ	রিয়াল	আরবি	২,১৫০,০০০	৩২.৯৪	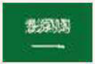
৪২	সিরিয়া (Syria/سورية)	দামেস্ক	পাউন্ড	সিরিয়াক	১৮৫,১৮০	১৮.২৭	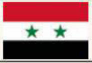
৪৩	ইয়েমেন (Yemen/اليمن)	সানা	রিয়াল	ইয়েমেনিট (জুডিও ইয়েমেনি এ্যারাবিক)	৫২৭,৯৬৮	২৮.২৫	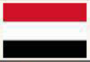
৪৪	সংযুক্ত আরব আমিরাত (United Arab Emirates (UAE)/ (الأمارات العربية المتحدة)	আবুধাবি	দিরহাম	আরবি	৮৩,৬০০	৯.৪	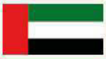
৪৫	তুরস্ক (Turkey/تركية)	আঙ্কারা	লিরা	টার্কি	৭৮৩,৫৬২	৭৯.৮১	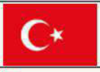
৪৬	ফিলিস্তিন (Palestine/فلسطين)	রামাল্লা	দিনার	আরবি	৬,২২০	৪.৮১৭ (২০১৬)	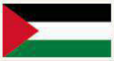

ইউরোপ মহাদেশের দেশসমূহ

ক্র. নং	দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম	ভাষা/প্রধান ভাষা	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা (২০১৭) (মিলিয়ন)	পতাকা
১	জার্মানি (Germany/ألمانيا)	বার্লিন	ইউরো	জার্মান	৩৫৭,৩৮৬	৮২.৫২	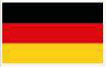
২	পোলান্ড (Poland/بولندا)	ওয়ারশ	জোলটি	পোলিশ	৩১২,৬৭৯	৩৭.৯৭	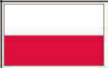
৩	হাঙ্গেরী (Hungary/هنغاريا)	বুদাপেস্ট	ফোরিন্ট	জার্মান, রোমানিয়ান	৯৩,০৩০	৯.৭৮১	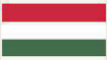
৪	রোমানিয়া (Romania/رومانيا)	বুখারেস্ট	লিউ	রোমানিয়ান	২৩৮,৩৯৭	১৯.৬৪	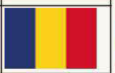
৫	বুলগেরিয়া (Bulgaria/بلغاريا)	সোফিয়া	লেভ	বুলগেরিয়ান	১১০,৯৯৪	৭.১০২	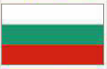
৬	স্লোভাকিয়া (Slovakia/سلوفاكيا)	ব্রাটিস্লাভা	ইউরো	স্লোভাক	৪৯,০৩৫	৫.৪৩৫	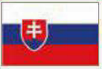
৭	ক্রোয়েশিয়া (Croatia/كرواتيا)	জাগরেব	কুনা	ক্রোটিয়ান	৫৬,৫৯৪	৪.১৫৪	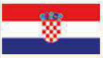
৮	স্লোভেনিয়া (Slovenia/سلوفينيا)	লুবজানা	তোলার	স্লোভেন	২০,২৭৩	২.০৬৬	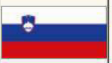

৯	চেক-প্রজাতন্ত্র (Czech Republic/التشيك)	প্রাগ	চেক করুনা	চেক	৭৮,৮৬৫	১০.৫৮	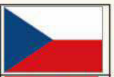
১০	আলবেনিয়া (Albania/ألبانية)	তিরানা	লেক	টস্ক, ঘেঘ	২৮,৭৪৮	২.৮৭৩	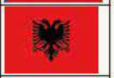
১১	বসনিয়া-হার্জেগোভিনা (Bosnia and Herzegovina/البوسنه والهرسك)	সারায়েবো ক্রোটিয়ান	নিউ দিনার	বোসনিয়ান,	৫১,১৯৭	৩.৫০৭	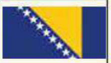
১২	মন্টিনিগ্রো (Montenegro/مونتينيغرو)	পোডগোরিকো	ইউরো	মন্টিনেগরিন, ক্রোটিয়ান	১৩,৮১২	০.৬২২৪৭১	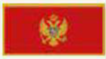
১৩	সার্বিয়া (Serbia/صربيا)	বেলগ্রেড	নিউ দিনার	সার্বিয়ান, রোমানিয়ান	৮৮,৩৬১	৭.০২২	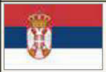
১৪	মেসিডোনিয়া (Macedonia /مكدونية)	স্কোপজে	দিনার	মেসিডোনিয়ান	২৫,৭১৩	২.০৭৪	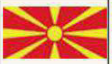
১৫	কসোভো (Kosovo/كوسوفو)	ক্রিস্টিনা	ইউরো	আলবেনিয়ান, সার্বিয়ান	১০,৯০৮	১.৮৩১	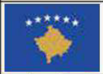
১৬	ফ্রান্স (France/فرنسا)	প্যারিস	ইউরো	ফ্রেন্স (ফরাসী)	৬৪৩,৮০১	৬৭.১২	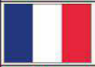
১৭	নরওয়ে (Norway/النرويج)	অসলো	নরজিয়ান ক্রোনা	নরওয়েইয়ান	৩৮৫,২০৩	৫.২৫৮	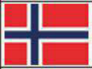
১৮	সুইডেন (Sweden/ السُوَيد)	স্টকহোম	ক্রোনা	সুইডিশ, রোমানিয়ান, ফিনিশ	৪৫০,২৯৫	৯.৯৯৫	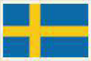

১৯	ডেনমার্ক (Denmark/الدنمارك)	কোপেন হেগেন	ডেনিশ ক্রোনা	ডেনিশ	৪২,৯২৪	৫.৭৭	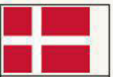
২০	ইংল্যান্ড (United Kingdom (UK) / المملكة المتحدة)	লন্ডন	পাউন্ড	ইংরেজি (মোট ১১টি আঞ্চলিক ভাষা)	২৪২,৪৯৫	৬৬.০২	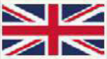
২১	রাশিয়া (Russia/روس/روسيا)	মস্কো	রুবল	রাশিয়ান	১৭,১০০,০০০	১৪৪.৫	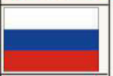
২২	অস্ট্রিয়া (Austria/النمسا)	ভিয়েনা	ইউরো	জার্মান, এ্যালেমানিক	৮৩,৮৭৯	৮.৭৭৩	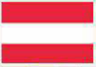
২৩	বেলজিয়াম (Belgium/بلجيكا)	ব্রাসেল্স	ইউরো	ডাচ, ফরাসী, জার্মান	৩০,৫২৮	১১.৩৫	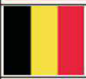
২৪	আন্ডোরা (Andorra/ أندورا)	এনডোরালা ভিলা	ইউরো	ক্যাটালোনিয়া	৪৬৭.৬	০.০৭৬৯৬৫	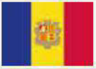
২৫	গ্রিস (Greece/اليونان)	এথেন্স	ইউরো	গ্রীক	১৩১,৯৫৭	১০.৭৭	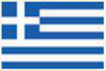
২৬	ফিনল্যান্ড (Finland/ فِنْلَنْدَا)	হেলসিংকি	ইউরো	ফিনিশ, সুইডিশ	৩৩৮,৪২৪	৫.৫০৩	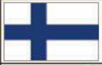
২৭	সাইপ্রাস (Cyprus/قبرص)	নিকোশিয়া	ইউরো	গ্রীক, টার্কি	৯,২৫১	১.১৮	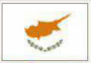
২৮	আইসল্যান্ড (Iceland/ آيسلندا)	রিকজাভিক	ক্রোনা	আইসল্যান্ডিক	১০৩,০০০	০.৩৩৭৭৮ (২০১৮)	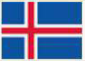

২৯	আয়ারল্যান্ড (Ireland/ جزيرة أيرلندا)	ডাবলিন	ইউরো	ইংলিশ, আইরিশ	৭০,২৭৩	৪.৭৮৪	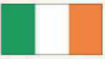
৩০	নেদারল্যান্ড/হল্যান্ড (Netherlands/هولندا)	আমস্টারডাম	ইউরো	প্যাপিয়ামিন্টো, ডাচ, ওয়েস্ট ফ্রিশিয়ান	৪১,৫৪৩		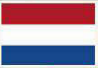
৩১	মাল্টা (Malta/مالطا)	ভালেটা	লিরা	ইংরেজি, মাল্টিজ	৩১৬	০.৪৬০২৯৭	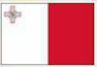
৩২	লুক্সেমবার্গ (Luxembourg/ لوكسمبورغ)	লুক্সেমবার্গ	ইউরো	ফরাসী, জার্মান, লুক্সেমবার্গ	২,৫৮৫	০.৫৯০৬৬৭	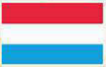
৩৩	মোনাকো (Monaco/ موناكو)	মোনাকো	মোনাকো ফ্রাঁ	ফরাসী	২০২ হেক্টর	০.০৩৮৬৯৫	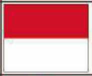
৩৪	পর্তুগাল (Portugal/ البرتغال)	লিসবন	ইউরো	পর্তুগিজ, স্প্যানিশ	৯২,২১২	১০.৩১	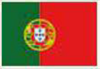
৩৫	সুইজারল্যান্ড (Switzerland/ سِويسْرَا)	বার্ন	ফ্রাঁ	ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, রোম্যান্শ	৪১,২৮৫	৪.৮২	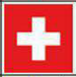
৩৬	ভ্যাটিকান সিটি (Vatican City/الفاتيكان)	ভ্যাটিকান সিটি	ইউরো		৪৪ হেক্টর	১ হাজার	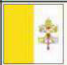
৩৭	ইতালি (Ital/ إيطاليا)	রোম	ইউরো	ইটালিয়ান	৩০১,৩৩৮	৬০.৫৯	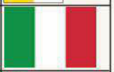
৩৮	বেলারুশ (Belarus/روسيا البيضاء/بيلاروس)	মিনস্ক	রুবল	বেলারুশিয়ান	২০৭,৫৯৫	৯.৫০৮	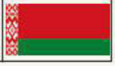

৩৯	ইউক্রেন (Ukraine/ أوكرانيا)	কিয়েভ	রিভনা	ইউক্রেনিয়ান	৬০৩,৬২৮	৪৪.৮৩	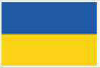
৪০	এস্তোনিয়া (Estonia/إستونيا)	তাল্লিন	ক্রোন	এস্তোনিয়ান	৪৫,২২৬	১.৩১৬	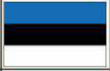
৪১	লাট্ভিয়া (Latvia/لاتفيا)	রিগা	লার্টস	লাটভিয়ান	৬৪,৫৫৯	১.৯৫	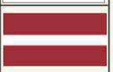
৪২	আর্মেনিয়া (Armenia/ آرمينيا)	ইয়েরেভান	ড্রাম	আর্মেনিয়ান	২৯,৭৪৩	২.৯৩	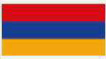
৪৩	জর্জিয়া (Georgia/جورجيا)	তিবলিস	লারি	জর্জিয়ান	১৫৩,৯১০	৩.৭১৭	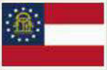
৪৪	লিথুনিয়া (Lithuania/ ليتوانية)	ভিনিয়াস	লিটাস	লিথুয়ানিয়ান	৬৫,৩০০	২.৮৪৮	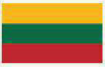
৪৫	মলদোভা (Moldova/ مولدوفا)	চিসিনিউ	লিউ	মলদোভান, রোমানিয়ান	৩৩,৮৪৬	৩.৫৫	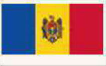
৪৬	সানমেরিনো (San Marino/ سان مارينو)	সানমেরিনো	ইতালীয় লিরা	ইটালিয়ান	৬১.২	০.০৩৩৪	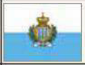
৪৭	লিচেনস্টেইন (ৼiechtenstein/ ليختنشتاين)	ভাদুজ	সুইচ ফ্রাঁ	জার্মান	১৬০	০.০৩৭৮১	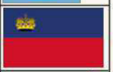
৪৮	স্পেন (Spain/إسبانيا/أندلس)	মাদ্রিদ	ইউরো	স্প্যানিশ	৫০৫,৯৯০	৪৬.৫৭	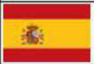

আফ্রিকা মহাদেশের দেশসমূহ

ক্র. নং	দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম	ভাষা/প্রধান ভাষা	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা (২০১৭) (মিলিয়ন)	পতাকা
১	মিশর (Egypt/مصر)	কায়রো	পিাউন্ড	আরবি	১,০১০,০০০	৯৭.৫৫	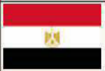
২	সুদান (Sudan/السودان)	খার্তুম	পাউন্ড/ ডলার	আরবি	১,৮৮৬,০০০	৪০.৫৩	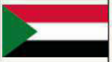
৩	দক্ষিণ সুদান (South Sudan/ جنوب السودان)	জুবা	পাউন্ড	ইংরেজি, ডিন্কা	৬১৯,৭৪৫	১২.৫৮	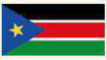
৪	লিবিয়া (Libya/ليبيا)	ত্রিপলি	দিনার	আরবি	১,৭৬০,০০০	৬.৩৭৫	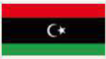
৫	তিউনিশিয়া (Tunisia/تونس)	তিউনিশ	দিনার	আরবি	১৬৩,৬১০	১১.৫৩	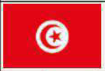
৬	আলজেরিয়া (Algeria/الجزائر)	আলজিয়ার্স	দিনার	আরবি	২,৩৮২,০০০	৪১.৩২	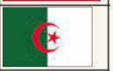
৭	ইরিত্রিয়া (Eritrea/إرتيرية)	আসমেরা	ইথিওপিয়ান বির	টিগ্রিনিয়া, ইংরেজি	১১৭,৫৯৮	৫.২২৬ (২০১৮)	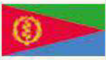
৮	ইথিওপিয়া (Ethiopia/إثيوبيا)	আদ্দিস আবাবা	বির	আম্হারিক	১,১০৪,০০০	১০৫	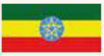
৯	জিবুতি (Djibouti/جيبوتي)	জিবুতি	ফ্রাঙ্ক	সোমালী, ফরাসী	২৩,২০০	০.৯৫৬৯৮৫	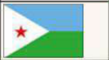
১০	সোমালিয়া (Somalia/الصومال)	মোগাদিসু	শিলিং	সোমালী, আরবি	৬৩৭,৬৫৫	১৪.৭৪	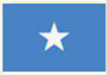
১১	কেনিয়া (Kenya/ كينيا)	নাইরোবি	কেনিয়া সিলিং	সাওয়াহিলী, ইংরেজি	৫৮২,৬৪৪	৪৯.৭	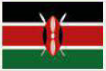
১২	তাঞ্জানিয়া (Tanzania/تنزانية)	দারুস সালাম	তাঞ্জানিয়া সিলিং	সাওয়াহিলী, ইংরেজি	৯৪৫,০৮৭	৫৭.৩১	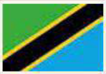
১৩	মোজাম্বিক (Mozambique/موزمبيق)	মাপুতো	মেটিকাল	পর্তুগিজ	৮০১,৫৯০	২৯.৬৭	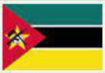
১৪	মাদাগাস্কার (Madagascar/مدغشقر)	আন্টা নানারিভো	এরিআরি	ফরাসী	৫৮৬,৮৮৪	২৫.৫৭	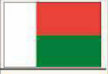
১৫	সোয়াজিল্যান্ড (Swaziland/سوازيلاند)	বাবেন	লিলাংগিনি	ইংরেজি, ফরাসী	১৭,৩৬৪	১.৩৬৭	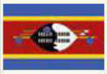
১৬	জিম্বাবুয়ে (Zimbabwe/زيمبابوي)	হারারে	জিম্বাবুয়ে ডলার	ইংরেজি, সোনা, শোথো প্রভৃতি	৩৯০,৭৫৭	১৬.৫৩	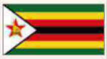
১৭	মালাউয়ী (Malawi/مالاوي)	লিলংউই	ওয়াচা	ইংরেজি, চিচিওয়া	১১৮,৪৮৪	১৮.৬২	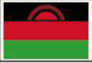
১৮	কমোরোস (Comoros islands/جزر كومورو)	মোরোনি	ফ্রাঁ	কমোরিয়ান, ফরাসী, আরবি	২,৬১২	০.৮৩২৩৪৭ (২০১৮)	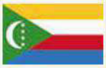

১৯	মৌরিশাস (Mauritius/ موريشيوس)	পোর্টলুইস	মৌরিতানিয়ান রুপি	ইংরেজি	২,০৪০	১.২৬৫	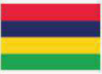
২০	সিসিলি (Seychelles/ سيشل)	ভিক্টোরিয়া	সিসিলি রুপি	ফরাসী, ইংরেজি, সিসিলিয়েস ক্রেওলি	৪৫৮.৪	০.০৯৫৮৪৩	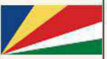
২১	মরক্কো (Morocco/المملكة المغربية/المغرب/مراقش)	রাবাত	দিরহাম	আরবি	৪৪৬,৫৫০	৩৫.৭৪	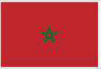
২২	মৌরিতানিয়া (Mauritania/موريتانية)	নৌয়াক্চট	ওগিয়া	আরবি	১,০৩০,০০০	৪.৪২	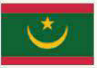
২৩	সেনেগাল (Senegal/السنغال)	ডাকার	ফ্রাঙ্ক সিএফএ	ফরাসী, ওলোফ	১৯৬,৮৩৯	১৫.৮৫	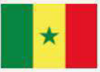
২৪	গিনি (Guinea/غينية)	কোনাক্রি	গায়ানিয়ান ফ্রাঙ্ক	ফরাসী	২৪৫,৮৫৭	১২.৭২	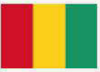
২৫	গিনি বিসাউ (Guinea-Bissã/غينية بيساو)	বিসাও	পেসো	পর্তুগিজ, ফরাসী, ইংরেজি	৩৬,১২৫	১.৮৬১	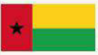
২৬	সিয়েরালিওন (Sierra Leone/سيراليون)	ফ্রিটাউন	লিওন	ইংরেজি	৭১,৭৪০	৭.৫৫৭	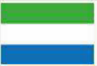
২৭	লাইবেরিয়া (Liberia/ليبيريا)	মনরোভিয়া	লাইবেরিয়ান ডলার	আইবেরিয়ান	১১১,৩৬৯	৪.৭৩২	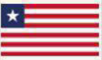

২৮	কোট ডি আইভরি (Cote d'Ivoire/ساحل العاج)	আবিদজান	অস্ট্রেলিয়ান ডলার	ফরাসী	৩২২,৪৬৩	২৪.২৯	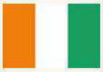
২৯	মালি (Mali/مالي)	বামাকো	ফ্রাঙ্ক সিএফএ	ফরাসী, আরবি	১,২৪১,০০০	১৮.৫৪	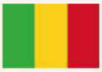
৩০	ঘানা (Ghana/غانه)	আক্রা	সেডি	ইংরেজি, আখান		২৮.৮৩	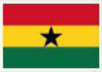
৩১	বুরকিনা ফাসো (Burkina Faso/بوركينافاسو)	উয়াগাড়ায়াগা	সিএফএফ্রাঁ	ফরাসী	২৭৪,২০০	১৯.১৯	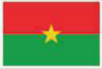
৩২	বেনিন (Benin/بنين)	পোর্টোনোভা	সিএফএফ্রাঁ	ফরাসী	১১৪,৭৬৩	১১.১৮	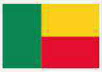
৩৩	টোগো (Togo/توغو)	লোম	ফ্রাঙ্ক সিএফএ	ফরাসী	৫৬,৭৮৫	৭.৭৯৪	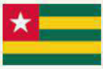
৩৪	জাম্বিয়া (Zambia/زامبيا)	লুসাকা	জাম্বিয়ান কওয়া	ইংরেজি	৭৫২,৬১৮	১৭.০৯	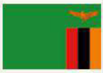
৩৫	কেপভার্দে (Cape Verde /الرأس الأخضر)	প্রেইরা	এসকুডো	পর্তুগিজ	৪,০৩৩	০.৫৫৩৩৩৫	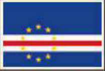
৩৬	নাইজেরিয়া (Nigeria/نيجيريا)	আবুজার	নায়েরা	হাওসা, ইগ্‌বো, ইয়োরুবা, ইংরেজি	৯২৩,৭৬৩	১৯০.৯	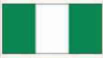

৩৭	নাইজার (Niger/النيجر)	নিয়ামি	ফ্রাঙ্ক সিএফএ	ফরাসী, সুঙ্গাই, আরবি প্রভৃতি	১,২৬৮,০০০	২১.৪৮	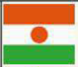
৩৮	চাদ (Chad/تشاد)	এজামেনা	সিএফএ ফ্রাঙ্ক	ফরাসী, আরবি	১,২৮৪,০০০	১৪.৯	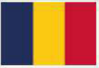
৩৯	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (Central African Republic (CAR) جمهورية أفريقيا الوسطى	বাঙুগুই	সিএফএ ফ্রাঙ্ক	শাঙ্গু, ফরাসী	৬২২,৯৮৪	৪.৬৫৯	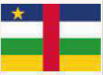
৪০	ক্যামেরুন (Cameroon/ الكاميرون)	ইয়াউন্ডি	সিএফএ ফ্রাঙ্ক	ফরাসী, ইংরেজি	৪৭৫,৪৪২	২৪.০৫	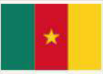
৪১	কঙ্গো (Congo/ الكونغو)	কিনশাসা	ফ্রাঙ্ক	ফরাসী	২,৩৪৫,০০০	৮১.৩৪	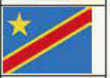
৪২	ইকুয়েটোরিয়াল গিনি (Equatorial Guinea/ غينيا الاستوائية)	মালাবো	ফ্রাঙ্ক সিএফএ	স্প্যানিশ, ফরাসী, পর্তুগিজ	২৮,০৫০	১.২৬৮	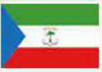
৪৩	গাম্বিয়া (Gambia/غامبية)	বানজুল	ডালাসি	মান্দিঙ্গো, ওলোফ, ইংরেজি	১১,২৯৫	১৭.০৯	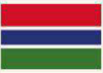
৪৪	উগান্ডা (Uganda/أوغندا)	কামপালা	উগান্ডা সিলিং	ইংরেজি, সাওয়াহিলী	২৪১,০৩৭	৪২.৪৬	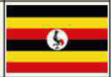
৪৫	রুয়ান্ডা (Rwanda/رواندا)	কিগালি	রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক	ইংরেজি, সাওয়াহিলী	২৬,৩৩৮	১২.২১	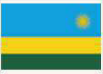

৪৬	বুরুন্ডি (Burundi/بوروندي)	বুজুমবুরা	বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক	কিরুন্দী, ফরাসী, ইংরেজি	২৭,৮৩৪	১০.৪৬	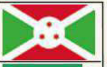
৪৭	গ্যাবন (Gabon/الغابون)	লিব্রেভিল	ফ্রাঙ্ক সিএফএ	ফরাসী, ফাংগ্	২৬৭,৬৬৮	২.০২৫	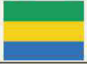
৪৮	সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি (Sao Tome and Principe/ساو تومي وبرينسيب)	সাওটোমে	দোবরা	পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ফরাসী, ইংরেজি	১,০০১	০.২০৪৩২৭	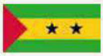
৪৯	এঙ্গোলা (Angola/ أنغولا)	লুয়ান্ডা	খোয়াঞ্জা	পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ফরাসী, ইংরেজি	১,২৪৭,০০০	২৯.৭৮	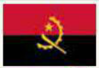
৫০	নামিবিয়া (Namibia/ ناميبيا)	উইন্ডহোক	নামিবিয়ান ডলার	হেরিও, কোয়াঙ্গালি	৮২৫,৪১৯	২.৫৩৪	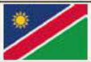
৫১	দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa/ جنوب أفريقيا)	কেপটাউন	রান্ড	আফ্রিকান, ইংরেজি, শোথো, জুলু প্রভৃতি	১,২২০,০০০	৫৬.৭২	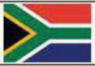
৫২	বোতসোয়ানা (Botswana/بوتسوانا)	গ্যাবরন	পুলা	ইংরেজি, তোসওয়ানা	৬০০,৩৭০	২.২৯২	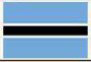
৫৩	লেসোথো (Lesotho/ليسوتو)	মাসেরো	লর	ইংরেজি, শোথো	৩০,৩৫৫	২.২৩৩	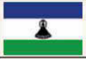
৫৪	পশ্চিম সাহারা[১] (West sahara/ الصحراء الغربي)	আল-উয়ুন	মরক্কীয় দিরহাম	আরবি, স্প্যানিশ	২৬৬,০০০	০.৫১৩ (২০০৯)	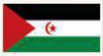
৫৫	মায়ূতী[২] (Mayotte/مايوت)	মামুদঝু	ইউরো	ফরাসী, মালাগাছি	৩৭৪	০.২৩৫১৩২ (২০১৬)	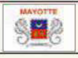

১. পশ্চিম সাহারা দেশটি মরক্কোর দখলে।

২. মায়ূতী আফ্রিকার মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার-এর মধ্যবর্তী একটি দ্বীপদেশ। দেশটি ফ্রান্সের অধীনস্থ।

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশসমূহ

ক্র. নং	দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম	ভাষা/প্রধান ভাষা	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) (২০১৭)	পতাকা
১	যুক্তরাষ্ট্র (United States of America (USA)/ (الوِلَايَات المُتَّحِدَة الأَمرِيكِيَّة)	ওয়াশিংটন ডিসি	ডলার	ইংরেজি, স্প্যানিশ, চাইনিজ	৯,৮৩৪,০০০	৩২৫.৭	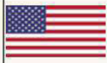
২	কানাডা (Canada/ كَنَدَا)	অটোয়া	ডলার	ইংরেজি, ফরাসী	৯,৯৮৫,০০০	৩৬.৭১	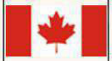
৩	মেক্সিকো (Mexico/ المكسيك)	মেক্সিকো সিটি	নিউ পেসো	স্প্যানিশ, নাহুইয়াতি, মিক্সটেক	১,৯৭৩,০০০	১২৯.২	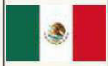
৪	এল সালভাদর (El Salvador/السلفادور)	সান সালভাদর	কোলেন	স্প্যানিশ	২১,০৪১	৬.৩৭৮	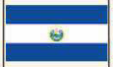
৫	কোস্টারিকা (Costa Rica/كوستاريكا)	সানজোসে	কোলেন	স্প্যানিশ	৫১,১০০	৪.৯৫ (২০১৮)	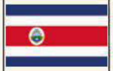
৬	গুয়াতেমালা (Guatemala/غواتيمالا)	গুয়াতেমালা সিটি	কুয়েটজাল	স্প্যানিশ	১০৮,৮৮৮	১৬.৯১	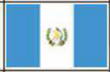
৭	নিকারাগুয়া (Nicaragua/ نيكاراغوا)	মানাগুয়া	করডোবা	স্প্যানিশ	১২৯,৯৯৯	৬.২১৮	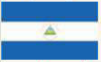
৮	পানামা (Panama/بَنَمَا)	পানামা সিটি	বালবোয়া	স্প্যানিশ	৭৫,৫১৭	৪.০৯৯	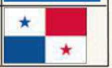
৯	হন্ডুরাস (Honduras/هندوراس)	তেগুচিগালপা	লেম্পিরা	স্প্যানিশ	১১২,০৯০	৯.২৬৫	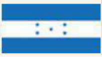
১০	এন্টিগুয়া ও বারবুডা (Antigua and Barbuda/ أنتيغوا وباربودا)	সেন্ট জোহন্স	ডলার	ইংরেজি	৪৪০	০.১০২০১২	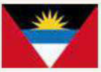
১১	কিউবা (Cuba/ كوبا)	হাভানা	পেসো	স্প্যানিশ	১০৯,৮৮৪	১১.৪৮	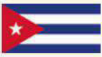
১২	গ্রানাডা (Grenada/غرينادا)	সেন্ট জর্জেস	ডলার	স্প্যানিশ	৩৪৮.৫	০.১০৭৮২৫	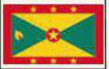
১৩	জ্যামাইকা (Jamaica/جامايكا)	কিংসটন	ডলার	জ্যামাইক্যান প্যাটোয়েজ	১০,৯৯২	২.৮৯	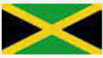
১৪	ডোমিনিকা (Dominica/دومينيكا)	রোসিয়াউ	ডলার	ইংরেজি	৭৫০	০.০৭৩৯২৫	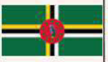
১৫	ডোমিনিকান রিপাবলিক (Dominican Republic/ جُمْهُورِيَّة الدُّومِنِيكَان)	সেন্ট ডোমিনিগো	পেসো	স্প্যানিশ	৪৮,৪৪২	১০.৭৭	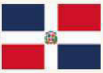
১৬	ত্রিনিদাদ ও টোবাগো (Trinidad and Tobago/ ترينيداد وتوباغو)	পোর্ট অব স্পেন	ডলার	ইংরেজি, চাইনিজ	৫,১৩১	১.৩৬৯	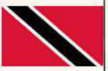
১৭	বারবাডোজ (Barbados/ باربادوس)	ব্রিজটাউন	ডলার	ইংরেজি	৪৩১	০.২৮৫৭১৯	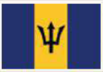

১৮	বাহামা দ্বীপপুঞ্জ (Bahamas/باهاماس)	নাসাউ	ডলার	ইংরেজি	১৩,৮৭৮	০.৩৯৫৩৬১	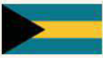
১৯	বেলিজ (Belize/بليز)	বেলমোপান	ডলার	ইংরেজি	২২,৯৬৫	০.৩৭৪৬৮১	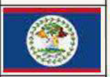
২০	সেন্ট কিট্স এ্যান্ড নেভিস (saint kitts and nevis /سانت كيتس ونيفيس)	বাসটেরে	ডলার	ইংরেজি	২৬৯.৪	০.০৫৫৩৪৫	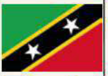
২১	সেন্ট ভিনসেন্ট (Saint Vincent/سانت فينسنت)	কিংসটাউন	ডলার	ইংরেজি, স্প্যানিশ	৩৮৯	০.১০৯৮৯৭	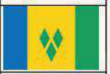
২২	সেন্ট লুসিয়া (Saint Lucia/سانت لوسيا)	কাস্ট্রি	ডলার	ইংরেজি, ফরাসী	৬১৭	০.১৭৮৮৪৪	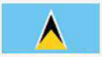
২৩	হাইতি (Haiti/هايتي)	পোর্ট অব প্রিন্স	গুর্দে	ফরাসী, হাইতিয়ান ক্রেওলি	২৭,৭৫০	১০.৯৮	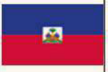
২৪	কাইম্যান দ্বীপপুঞ্জ[১] (Cayman Islands/جزر كايمان)	জর্জটাউন	কিড	ইংরেজি	২৬৪.২	০.০৬১৫৫৯	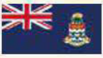
২৫	পোর্টোরিকো (Puerto Rico/بورتوريكو)	সানজুয়ান	ডলার	স্প্যানিশ, ইংরেজি	৫৬৫৬.৮৫	৩.৬৮ (২০১৮)	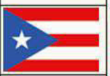
২৬	বারমুডা[২] (Bermuda/برمودا)	হ্যামিলটন	ডলার	ইংরেজি	৫৩.২	০.০৬৫৪৪১	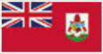

১. যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ দেশ। ২. যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ দেশ।

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশসমূহ

ক্র. নং	দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম	ভাষা/প্রধান ভাষা	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) (২০১৭)	পতাকা
১	আর্জেন্টিনা (Argentina/الأرجنتين)	বুয়েন্স আয়ার্স	পেসো	স্প্যানিশ	২,৭৮০,০০০	৪৪.২৭	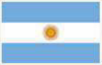
২	ইকুয়েডর (Ecuador/الإكوادور)	কুইটো	সুক্রা	স্প্যানিশ	২৮৩,৫৬০	১৬.৬২	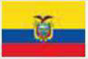
৩	উরুগুয়ে (Uruguay/الأوروغواي)	মন্টিভিডিও	পেসো	স্প্যানিশ	১৭৬,২১৫	৩.৪৫৭	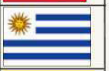
৪	কলম্বিয়া (Colombia/كولومبيا)	বগোটা	পেসো	স্প্যানিশ	১,১৪২,০০০	৪৯.০৭	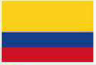
৫	গায়ানা (Guyana/غيانا)	জর্জটাউন	ডলার	ইংরেজি	২১৪,৯৬৯	২৮.৮৩	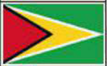
৬	চিলি (Chile/تشيلي)	সান্টিয়াগো	পেসো	স্প্যানিশ	৭৫৬,১০২	১৮.০৫	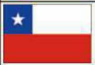
৭	প্যারাগুয়ে (Paraguay/باراغواي)	আসুনসিওন	ওয়ারনি	স্প্যানিশ, গোয়ারানি	৪০৬,৭৫২	৬.৮১১	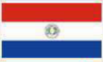
৮	বলিভিয়া (Bolivia/بوليفيا)	লাপাজ	বলিভিয়ানো	স্প্যানিশ, আইমারা, গোয়ারানি	১,০৯৯,০০০	১১.০৫	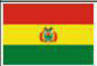
৯	ব্রাজিল (Brazil/البَرازِيل)	কারাকাস ব্রাসিলিয়া	রিয়েল	পর্তুগিজ	৮,৫১৬,০০০	২০৯.৩	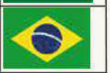

১০	ভেনিজুয়েলা (Venezuela/فنزويلا)		বলিভার	স্প্যানিশ	৯১৬,৪৪৫	৩১.৯৮	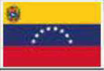
১১	সুরিনাম (Suriname/سورينام)	পারামারিবো	গিল্ডার	সুরিনামিজ ডাচ	১৬৩,৮২১	০.৫৬৩৪০২	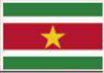
১২	পেরু (Peru/بيرو)	লিমা	ইন্টি	স্প্যানিশ, আইমারা, কিউচুয়া	১,২৮৫,০০০	৩২.১৭	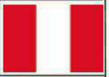
১৩	ফ্রেঞ্চগায়ানা (French Guiana/غويانا الفرنسية)	কেনি	ইউরো	ফরাসী	৮৩,৫৩৪	০.২৭৪১৫৩	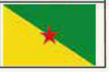

ওশেনিয়া/অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দেশসমূহ

ক্র. নং	দেশের নাম	রাজধানী	মুদ্রার নাম	ভাষা/প্রধান ভাষা	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন) (২০১৭)	পতাকা
১	অস্ট্রেলিয়া (Australia/أستراليا)	ক্যানবেরা	ডলার	ইংরেজি	৭,৬৯২,০০০	২৪.৬	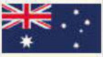
২	নিউজিল্যান্ড (New Zealand/نيوزيلندا)	ওয়েলিংটন	ডলার	ইংরেজি, মাওরি, নিউজিল্যান্ড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ	২৬৮,০২১	৪.৭৯৪	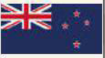
৩	ফজি/ফিজি আইসল্যান্ড (Fiji/فيجي)	সুভা	ডলার	ইংরেজি, ফিজিয়ান, হিন্দী	১৮,২৭৫	০.৯০৫৫০২	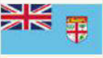
৪	টোঙ্গা (Tonga/تونغا)	নুকুয়ালোফা	ফ্রাঙ্ক	টোঙ্গান	৭৪৮.৫	০.১০৮০২	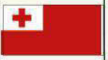
৫	পাপুয়া নিউগিনি (Papua New Guinea/ بابوا غينيا الجديدة)	পোর্ট মোসাবি	কিনা	ইংরেজি, টক পিসিন, হিরিমোতু	৪৬২,৮৪০	৮.২৫১	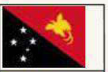
৬	পশ্চিম সামোয়া (Samoa/ ساموا)	আপিয়া	তালা	সামোয়ান, ইংরেজি	২,৮৪১	০.১৯৬৪৪	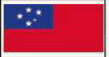
৭	নাউরু (Naur̃/ناورو)	ইয়েরেন	ডলার	নাউরুয়ান	২০.৯৮	০.০১৩৬৪৯	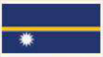
৮	মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ (Marshall Islands/جزر مارشال)	মাজুরো	মার্কিন ডলার	মার্শালিজ, ইংরেজি	১৮১.৩	০.০৫৩১২৭	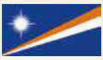
৯	টুভ্যালু (Tuvalu/توفالو)	ফুনাফুটি	ডলার	টুভালিয়ান	২৫.৯	০.০১১১৯২	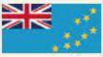
১০	মাইক্রোনেশিয়া (Micronesia/ميكرونيسيا)	পালিকির	মার্কিন ডলার	মাইক্রোনেশিয়ান, মার্শালিজ, ইংরেজি	৭০২	১.০৫৫৪৪	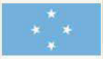
১১	সলোমন দ্বীপপুঞ্জ (Solomon Islands/ جزر سليمان)	হোনিয়ারা	ডলার	ইংরেজি	২৮,৩৯৯	০.৬১১৩৪৩	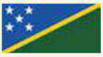
১২	পালাউ (Palau/بالاو)	নেগারুলমার্ড	মার্কিন ডলার	পালাউয়ান, ইংরেজি	৪৫৮.৪	০.০২১৭২৯	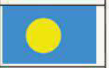
১৩	ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া (French Polynesia/بولينزيا الفرنسية)	পাপেট্টি	সিএফএ ফ্রাঙ্ক	ফরাসী	৪,১৬৭	০.২৮৩০০৭	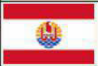
১৪	ভানুয়াতু (Vanuatu/فانواتو)	ভিলা	ভাটু	ইংরেজি, ফরাসী, বিস্‌লামা	১২,১৯৯	০.২৭৬২৪৪	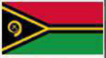
১৫	কিরিবাতি (Kiribati/كيريباتي)	তারাওয়া	ডলার	গিল্‌বার্টিজ	৮১১	০.১১৬৩৯৮	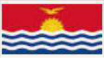

বিভিন্ন দেশের সাবেক ও বর্তমান নাম

ক্রমিক নং	বর্তমান নাম	সাবেক নাম	যে মহাদেশে অবস্থিত
১	বাংলাদেশ	পূর্ব পাকিস্তান	এশিয়া
২	মিয়ানমার	বার্মা	এশিয়া
৩	মালয়েশিয়া	মালয়	এশিয়া
৪	ইরাক	মেসোপটেমিয়া	এশিয়া
৫	থাইল্যান্ড	শ্যাম (Siam)	এশিয়া
৬	শ্রীলঙ্কা	সিংহল/সেইলন (Ceylon)	এশিয়া
৭	ইরান	পারস্য	এশিয়া
৮	ইন্দোনেশিয়া	ডাচ ইষ্ট ইন্ডিয়া	এশিয়া
৯	জাপান	নিপ্পন	এশিয়া
১০	চীন (উত্তর)	ক্যাথে	এশিয়া
১১	চীন (দক্ষিণ)	মাঙ্গি	এশিয়া
১২	তাইওয়ান	ফরমোসা	এশিয়া
১৩	কম্বোডিয়া	কম্পুচিয়া	এশিয়া
১৪	কোরিয়া (উত্তর ও দক্ষিণ)	চোসোন	এশিয়া
১৪	পোল্যান্ড	পোলাস্কা	ইউরোপ
১৫	নেদারল্যান্ড	হল্যান্ড	ইউরোপ
১৬	সুইজারল্যান্ড	হেলভেসিয়া	ইউরোপ
১৭	জার্মানি	ডায়েচল্যান্ড	ইউরোপ
১৮	ফ্রান্স	গল	ইউরোপ
১৯	চেক-প্রজাতন্ত্র ও শ্লোভাকিয়া	বহিমিয়া, মোরাভিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া	ইউরোপ
২০	মলদোভা	মোলদাভিয়া	ইউরোপ
২১	জাম্বিয়া	উত্তর রোডেসিয়া	আফ্রিকা
২২	জিম্বাবুয়ে	দক্ষিণ রোডেসিয়া	আফ্রিকা
২৩	ইথিওপিয়া	আবিসিনিয়া	আফ্রিকা
২৪	ঘানা	গোল্ড কোষ্ট	আফ্রিকা

ক্রমিক নং	বর্তমান নাম	সাবেক নাম	যে মহাদেশে অবস্থিত
২৫	লেসেথো	বাসুতোল্যান্ড	আফ্রিকা
২৬	বোতসোয়ানা	বসুয়ানাল্যান্ড	আফ্রিকা
২৭	মাদাগাস্কার	মালাগাছি	আফ্রিকা
২৮	এঙ্গোলা	পশ্চিম আফ্রিকা	আফ্রিকা
২৯	তাঞ্জানিয়া	তাঞ্জানিকা এ্যান্ড জাঞ্জিবার	আফ্রিকা
৩০	রিপাবলিক কঙ্গো	জায়ারে	আফ্রিকা
৩১	নামিবিয়া	দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা	আফ্রিকা
৩২	বুরকিনা ফাঁসো	আপার ভোল্টা	আফ্রিকা
৩৩	লিবিয়া	ত্রিপলিতানিয়া	আফ্রিকা
৩৪	আলজেরিয়া	নামিদিয়া	আফ্রিকা
৩৫	মালি	সুদানিজ রিপাবলিক	আফ্রিকা
৩৬	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র ও চাদ	ফ্রান্স ইকুয়েটোরিয়াল আফ্রিকা	আফ্রিকা
৩৭	রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডি	জার্মান ইস্ট আফ্রিকা	আফ্রিকা
৩৮	সুরিনাম	ডাচ গায়ানা	দক্ষিণ আমেরিকা
৩৯	গায়ানা	ব্রিটিশ গায়ানা	দক্ষিণ আমেরিকা
৪০	টুভ্যালু	এলিস দ্বীপপুঞ্জ	ওশেনিয়া/অস্ট্রেলিয়া

বিশ্ব ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি

মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৩টি মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১. অবিচল অবস্থিতি মতবাদ (Steady State Theory[১])। এই মতবাদে বলা হয়েছে, গ্যালাক্সি (Galaxy[২]/مَجَرَّة) তথা জ্যোতিষ্কমণ্ডলগুলো তৈরি হচ্ছে এবং একই সময়ে মহাবিশ্বের সীমান্ত পার হয়ে চলে যাচ্ছে। সুতরাং প্রতি একক স্তুপে গ্যালাক্সিগুলোর সংখ্যা স্থির। তারা মনে করেন মহাবিশ্ব যখন সম্প্রসারিত হয় তখন বিভিন্ন আন্ত গ্যালাক্সির স্থানে অবিরতভাবে শক্তি থেকে নতুন নতুন বস্তু তৈরি হয়। এর ফলে বিভিন্ন গ্যালাক্সির মধ্যে সতত সম্প্রসারণশীল ফাঁকগুলো পূর্ণ হতে থাকে। সুতরাং মহাবিশ্বের সর্বত্র অপেক্ষিকভাবে ঐক্যবহুল, অপরিবর্তনীয়, শুরু বা শেষ বিহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। (তথ্যসূত্র: প্রাকৃতিক পরিবেশ)

---

[১] উচ্চারণ: স্টেডি স্টেট্ থিয়রি।

[২] গ্যালাক্সি বা জ্যোতিষ্কমণ্ডল বলতে বুঝায় আকাশের কোটি কোটি নক্ষত্র, ধুলিকণা ও বিশাল বাষ্পকুণ্ড নিয়ে জ্যোতিমণ্ডলীর যে দল গঠিত হয় তাকে। একে নক্ষত্রজগৎও বলা হয়।

মন্তব্য: এটি একটি অস্পষ্ট মতবাদ। তদুপরি এ মতবাদে সবকিছুকে একই ও অপরিবর্তনীয় বলা হয়েছে যা পরবর্তীতে সমর্থন লাভ করেনি। গ্যালাক্সিগুলো যদি কমবেশি সুবিন্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছে বলে প্রমাণিত হত তাহলে অবিচল অবস্থিতি মতবাদ সমর্থিত হত।

২. স্পন্দনশীল মতবাদ (Pulsating Theory[১])। এই মতবাদে বলা হয়েছে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমিকভাবে এটি সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বলা হয়েছে, একটি স্পন্দনশীল বা আন্দোলিত মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছিল, যা আদিম মৌলিক অবয়বের বিস্ফোরণ থেকে মাঝে মাঝে সম্প্রসারিত হয় এবং এরপর সঙ্কুচিত হয়ে আবার বিস্ফোরিত হচ্ছে এবং অনন্তকাল থেকে দীর্ঘচক্রের এই প্রক্রিয়া চলে আসছে। অবিচল অবস্থিতি মতবাদে বলা হয়েছে, সম্প্রসারণ অব্যাহতভাবে চলছে। আর স্পন্দনশীল মতবাদে বলা হয়েছে, সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ একই সময়ে চলছে।

৩. মহাবিস্ফোরণ মতবাদ (Big Bang Explosion Theory[২]) বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট হল কোনো ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে একটি বিশেষ মুহূর্তে মহাবিশ্বের উদ্ভব। যদিও এ মতবাদেরও বিরোধিতা রয়েছে, তবে মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে এটি বর্তমানে জোরালো ও অধিক সমর্থিত মত হিসেবে প্রচারিত হচ্ছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এই তত্ত্বকেই প্রায় সত্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ লেমিটার (George Lemaitre জন্ম ১৮৯৪, মৃত্যু ১৯৬৬ খৃ.) এই মতবাদটি উপস্থাপন করেন এবং পরবর্তিতে ইউক্রেনের বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো (George Gamow জন্ম ১৯০৪ মৃত্যু ১৯৬৮ খৃ.) এই তত্ত্বকে বিস্তৃত করেন। ইতিপূর্বে জার্মান বিজ্ঞানী আইনস্টাইন (১৮৭৯–১৯৫৫ খৃ.) বলেছিলেন, মহাবিশ্বের বস্তুগুলো একটি বিশেষ উৎস থেকে জন্ম নিচ্ছে এবং তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। আবার ডি, সিটার বলেছিলেন, এক অদৃশ্য মহাজগতিক শক্তি নীহারিকাগুলোকে[৩] জোর করে একদিকে ঠেলে দিচ্ছে। এরপর ডি, সিটার ও আইনস্টাইনের বক্তব্যের সমন্বয় সাধন করে জর্জ লেমিটার ক্রমবর্ধমান মহাবিশ্ব সম্বন্ধে তার মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে বলা হয়, যদি বিশ্বের সমস্ত শক্তি একইভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সুদূরতম অতীতে কোন এক সময় বিশ্বের যাবতীয় শক্তি ও বস্তু একটা বিশাল অখণ্ড বস্তুতে অবস্থান করছিল। জর্জ লেমিটার এই অখণ্ড বস্তুপিণ্ডকে আদি অণু (Primeval Atom[৪]) নামে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, আনুমানিক ১৫০০ কোটি কিলোমিটার ব্যাসের এই বিশাল আদি অণুটাই আজ থেকে ১৫০০ বা ২০০০ কোটি বছর আগে এক মহা বিস্ফোরণে ফেটে অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়।[৫] তার মতে অণুর মধ্যকার বস্তু ও বস্তুবিরোধী শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই এই বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের পর থেকেই বিচ্ছিন্ন বস্তুকণাগুলো বর্তমান মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে এবং বস্তুকণাগুলো ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। সেই সম্প্রসারণ আজও অব্যাহত রয়েছে। (তথ্যসূত্র: প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উইকিপিডিয়া)

---

১. উচ্চারণ: পাল্‌সেটিং থিয়রি।
২. উচ্চারণ: বিগ ব্যাঙ এক্‌স্‌প্লোসন্‌ থিয়রি।
৩. নীহারিকা হল আকাশে দৃশ্যমান নক্ষত্রসদৃশ বহুবিস্তৃত বাষ্পীয় পদার্থ (যা অনেকটা মেঘের মত)।
৪. উচ্চারণ: প্রাইমিভ্যাল অ্যাটম্‌।
৫. বলা হয় ১ সেকেন্ডের চেয়ে অনেক কম সময়ে এই বিস্ফোরণ সম্পন্ন হয়।

এতক্ষণ মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মতামত উল্লেখ করা হল। মহাবিশ্ব সৃষ্টির এক দেড় হাজার কোটি বছর পরে অর্থাৎ, ৪৫৬ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে সৌরজগত সৃষ্টি হয়। তারপর আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে পৃথিবীর উৎপত্তি বা জন্ম হয় প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক পৃথিবী পৃষ্ঠের উল্কাখণ্ড পরীক্ষা পূর্বক দাবি করেছেন, আমাদের এই গ্রহ তথা পৃথিবী সম্ভবত ৪৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে বর্তমান আকৃতিতে পৌছে। এর আগের হিসাব অনুযায়ী ধারণা করা হয়েছিল, এর বয়স ৪৫৩ কোটি ৭০ লক্ষ বছর।

এতক্ষণ মহাবিশ্ব, সৌরজগত ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কিছু মতামত তুলে ধরা হল। এবার কুরআন হাদীছে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা নিম্নে পেশ করা হল।

কুরআন হাদীছে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে বক্তব্য

কুরআন হাদীছে 'মহাবিশ্ব' কথাটির উল্লেখ নেই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী– কথা দু'টোর উল্লেখ রয়েছে। তবে কুরআন হাদীছে বর্ণিত 'আকাশমণ্ডলী'-র পরিধি বিজ্ঞানীদের সংজ্ঞায়িত 'মহাবিশ্ব'-এর পরিধির চেয়ে কম নয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সম্বন্ধে কুরআন হাদীছে উল্লেখিত বিশেষ ৪টি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি।

১. **আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একসময় রুদ্ধ ছিল, পরে খুলে দেয়া হয়।** এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا.

অর্থাৎ, যারা কুফরী করে তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিলিত ছিল অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করেছি। (সূরা আম্বিয়া: ৩০)

এ আয়াতে উল্লেখিত رَتْقًا শব্দের অর্থ 'মিলিত হওয়া' এবং فَتَقْ শব্দের অর্থ পৃথক হওয়া। (মুফরাদাত) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে, رتق এবং فتق -এর অর্থ যথাক্রমে রুদ্ধ থাকা এবং খুলে দেয়া। এক সময়ে আসমান রুদ্ধ ছিল অর্থাৎ, বৃষ্টি হত না এবং জমিনও রুদ্ধ ছিল অর্থাৎ, ফসল উৎপন্ন হত না। আল্লাহ তা'আলা আসমানকে খুলে দিয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং জমিনকে খুলে দিয়ে ফসল উৎপন্ন করান। (মাআরিফুল কুরআন) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ছাড়াও আরও অনেক সাহাবী থেকে এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। যদিও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে এ আয়াতে উল্লেখিত رتق এবং فتق শব্দদ্বয়ের উপরোক্ত বিশেষ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, তবে শব্দদ্বয় শর্তমুক্ত (مطلق) হওয়ায় এবং তার সঙ্গে বিশেষ কোন কয়েদ (قيد) তথা শর্ত-বন্ধন যুক্ত না থাকার কারণে অর্থে ব্যাপকতারও অবকাশ রয়েছে। সেমতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের ব্যাখ্যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না– এমন অন্য কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করাতেও অসুবিধে নেই। পূর্বে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে নীহারিকার কথা উল্লেখিত হয়েছে, যার মাঝে মহাবিশ্ব যুক্ত বা সমন্বিত ছিল তথা মহাবিশ্ব একত্রিত ছিল, পৃথক ছিল না। পরে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় সবকিছু পৃথক হয়। এখন যদি বলা হয়, আয়াতে এই যুক্ত তথা সমন্বিত থাকা ও পৃথক হওয়ার অর্থের দিকে ইংগিত রয়েছে, তাহলে তা তাফসীরের মূলনীতি বিরোধী হবে না। তবে এটাকে কুরআনের ইংগিত থেকে অর্জিত বলা যাবে, কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা আদৌ নয়।

২. বর্তমান আকারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে সেগুলো ধুম্রবৎ উপকরণ রূপে ছিল। সূরা হা-মীম-সাজদার ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ.

অর্থাৎ, তারপর তিনি আকাশের (সৃষ্টির) প্রতি মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধুম্রবৎ।

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. (رواه أحمد فى المسند ١٦١٣٢ والترمذي ٣١٠٩ وابن بطة في الإبانة الكبرى ٢٥٣٦ وابن حبان في صحيحه ٦١٤١)

অর্থাৎ, আবূ রযীন জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক তার মাখলূক সৃষ্টি করার পূর্বে কোথায় ছিলেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনি ছিলেন মেঘের মধ্যে, যার নিচেও শূন্যতা, উপরেও শূন্যতা। (হাদীছটি কারও কারও মতে জয়ীফ হলেও ইবনে হিব্বানের মতে জয়ীফ নয়।)

ইবনুল আছীর, ইসহাক ইবনে রাহুইয়াহ ও কাজী নাসিরুদ্দীন ইবনুল মুনীর প্রমুখ এ হাদীছে উল্লেখিত عماء শব্দের অর্থে বলেছেন, এর অর্থ মেঘ । তবে সে মেঘ কেমন ছিল তা আমাদের জানা নেই। যাহোক এ ব্যাখ্যাও সৃষ্টির পূর্বে সবকিছু নীহারিকা আকারে থাকার ধারণাকে সমর্থন করে।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ৬ দিনে সৃষ্টি করা হয়। এ প্রসঙ্গে সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদার ৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الآية.

অর্থাৎ, আল্লাহ! যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এই দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে[১] সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হন।[২]

সূরা হা-মীম-সাজদায় ৯ ও ১০ নং আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে,

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠)

অর্থাৎ, তুমি বল, তোমরা কি এমন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করছ যিনি যমীনকে দু'দিনে[৩] সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করছ? তিনিই জগতসমূহের প্রতিপালক। (৯) আর তিনি

---

[১] ৬ দিন অর্থাৎ, এই দুনিয়ার ৬ দিনের সমপরিমাণ সময়। ৬ দিন বলতে ছয়টা সময় তথা ছয়টা কালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা يوم বলতে مطلق الوقت (সময়)ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ৬ দিন বলতে ছয় হাজার বছরও হতে পারে। কারণ সূরা হজ্জের ৪৭ নং আয়াত ও সূরা আলিফ-লাম-মীম এর ৫ নং আয়াতে আল্লাহর নিকটের এক দিনকে আমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। তাফসীরে রূহুল মাআনীতে ৬ দিন সম্বন্ধে এই তিন ধরনের ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

[২] ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি আরও বর্ণিত হয়েছে, সূরা আ'রাফ: ৫৪, সূরা ইউনুস: ৩, সূরা ফুরক্বান: ৫৯ ও সূরা হাদীদ: ৪ আয়াতসমূহে।

[৩] অর্থাৎ, দু'দিনের সমপরিমাণ সময়ে।

পৃথিবীতে – তার উপরিভাগে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা এবং তাতে (জমিনে) রেখেছেন উপকারী জিনিস, আর তাতে তার অধিবাসীদের জন্য খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন চারদিনে ।[১] পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্য। (১০)

উপরোক্ত দুই স্থানের বর্ণনার সারকথা হল– আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও পৃথিবীতে অবস্থিত গাছ-পালা, তরুলতা, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি চার দিনে সৃষ্টি করেছেন আর আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মোট ছয় দিনে।[২]

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াতের বক্তব্য লক্ষ করুন:

সূরা হা-মীম সাজদার ৯, ১০ ও ১১ নং আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে–

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. (١١)

অর্থাৎ, তুমি বল, তোমরা কি এমন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করছ যিনি যমীনকে দু'দিনে[৩] সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করছ? তিনিই জগতসমূহের প্রতিপালক। (৯) আর তিনি পৃথিবীতে – তার উপরিভাগে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা এবং তাতে (জমিনে) রেখেছেন উপকারী জিনিস, আর তাতে তার অধিবাসীদের জন্য খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন চারদিনে।[৪] পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্য। (১০) অতঃপর তিনি আসমানের (সৃষ্টির) প্রতি মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধুম্রবৎ, অতঃপর তিনি তাকে এবং জমিনকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। উভয়ে আরয করল, আমরা আসলাম স্বেচ্ছায়।[৫] (১১)

---

[১] এখানে চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিন সহ; পৃথক চার দিন নয়। অর্থাৎ দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং দু'দিনে যমীনে ফল-ফলাদি, খাদ্যশষ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। স্মর্তব্য যে, এখানে চার দিন দ্বারা চার দিনের সমপরিমাণ সময় বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

[২] তাফসীরকারকগণ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এক মুহূর্তেই সবকিছু করতে সক্ষম, তা সত্ত্বেও আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করার কারণ হল মানুষকে তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে সব কাজ সমাধা করার নীতি শিক্ষা দেয়া। (তাফসীরে আবিস সুঊদ, বয়ানুল কুরআন প্রভৃতি)

[৩] অর্থাৎ, দু'দিনের সমপরিমাণ সময়ে।

[৪] এখানে চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। অর্থাৎ দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং দু'দিনে যমীনে ফল-ফলাদি, খাদ্যশষ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। স্মর্তব্য যে, এখানে চার দিন দ্বারা চার দিনের সমপরিমাণ সময় বুঝানো হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন ও ফাওয়ায়েদে উছমানী)

[৫] কোন কোন তাফসীরবিদের মতে আসমান ও পৃথিবীকে এ আদেশ দেয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা রূপক অর্থে বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহর প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। আবার কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, কোন রূপক অর্থে নয় বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে সম্বোধন বুঝার মত চেতনা অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়াব দেয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করেছিলেন।

সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ الآية.

অর্থাৎ, তিনিই এমন সত্তা, যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দেন। আর সেগুলোকে যথাযথভাবে সপ্তাকাশে পরিণত করেন।

সূরা নাযিআত-এর ২৭ থেকে ৩০ নং আয়াতসমূহে বলা হয়েছে,

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠)

অর্থাৎ, আচ্ছা তোমাদেরকে (দ্বিতীয়বার) সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না কি আসমান? আল্লাহ যেটা সৃষ্টি করেছেন। (২৭) তিনি তার ছাদ উচ্চ করেছেন এবং তাকে সঠিক ও সুবিন্যস্ত বানিয়েছেন। (২৮) এবং তার রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার সূর্যালোক (দিন) কে প্রকাশ করেছেন। (২৯) এবং এরপর যমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন। (৩০)

এবার লক্ষ করুন সূরা হা-মীম সাজদাহ ও সূরা বাকারার উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাযিআত আয়াতসমূহ থেকে এর বিপরীত জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পর পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। এ বাহ্যদৃষ্ট বিরোধের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধুম্রপুঞ্জের আকারে আসমানের উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, খাদ্য ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর আকাশের তরল ধুম্রপুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এ বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। (বয়ানুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআন)

মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব এবং কুরআন-হাদীছে বর্ণিত তথ্যাবলি: একটি পর্যালোচনা

এতক্ষণ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন হাদীছে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হল। পূর্বে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এসব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, শুধুমাত্র মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে বর্ণিত মহাবিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে সবকিছু নীহারিকা (বা বলা যায় ধুম্রপুঞ্জ) আকারে থাকার বিষয়টিতে কুরআন হাদীছে বর্ণিত তথ্যাদির আনুকূল্য পাওয়া যায়। তাছাড়া মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে বর্ণিত অন্য অনেক কিছুর সঙ্গেই কুরআন হাদীছে বর্ণিত তথ্যাদির অমিল রয়েছে কিংবা কুরআন হাদীছ সে ব্যাপারে নীরব। যেমন:

(১) মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে যে বিশাল আদি কণার কথা বর্ণিত হয়েছে কুরআন-হাদীছ সে ব্যাপারে নীরব।
(২) মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে যে বিস্ফোরণের কথা বর্ণিত হয়েছে কুরআন-হাদীছ সে ব্যাপারে নীরব।
(৩) মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে ১ সেকেন্ডের চেয়ে ক্ষুদ্রতম সময়ে ঘটিত একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এর বিপরীত কুরআন হাদীছে ৬ দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

(৪) মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বে প্রথমবারে শুধু মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, অনেক বিজ্ঞানীর বর্ণনামতে সৌরজগত ও পৃথিবী শত শত কোটি বছর পরে সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন হাদীছে আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবী সবকিছুর সৃষ্টি ৬ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে।
(৫) বিজ্ঞানীদের বর্ণনামতে মহাবিশ্ব (যার মধ্যে আমাদের বর্ণনামতে আকাশমণ্ডলীও অন্তর্ভুক্ত) আগে সৃষ্টি হয়েছে, পৃথিবী পরে সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনের বর্ণনামতে আগে পৃথিবী পরে সপ্ত আকাশের সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব এখনও একটি বিতর্কিত মতবাদ, অবিসংবাদিত নয়। তদুপরি এটা এমন কোন বিষয়ও নয় যা চাক্ষুস সত্য বলে প্রমাণিত। তাই কুরআন হাদীছে বর্ণিত তথ্যাবলীকে দুমড়ে মুচড়ে হলেও মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা কুরআনের তাফসীর ও হাদীছের ব্যাখ্যার বিশুদ্ধ-নীতি-সম্মত নয়। বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য বা তত্ত্ব কেবল চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে কিংবা চাক্ষুসভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হলেই সে আলোকে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। আর বলা বাহুল্য, চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীনভাবে কিংবা চাক্ষুসভাবে সত্য বলে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য বা তত্ত্বই কুরআন-হাদীছের বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না– আজ পর্যন্ত হয়ওনি, কখনও হবেও না। কারণ কুরআন হাদীছের স্পষ্ট বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন সত্য। আর সত্যে সত্যে কখনও সংঘর্ষ হতে পারে না।

পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন

পৃথিবী গোলাকার, তবে সুগোল বা সঠিক গোলক নয়, বরং এর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ কিছুটা চাপা (উত্তর দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিক বেশি চাপা।) এবং মধ্য ভাগ কিছুটা স্ফীত। উত্তর মেরু অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে নিচু। দক্ষিণ মেরু অঞ্চল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উঁচু ও পর্বতাকীর্ণ। পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস ৭৯২৬ মাইল। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বিন্দু সংযোজক ব্যাস ৭৮৯৯ মাইল। এর বৃহত্তম পরিধি ২৪৮৬০ মাইল এবং ক্ষেত্রফল প্রায় ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল।

পৃথিবীর গতি ও ঘূর্ণন তত্ত্ব

পৃথিবীর দুই প্রকার গতি রয়েছে। যথা:

(ক) আহ্নিক গতি। পৃথিবী নিজ মেরু রেখার চারদিকে চব্বিশ ঘন্টায় একবার আবর্তন করে। এই আবর্তনকে বলা হয় আহ্নিক গতি। 'অহ্ন' কথাটার অর্থ হল দিন, এর থেকেই আহ্নিক নামকরণ হয়েছে।

আহ্নিক গতির ফলে দিন রাতের সৃষ্টি হয় এবং বায়ু ও সমুদ্র স্রোতের গতি প্রভাবিত হয়। উত্তর গোলার্ধে বায়ু ও সমুদ্র স্রোত ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। পৃথিবীর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। আবর্তনের সময় পৃথিবীর গতি থাকে (নিরক্ষরেখায়) প্রতি মিনিটে ২৬.৮৩ কি.মি. যা প্রতি ঘণ্টায় ১৬০৯.৮০ কিলোমিটার। কারও কারও মতে ১৬৫০ কি. মি.। নিরক্ষ রেখার পরিধি সবচেয়ে বেশি বিধায় নিরক্ষ রেখার উত্তর ও দক্ষিণে এই

গতির বেগ ক্রমশ কমতে থাকে। একেবারে মেরুতে গিয়ে এই গতি প্রায় শূন্যের কাছাকাছি হয়। নিম্নের চিত্রে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

মেরু থেকে আধা মাইল দূরে কোন বৃত্ত আঁকা হলে তার পরিধি ৩ মাইলের চেয়ে অধিক হবে না। তার প্রতি ডিগ্রীর দৈর্ঘ হবে মাত্র ৪৫ ফুটের কাছাকাছি। (فلکیات جدیدہ) তবে এই ৩ মাইলের পরিধিরও ঘুরতে বিষুব রেখার পরিধির সমান ২৪ ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ, মেরুর দিকে ঘূর্ণনের গতি কম। বিষুব রেখায় ঘূর্ণনের গতিবেগ সবচেয়ে অধিক। তারপর ক্রমান্বয়ে মেরুর দিকে ঘূর্ণনের গতিবেগ কম। একেবারে মেরুতে কোনই গতি নেই। নিম্নের চিত্রে আবর্তনের সময় পৃথিবীর গতি কোন্ অক্ষে কত থাকে তা লক্ষ করুন।

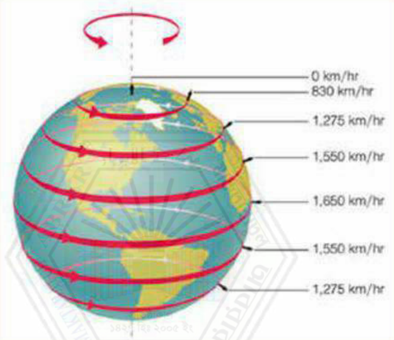

চিত্র নং .২৫ – আবর্তনের সময় পৃথিবীর গতি কোন অক্ষে কত থাকে

(খ) বার্ষিক গতি। পৃথিবী মেরু রেখার চারদিকে একটা নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই পরিক্রমণকে বলা হয় বার্ষিক গতি। এই পরিক্রমণের পথকে বলা হয় পৃথিবীর কক্ষপথ। এই কক্ষপথের দৈর্ঘ ৫৮ কোটি মাইল। এই কক্ষপথটি বৃত্তাকার নয় বরং উপবৃত্তাকার। সূর্য এই উপবৃত্তাকার পথের নাভিতে অবস্থান করছে। ফলে পৃথিবী কখনও সূর্যের কাছে আবার কখনও দূরে অবস্থান করে।

যেহেতু সাধারণ হিসেবে ৩৬৫ দিনে এক বছর ধরা হয়। আর পৃথিবীর বার্ষিক গতি তার চেয়ে প্রায় ৬ ঘণ্টা বেশি। তাই প্রতি ৪ বছর পরপর ১ দিন বাড়িয়ে ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করা হয়। এই বছরকে বলা হয় অধিবর্ষ বা লিপইয়ার (Leap-year)। লিপইয়ারের ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত একদিন বাড়িয়ে লিপইয়ারের ফেব্রুয়ারী মাসের সংখ্যা ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিন করা হয়। এভাবে সৌর বছরের সাথে সাধারণ হিসেবের বছরের সমতা রক্ষা করা হয়।

বার্ষিক গতির ফলে দিন রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ঋতুর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর পরিক্রমণের বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১৮ মাইল তথা প্রায় ২৯ কিলোমিটার (আবর্তনের বেগের প্রায় ৬০ গুণ)।

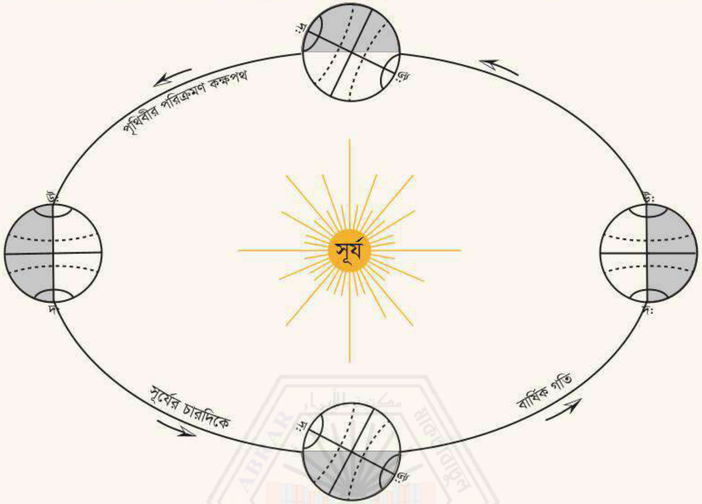

চিত্র নং ২৬ – পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির চিত্র

পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্বন্ধে কুরআন হাদীছের বক্তব্য

পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্বন্ধে (চাই আহ্নিক গতি হোক চাই বার্ষিক গতি হোক) কুরআন হাদীছে স্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই। সূরা ইয়াছীনের ৪০ নং আয়াতে যা বলা হয়েছে তা লক্ষ করুন:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

অর্থাৎ, সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া আর রাতও দিনের পূর্বে আসতে পারে না। আর (তাদের) প্রত্যেকেই এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করছে।

এখানে যে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা তার চক্রে তথা কক্ষপথে সন্তরণ করছে, এ 'প্রত্যেকটা' দ্বারা মহাবিশ্বের সবকিছু বুঝানো হয়নি, যা বর্ণনা-কাঠামো (سِیاق) থেকে খুবই স্পষ্ট। বরং পূর্বে উল্লেখিত সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যেকটা বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে জালালাইনেও বলা হয়েছে, كُلٌّ শব্দের তানবীন مضاف اليه এর বদল। অর্থাৎ, كل الشمس والقمر অতএব প্রত্যেকটা অর্থ হল সূর্য ও চন্দ্রের প্রত্যেকটা। সুতরাং এখানকার বর্ণনার ভিত্তিতে সূর্য ও চন্দ্র তাদের কক্ষপথে চলে বলে প্রমাণিত হয়, কিন্তু পৃথিবী তার কক্ষপথে চলে তা প্রমাণিত হয় না। আর সূর্য হোক বা চন্দ্র (তেমনি পৃথিবী) কোনটার অক্ষে ঘূর্ণনের কথা এখানে বলাই হয়নি। হযরত মাওলানা তাকী উছমানী সাহেবও 'উলূমুল কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন, পৃথিবীর ঘোরা সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়,

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে কুরআন হাদীছ ইতিবাচক নেতিবাচক কিছুই বলেনি। যদিও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত বলছেন যে, পৃথিবীর উভয় রকম গতি রয়েছে। কেননা তারা পৃথিবী থেকে পাঠানো মহাকাশযান ও কৃত্রিম উপগ্রহের শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ও ক্যামেরার সাহায্যে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর পরিক্রমণ এবং পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্পষ্ট চিত্র দেখতে পেয়েছেন বলে দাবি করেন।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, আসমানে যে বাইতুল মা'মূর রয়েছে –যাতে সর্বক্ষণ ফেরেশতাগণ তওয়াফ করেন– সেই বাইতুল মা'মূর সম্বন্ধে তাবারানী কাবীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটা মারফূ' হাদীছে এসেছে যে, সেটা হুবহু বাইতুল্লাহ (কা'বা শরীফ) বরাবর অবস্থিত। এমনকি এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতে এসেছে لو سقط لسقط عليه অর্থাৎ, সেটি (বাইতুল মা'মূর) যদি পতিত হয় তাহলে বাইতুল্লাহর (কা'বা শরীফের) উপর পতিত হবে। এ রেওয়ায়েত থেকে কেউ প্রমাণিত করার চেষ্টা করতে পারেন যে, তাহলে পৃথিবী ঘোরে না। কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি অত্যন্ত বেশি জয়ীফ। হাইছামী مجمع الزوائد গ্রন্থে বলেছেন, وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك. অর্থাৎ, এর বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনে বিশ্‌র মাতরূক। উকাইলী বলেছেন, এ রেওয়ায়েতের কোন ভিত্তি নেই। আল্লামা সুয়ূতীও রেওয়ায়েতটিকে জয়ীফ বলেছেন। বাইতুল মা'মূর বাইতুল্লাহ বরাবর হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকেও বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, أن البيت المعمور بحيال الكعبة। অর্থাৎ, বাইতুল মা'মূর কা'বা বরাবর। এ রেওয়ায়েতও জয়ীফ। উকাইলী, ইবনে আদী, হাকিম, ইবনুল জাওযী, যাহাবী, ইবনে হাজার, সুয়ূতী ও মুনাবী প্রমুখ বহু মুহাদ্দিস স্পষ্টত এ হাদীছকে জয়ীফ বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আবূ হুরাইরার এই রেওয়ায়েতের কোন ভিত্তি নেই।[১] তাই এসব রেওয়ায়েত দ্বারা পৃথিবী না ঘোরার পক্ষে ইস্তিদলাল (দলীল প্রদান) করা যাবে না। এ ব্যাপারে কোন মারফূ হাদীছ নেই বা সহীহ নেই। কোন মাওকূফ হাদীছ (সাহাবীর উক্তি) কোন সহীহ সনদে উল্লেখিত হয়ে থাকলেও সেটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনামুক্ত নয়। তদুপরি بحيال শব্দের অর্থ 'বিপরীতে'ও হতে পারে। অর্থাৎ, বুঝানো হয়েছে দুনিয়ার কা'বার বিপরীতে আসমানেও কা'বা রয়েছে, সেটি হল বাইতুল মা'মূর। দুনিয়ার কা'বাতে যেমন তওয়াফ হয় বাইতুল মা'মূরেও তওয়াফ হয়। সেখানে তাওয়াফ করেন ফেরেশতাগণ। তাহলে بحيال الكعبة কথাটির অর্থ হুবহু কা'বা বরাবর– তাও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। তাই কোনোভাবে এরূপ রেওয়ায়েতের দ্বারা পৃথিবী না ঘোরার পক্ষে ইস্তিদলাল (দলীল প্রদান) করার অবকাশ নেই।

দিন ও রাত ছোট/বড় কেন হয়

পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, পৃথিবী তার বার্ষিক পরিক্রমণের বিভিন্ন পর্যায়ে কখনও সূর্যের কাছে আসে কখন দূরে সরে যায়। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে দিন ও রাতের পরিমাণ ছোট বড় হয়ে থাকে। পৃথিবী তার কক্ষতলে ৬৬.৫০ (সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রী) হেলে আবর্তন করতে থাকে। ফলে পৃথিবীর সব অঞ্চলে সব সময় সূর্যরশ্মি সমভাবে পতিত হয় না। এভাবে আবর্তন করতে করতে ২১ মার্চ সূর্য বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে বছরের এই দিন পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরত্বে অবস্থান করে। এই দিন উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সব জায়গায় সূর্যের আলো সমান পৌঁছয়। ফলে ২১ মার্চ পৃথিবীর সব জায়গায় দিন ও রাতের দৈর্ঘ সমান (১২ ঘণ্টা) হয়। এসময় উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল। এজন্য সূর্যের এই অবস্থানকে বাসন্তী বিষুব বা মহাবিষুব বলে।

---

[১] হতে পারে এটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। أخبار مكة কিতাবে আযরকী বলেছেন, بيتا في السماء بحيال الكعبة বিষয়ক বর্ণনা তাওরাতে পাওয়া যায়।

২১ মার্চের পর পৃথিবী যতই তার কক্ষপথে অগ্রসর হতে থাকে ততই পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকতে থাকে অর্থাৎ, আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে থাকে সূর্য ক্রমশ উত্তর গোলার্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলে উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ ক্রমশ বৃদ্ধি এবং রাতের দৈর্ঘ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। অপরপক্ষে দক্ষিণ গোলার্ধে তার বিপরীত অবস্থা হয়। এভাবে সূর্য উত্তর গোলার্ধের দিকে অগ্রসর হতে হতে ২১ জুন কর্কট রেখা বরাবর উপনীত হয়। ঐ দিন সূর্য কর্কট রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত (১৪ ঘণ্টা দিন, ১০ ঘণ্টা রাত) হয়। অপর পক্ষে দক্ষিণ গোলার্ধে তার বিপরীত অবস্থা হয়। ২১ জুন সূর্য উত্তরায়ণের শেষ সীমায় পৌঁছয় বলে এই দিনকে উত্তর অয়নান্ত দিবস বা কর্কট সংক্রান্তি বলে। একে মহাবিষুব, বসন্তকালীন বিষুব, মার্চ বিষুব ইত্যাদি নামেও পরিচয় দেয়া হয়। বিষুব রেখার উত্তরে যখন মহাবিষুব দক্ষিণে তখন জলবিষুব।

২১ জুনের পর থেকে সূর্য আবার ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরতে থাকে। এভাবে সরতে সরতে ২৩/২২ সেপ্টেম্বর নিরক্ষ রেখা বরাবর উপনীত হয়। ফলে ২৩ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সব জায়গায় দিন ও রাতের দৈর্ঘ সমান (১২ ঘণ্টা) হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল হয় বিধায় সূর্যের এই অবস্থানকে শারদীয় বিষুব বা শারদীয় জলবিষুব বলে। এক হেমন্তকালীন বিষুব, সেপ্টেম্বর বিষুবও বলা হয়।

২৩/২২ সেপ্টেম্বরের পর সূর্য নিরক্ষ রেখা থেকে দক্ষিণে সরতে সরতে ২২/২৩ ডিসেম্বর মকর ক্রান্তি বরাবর উপনীত হয়। ঐই দিন মকর ক্রান্তিতে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হয় বিধায় ঐ দিন দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত (১৪ ঘণ্টা দিন, ১০ ঘণ্টা রাত) হয়। আর উত্তর গোলার্ধে তার বিপরীত অবস্থা হয়। ২২ ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণায়ণের শেষ সীমায় পৌঁছায় বলে এই দিনকে দক্ষিণ অয়নান্ত দিবস বা মকর সংক্রান্তি বলে।

কর্কট ক্রান্তি থেকে মকর ক্রান্তি পর্যন্ত আবার মকর ক্রান্তি থেকে কর্কট ক্রান্তি পর্যন্ত সূর্যের এই গমনাগমনের কিছু আভাষ কুরআনে কারীমের একটি আয়াতের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। সূরা ইয়াসীনের ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.

অর্থাৎ, সূর্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলে। এটা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ। (সূরা ইয়াছীন: ৩৮)

এ আয়াতে مُسْتَقَرّ বা অবস্থানস্থল বলে কী বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কারও কারও উক্তিমতে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন গন্তব্য তথা কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তিকে বুঝানো হয়েছে। অন্য অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, অবস্থান-স্থল বলতে ব্যাপক অর্থে সূর্যের ভ্রমণের শেষ সীমাকে বুঝানো হয়েছে। চাই তা স্থানগত হোক, বা কালগত। স্থানগত ভ্রমণের সীমা সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) কর্তৃক

বর্ণিত হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে গিয়ে সাজদা করে এবং পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে পুনরায় সে ভ্রমণ শুরু করে। উক্ত হাদীছে এ-ও উল্লেখিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত কথার পর এ আয়াতটি প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। আর কালগত ভ্রমণের শেষ বলতে দৈনিক ভ্রমণের শেষও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার বার্ষিক ভ্রমণের শেষও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার দুনিয়ার জীবনের শেষ অর্থাৎ কেয়ামত দিবসও উদ্দেশ্য হতে পারে। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই।

সারকথা–

* ২১ মার্চ ও ২৩/২২ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সবস্থানে দিন রাত সমান। (১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত)

* ২১ জুন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন ও সবচেয়ে ছোট রাত। (১৪ ঘণ্টা দিন, ১০ ঘণ্টা রাত)। দক্ষিণ গোলার্ধে তার বিপরীত।

* ২২/২৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন ও সবচেয়ে ছোট রাত (১৪ ঘণ্টা দিন, ১০ ঘণ্টা রাত)। উত্তর গোলার্ধে তার বিপরীত।

ঋতু, অয়নান্ত ও বিষুব সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী

উত্তর গোলার্ধে

- মে, জুন, জুলাই গ্রীষ্মকাল;
- ২১ জুন উত্তর অয়নান্ত।
- আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর শরৎকাল;
- ২৩ সেপ্টেম্বর শারদী বিষুব।
- নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি শীতকাল;
- ২২ ডিসেম্বর দক্ষিণ অয়নান্ত।
- ফেব্রুয়ারি, মার্চ এপ্রিল বসন্তকাল;
- ২১ মার্চ বাসন্তী বিষুব।

দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা।

দুটো পর্যালোচনা

১. ২১ মার্চ যখন উত্তর গোলার্ধে মহাবিষুব ঘটে অর্থাৎ যে মুহূর্তে সূর্য বিষুব রেখা অতিক্রম করে তা সব দেশে এবং এক দেশেরও সব অঞ্চলে একই মুহূর্তে ঘটে না। কোথাও ১৯ মার্চ, কোথাও ২০ মার্চের সন্ধায় বা আরও কিছু পরে এবং কোথাও ২১ মার্চ সকালে ঘটে থাকে। এমনিভাবে সেপ্টেম্বর মাসেও ঘটে থাকে। অর্থাৎ, বিষুবীয় মাস দুটো ঠিক থাকে, কিন্তু তারিখটি সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক থাকে না।

২. পূর্বে ২১ মার্চ ও ২৩/২২ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সবস্থানে দিন রাত সমান হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রায় সমান হওয়া, পূরোপুরি সমান হওয়া নয়। যেমন: ২১ মার্চ বাংলাদেশে সূর্যোদয় হয় ৬টা ২ মিনিটে আর সূর্যাস্ত হয় ৬টা ১০ মিনিটে। তাহলে প্রকৃত পক্ষে দিন হল ১২ ঘণ্টা ৮ মিনিট আর রাত হল ১১ ঘণ্টা ৫২ মিনিট। এমনিভাবে ২২ সেপ্টেম্বর সূর্যোদয় হয় ৫টা ৪৭ মিনিটে আর সূর্যাস্ত হয় ৫টা ৫৪ মিনিটে। তাহলে প্রকৃত পক্ষে দিন হল ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট আর রাত হল ১১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট।

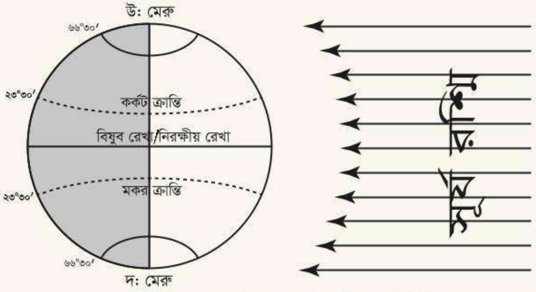
উ: মেরু
৬৬°৩০'
২৩°৩০'
কর্কট ক্রান্তি
বিষুব রেখা/নিরক্ষীয় রেখা
মকর ক্রান্তি
২৩°৩০'
৬৬°৩০'
দ: মেরু
সূর্য রশ্মি

চিত্র নং ২৭– ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর পৃথিবীর উপর সূর্যরশ্মি পতনের দৃশ্য

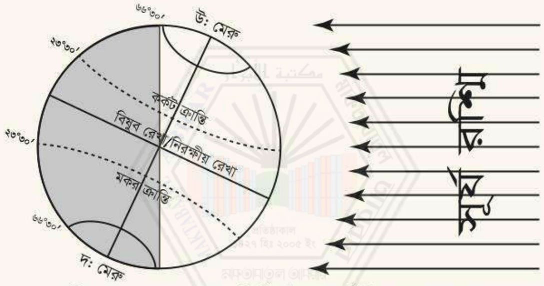
৬৬°৩০'
উ: মেরু
২৩°৩০'
কর্কট ক্রান্তি
বিষুব রেখা/নিরক্ষীয় রেখা
২৩°৩০'
মকর ক্রান্তি
৬৬°৩০'
দ: মেরু
সূর্য রশ্মি

চিত্র নং ২৮– ২১ জুন পৃথিবীর উপর সূর্যরশ্মি পতনের দৃশ্য

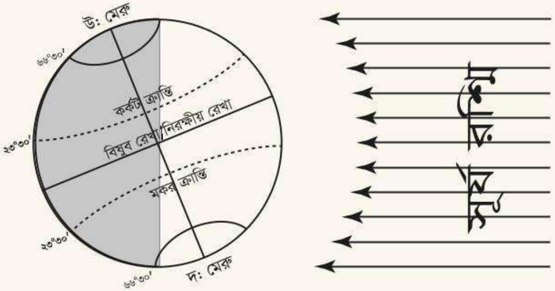
উ: মেরু
৬৬°৩০'
কর্কট ক্রান্তি
বিষুব রেখা/নিরক্ষীয় রেখা
২৩°৩০'
মকর ক্রান্তি
২৩°৩০'
৬৬°৩০'
দ: মেরু
সূর্য রশ্মি

চিত্র নং ২৯– ২২ ডিসেম্বর পৃথিবীর উপর সূর্যরশ্মি পতনের দৃশ্য

শীত-গ্রীষ্ম ও মৌসুমের পরিবর্তন-তত্ত্ব

পৃথিবী তার কক্ষতলে ৬৬.৫০° (সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রী) হেলে আবর্তন করতে থাকে। ফলে পৃথিবীর সব সময় সব অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সমভাবে পতিত হয় না। একারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় এবং মৌসুমের পরিবর্তন ঘটে।

পৃথিবীর বার্ষিক পরিক্রমণের এক পর্যায়ে ২২ শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধের মকর ক্রান্তি বরাবর সূর্য অবস্থান করে। এ সময় মকর ক্রান্তির রেখায় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে মকর ক্রান্তি অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রীষ্মকাল হয়। এর বিপরীত এ সময়ে উত্তর গোলার্ধে সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে পতিত হয়, ফলে এসময় উত্তর গোলার্ধে তাপ হ্রাস পায় এবং এ অঞ্চলে শীতকাল হয়। ঐ দিনের পূর্বের দেড়মাস এবং পরের দেড়মাস এই সর্বমোট ৩ মাস দক্ষিণ গোলার্ধে (যেমন অষ্ট্রেলিয়ায়) গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধে শীতকাল হয়।

২২ ডিসেম্বরের পর সূর্যের উত্তরায়ন শুরু হয়। এভাবে উত্তরায়ন হতে হতে ২১ মার্চ সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ সময় উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে অবস্থান করে। এ দিনের পূর্বের দেড় মাস এবং পরের দেড় মাস সর্বমোট ৩ মাস দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল এবং উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল হয়। উল্লেখ্য, শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকাল আসার মাঝে বসন্তকালের আগমন ঘটে থাকে এবং গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকাল আসার মাঝে শরৎকালের আগমন ঘটে থাকে।

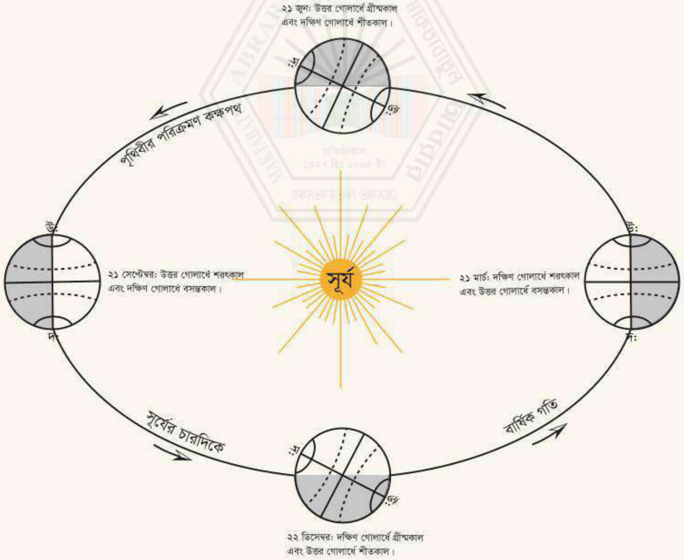
২১ জুন: উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল
এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল।
পৃথিবীর পরিক্রমণ কক্ষপথ
উ:
দ:
২১ সেপ্টেম্বর: উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল
এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।
সূর্য
২১ মার্চ: দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল
এবং উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল।
সূর্যের চারদিকে
বার্ষিক গতি
২২ ডিসেম্বর: দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল
এবং উত্তর গোলার্ধে শীতকাল।

চিত্র নং ৩০ – মৌসুমের পরিবর্তনে পৃথিবীর অবস্থান

২১ জুন সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ দিন। এ দিন সূর্য কর্কটক্রান্তি বরাবর অবস্থান করে। এ সময় কর্কটক্রান্তির রেখায় সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে কর্কটক্রান্তি অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রীষ্মকাল হয়। এর বিপরীত এ সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে পতিত হয়, ফলে এসময় দক্ষিণ গোলার্ধে তাপ হ্রাস পায় এবং এ অঞ্চলে শীতকাল হয়। ঐ দিনের পূর্বের দেড়মাস এবং পরের দেড়মাস এই সর্বমোট ৩ মাস উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে (যেমন অষ্ট্রেলিয়ায়) শীতকাল হয়।

২২ জুন থেকে সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়। এভাবে সূর্য দক্ষিণে অগ্রসর হতে হতে ২৩ সেপ্টেম্বর আবার নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ সময় উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে অবস্থান করে। এ দিনের পূর্বের দেড় মাস এবং পরের দেড় মাস সর্বমোট ৩ মাস উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল হয়। উল্লেখ্য, গ্রীষ্মকাল থেকে শীতকাল আসার মাঝে শরৎকালের আগমন ঘটে থাকে এবং শীতকাল থেকে গ্রীষ্মকাল আসার মাঝে বসন্তকালের আগমন ঘটে থাকে।

পূর্বের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য হওয়ার মূল কারণ সূর্যের নিকটবর্তী হওয়া ও দূরবর্তী হওয়া। এই সূর্যই হচ্ছে তাপের উৎস। ফলে সূর্য নিকটবর্তী থাকলে তাপ বেশি হয় এবং দূরবর্তী থাকলে তাপ কম হয়। কিন্তু সূর্যের তাপের উৎস কী? এ পর্যায়ে একটি হাদীছের বিষয়ে কিছু কথা উল্লেখ করতে হয়।

সূর্যের তাপের উৎস ও একটি হাদীছ

সূর্য সম্পূর্ণ গ্যাসীয় পদার্থে তৈরি। এর ৭৪% হাইড্রোজেন, ২৫% হিলিয়াম ও ১% অন্যান্য পদার্থ। এই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি হল সূর্যের জ্বালানী। এগুলোই সূর্যের তাপের উৎস। এ পর্যায়ে একটি হাদীছের কথা উল্লেখ করতে হয়। হাদীছটি হল–

اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٣٢٦٠ ومسلم برقم ١٤٣٢ واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, জাহান্নাম আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার একাংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। তখন তিনি জাহান্নামকে দু'টো শ্বাস ছাড়ার অনুমতি দিলেন– একটা শীতকালে, আরেকটা গ্রীষ্মকালে। এটাই হচ্ছে তোমরা যে তীব্র গরম অনুভব কর এবং যে তীব্র শীত অনুভব কর (তার উৎস)। [বোখারী : ৩২৬০, মুসলিম : ১৪৩২]

এ হাদীছে বুঝানো হয়েছে, গ্রীষ্মকালে তাপের যে তীব্রতা সেটা জাহান্নামের উষ্ণ অংশের গরম শ্বাস ছাড়ার কারণে, আর শীতকালে শীতের যে তীব্রতা সেটা জাহান্নামের শীতল অংশের ঠাণ্ডা অংশের শ্বাস ছাড়ার কারণে। অর্থাৎ, আমরা যে গরম বা শীতের তীব্রতা অনুভব করি তা মূলত জাহান্নামের কারণে ঘটে থাকে । মুসনাদে আবী আওয়ানা-য় এ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, فَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرٍّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, তোমরা যে ঠাণ্ডা অনুভব কর, তাও স্বয়ং জাহান্নামের কারণে। আবার যে গরম অনুভব কর তাও স্বয়ং জাহান্নামের কারণে।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমরা বাস্তবে যা উপলব্ধি করি তা হচ্ছে গরম বা শীতের হ্রাস বৃদ্ধি সূর্যের নিকটে বা দূরে থাকার কারণে হয়। সূর্যই হচ্ছে তাপের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ। আর বৈজ্ঞানিকভাবে

প্রমাণিত যে, সূর্যের তাপের উৎস হচ্ছে তার অভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি। অথচ হাদীছ থেকে জানা গেল গরম বা শীতের হ্রাস বৃদ্ধি জাহান্নামের শ্বাস ছাড়ার কারণে, অর্থাৎ, তাপের উৎস (এমনিভাবে শৈত্যেরও উৎস) হল জাহান্নাম। এ প্রশ্নের জবাব হল দু'টোর মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। সূর্যের অভ্যন্তরস্থ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদিও তাপের উৎস হতে পারে, আবার তার সঙ্গে জাহান্নামের শ্বাসজনিত তাপও ছড়াতে পারে। সূর্য যখন যে এলাকার নিকটবর্তী থাকে তখন জাহান্নামের উষ্ণশ্বাস জনিত তাপ সে এলাকায় ছড়ায়, আবার যে এলাকা থেকে সূর্য দূরে থাকে জাহান্নামের ঠাণ্ডাশ্বাস জনিত শীত সে এলাকায় ছড়ায়। তবে হাঁ সূর্যের তাপ ও জাহান্নামের তাপের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য যে, সূর্যের তাপের বিষয়টা আমরা ইন্দ্রীয় দ্বারা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারি আর জাহান্নামের শ্বাস ছাড়া জনিত তাপ বা শৈত্যের বিষয়টা আমরা ইন্দ্রীয় দ্বারা এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারি না, বরং শুধু হাদীছে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি।

এখানে আরও প্রশ্ন হতে পারে যে, সূর্য যখন কোন অঞ্চলের কাছে থাকে তখন কেন জাহান্নাম সেখানে গরম শ্বাস ছাড়ে আর যখন সূর্য কোন অঞ্চল থেকে দূরে থাকে তখন কেন সেখানে ঠাণ্ডা শ্বাস ছাড়ে, মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রম কেন হয় না? এর উত্তর সহজ। তা হল তাহলে তো ঋতুর পার্থক্য ঘটত না। ঋতুর পার্থক্য ঘটানোর জন্যই হয়তো আল্লাহ এমন ব্যবস্থা রেখেছেন। এভাবে প্রশ্নও আরও অনেক হতে পারে। মূল কথা হল কুরআন-হাদীছে বিশ্বাস রাখলে সেই বিশ্বাসের আলোকে সব প্রশ্নেরই জবাব দেয়া সম্ভব হতে পারে।

ইল্‌মুন্‌ নুজূম আত-তাবীয়ী শিক্ষা করার হুকুম

সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের তারতম্যে আবহাওয়া ও মৌসুমের পরিবর্তন এবং শীত গ্রীষ্মের আবর্তন সম্পর্কিত বিদ্যাকে আরবিতে বলা হয় 'ইল্‌মুন নুজূম আত-তাবীয়ী' (علم النجوم الطبيعي) এ বিদ্যা শিক্ষা করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। (فتح الملهم ج١) এ বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইসলামে নিষেধাজ্ঞাও নেই আবার তাতে তেমন ধর্মীয় উপকারিতাও নেই। তবে শুধু এতটুকু যে, এর দ্বারা আল্লাহর কুদরত অনুধাবিত হয়ে থাকে। এক মৌসুমে দিন ছোট রাত বড়, আবার অন্য মৌসুমে দিন বড় রাত ছোট হয়ে থাকে, এটাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের আলামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। রাত দিনের এই হ্রাস-বৃদ্ধি এবং রাতের পর দিনের আগমন আল্লাহ তাআলার কুদরতেরই নিদর্শন। এ মর্মে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিবস ও রাত্রির আবর্তনে বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা আলে ইমরান: ১৯১)

রাত ও দিন ছোট বড় হওয়ার তথ্য কুরআনে কারীমের অন্য একটি আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ الأية.

অর্থাৎ, (তুমি বল, হে আল্লাহ,) তুমি রাত্রকে দিবসের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিবসকে রাত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। (সূরা আলে ইমরান: ২৭)

এ আয়াতে বুঝানো হয়েছে– কোন মৌসুমে (যেমন গ্রীষ্মকালে) রাতের কিছু অংশকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিনকে বড় বানিয়ে দাও। আবার অন্য মৌসুমে (যেমন শীতকালে) দিনের কিছু অংশ রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে রাতকে বড় বানিয়ে দাও। (বয়ানুল কুরআন)

সপ্ত একলীম (الأقاليم السبعة)–এর বিবরণ

কোন কোন ফেকাহ্‌র কিতাবে উল্লেখিত কিছু মাসআলা বোঝার জন্য সাত একলীম (ফার্সিতে 'হাফ্‌ত একলীম') সম্বন্ধে জানা থাকা ভাল। আভিধানিকভাবে একলীম অর্থ অঞ্চল। সেমতে যেকোন অঞ্চলকে একলীম বলা যায়। বলা যায়, আমি অমুক একলীম তথা অমুক এলাকার মানুষ। তবে ভূগোল শাস্ত্রের পারিভাষায় একলীম কী এবং পৃথিবীকে কীভাবে সপ্ত একলীমে বিভক্ত করা হবে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধকে যেমন সাত ভাগে বিভক্ত করেছেন তদ্রূপ দক্ষিণ গোলার্ধকেও সাত ভাগে বিভক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সাত একলীম অর্থ পৃথিবীর সাতটা অঞ্চল। যথা: ১ম একলীম ভারতবর্ষ, ২য় একলীম হেজায, ৩য় একলীম মিসর, ৪র্থ একলীম বাবেল অঞ্চল (আরব উপদ্বীপ ও ইরাক এর অন্তর্ভূক্ত), ৫ম একলীম রূম ও শাম, ৬ষ্ট একলীম তুর্কীদের এলাকা আর ৭ম একলীম চীন অঞ্চল। কেউ কেউ আরও অন্যভাবেও সাত একলীম ভাগ করেছেন। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী এবং অধিকাংশের মতানুযায়ী পৃথিবীকে সপ্ত একলীমে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে বিষুব রেখার উত্তরের ৯০ ডিগ্রী অঞ্চলকে (অর্থাৎ, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধকে) ৯ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ১০ ডিগ্রী অঞ্চলকে একেক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ০ ডিগ্রী থেকে ১০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চল প্রথম একলীম, ১১ থেকে ২০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চল দ্বিতীয় একলীম , ২১ থেকে ৩০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চল তৃতীয় একলীম, ৩১ থেকে ৪০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চল চতুর্থ একলীম, ৪১ থেকে ৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চল পঞ্চম একলীম, ৫১ থেকে ৬০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চল ষষ্ট একলীম এবং ৬১ থেকে ৭০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চল সপ্তম একলীম। তার পর ৭১ থেকে ৮০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হয়েছে ৮০ ডিগ্রীর অঞ্চল (عَرْض الثمانين) এবং ৮১ থেকে ৯০ ডিগ্রী পর্যন্ত অঞ্চলকে বলা হয়েছে ৯০ ডিগ্রীর অঞ্চল (عَرْض التسعين)।

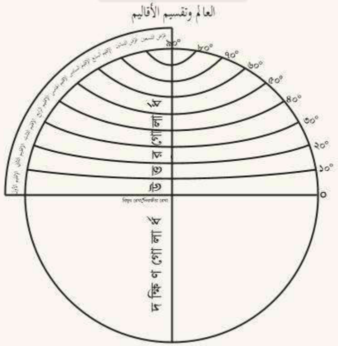

চিত্র নং ৩১ – সাত একলীম

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ মণ্ডলীকরণ (التركيب الداخلي للكرة الأرضية)

বিজ্ঞানীরা ভূ-ত্বক থেকে শুরু করে ভূ-কেন্দ্র পর্যন্ত অংশকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা:

১. কেন্দ্রমণ্ডল (Core[১]/اللُّبُّ/النَّواة)। এ মণ্ডলটি লোহা, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি ভারি পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। এমণ্ডলটি কেন্দ্রের চার দিকে প্রায় ৩৪৮৬ কি. মি. জুড়ে অবস্থিত। কেন্দ্রমণ্ডলের তাপমাত্রা স্থানভেদে ৩০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ৫০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তারও বেশি। প্রচণ্ড চাপ ও তাপের প্রভাবে কেন্দ্রমণ্ডলের উপাদানগুলো স্থিতিস্থাপক[২] ও চটচটে (আঠালো) অবস্থায় রয়েছে।

২. গুরুমণ্ডল (Mantle[৩]/الوِشاح)। কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরে গুরুমণ্ডল অবস্থিত। এ মণ্ডলটি সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কার্বন– এ জাতীয় অন্যান্য গুরু উপাদান দ্বারা গঠিত। এই স্তরের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে গলিত পাথর, যাকে বলা হয় ম্যাগমা। কেন্দ্রমণ্ডলের চারদিকে প্রায় ২২০০ কি. মি. জুড়ে এ মণ্ডলটি অবস্থিত। এর গভীরতা ২৯০০ কি. মি.। এ মণ্ডলের তাপমাত্রা ১০০ কি. মি. গভীরতায় ১৫৭৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস, ৭০০ কি. মি. গভীরতায় ১৯০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস, এবং ২৯০০ কি. মি. গভীরতায় প্রায় ৩০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বলে ধারণা করা হয়। গুরুমণ্ডলটি যথেষ্ট উত্তপ্ত হলেও প্রচণ্ড চাপের প্রভাবে এই স্তরের উপাদানগুলো তরল ও কঠিনের মধ্যবর্তী কর্দমাক্ত অবস্থায় রয়েছে।

৩. অশ্মমণ্ডল (Crust[৪]/القِشرة)। অশ্মমণ্ডলকে শিলামণ্ডল[৫] বা পৃথিবীর বহিরাবরণও বলা হয়। এ মণ্ডলটি সিলিকন, অক্সিজেন, এলুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কোয়ার্টজ, গ্রানাইট ও কিছু পরিমাণ ব্যাসল্ট, লোহা ও ক্যালশিয়াম উপাদান দ্বারা গঠিত। এই স্তর নিচের থেকে উপরে ক্রমশ বড় থেকে ছোট কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত। সবচেয়ে উপরে বালি ও সুক্ষ্ম পলিকণা রয়েছে। এই স্তর ৩০ কি. মি. থেকে ১০০ কি. মি. পর্যন্ত। মহাদেশের নিচে বিশেষত পর্বতমালার নিচে এর পুরুত্ব সবচেয়ে বেশি এবং সমুদ্রের তলদেশে এর পুরুত্ব সবচেয়ে কম। অশ্মমণ্ডলে নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। (প্রাকৃতিক পরিবেশ, সৌরজগত ও ভূমণ্ডল [নবম–দশম শ্রেণী], المورد ও নেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত)

---

[১] উচ্চারণ: কোর্। মূল শব্দের অর্থ ফলের শাঁস।

[২] স্থিতিস্থাপক অর্থ প্রসারণ ও সংকোচনের পরও যা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়।

[৩] উচ্চারণ: ম্যান্টল্।

[৪] উচ্চারণ: ক্রাস্ট্। মূল শব্দের অর্থ কঠিন আবরণ।

[৫] ভূ-ত্বক বিভিন্ন শিলার সমন্বয়ে গঠিত বিধায় একে শিলামণ্ডল বলা হয়। ভূগোলের পরিভাষায় 'শিলা' বলতে কেবল কঠিন পাথরকেই বুঝানো হয় না। বরং দুই বা তারও বেশি খনিজদ্রব্য প্রাকৃতিক উপায়ে একত্রিত হয়ে যে পদার্থ গঠন করে তাকে শিলা বলে। তাই ভূগোলের পরিভাষায় নুড়ি, কাঁকর, পাথর, বালি, মাটি, কাদা প্রভৃতি সবই শিলার অন্তর্ভুক্ত।

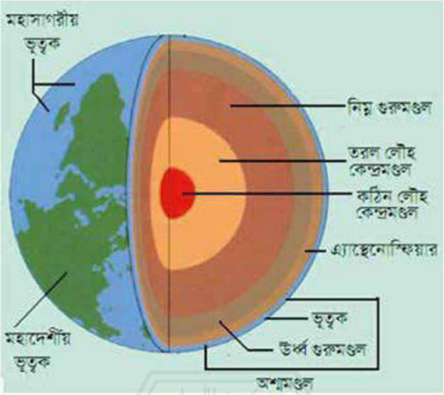

চিত্র নং ৩২ – পৃথিবীর মণ্ডলসমূহ

সাত তবক জমিন প্রসঙ্গ (طبقات الأرض السبع)

সাত তবক জমিন বা জমিনের সাত স্তর বলতে বুঝায় ভূ-ত্বক থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত অংশের ৭টি স্তরকে। এই সাত তবকের ধারাবাহিকতা নিয়ে ভূগোলবিদদের বর্ণনায় উনিশ-বিশ পার্থক্য দেখা যায়। আমেরিকান জিয়লজিক্যাল্ সার্ভে (U.S. Geological Survey)-এর বর্ণনায় ভূ-ত্বক থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত অংশকে ৩ ভাগে বিভক্ত বলা হয়েছে। (যা পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে) যথা: **কেন্দ্রমণ্ডল** (Core/اللُّبُّ/النَّواة)। **গুরুমণ্ডল** (Mantle/الوِشاح)। **অশ্মমণ্ডল** (Crust/القِشرة)। এই তিন ভাগের মধ্যে সাত ভাগ রয়েছে। কেননা, কেন্দ্রমণ্ডল আবার ২ ভাগে বিভক্ত। যথা: বহিঃ কেন্দ্রমণ্ডল (Outer Core[১]/ اللُّبُّ الخارجي) ও অন্তঃ কেন্দ্রমণ্ডল (Inner Core[২]/اللُّبُّ الداخلي)। আর গুরুমণ্ডল প্রধানত ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা: বহিঃ গুরুমণ্ডল (Upper[৩] Mantle/الوِشاح العلوي), অন্তঃ গুরুমণ্ডল (Lower[৪] Mantle/الوِشاح السفلي) আর বহিঃ গুরুমণ্ডল ও অন্তঃস্তরের মধ্যবর্তী একটি পাতলা স্তর যাকে বলা হয় 'নমনীয় মণ্ডল' (Asthenoshpere[৫]/الغلاف المائع/الطبقة الضعيفة) আর অশ্মমণ্ডল প্রধানত ২ ভাগে বিভক্ত। যথা: ভূ-ত্বক (Oceanic[৬] crust/القِشرة المحيطية) ও অন্তঃস্তর (Continental[৭] crust/القِشرة القارِّيَّة)। তাহলে জমিনের ৭টি স্তর তথা জমিনের সাত তবক যথাক্রমে (কেন্দ্র থেকে ভূ-ত্বক পর্যন্ত ধারাবাহিকতায়) নিম্নরূপ:

---

[১] উচ্চারণ: আউটার্ কোর্। [২] উচ্চারণ: ইনার্ কোর্। [৩] উচ্চারণ: আপার্। [৪] উচ্চারণ: লোয়ার্।

[৫] উচ্চারণ: এ্যাস্থেনোস্ফিয়ার্। [৬] উচ্চারণ: ওশিয়্যানিক্। মূল শব্দের অর্থ মহাসমুদ্র সম্বন্ধীয়।

[৭] উচ্চারণ: কন্টিনেন্ট্যাল্। শব্দের মূল অর্থ মহাদেশ সম্বন্ধীয়।

১. অন্তঃ কেন্দ্রমণ্ডল (Inner Core/اللُّبُّ الداخلي) বিজ্ঞানীদের মতে এই স্তরে লোহা ও নিকেল উপাদানগুলো কঠিন অবস্থায় রয়েছে। আরবিতে এ স্তরকে النواة الداخلية বা النواة الحديدة الصلبة ও বলা হয়। বাংলায় এ স্তরকে কঠিন লৌহ কেন্দ্রমণ্ডলও বলা হয়।

২. বহিঃ কেন্দ্রমণ্ডল (Outer Core/اللُّبُّ الخارجي) বিজ্ঞানীদের মতে এই স্তরে লোহা ও নিকেল উপাদানগুলো তরল ও যথেষ্ট ঘনীভূত অবস্থায় রয়েছে। আরবিতে এ স্তরকে النواة الخارجية বা النواة الحديدية السائلة ও বলা হয়। আর বাংলায় এ স্তরকে তরল লৌহ কেন্দ্রমণ্ডলও বলা হয়।

৩. অন্তঃ গুরুমণ্ডল (Lower Mantle/الوِشاح السفلي) এই স্তরে নিকেল, লোহা, সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ বেশি রয়েছে। আরবিতে এ স্তরকে الوشاح الأدنى ও বলা হয়। বাংলায় এসে নিম্ন গুরুমণ্ডলও বলা হয়।

৪. বহিঃ গুরুমণ্ডল (Upper Mantle/الوِشاح العلوي) এই স্তরে ক্রোমিয়াম, লোহা, সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি গঠনকারী উপাদানগুলো আংশিক নরম অবস্থায় রয়েছে। আরবিতে এ স্তরকে الوشاح الأعلى ও বলা হয়। বাংলায় এ স্তরকে উর্ধ্ব গুরুমণ্ডলও বলা হয়।

৫. 'নমনীয় মণ্ডল' (Asthenoshpere/الغلاف المائع/الطبقة الضعيفة)। এটি বহিঃ গুরুমণ্ডল ও অন্তঃস্তরের মধ্যবর্তী একটি পাতলা স্তর। এটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৯০০ কিলোমিটার নিচে অবস্থিত।

৬. অন্তঃস্তর (Continental crust/القِشرة القارِيَّة) অন্তঃস্তর প্রায় একই প্রকার সমসত্ত্ব বিশিষ্ট শিলা দ্বারা গঠিত।[১] আরবিতে এ স্তরকে القشرة الأرضية বা الغلاف الصخري ও বলা হয়। আর বাংলায় একে মহাদেশীয় ভূ-ত্বকও বলা হয়।

৭. ভূ-ত্বক (Oceanic crust/القِشرة المحيطية) অশ্মমণ্ডলের উপরের ভাগ তথা ভূ-ত্বক অসমসত্ত্ব বা বিভিন্ন প্রকার শিলা দ্বারা গঠিত। আরবিতে এ স্তরকে القشرة الأرضية ও বলা হয়। বাংলায় একে মহাসাগরীয় ভূ-ত্বকও বলা হয়।

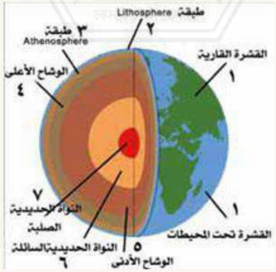

ছবি নং ৩৩ – সাত তবক জমিন

---

১. এ স্তরকে ইংরেজিতে Lithosphere (الغلاف الصخري)ও বলা হয়। Lithos শব্দের অর্থ শিলা। এ দিক থেকে একে শিলাস্তর বলাই সংগত ছিল। কিন্তু বাংলাতে অন্তঃস্তর নামটি অধিক পরিচিতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, কেউ কেউ গোটা অশ্মমণ্ডলকেই Lithosphere বলে থাকেন। এটা বলা যেতে পারে এ হিসেবে যে, গোটা অশ্মমণ্ডলই (চাই ভূ-ত্বক হোক বা অন্তঃস্তর) শিলামণ্ডল।

সাত জমিন প্রসঙ্গ (الأراضي السبعة)

কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে সাত আসমানের অনুরূপ জমিন সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে আয়াতটির বক্তব্য লক্ষ করা যাক। সূরা তালাকে ইরশাদ হয়েছে,

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

অর্থাৎ, আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং তার অনুরূপ জমিনও। সেগুলোর মাঝে নির্দেশ নাযেল হয়। (তিনি তোমাদেরকে এটা অবগত করেছেন) যাতে তোমরা জানতে পার অবশ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সর্ববিষয়ে আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। (সূরা তালাক: ১২)

এখানে প্রথমত কথা হল আয়াতে সাত আসমান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অধিকাংশ আলেম বলেছেন, এই সাত দ্বারা 'সাত'ই উদ্দেশ্য 'বহু সংখ্যক' উদ্দেশ্য নয়। (এ সম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে 'আকাশ ও মহাকাশ প্রসঙ্গ' শিরোনামের আলোচনা দ্রষ্টব্য।) তারপর সাত আসমানের অনুরূপ জমিন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সাত জমিন দ্বারা সাতটি ভিন্ন ভিন্ন জমিনই উদ্দেশ্য। আবার অনেকে বলেছেন, 'সাত আসমানের অনুরূপ' বলে সাত আসমানের সংগে জমিনের যে সাদৃশ্য উল্লেখিত হয়েছে সে সাদৃশ্য বিশেষ অবস্থা বা গুণাবলীর ভিত্তিতে, সংখ্যার দিক থেকে নয়। অতএব এর দ্বারা জমিন সাতটা হওয়ার অপরিহার্যতা দেখা দেয় না। এভাবে তারা বলতে চান জমিন মাত্র একটি। অতএব সাত জমিন বলে একই জমিনের সাতটি স্তর বুঝানো উদ্দেশ্য।

যদি জমিন ভিন্ন ভিন্ন সাতটা হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই সাত জমিনের স্থান কোথায় তা কুরআন-হাদীছে কোথাও স্পষ্টত বর্ণিত হয়নি। ফলে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ৩ টা মত পাওয়া যায়। যথা:

১. সাত জমিন একটা আরেকটার উর্ধ্বে অবস্থিত এবং সেগুলোর মাঝে দূরত্ব রয়েছে, একটা আরেকটার সঙ্গে লাগোয়া নয়।

২. প্রথম আসমানের উপর দ্বিতীয় জমিন, দ্বিতীয় আসমানের উপর তৃতীয় জমিন, এভাবে ষষ্ঠ আসমানের উপর সপ্তম জমিন।

৩. সাত জমিন দ্বারা সাত একলীম উদ্দেশ্য। (সাত একলীম সম্বন্ধে কয়েক পৃষ্ঠ পূর্বে 'সপ্ত একলীম এর বিবরণ' শিরোনামে আলোচনা আতিবাহিত হয়েছে।)

কারও কারও মতে উপরোক্ত তিনটি মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। তাফসীরে রূহুল মাআনীতে মাহমূদ আলূসী রহ. এটাকে জুমহুরের মত বলে অভিহিত করেছেন। এ মতটিকে প্রাধান্য দেয়ার দলীল প্রধানত ৩টি। যথা:

(১) এক হাদীছে জমিন ভিন্ন ভিন্ন সাতটা হওয়ার কথা বণিত হয়েছে। হাসানে বসরী কর্তৃক আবূ হুরায়রা (রা.)–এর সূত্রে বর্ণিত সে হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, بينهما مسيرة خمسمائة سنة فإن تحتها الأرض الأخرى একটার নিচে আরেকটা জমিন রয়েছে। এতদুভয়ের মাঝে পাঁচশ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এরপর হাদীছের শব্দ হল– حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِينَ অর্থাৎ, এভাবে তিনি গণে গণে সাতটা জমিনের কথা বলেছেন। (তিরমিযী শরীফে বর্ণিত ৩২৯৮ নং দীর্ঘ হাদীছের একাংশ।)

২. মুস্তাদরকে হাকিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ. قال : سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى.

অর্থাৎ, আল্লাহ সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনেরও অনুরূপ। তিনি বলেন, সাত জমিন, তার প্রত্যেক জমিনে তোমাদের নবীর ন্যায় নবী রয়েছেন এবং আদমের ন্যায় আদম, নূহের ন্যায় নূহ, ইবরাহীমের ন্যায় ইবরাহীম ও ঈসার ন্যায় ঈসা। (মুস্তাদরকে হাকিম: হাদীছ নং ৩৮২২)

৩. হযরহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, (প্রত্যেক জমিনে অধিবাসী রয়েছে।) أنهم إما ملائكة أو جن

অর্থাৎ, তার অধিবাসীরা হয় ফেরেশতা কিংবা জিন। (তাফসীরে রূহুল মাআনী)

কারও কারও মতে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত এটিই যে, সাত জমিন দ্বারা আমাদেরই এই এক পৃথিবীর সাতটা স্তর (পূর্বের পরিচ্ছেদে সে সাতটা স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।) উদ্দেশ্য।

এ মতের পক্ষে বিশেষ দুটো সহীহ হাদীছ রয়েছে। এক মারফূ' হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে, কেয়ামতের দিন ঐ জমি সাত জমিনসহ তার গলায় বেড়ি বানিয়ে দেয়া হবে। (বোখারী: হাদীছ নং ৩১৯৮)

এ হাদীছের জাহের থেকে প্রতীয়মান হয়– যে জমিনের ভূমি গ্রাস করেছে সেই জমিনই তার গলার বেড়ি হবে। অতএব সাত জমিন ঐ জমিনেরই অংশ হবে তথা সাত জমিন দ্বারা ঐ একই জমিনের সাতটা স্তর উদ্দেশ্য হবে।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আরেক মারফূ' হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٥٧٤٠ وإسناده صحيح على شرط الشيخين)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জমিনের কিছু অংশও অন্যায়ভাবে গ্রহণ করবে তাকে সাত জমিন পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। (মুসনাদে আহমদ: হাদীছ নং ৫৭৪০)

এ হাদীছের জাহের থেকেও প্রতীয়মান হয়– যে জমিনের ভূমি গ্রাস করেছে সেই জমিনেই ধ্বসানো হবে। অতএব সাত জমিন ঐ জমিনেরই অংশ হবে তথা সাত জমিন দ্বারা ঐ একই জমিনের সাতটা স্তর উদ্দেশ্য হবে।

রয়ে গেল প্রথমোক্ত মত প্রাধান্যপ্রাপ্ত হওয়ার দলীলসমূহের জওয়াব প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে তিরমিযী শরীফের হাদীছটির জওয়াবে স্বয়ং ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাসানে বসরীর শ্রবণ (سمع) প্রমাণিত নয়। এভাবে ইমাম তিরমিযী হাদীছটি জয়ীফ হওয়ার দিকে ইংগিত করেছেন। আর মুস্তাদরকে হাকিমের হাদীছ সম্বন্ধে আল্লামা যাহাবী বলেছেন, এ হাদীছের সনদ সহীহ হলেও হাদীছটি শায। আবূ হাইয়্যান বলেছেন, হাদীছটি মওজূ' হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হয়ত ইসরাঈলী রেওয়ায়াত থেকে এটি শুনে থাকবেন। আর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি– 'তার অধিবাসীরা হয় ফেরেশতা কিংবা জিন'– রূহুল মাআনীতে এই উক্তির কোন সনদ উল্লেখ নেই। তাফসীরে কাশ্শাফেও উক্তিটি সনদবিহীন উল্লেখিত হয়েছে। তদুপরি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও কথাটি সন্দেহের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, 'তার অধিবাসীরা হয় ফেরেশতা কিংবা জিন।' এই সন্দেহও বিষয়টিকে দুর্বল করে দেয়।

সর্বশেষে একটি কথা উল্লেখ্য, সাত জমিন ভিন্ন ভিন্ন সাতটি জমিন নাকি একই জমিনের সাতটি স্তর–এ সম্বন্ধে অকাট্য বা দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য নেই। যা উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে ভিন্নরকম ব্যাখ্যারও অবকাশ রয়েছে। তবে যেহেতু এ বিষয়ের সঙ্গে আকীদা বা আমল কোন কিছু সম্পর্কিত নয়, তাই বিষয়টি নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটির প্রয়োজন নেই।

জাহান্নাম কোথায় অবস্থিত?

আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল জাহান্নাম এখই তৈরি অবস্থায় রয়েছে, এমন নয় যে, কেয়ামতের পরে তা তৈরি করা হবে। তবে জাহান্নাম তৈরি অবস্থায় কোথায় রয়েছে, অর্থাৎ, জাহান্নাম কোথায় অবস্থিত– এ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে।

- কেউ বলেছেন জাহান্নাম সাগরের তলে,
- কেউ বলেছেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে।
- আবার কেউ আরও একটু স্পষ্ট করে বলেছেন, জাহান্নাম সাত তবক জমিনের নিচে।

সাগরের তলে আর পৃথিবীর অভ্যন্তরে কথা দু'টোর মধ্যে তেমন তফাৎ নেই। সাগরের তলে হলেও তো সেটা পৃথিবীর অভ্যন্তরেই হল। আবার সাত তবক জমিনের নিচে হলেও তো সেটা পৃথিবীর অভ্যন্তরেই হল। তাহলে দেখা গেল জাহান্নাম এই পৃথিবীর মধ্যেই রয়েছে– এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তবে পৃথিবীর কোথায় রয়েছে সে ব্যাপারে সকলের ভাষ্য এক রকম নয়। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় না জাহান্নাম পৃথিবীর কোথায় অবস্থিত।

জাহান্নাম যে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই রয়েছে সে ব্যাপারে সহীহ হাদীছ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন,

إن الجنة في السماء و إن النار في الأرض. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٨٦٩٨ وقال : صحيح الإسناد، وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, জান্নাত আসমানে আর জাহান্নাম পৃথিবীতে। (মুস্তাদরকে হাকিম: হাদীছ নং ৮৬৯৮)

এ রেওয়ায়েতে জাহান্নাম পৃথিবীতে থাকার কথা বলা হয়েছে। তবে পৃথিবীর কোন্ স্তরে তা বলা হয়নি। মুস্তাদরকে হাকিমের এক রেওয়ায়েতে পৃথিবীর সপ্ত স্তরের নিচে থাকার কথা রয়েছে। হাকিম বলেন,

وقد قدمت الرواية الصحيحة أن جهنم تحت الأرض السابعة.

অর্থাৎ, আমি সহীহ রেওয়ায়েত পেশ করেছি[১] যে, জাহান্নাম জমিনের সপ্তম স্তরের নিচে অবস্থিত। (মুস্তাদরকে হাকিম: হাদীছ নং ৮৯৪৩)

এ ছাড়া সমুদ্র হচ্ছে জাহান্নাম, কিংবা সমুদ্রের নিচে জাহান্নাম– এ ধরনের রেওয়ায়েতও রয়েছে। যেমন এক সহীহ হাদীছে আছে– রসূল সাল্লাল্লাম ইরশাদ করেছেন, إِنَّ الْبَحْرَ هُوَ جَهَنَّمُ অর্থাৎ,

---

[১] তিনি এ রেওয়ায়েতটি কোথায় পেশ করেছেন তা আমাদের জানা নেই। মুস্তাদরক কিতাবের কোথাও আমরা এটি খুঁজে পাইনি। হতে পারে অন্য কোন কিতাবে তিনি বর্ণনা করেছেন কিংবা এই কিতাবেই ভিন্ন কোন শব্দে উল্লেখ করেছেন।

সমুদ্রই হচ্ছে জাহান্নাম। (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٨٩٤٢ وقال : صحيح الإسناد، وأقره عليه الذهبي في التلخيص) আর এক সহীহ হাদীছে আছে– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রা.) বলেছেন, إنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا অর্থাৎ, সমুদ্রের নিচে জাহান্নাম। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীছ নং ১৪০৪) মুস্তাদরকে হাকিমে হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ নিশাপূরী (রহ.) এসব হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সমুদ্রকে জাহান্নাম আখ্যায়িত করে বুঝানো হয়েছে সমুদ্র অত্যন্ত ভয়াবহ। নতুবা জাহান্নাম জমিনের সপ্তম স্তরের নিচে।

আল্লামা বরভারী 'শরহুস সুন্নাহ' কিতাবে, সাফারীনী 'লাওয়ামিউল আনহার' কিতাবে এবং নু'মান আলূসী 'জিলাউল আইনাইন' কিতাবে বলেছেন, জান্নাত সপ্তম আসমানের উপরে, আরশ যার ছাদ, আর জাহান্নাম পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নিচে। সাফারীনী ও নু'মান আলূসী এটাকে সহীহ মত বলে আখ্যা দিয়েছেন। আবার শায়খ আহমদ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম–এর স্থান কোথায় এ ব্যাপারে পরিষ্কার ভাষ্য পাওয়া যায় না। বরং আল্লাহ যেখানে চেয়েছেন সেখানে রয়েছে। শায়খ সিদ্দীক হাসান বলেন, এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও সতর্কতাপূর্ণ অভিমত। (তবে জাহান্নাম পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত– এতটুকুর ব্যাপারে ঐক্যমতের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।)

জান্নাত কোথায় অবস্থিত?

আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হল জান্নাত এখই তৈরি অবস্থায় রয়েছে, এমন নয় যে, কেয়ামতের পরে তা তৈরি করা হবে। জান্নাত তৈরি অবস্থায় কোথায় রয়েছে, অর্থাৎ, জান্নাত কোথায় অবস্থিত তা কুরআনের একটি আয়াত (সূরা নাজ্‌মের ১৪ নং আয়াত) ও একটি হাদীছের সমন্বয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুরআনের সেই আয়াতে বলা হয়েছে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার কাছে অবস্থিত আর সেই হাদীছে ব্যক্ত হয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা[১] সপ্তম আসমানে। অতএব স্পষ্ট হল যে, জান্নাত সপ্তম আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহার কাছে অবস্থিত। এবার সেই আয়াত ও হাদীছটি পেশ করা হল।

কুরআনে কারীমে সূরা নাজ্‌মে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (١٥)

অর্থ: আর নিশ্চয় সে (মুহাম্মাদ স.) তো তাকে (জিবরাঈলকে) আরেকবারও দেখেছিল সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। তার কাছেই হল জান্নাতুল মাওয়া[২]। (সূরা নাজ্‌ম: ১৩–১৫)

---

[১] سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى (সিদরাতুল মুনতাহা) অর্থ শেষ প্রান্তে অবস্থিত বরই গাছ। এটি সপ্তম আসমানে অবস্থিত। ফেরেশতাগণ এর উর্ধ্বে গমন করতে পারেন না বলে এটিকে শেষ প্রান্তের গাছ বলা হয়। এখানে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার হযরত জিবরাঈল (আ.)কে তার নিজ আকৃতিতে দেখেছিলেন। (মাআরিফুল কুরআন)

[২] মুফতী শফী সাহেব (রহ.) মাআরিফুল কুরআনে লিখেছেন, মাওয়া (الْمَأْوَى) শব্দের অর্থ ঠিকানা। যেহেতু জান্নাতই হল মানুষের আসল ঠিকানা, সেহেতু জান্নাতকে জান্নাতুল মাওয়া (جَنَّةُ الْمَأْوَى) বলে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে তা মুমিনদের অবস্থানের জান্নাতও হতে পারে আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা শহীদগণের রূহ থাকার স্থান। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ফেরেশতাদের জান্নাত। (তাফসীরে কাবীর: সূরা নাজ্‌মের ব্যাখ্যা) তাহলে এ আয়াত দ্বারা সিদরাতুল মুনতাহার নিকট তথা আসমানে মুমিনদের জান্নাত থাকাটা সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুসারে সাব্যস্ত হল না। তবে আয়াত দ্বারা সেটা সেভাবে সাব্যস্ত না হলেও পূর্বের পরিচ্ছেদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম-এর যে রেওয়ায়েত এবং সামনে বাগাবী কর্তৃক বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর যে উক্তি পেশ করা হয়েছে তা দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

বোখারী শরীফে মেরাজ সম্পর্কিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ.

অর্থ: … অতঃপর আমরা সপ্তম আসমানে (-র দরজায়) এলাম। জিজ্ঞাসা করা হল কে? বলা হল, জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে? বলা হল, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞাসা করা হল তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? ধন্যবাদ তাঁকে, শুভাগমন! তারপর আমি ইবরাহীমের নিকট এলাম। তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ধন্যবাদ তোমাকে পুত্র ও নবী হিসেবে। তারপর আমার সামনে বায়তুল মা'মূর আসল। আমি জিবরীলকে (সে ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বাইতুল মা'মূর। এখানে প্রতিদিন এমন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়েন যারা এখান থেকে বের হওয়ার পর আর কোনো দিন সেখানে ফিরে আসেন না। এটাই তাদের শেষ আসা। আর আমার সামনে সিদরাতুল মুনতাহা আসল। তার বরইগুলো যেন হাজার[১]-এর মটকা আর তার পাতাগুলো যেন হাতির কান। … (বোখারী: হাদীছ নং ৪২০৭)

এ ছাড়াও পূর্বের পরিচ্ছেদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর বাচনিক জান্নাত আসমানে থাকার রেওয়ায়েত পেশ করা হয়েছে এবং সামনে আরশ জান্নাতের উপরে থাকার হাদীছ আসছে। তাহলে সারকথা এই দাঁড়াবে যে, জান্নাত সপ্তম আসমানের উপরে এবং আরশের নিচে অবস্থিত।

আরশ জান্নাতের উপরে– এ সম্পর্কিত একটি সহীহ রেওয়ায়েত এই– রসূল সাল্লাল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ … الحديث (رواه البخاري في صحيحه برقم ٧٤٢٣)

অর্থাৎ, জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যেগুলো আল্লাহ তাঁর পথে জেহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দুই স্তরের মাঝে ব্যবধান আসমান ও জমিনের ব্যবধান সমপরিমাণ। অতএব যখন আল্লাহর কাছে আবেদন করবে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য আবেদন করো। কেননা, অবশ্যই সেটা (ফেরদাউস) জান্নাতের উত্তম স্তর এবং সর্বোচ্চ স্তর। আর তার উপরে দয়াময় আল্লাহর আরশ অবস্থিত। (বোখারী: হাদীছ নং ৭৪২৩)

---

[১] 'হাজার' তৎকালীন ইয়ামানের একটি শহর (উমদাতুল কারী) যেখানে বড় বড় মটকা তৈরি হত।

একটি রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) থেকে এমন বর্ণনা স্পষ্টত পাওয়া যায়। তাফসীরে বাগাবীতে[১] বর্ণিত হয়েছে–

وسُئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن الجنة: أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة؟ قيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع تحت العرش.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল জান্নাত কি আসমানে না পৃথিবীতে? তিনি বললেন, কোন্ আসমান জমিনে জান্নাতের সামাই হতে পারে? জিজ্ঞাসা করা হল তাহলে তা কোথায়? তিনি বললেন, সাত আসমানের উপরে, আরশের নিচে।

আরশ ও কুরছী কোথায় অবস্থিত?

পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে জান্নাত সপ্তম আসমানের উপরে অবস্থিত। আর সহীহ হাদীছে এসেছে যে, আরশ হচ্ছে জান্নাতের উপরে। তাহলে অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, আরশ সপ্তম আসমানের উপরে এবং জান্নাতেরও উপরে। বস্তুত উলামায়ে কেরামের ভাষ্যমতে আরশ হচ্ছে সব মাখলূকের উপরে অবস্থিত। আরশ জান্নাতের উপরে– এ সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েত এই– রসূল সাল্লাল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ... الحديث (رواه البخاري في صحيحيه برقم ٧٤٢٣)

অর্থাৎ, জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে যেগুলো আল্লাহ তাঁর পথে জেহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দুই স্তরের মাঝে ব্যবধান আসমান ও জমিনের ব্যবধান সমপরিমাণ। অতএব যখন আল্লাহর কাছে আবেদন করবে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য আবেদন করো। কেননা, অবশ্যই সেটা (ফেরদাউস) জান্নাতের উত্তম স্তর এবং সর্বোচ্চ স্তর। আর তার উপরে দয়াময় আল্লাহর আরশ অবস্থিত। (বোখারী: হাদীছ নং ৭৪২৩)

আর কুরছী জান্নাত ও আরশের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত। কুরআনে কারীমের বর্ণনামতে কুরছী সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ.

অর্থাৎ, তাঁর কুরছী আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। (সূরা বাকারা: ২৫৫)

কুরছী জান্নাত ও আরশের মধ্যবর্তীতে থাকা সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

بَيْنَ السَّمَاء الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسمِائَةِ عَام , وَبَيْنَ كُلّ سَمَاء مسيرة خَمْسمِائَةِ عَام. (وَفِي رِوَايَة " وَغِلَظ كُلّ سَمَاء مَسِيرَة خَمْسمِائَةِ عَام)، وَبَيْنَ السماء السَّابِعَة وَبَيْنَ الْكُرْسِيّ خَمْسمِائَةِ عَام، وَبَيْنَ الْكُرْسِيّ وَبَيْنَ الْمَاء خَمْسمِائَةِ عَام، وَالْعَرْش فَوْق الْمَاء وَاَللَّه فَوْق الْعَرْش وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء مِنْ أَعْمَالكُمْ. (رواه اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه برقم ١٠٥ وفي كتاب التوحيد له برقم ٥٩٤، وصححه الذهبي في العلو ص٦٤ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١٠٠)

---

[১] উল্লেখ্য, তাফসীরে বাগাবীতে হযরত আনাস (রা.)-এর এ উক্তির কোন সনদ উল্লেখ করা হয়নি। তবে পূর্বের হাদীছ দ্বারা এ বক্তব্য সমর্থিত।

অর্থাৎ, দুনিয়ার আসমান ও তার সংলগ্ন (২য়) আসমানের মাঝে পাঁচশ বছরের ব্যবধান। (এভাবে) প্রত্যেক আসমানের মাঝে পাঁচশ বছরের ব্যবধান। (এক রেওয়ায়েতে আছে– প্রত্যেক আসমানের পুরুত্ব পাঁচশ বছরের ব্যবধান সমপরিমাণ) আর সপ্তম আসমান ও কুরছির মাঝে পাঁচশ বছরের ব্যবধান। আর কুরছী ও পানির মাঝে পাঁচশ বছরের ব্যবধান। আর আরশ সেই পানির উপরে অবস্থিত এবং আল্লাহ আরশের উপর। তাঁর কাছে তোমাদের আমলসমূহের কোনো কিছুই গোপন নয়। (সহীহ ইবনে খুযাইমা: হাদীছ নং ১০৫)

ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস[১]

ভূমিকম্প (Earthquake[২]/الزلزلة):

ভূমিকম্প বলতে বুঝায় আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী ভূ-কম্পনকে, চাই সে কম্পন প্রাকৃতিক অথবা মনুষ্য সৃষ্ট যাই হোক না কেন। কম্পন-তরঙ্গ থেকে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই তরঙ্গ ভূ-গর্ভের কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থল থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের ভূ-পৃষ্ঠ অনেকগুলো প্লেট-এর সমন্বয়ে গঠিত। এই প্লেটগুলো একটি আরেকটির থেকে আলাদা থাকে ফল্ট বা ফাটল দ্বারা। এই প্লেটগুলোর নিচেই থাকে ভূ-অভ্যন্তরের সকল গলিত পদার্থ। কোনও প্রাকৃতিক কারণে এই গলিত পদার্থগুলোর স্থানচ্যুতি ঘটলে প্লেটগুলোরও কিছুটা স্থানচ্যুতি ঘটে। এ কারণে একটি প্লেটের কোনও অংশ অপর প্লেটের তলায় ঢুকে যায়, যার ফলে ভূমিতে কম্পন সৃষ্টি হয়। আর এই কম্পনই আমাদের নিকট ভূমিকম্প রূপে আবির্ভূত হয়।

ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে এক/দু-মিনিট স্থায়ী হয়। মাঝে মাঝে কম্পন এত দুর্বল হয় যে, তা অনুভব করা যায় না। কিন্তু শক্তিশালী ও বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে।

বেশিরভাগ ভূমিকম্পের কারণ হল ভূগর্ভে ফাটল ও স্তরচ্যুতি হওয়া। এই ফাটল ও স্তরচ্যুতি অগ্ন্যুৎপাত (তথা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা[৩] উৎক্ষিপ্ত হওয়া), ভূমিধস, খনিতে বিস্ফোরণ ইত্যাদি কারণে হতে পারে। কখনো কখনো পাহাড় কিংবা উঁচু স্থান থেকে বৃহৎ পরিসরে শিলাচ্যুতিজনিত কারণেও ভূমিকম্প হতে পারে। ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হয়ে পড়লে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হতে পারে। কখনও নানান কারণে ভূগর্ভে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্প ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে তা ভূত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেয়; ফলে প্রচণ্ড ভূকম্পন অনুভূত হয় এবং ভূমিকম্প হয়। কখনো কখনো প্রকাণ্ড হিমবাহ পর্বতগাত্র হতে হঠাৎ নিচে পতিত হয়। এতে ভূমি কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প হয়। সম্প্রতি ভূগর্ভস্থ নিউক্লিয়ার গবেষণায় যে আনবিক পরীক্ষা ঘটানো হয় তা থেকেও ভূমিকম্প হতে পারে।

---

[১] ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস সংক্রান্ত আলোচনার সিংহভাগ 'উইকিপিডিয়া: মুক্ত বিশ্বকোষ' থেকে গৃহীত (নিজস্ব বিন্যাসে)।

[২] উচ্চারণ: আর্থকোয়েক্।

[৩] লাভা সম্বন্ধে জানতে সামনের 'আগ্নেয়গিরি' শিরোনামের আলোচনা দেখুন।

ভূমিধ্বস (Landslide[1] /انهيال):

ভূমিধ্বস বলতে পাহাড়-পর্বতের গা থেকে মাটির চাকা বা পাথরের বিরাট আকারের খণ্ড খসে নিচে পড়ার ঘটনাকে বুঝায়। অনেক সময় পাহাড়ের ওপর থেকে পানি ও মাটি মিশে কাদা আকারে বিপুল পরিমাণে নিচে নেমে এলে তাকেও এক ধরনের ভূমিধ্বস আখ্যা দেয়া হয়।

ভূমিধ্বস প্রাকৃতিক কারণেও ঘটে থাকে, আবার মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলেও ঘটে থাকে। প্রাকৃতিক যেসব কারণে ভূমিধ্বস ঘটে থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

- ভূমিস্থ পানির চাপ।
- গাছপালা কেটে ফেলা বা আগুনে পুড়ে যাওয়ার ফলে ভূমি ক্ষয় হওয়া।
- নদী বা সমুদ্রের ঢেউয়ের ফলে ভূমিক্ষয়।
- বৃষ্টিপাত কিংবা বরফ গলার ফলে মাটি নরম হওয়া।
- ভূমিকম্পের কারণে ভূমি অস্থিতিশীল হওয়া।
- ভূমিকম্পের কারণে মাটি তরলীভূত হয়ে যাওয়া।
- অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি।

আর মানুষের যেসব কর্মকাণ্ডের ফলে ভূমিধ্বস ঘটে থাকে তার মধ্যে রয়েছে–

- যন্ত্রপাতি কিংবা রাস্তার গাড়ির দ্বারা সৃষ্ট কম্পন ও অনুরণন।
- বিস্ফোরণ।
- বাঁধ বা মাটির স্তুপ, যা ঢালের উপরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।
- কৃষি, নির্মাণ, কিংবা গাছ কাটার ফলে মাটি থেকে পানির পরিমাণ কমে যাওয়া।

ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস সম্বন্ধে কুরআন হাদীছের কিছু কথা

এতক্ষণ ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বসের যে কারণগুলো বর্ণনা করা হল তা হচ্ছে প্রাকৃতিক ও বস্তুগত কারণ। কুরআন হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বসের কিছু অতিপ্রাকৃতিক ও অ-বস্তুগত কারণও রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্ন পাপের কারণে আযাব হিসেবেও ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস হয়ে থাকে।

সূরা আ'রাফের ৭৮ নং আয়াতে কওমে ছামূদকে ভূমিকম্প দ্বারা আযাব দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে এক সহীহ হাদীছে আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة جعل الله عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن. (واه الحاكم في المستدرك رقم ٨٣٧٢ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। (যদি খাঁটি উম্মত হয়, তাহলে) পরকালে তাদের কোন আযাব হবে না। তাদের যা শাস্তি তা আল্লাহ দুনিয়ায় রেখে দিয়েছেন হত্যা, ভূমিকম্প ও বিভিন্নরকম ফিতনার মধ্যে। (মুস্তাদরকে হাকিম: হাদীছ নং ৮৩৭২)

---

[1] উচ্চারণ: ল্যান্ড্স্লাইড্।

বিভিন্ন পাপের কারণে ভূমিকম্প হয় বিধায় শেষ জমানায় ভূমিকম্প বেড়ে যাবে বলে সহীহ হাদীছে উল্লেখ আছে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ الحديث.

অর্থাৎ, কেয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ ইল্‌ম তুলে নেয়া না হয় এবং ভূমিকম্প বেড়ে না যায়। ... (বোখারী: হাদীছ নং ১০৩৬)

আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি ও বুখারীতে (بَاب الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ) বর্ণিত আছে– হযরত আলী (রা.) বাবেলে যেখানে ভূমিধ্বস হয়েছিল তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে নামায পড়েননি, বরং সেই স্থানটা অতিক্রম করার পর নামায পড়েছেন। সহীহ হাদীছেও বর্ণিত আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন–

أعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي يعني الخسف.(رواه الحاكم في المستدرك برقم ١٩٠٢ وقال : صحيح الإسناد وأبو داود برقم ٥٠٧٦ وأحمد برقم ٤٧٨٥)

অর্থাৎ, আমি তোমার মাহাত্মের ওছীলায় পানাহ চাই যেন আমার নিচ থেকে ধ্বসে না যাই (বর্ণনাকারী ওকী' বা জুবায়ের বলেন,) অর্থাৎ, যেন ভূমিধ্বসে আক্রান্ত না হই। (মুস্তাদরকে হাকিম, আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমদ)

হাদীছে বর্ণিত আছে শেষ জমানায় যখন একটা বাহিনী বাইতুল্লাহকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে আসবে, তাদেরকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। (মুসলিম: ৭৪২১, আবূ দাউদ: ৪২৯১)

আগ্নেয়গিরি (Volcano[1]/براكين)

আগ্নেয়গিরি-এর শাব্দিক অর্থ হল আগুনের পাহাড়। পরিভাষায় আগ্নেয়গিরি হলো বিশেষ ধরনের পাহাড় যার ভেতর দিয়ে ভূ-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত ও গলিত পাথর, ছাই এবং গ্যাস বেরিয়ে আসতে পারে। এটি একটি ভৌগোলিক প্রক্রিয়া। ভূমির কোনো কোনো ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে ভূগর্ভস্থ গরম বাতাস, জলীয় বাষ্প, গলিত শিলা, কাদা, ছাই, গ্যাস প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে। নির্গত এই সকল পদার্থ ভূপৃষ্ঠের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে, যার কিছুটা ফাটলের চারপাশে এসে ধীরে ধীরে জমা হয়ে মোচাকৃতির পর্বত হয়ে দাঁড়ায়। তখন একে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরি থেকে ভূগর্ভস্থ পদার্থের নির্গমনকে বলা হয় অগ্ন্যুৎপাত। আগ্নেয়গিরির বহিঃর্মুখ বা নির্গমন-পথ দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, তাকে বলে জ্বালামুখ।

ভূত্বকে ফাটল দেখা দিলে, ভূত্বকের কোনও দুর্বল ছিদ্রপথ থাকলে, কিংবা ভূগর্ভের তরল শিলা ও চাপ বৃদ্ধি পেলে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। অগ্ন্যুৎপাতের কারণে আকাশে ছাই ও বায়বীয় পদার্থের মেঘ তৈরি হতে পারে। আগ্নেয়গিরি ভূমি বা পাহাড়ি অঞ্চল ছাড়াও সমুদ্রের মাঝেও সৃষ্টি হতে পারে। ভূ-অভ্যন্তরে সঞ্চিত তরল শিলাকে বলে ম্যাগমা। ম্যাগমা (তরল শিলা) অনেক সময় ভূপৃষ্ঠে উঠে আসতে না পেরে মাটির স্তরের মধ্যে জমাটবদ্ধ হয়ে নানান প্রকার আগ্নেয়শিলার সৃষ্টি করে। আর যে ম্যাগমা (তরল শিলা) ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে আসে তাকে বলে লাভা। লাভা বেরিয়ে এসে প্রবাহিত হলে তাকে বলে 'বিদার উদগিরণ'।

---

[1] উচ্চারণ: ভল্‌কেনো।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় অর্ধ সহস্র সক্রিয় বা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে। যেসমস্ত আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই, তাদেরকে মৃত বা নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি বলে। এছাড়াও বর্তমানে সক্রিয় নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে অগ্ন্যুদগার করতে পারে, এমন আগ্নেয়গিরিকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলে। (আগ্নেয়গিরি সংক্রান্ত সমুদয় তথ্য 'উইকিপিডিয়া: মুক্ত বিশ্বকোষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

দ্বীপ (جزيرة)-এর সংজ্ঞা

চারদিকে পানিবেষ্টিত স্থলভাগকে দ্বীপ বলে। অর্থাৎ, যে ভূমির চারদিকে পানি তা হল দ্বীপ। যেমন বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার সেন্ট মার্টিন একটা দ্বীপ, চট্টগ্রামের সন্দীপ উপজেলা একটা দ্বীপ, কাঠগড় একটা দ্বীপ।

উপদ্বীপ (شبه الجزيرة) -এর সংজ্ঞা

যে ভূমির চারদিকে নয় তবে প্রায় চারদিকে পানি তা হল উপদ্বীপ। যেমন আরব উপদ্বীপ (شبه جزيرة العرب)।

পাহাড়/পর্বত (جَبَل) -এর সংজ্ঞা

সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চে অবস্থিত ঢাল বিশিষ্ট স্বল্পদূর বিস্তৃত শিলাস্তুপকে বলে পাহাড় (Hill[১])। আর সমুদ্র সমতল থেকে অতি উচ্চে অবস্থিত খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তুপকে বলে পর্বত (Mountain[২])। সাধারণত পাহাড় আর পর্বতের মাঝে উচ্চতা আর অতি উচ্চতা এবং ঢাল খাড়া হওয়া না হওয়ার পার্থক্য উল্লেখ করা হয়ে থাকে।[৩] আরবিতে পাহাড় ও পর্বত উভয়টিকেই সাধারণত জাবাল (جبل) বলা হয়। তবে পাহাড় বা পর্বতের জন্য ন্যূনতম কতটুকু উঁচু হতে হবে সে সম্বন্ধে আধুনিক এক তাহকীকে বলা হয়েছে, ৫০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু ভূমিকে সাহ্‌ল (سَهْل) তথা সমতলভূমি/সমভূমি বলে। ৫০১−৯৯৯ ফুট উঁচু হলে তাকে তাল্ল (تَلّ) তথা উচ্চভূমি বা টিলা বলে এবং ১০০০ ফুট বা তার চেয়ে উঁচু হলে তাকে জাবাল (جبل) তথা পাহাড়/পর্বত বলে।

পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গসমূহ

পর্বতের নাম	দেশ/স্থান	উচ্চতা (মিটার)
এভারেষ্ট (Mount Everest/إيرست)	নেপাল, চীন	৮৮৪৮
কারাকোরাম (Kara koram/کره کورم)	জম্মু−কাশ্মির	৮৬১১
কাঞ্চনজঙ্গা (Kanchenjunga/ كنتشنجنغا)	নেপাল	৮৫৮৬
ধবলগিরি (Dhaulagiri/ دهاولاغيري)	নেপাল	৮১৭২
নাঙ্গা পর্বত (Nanga Parbat/ نانكا بربت)	জম্মু−কাশ্মির	৮১২৬
অন্নপূর্ণা (Annapurna/ أنابورنا)	নেপাল	৮০৭৮
গ্যাসেরব্রাম (Gasherbrum/جاشيربروم)	জম্মু−কাশ্মির	৮০৮৬
গোসাইনথান (Gosainthan / شيشابانغما)	তিব্বত	৮০১৩
নন্দাদেবী (Nanda Devi /ناندا ديبي)	ভারত	৭৮১৬

---

[১] উচ্চারণ: হিল্।

[২] উচ্চারণ: মাউন্টেন্।

[৩] উইকিপিডিয়া-য় কমপক্ষে ৬০০ মিটার বা ২০০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট না হলে তাকে পর্বত বলা হয় না বরং তাকে পাহাড় বলা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বক্তব্যের কোন সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

পাহাড়-পর্বত সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছের বিশেষ দু'টো তথ্য

পাহাড়-পর্বত সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছে বিশেষ দু'টো তথ্য বর্ণিত হয়েছে। যথা :

১. পাহাড়-পর্বত পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ.

অর্থাৎ, আর পৃথিবীতে আমি দৃঢ়ভাবে স্থিত পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছি, যেন তা (পৃথিবী) তাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে। (সূরা আম্বিয়া : ৩১)

আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের ভার রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। (মাআরিফুল কুরআন) আধুনিক ভূতত্ত্ববিদদের মতে পৃথিবীর ভেতরের গরম বস্তুসমূহের তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর উপারিভাগে ভাজের সৃষ্টি হয়। এর উচু অংশের-ই নাম হল পাহাড়। এরূপ ঘটার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ওজনের সমতা রক্ষিত হয়। (আল কুরআনুল কারীম, ই. ফা.)

২. পাহাড়-পর্বতের মধ্যে অনুভূতি আছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ.

অর্থাৎ, কতক পাথরও তো এমন আছে, যা থেকে প্রবাহিত হয় ঝরণাসমূহ এবং তন্মধ্যে কতক তো এমন আছে, যা ফেটে যায় অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়, আবার তন্মধ্যে কতক এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে পতিত হয়। (সূরা বাকারা : ৭৪)

আয়াতটি ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের মূল উদ্দেশ্য তথা পাথরের তিনটি প্রকার উল্লেখ করে যা বুঝানো হয়েছে তা হল, কোন কোন পাথর স্বল্প হলেও কিছু পানি প্রবাহিত করে এবং অপেক্ষাকৃত কম হলেও তা দ্বারা সৃষ্টিকূলের উপকার সাধিত হয়। কোন কোন পাথর দ্বারা কেউ উপকৃত না হলেও সেগুলো স্থবির নয় বরং তাতেও কিছুটা ক্রিয়া ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; সেগুলো আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-কম্পিত হয়ে নিচে খসে পড়ে। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এত কঠিন, পথভ্রষ্টতার নিরেট আবরণে এমনভাবে আচ্ছাদিত যে, আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করেও বিগলিত হয় না এবং তাতে সত্য প্রবেশ করে না। আয়াতের উদ্দেশ্য উপরোক্ত বিষয় হলেও আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পাথরের মধ্যেও অনুভূতি আছে।

পাথরের মধ্যে অনুভূতি থাকার বিষয়টি সহীহ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পায়ের তলে উহূদ পাহাড় কেঁপে উঠেছিল আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্থির হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে হাদীছে বর্ণিত আছে। হাদীছটি নিম্নরূপ :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ. (رواه البخاري في صحيحه برقم ٣٦٨٦)

অর্থাৎ, অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বরক, ওমর ও উছমান (রা.)। পাহাড়টি তাদেরসহ কেঁপে উঠল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উহুদ! স্থির হও। তোমার উপর নবী কিংবা সিদ্দীক কিংবা দু'জন শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই। (বোখারী : হাদীছ নং ৩৬৮৬)

পঞ্চম অধ্যায়

(জ্যেতিষ ভূগোল বৃত্তান্ত)

জ্যোতিষ্ক (الكوكب)-এর সংজ্ঞা

আকাশে ছোট বড় জ্যোতির্ময় (আলোকময়/দ্বীপ্তিময়) যত গ্রহ-নক্ষত্র দেখা যায় তার প্রত্যেকটিকে জ্যোতিষ্ক বলা হয়। জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলোক বা উত্তাপ থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে।

নক্ষত্র (النجم)-এর সংজ্ঞা

আকাশে ছোট বড় যেসব জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তার মধ্যে যে জ্যোাতিষ্কের নিজস্ব আলোক ও উত্তাপ রয়েছে, তাকে বলা হয় নক্ষত্র বা তারকা। প্রত্যেকটা নক্ষত্র হল এক একটা অগ্নিপিণ্ড। যেমন সূর্য একটা নক্ষত্র। এর নিজস্ব আলোক ও উত্তাপ রয়েছে। সূর্য পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম নক্ষত্র। নক্ষত্রকে আরবিতে বলা হয় النجم আর ইংরেজিতে বলা হয় Star[১]। বর্তমানে শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা ১০০ কোটিরও বেশি নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন।

---

[১] উচ্চারণ: স্টার্।

উত্তর গোলার্ধের নক্ষত্রপুঞ্জ (مجموعات النجوم في الكرة الشمالية)

আকাশের উত্তর গোলার্ধে অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ কিছু নক্ষত্রের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

নক্ষত্রের নাম ইংরেজিতে	আরবিতে	বাংলায়	পৃথিবী থেকে দূরত্ব
			(আলোকবর্ষে)
Andromeda	المرأة المسلسلة		২.৫৩৭ মিলিয়ন
Auriga	مُمْسك الأعِنَّة	প্রজাপতি	৩,৯০০
The Bear Driver	العواء		
Ophiuchus	الحواء		২০,০০০
Cassiopeia	ذات الكرسي	ক্যাসিওপিয়া/জমদগ্নি	১৪২
North star/ pole star/Polaris	النجم القطبي	ধ্রুবতারা	৪৩৩
Ursa Major/Great Bear	الدُّب الأكبر	বৃহৎ সপ্তর্ষীমণ্ডল	৮০
Ursa Minor/Little Bear	الدُّب الأصغر	লঘু সপ্তর্ষীমণ্ডল	প্রায় ৪৩৪
Alkaid	القائد	মরীচি	১০৪
Mizar	المزار	বশিষ্ট	৮২.৮৪
Alioth	الجون	অঙ্গিরা	৮২.৫২
Megrez	المغرز	অত্রি	৫৮.৪১
Phecda	الفخذ	পুলস্ত্য	৮৩.১৭
Merak	المراق	পুলহ	৭৯.৭৫
Dubhe	الدب	ক্রতু	১২৩
cepheus	قيفاوس		২,৮৩৮
Coma Berenices	الذوَّابة		
Corona Borealis	الإكليل الشمالي		৩.৯ বিলিয়ন
cygnus	الدجاجة		৬,১৯৭
delphinus	الدُّلْفِين	বুসদেব	৩২.৬
draco	التِنين		৩০৩.৩
Equuleus/Foal	الفرس الأصغر/قطعة الفرس		
hercules	كوكبة الجاثي/كوكبة هرقل		
Lacerta	العظاءة		
Leo Minor	ليو الصغير/الأسد الصغير		
Lyra	القِيثارة / النسر الواقع		৬৩৫ থেকে অধিক
Pagasus	الفرس الأعظم		৫০
Perseus	كوكبة الجبار/فرساوس	রেনুকা	১৪৭৫
Sagittarius	كوكبة القوس والرامي	গামা, ধনু	২৬০০
Triangulum	المثلث / كوكبة المثلث		২.৭২৩ মিলিয়ন
Venatici		কনিষ্ঠ কালকজ	

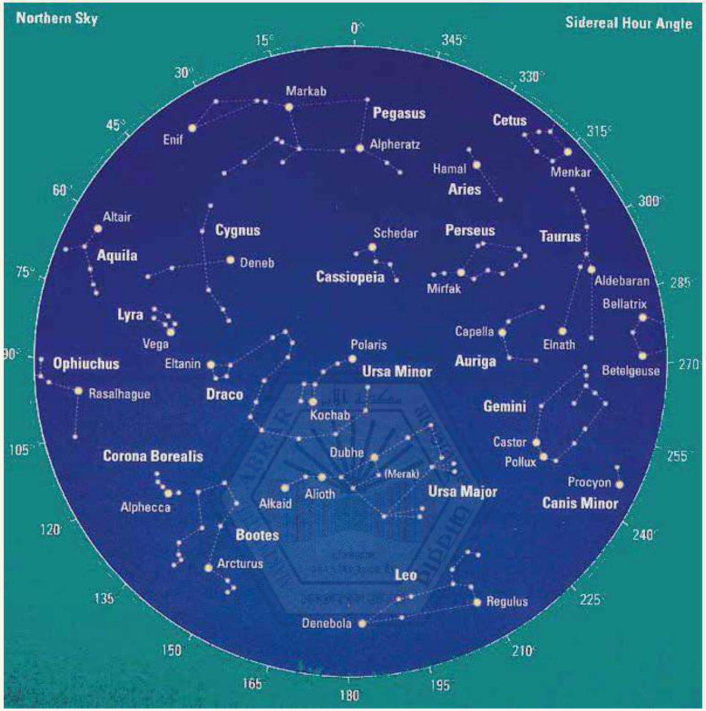
Northern Sky
Sidereal Hour Angle
0°
15°
345°
30°
330°
45°
315°
60°
300°
75°
285°
90°
270°
105°
255°
120°
240°
135°
225°
150°
210°
165
180
195
Markab
Pegasus
Cetus
Enif
Alpheratz
Hamal
Aries
Menkar
Altair
Aquila
Cygnus
Deneb
Schedar
Cassiopeia
Perseus
Mirfak
Taurus
Aldebaran
Bellatrix
Lyra
Vega
Eltanin
Ophiuchus
Rasalhague
Draco
Polaris
Ursa Minor
Capella
Auriga
Elnath
Betelgeuse
Kochab
Gemini
Corona Borealis
Dubhe
(Merak)
Castor
Pollux
Alphecca
Alkaid
Alioth
Ursa Major
Procyon
Canis Minor
Bootes
Arcturus
Leo
Regulus
Denebola

চিত্র নং ৩৪ – উত্তর গোলার্ধের নক্ষত্রপুঞ্জ

দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রপুঞ্জ (مجموعات النجوم في الكرة الجنوبية)

আকাশের দক্ষিণ গোলার্ধেও অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ কিছু নক্ষত্রের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

নক্ষত্রের নাম ইংরেজিতে	আরবিতে	বাংলায়	পৃথিবী থেকে দূরত্ব (আলোকবর্ষে)
Southern Cross/ Crux	صَليب الجنوب	ত্রিশঙ্কু	৮৮
Fornax			৬২ মিলিয়ন
Horologium	الساعة		
Reticulum	الشبكة		৩৯
Hydrus	حيتة الماء		২৪.৩৮
Eridanus	النهر		
Orion	كوكبة الجبار/الجوزاء	কালপুরুষ	১,৩৬০
Lepus	الأرنب		৪১,০০০
Columba	كوكبة الحمامة		
Canis minor	الكلب الأصغر/الشِّعرى الشامية		১১.৪
Canis major/ Dog Star/Sirius	الكلب الأكبر/الشِّعرى اليمانية	লুব্ধক	৪,৮৯২
Caelum			৫৭.৮৬
Volant	السمكة الطيارة		
Pyxis	نجمة الجرس		৩২.৬
Monoceros	مونوسيروس		২০,০০০
puppies	الجراء		১৮২
Carina	النجوم كارينا		৭,৫০০
Chamaelon	حِرْباء		১৬৬.৭৩
Sextans	نجمة السداسية		৩২.৬
Crater	فوَّهة بُرْكانيّة		৩২.৬
Hydra	الهِيدرة	বাসুকি	৩২.৬
Antlia			৫০ মিলিয়ন
Corvus	الغُراب	মণিবন্ধ	
Centauri	قِنطورس		৪.৩৬৭
Crux/Southern Cross	صَليب الجنوب	ত্রিশঙ্কু/বিশ্বামিত্র	৮৮
Musca	كوكبة الذبابة		৩২.৬
Lupus	نجم الذئبة		৭,২০০
Circinus			২.৫৩৭
ara			৩২.৬
Triangulum Australe	المثلث الجنوبي		
Apus			৩২.৬
Serpense Cauda	ذنب الحية		২৪.৬০
Scutum Sobiesci		ঢাল	৪১.৫৪
Corona Australis	الإكليل الجنوبي		৪০০
Telescopium			
Perseus	الطاؤس		৬০০

Aquila			১৭
Octant	النجمة المُثمنة		
Grus			৩২.৬
Tucana			৩২.৬
Cetus	قَيطَس		৯৬
Sculptor	النقاش		৫০০
Phoenix	طائر الفينيق		৫.৭

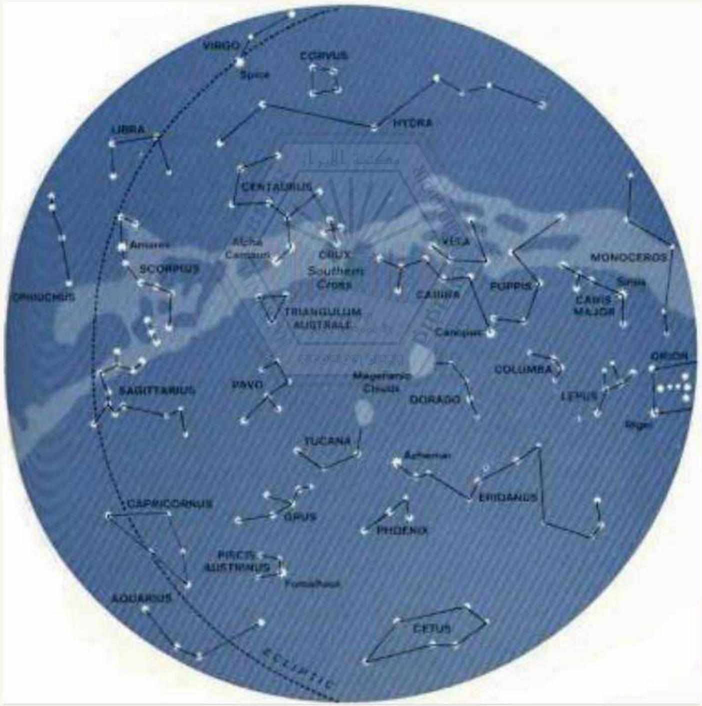
VIRGO
Spica
CORVUS
HYDRA
LIBRA
CENTAURUS
Antares
Alpha Centauri
CRUX
Southern Cross
VELA
MONOCEROS
SCORPIUS
OPHIUCHUS
TRIANGULUM AUSTRALE
CARINA
PUPPIS
Sirius
CANIS MAJOR
Canopus
ORION
SAGITTARIUS
PAVO
Magellanic Clouds
DORADO
COLUMBA
LEPUS
Rigel
TUCANA
Achernar
CAPRICORNUS
GRUS
PHOENIX
ERIDANUS
PISCIS AUSTRINUS
Fomalhaut
AQUARIUS
CETUS
ECLIPTIC

চিত্র নং ৩৫ – দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ

রাশিচক্রের নক্ষত্রপুঞ্জ (مجموعات النجوم في منطقة البروج)

নক্ষত্রের নাম ইংরেজিতে	আরবিতে	বাংলায়	পৃথিবী থেকে দূরত্ব (আলোকবর্ষে)
Aries	بُرْج الحَمَل	মেশরাশি	৬৬
Taurus	بُرْج الثَّور	বৃষরাশি	
Gemini	بُرْج الجَوْزاء	মিথুনরাশি	
Cancer	برج السَّرْطان	কর্কটরাশি	
Leo/Lion	برج الأسَد	সিংহরাশি	৩৭
Virgo	برج السُّنبُلَة/برج العَذراء	কন্যারাশি	
Libra	برج الميزان	তুলারাশি	১৬০
Scorpio	برج العقرب	বৃশ্চিকরাশি	
Sagittarius	برج القَوس	ধনুরাশি	৪০০০
Capricorn	برج الجَدْي	মকররাশি	
Aquarius	برج الدلو	কুম্ভরাশি	৬০০
Pisces	برج الحُوت	মীনরাশি	১৩৮

উল্লেখ্য, এই অধ্যায়েই সামনে 'রাাশিচক্র' শিরোনামে ১২ রাশি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

গ্রহ (الكوكب السيار)-এর সংজ্ঞা

যে জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলোক বা তাপ নেই তা গ্রহ নামে পরিচিত। যেমন পৃথিবী একটি গ্রহ। এর নিজস্ব কোন আলোক বা তাপ নেই। গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করে। গ্রহকে আরবিতে বলা হয় الكوكب السيار আর ইংরেজিতে বলা হয় Planet[১]।

উপগ্রহ (قَمر)-এর সংজ্ঞা

কোন প্রধান গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী জ্যোতিষ্ককে বলা হয় উপগ্রহ (قَمر /Satellite[২])। উপগ্রহ হল অনুষঙ্গী গ্রহ। যেমন চাঁদ হল একটি উপগ্রহ (পৃথিবীর উপগ্রহ)। চাঁদ পৃথিবী নামক গ্রহের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে।

ছায়াপথ (المَجَرَّة)

বিজ্ঞানের ভাষায় ছায়াপথ মহাকর্ষীয় শক্তি দ্বারা আবদ্ধ একটি অতি বৃহৎ সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা যা তারকা, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণা, প্লাজমা [৩] এবং প্রচুর পরিমাণে অদৃশ্য বস্তু দ্বারা গঠিত।

---

১. উচ্চারণ: প্ল্যানিট্। ২. উচ্চারণ: স্যাটেলাইট্। ৩. প্লাজমা হচ্ছে পদার্থের তথাকথিত চতুর্থ অবস্থা (কঠিন, তরল ও বায়বীয়-এর পর)। প্লাজমা অবস্থায় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে না।

সহজ ভাষায় বলা যায়, কোটি কোটি নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি দিয়ে আবৃত্ত স্থান হল ছায়াপথ। বিচ্ছিন্ন তারকা ছাড়াও ছায়াপথে বহু তারা ব্যবস্থা, তারা স্তবক[১] এবং বিভিন্ন ধরনের নীহারিকা থাকে। ছায়াপথ হচ্ছে নক্ষত্রজগৎ। ইংরেজিতে বলা হয় গ্যালাক্সি (Galaxy)। অন্ধকার রাতে পরিষ্কার আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে তাকলে আকাশে সাদা মেঘের মতো বিস্তীর্ণ এলাকা দেখতে পাওয়া যায়, যা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত, এটাই হচ্ছে ছায়াপথ (Milky way)।

Galaxy (গ্যালাক্সি) শব্দটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ Galaxias kyklos থেকে, যার অর্থ হচ্ছে দুধের রাস্তা বা দুগ্ধ-প্রণালী। আর Milky way (মিল্কিওয়ে) শব্দের অর্থও দুধাল পথ। এ হিসেবে গ্যালাক্সি ও মিল্কিওয়ে শব্দ দু'টি মূলত একই অর্থ বহন করে। তবে গ্যালাক্সি শব্দটি বিশেষ একটি মিল্কিওয়ে তথা বিশেষ একটি ছায়াপথের অর্থেও প্রয়োগ হয়। যেমন আমরা যে ছায়াপথে অবস্থিত তাকেও ইংরেজিতে শুধু গ্যালাক্সি নামে পরিচয় দেয়া হয়। একে মিল্কিওয়ে, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি নামেও পরিচয় দেয়া হয়।

আমাদের পৃথিবী, সূর্য ও তার গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে যে সৌরজগত গড়ে উঠেছে এরকম অসংখ্য নক্ষত্র-ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত হয় এক একটি ছায়াপথ। আমাদের সৌরজগতের সূর্য আকাশগঙ্গা (ইংরেজি: Milky way/Galaxy) নামক ছায়াপথের অংশ।

মহাবিশ্বে ছায়াপথের সংখ্যা রয়েছে অনেক। গত শতাব্দির শেষ দশকের মাঝামাঝি জ্যোতির্বিদরা এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, এ সংখ্যা ২শ বিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে। একটি আদর্শ ছায়াপথে ১০ মিলিয়ন থেকে এক ট্রিলিয়ন পর্যন্ত তারকা থাকে।

নিম্নে দুইটি চিত্রে দুই আকাশের ছায়াপথ প্রদর্শন করা হল।

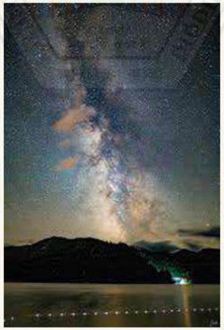

চিত্র নং ৩৬ – উত্তর আকাশের ছায়াপথ

---

[১] একসঙ্গে থাকা তারার সমষ্টিকে বলে তারার স্তবক। অনেক বড় জায়গা নিয়ে দেখলে যদি তারকাগুলোকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় সেটাকে বলে উন্মুক্ত তারার স্তবক। ইংরেজিতে বলে ওপেন ক্লাস্টার অথবা গ্যালাক্টিক ক্লাস্টার। আর অপেক্ষাকৃত ঘনসংবদ্ধ মনে হলে সেটাকে বলে ঘনসংবদ্ধ তারার স্তবক বা বর্তুলাকার স্তবক। ইংরেজিতে বলে গ্লোবুলার ক্লাস্টার।

চিত্র নং ৩৭ – দক্ষিণ আকাশের ছায়াপথ

ছায়াপথ প্রধানত ৩ প্রকারের। যথা:– উপবৃত্তাকার (ডিম্বাকৃতির) ছায়াপথ (elliptical galaxy), সর্পিল ছায়াপথ (spiral galaxy) অথবা অনিয়মিত আকৃতির ছায়াপথ (irregular galaxy)।

নিম্নে তিনটি চিত্রে প্রথম তিন প্রকারের ছায়াপথ স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হল।

চিত্র নং ৩৮ – উপবৃত্তাকার ছায়াপথ

চিত্র নং ৩৯ – সর্পিল ছায়াপথ

চিত্র নং ৪০ – অনিয়মিত আকারের ছায়াপথ

ব্লাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর

ব্ল্যাক হোল (black hole/الثقب الأسود)-এর বাংলা হল কৃষ্ণগহ্বর, কৃষ্ণ বিবর, অন্ধকূপ, অন্ধগহ্বর, কালো গর্ত। ব্ল্যাক হোল হচ্ছে নক্ষত্র বা তারকার এমন একটি অবস্থা বা পর্যায় যে পর্যায়ে এ থেকে আলো নির্গত হতে পারে না। আলো নির্গত না হতে পারার কারণ হল তার ভর ও ঘনত্ব বেশি থাকা। তার ভর ও ঘনত্ব বেশি থাকার কারণে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হয় যে, সেখান থেকে কোন কিছু এমনকি আলো পর্যন্ত নির্গত হতে পারবে না। আর কোন কিছু থেকে আলো নির্গত না হলে তা দেখা যায় না। উল্লেখ্য, পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোন বস্তুর পদার্থের পরিমাণকে ভর বলা হয়। যে কোন গ্রহ-উপগ্রহে নেয়া হোক বস্তুর ভর সমান থাকে। পক্ষান্তরে ওজন হল কোন বস্তুর উপর কার্যকর অভিকর্ষ বল। অর্থাৎ, অভিকর্ষের তারতম্যে বস্তুর ওজনে তারতম্য হয়। একারণেই অভিকর্ষের তারতম্য থাকায় গ্রহে গ্রহে একই বস্তুর ওজনে পার্থক্য ঘটে থাকে। এই অভিকর্ষ বল হচ্ছে আকর্ষণী শক্তি। পৃথিবী আপনাকে আমাকে যে আকর্ষণ করছে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ। এই মহাকর্ষ বা অভিকর্ষ-এর সঙ্গে 'বল' শব্দ যোগ করে মহাকর্ষ বল, অভিকর্ষ বল– এভাবে বলা হয়ে থাকে। ভর ও ঘনত্ব বেশি হলে মহাকর্ষীয় বলের মান তথা আকর্ষণী শক্তিও বৃদ্ধি পায়। ব্লাক হোলের স্থানে ভর ও ঘনত্ব বেশি থাকার ফলে সেখানে সাধারণ মহাকর্ষীয় বলের মান এত বেশি হয়ে যায় যে, এটি মহাবিশ্বের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করে। ফলে এ থেকে কোন কিছুই সরে যেতে পারে না।

এখন পর্যন্ত ব্ল্যাক হোলের কোন প্রত্যক্ষ দর্শন পাওয়া যায়নি। কারণ, এ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না। আর কোন কিছু থেকে আলো বিচ্ছুরিত না হলে তা দেখা যায় না। ব্ল্যাক হোল থেকে কোন আলো তো বিচ্ছুরিত হয়ই না বরং এটি তার নিজের দিকে আসা সকল আলোক-রশ্মিকে শুষে নেয়। ব্ল্যাক হোক যেহেতু দেখা যায় না, তাই তার নামকরণ হয়েছে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহ্বর। ব্ল্যাক হোল দেখা যায়নি, কিন্তু এর উপস্থিতির প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। আশে-পাশের তারামণ্ডলীর গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা ব্ল্যাকহোলের অস্তিত্বের প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন। প্রতিটি গালাক্সির স্থানে স্থানে কম-বেশি ব্লাক হোলের অস্তিতের কথা জানা যায়।

সর্বপ্রথম ১৮৮৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন মিচেল (John Mitchell) এ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, একটি নক্ষত্রে যদি যথেষ্ট ভর ও ঘনত্ব থাকে, তাহলে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হবে যে, সেখান থেকে কোন কিছু এমনকি আলো পর্যন্ত নির্গত হতে পারবে না। সেই নক্ষত্রের পৃষ্ঠ থেকে নির্গত আলো দূরে যাওয়ার আগেই নক্ষত্রের প্রবল আকর্ষণ তাকে পেছনে টেনে নিয়ে আসবে। এরকম বহুসংখ্যক নক্ষত্র রয়েছে বলে জন মিচেল ধারণা করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জন হুইলার (John Wheeler) সর্বপ্রথম Black Hole (কৃষ্ণগহ্বর) কথাটি ব্যবহার করেন।

ইদানিং কেউ কেউ কুরআনের নিম্নোক্ত দুটি স্থানের ৩টি আয়াত থেকে ব্লাক হোল প্রমাণিত বলে দাবি করছেন।

১. সূরা ওয়াকেয়ার ৭৫ নং আয়াত–

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ.

অর্থাৎ, যেসব স্থানে নক্ষত্র পতিত হয় আমি তার শপথ করে বলছি, ...।

তারা বলেন, মহাকাশের প্রতিটি নক্ষত্র তার জীবনচক্র সমাপন করে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যায়। সূর্যের চেয়ে যেসব নক্ষত্রের ভর ৮ থেকে ১৫০ গুণ বেশি তারা জীবনের শেষভাগে সুপারনোভায় (নবজাতক নক্ষত্রে) পরিণত হয়। অর্থাৎ তাদের বিস্ফোরণ ঘটে। আর এই বিস্ফোরণে জন্ম নেয় ব্লাক হোলের। আয়াতে নক্ষত্রের পতিত হওয়ার স্থান বলে এই বিস্ফোরণের স্থান বা ধ্বংসের স্থানকে বুঝানো হয়েছে। অতএব আয়াতটি দ্বারা ব্লাক হোলের বিষয়টি প্রমাণিত।

২. সূরা তাকবীরের ১৫–১৬ নং আয়াতদ্বয়–

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ، الْجَوَارِ الْكُنَّسِ.

অর্থাৎ, আমি শপথ করছি সেসব নক্ষত্রের যা পিছন দিকে চলে, যা চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা বলেন, আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত পিছন দিকে চলতে চলতে তথা পশ্চাদপসরণ করতে করতে অদৃশ্য হওয়ার স্থানটিই হল ব্লাক হোল।

উপরোক্ত ৩টি আয়াত দ্বারা ব্লাক হোল প্রমাণিত করার এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল ব্লাক হোলের বিষয়টি এখনও সন্দেহাতীতভাবে কিংবা চাক্ষুসভাবে প্রমাণিত বিষয় নয়। আর বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য সন্দেহাতীতভাবে কিংবা চাক্ষুসভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেই তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনের কোন বিষয়ের দ্ব্যর্থহীন ও অকাট্য পর্যায়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা যায় না। তবে সেরূপ সম্ভাবনা রয়েছে– এমন বক্তব্য প্রদান করা যায় কি না? এ ব্যাপারে কয়েকটি কথা আমাদের সামনে রাখতে হবে। তা হল– মুজাহিদ, কাতাদাহ, হাসানে বসরী প্রমুখ তাবিয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী মুফাসসিরগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল– مَوَاقِعِ النُّجُوْمِ দ্বারা নক্ষত্রের অস্তাচল, কিংবা উদয়াচল ও অস্তাচল উভয়, কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন নাযেল হওয়ার বিভিন্ন কিস্তী, কিংবা কেয়ামতের দিন নক্ষত্ররাজির খসে পড়ার স্থান ইত্যাদি উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকায় বুঝা গেল যে, শব্দটির উদ্দেশ্য দ্ব্যর্থহীন নয়, বরং শব্দের মধ্যে বেশ অবকাশ রয়েছে। এমনিভাবে اَلْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ দ্বারাও কি উদ্দেশ্য তা নিয়েও পূর্বসূরীদের অনেক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে চন্দ্র, সূর্য, শনিগ্রহ, বুধগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ, শুক্রগ্রহ ও বৃহস্পতিগ্রহ– এই ৭টি বিশেষ গ্রহ নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, শেষোক্ত ৫টি গ্রহের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা জঙ্গলী গরু উদ্দেশ্য, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এমন উক্তি রয়েছে। যাহোক এখানেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকায় বুঝা গেল যে, শব্দটির উদ্দেশ্য দ্ব্যর্থহীন নয়, বরং শব্দের মধ্যে বেশ অবকাশ রয়েছে। যেহেতু উভয় স্থানে শব্দের অর্থ অকাট্য বা নিশ্চিত নয়, বরং শব্দের মধ্যে বেশ অবকাশ রয়েছে, আর বৈজ্ঞানিকভাবে ব্লাক হোল অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হলেও প্রবল ধারণার পর্যায়ে অবশ্যই পৌছেছে, তাই তাফসীরের নীতি অনুসারে مَوَاقِعِ النُّجُوْمِ ও اَلْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ দ্বারা ব্লাক হোলের অবকাশ থাকার পর্যায়ে বক্তব্য চলতে পারে, কিন্তু অকাট্যভাবে বলা যাবে না যে, ব্লাক হোলই উদ্দেশ্য। والله اعلم بالصواب

গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আকাশকে সজ্জিত করা হয়েছে

এখন পর্যন্ত যত জ্যোতিষ্ক (গ্রহ-নক্ষত্র) আবিষ্কার হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা আবিষ্কার হবে (বা হবে না) কুরআনে কারীমের বর্ণনা অনুযায়ী সব গ্রহ-নক্ষত্রই প্রথম আকাশের নিচে। এসব গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা প্রথম আকাশকে সজ্জিত করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ.

অর্থাৎ, আমি প্রথম আকাশকে জ্যোতিষ্কমণ্ডল (গ্রহ-নক্ষত্র) দ্বারা সজ্জিত করেছি। (সূরা সাফফাত: ৬)

এ আয়াত থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, সব গ্রহ-নক্ষত্র প্রথম আকাশের নিচে। কেননা জ্যোতিষ্কমণ্ডল (গ্রহ-নক্ষত্র) দ্বারা প্রথম আকাশকে সাজানোর করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আর একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আকাশকে সজ্জিত করা হয়েছে।

গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা আকাশের সৌন্দর্য সাধিত হয়। আবার এই সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। কেননা সব গ্রহ-নক্ষত্রের গতি রয়েছে। ফলে উদাহরণ স্বরূপ আজ রাত ১২টায় যেসব গ্রহ-নক্ষত্রের যে যে স্থানে অবস্থানের কারণে আকাশের যে রূপ দেখা যাবে, আগামী রাতে এই সময় সেসব গ্রহ-নক্ষত্র তাদের গতির ফলে আরও কিছু পশ্চিমে সরে থাকা দেখা যাবে, আবার নতুন কিছু গ্রহ-নক্ষত্র যা গত রাতে পূর্ব দিগন্তের নিচে ছিল সেগুলো তাদের গতির ফলে দিগন্তের উপরে উঠে আসবে এবং কিছু গ্রহ-নক্ষত্র তাদের গতির ফলে পশ্চিম দিগন্তের নিচে চলে যাবে। এসব কিছু মিলিয়ে প্রতি রাতেই আকাশের সজ্জার পরিবর্তন দেখা যাবে। এভাবে প্রতি রাতেই আকাশ নতুন সাজে সজ্জিত হয়। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তাআলা গ্রহ-নক্ষত্রকে আকাশের সৌন্দর্য বানিয়েছেন, যে সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রবৎ এবং পথ লাভ করার নিদর্শনও বানিয়েছেন। পরবর্তীতে এ অধ্যায়েই 'জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ইসলাম' শিরোনামে এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

সৌরজগত (النظام الشمسي)-এর সংজ্ঞা ও পরিচিতি

সূর্য ও তার অনুসারী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে যে জগৎ গড়ে উঠেছে তাকে বলে সৌরজগত (Solar[১])। আমাদের সৌরজগতে রয়েছে পৃথিবী (الأرض/Earth[২]), মঙ্গল (مِرِّيخ/Mars[৩]), বুধ (عُطارِد/Mercury[৪]), বৃহস্পতি (مُشتَرِي/Jupiter[৫]), শুক্র (زُهره/Venus[৬]), শনি (زُحَل/Saturn[৭]), ইউরেনাস (أُورانُوس/Uranus), নেপচুন (نِبتُون/Neptune) ও প্লুটো (أَفلُوطُن/Pluto) নামক ৯টি গ্রহ। কতিপয় গ্রহের উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, লক্ষ লক্ষ ধুমকেতু, উল্কা, উল্কাপিণ্ড, অতিসুক্ষ্ম ধুলিকণা এবং গ্যাস– এই সব মিলে হল আমাদের সৌরজগত।

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রহগুলোর মধ্যে প্লুটো হচ্ছে সবচেয়ে দূরতম গ্রহ। সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব ৫৯১ কোটি কিলোমিটার। আর সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্যের আর কোন নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত না হলে প্লুটোর দূরত্ব পর্যন্ত হল এই সৌরজগতের আয়তন। (তথ্যসূত্র: প্রাকৃতিক পরিবেশ ও المورد প্রভৃতি)

---

১. উচ্চারণ: সোল্যার্। ২. উচ্চারণ: আর্থ্। ৩. উচ্চারণ: মার্স্। ৪. উচ্চারণ: মার্কিউরি। ৫. উচ্চারণ: জুপিটার্।
৬. উচ্চারণ: ভীনাস্। ৭. উচ্চারণ: স্যাটার্ণ।

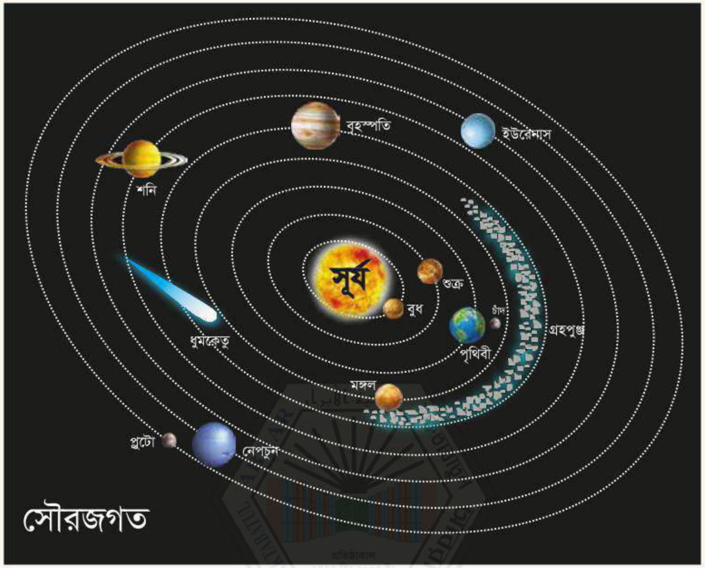

চিত্র নং ৪১ – সৌরজগতের চিত্র

সৌরজগত সম্পর্কে একটি নোট:

উল্লেখ্য, সৌরজগতের উপরোক্ত ৯টি গ্রহের বর্ণনাই প্রসিদ্ধ। তবে ২০০৬ সালের ২৪ আগস্ট চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন'-এর ২৬তম বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে গ্রহের নতুন সংজ্ঞা ঘোষণা করে প্লুটোকে তার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্টের কারণে সাধারণ গ্রহ (অভিজাত গ্রহ)–এর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 'ডোয়ার্ফ প্লানেট' (Dwarf planet/كوكب قَزَم) বা 'বামন গ্রহ'[১] হিসেবে নতুন তালিকাভুক্ত করা হয় এবং বামন গ্রহের

---

১. 'ডোয়ার্ফ প্লানেট' বা 'বামন গ্রহ' বলতে বুঝায় যার ভর গ্রহের সমান, কিন্তু গ্রহও নয়, উপগ্রহও নয়। যা সরাসরি প্রদক্ষিণ করে, যা নিজস্ব আকৃতি পাবারমত অভিকর্ষের মালিক, কিন্তু কক্ষপথকে অন্যান্য বস্তু থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র করতে পারেনি। উল্লেখ্য, এই টীকায় 'ভর' ও 'অভিকর্ষ'– এই দুটো শব্দ এসেছে। পদার্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোন বস্তুর পদার্থের পরিমাণকে ভর বলা হয়। যে কোন গ্রহ-উপগ্রহে নেয়া হোক বস্তুর ভর সমান থাকে। পক্ষান্তরে ওজন হল কোন বস্তুর উপর কার্যকর অভিকর্ষ বল। অর্থাৎ, অভিকর্ষের তারতম্যে বস্তুর ওজনে তারতম্য হয়। একারণেই অভিকর্ষের তারতম্য থাকায় গ্রহে গ্রহে একই বস্তুর ওজনে পার্থক্য ঘটে থাকে। একই কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠে একটা বস্তুর যা-ই ওজন থাকুক সে বস্তুটাকে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে তার ওজন শূণ্য হয়ে যায়। কারণ, পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষ ০ (শূণ্য)। (টীকার অবশিষ্টাংশের জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকা দ্র.)

তালিকায় সিরেস, এরিস ও মেইকমেইক নামক আরও তিনটি গ্রহকে যোগ করা হয়। যার ফলে বর্তমানে সৌরজগতের গ্রহের সংখ্যা ১২টি; যার ৮টি অভিজাত গ্রহ (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন) আর ৪টি বামন গ্রহ (প্লুটো, সিরেস, এরিস ও মেইকমেইক)। (তথ্যসূত্র: সৌরজগত) 'wikipedia'এর বর্ণনায় (২০১৮ সাল) দেখা যায় হৌমিয়া নামক আরও একটি বামন গ্রহ মিলে বর্তমান পর্যন্ত বামন গ্রহের সংখ্যা পাঁচ। এ ছাড়াও পত্র-পত্রিকায় ও নেটে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ আবিষ্কারের তথ্য দেখা যায়, তবে সেগুলো এখনও প্রতিষ্ঠিত তথ্যের মর্যাদা লাভ করেনি। ভবিষ্যতে সেরূপ মর্যাদা লাভ করলে তা গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যায় সংযোজন বলে গণ্য হবে।

সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য

প্রথমে সৌরজগতের রাজা সূর্য সম্পর্কে কিছু তথ্য, তারপর সূর্য থেকে দূরত্বের তারতম্যের ধারাবাহিকতা অনুসারে গ্রহগুলো সম্বন্ধে তথ্যাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে।

সূর্য (الشمس/Sun)

পরিচিতি	সূর্য একটি নক্ষত্র বা তারা।
কী পদার্থে তৈরি	সূর্য সম্পূর্ণ গ্যাসীয় পদার্থে তৈরি। এর ৭৪% হাইড্রোজেন[১], ২৫% হিলিয়াম[২] ও ১% অন্যান্য পদার্থ।
আকার	পৃথিবী থেকে ১৩ লক্ষ গুণ বড়।
ব্যাস	সূর্যের ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৪ কিলোমিটার।
পৃথিবী থেকে গড় দূরত্ব	১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার।
পৃথিবী থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব	১৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার।
পৃথিবী থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব	১৫ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত	প্রায় ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।
আলো আসতে সময় লাগে	
তাপমাত্রা (কেন্দ্রে)	২ কোটি ৩৩ লক্ষ ফারেনহাইট[৩]।
তাপমাত্রা (বহিঃভাগে)	প্রায় ১০ হাজার ফারেনহাইট।

তথ্যসূত্র: فهم الفلكيات ও সৌরজগত গ্রন্থদ্বয়

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকার অবশিষ্টাংশ) আর মহাবিশ্বের বস্তুসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যে আকর্ষণ রয়েছে তাকে বলা হয় মহাকর্ষ। এ হিসেবে পৃথিবীরও মহাকর্ষ রয়েছে, তবে পৃথিবীর মহাকর্ষকে বিশেষভাবে অভিকর্ষ বলা হয়। অর্থাৎ, কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণই অভিকর্ষ। পৃথিবী আপনাকে আমাকে যে আকর্ষণ করছে এটাই হচ্ছে পৃথিবীর অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ। এই মহাকর্ষ বা অভিকর্ষ–এর সঙ্গে 'বল' শব্দ যোগ করে মহাকর্ষ বল, অভিকর্ষ বল– এভাবে বলা হয়ে থাকে। এই 'বল' কী? কোন গতিশীল বস্তুকে স্থিতিশীল করা বা করার চেষ্টা করা কিংবা কোন স্থিতিশীল বস্তুকে গতিশীল করার যে বাহ্যিক কারণ তা-ই হচ্ছে 'বল'। (এই পৃষ্ঠার ১, ২ ও ৩ নং টীকার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)

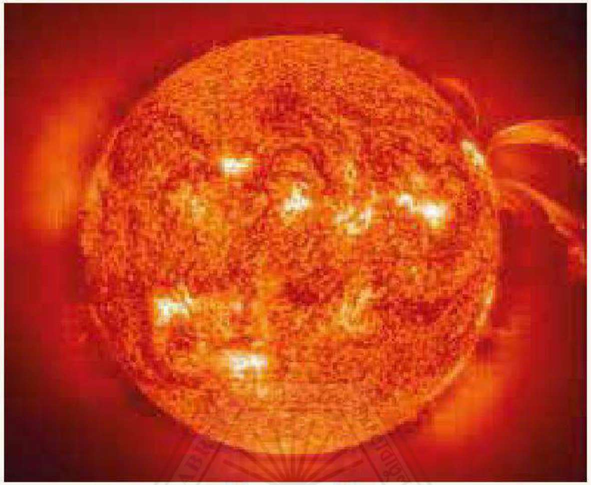

ছবি নং ৪২ – সূর্য

বুধ গ্রহ (عُطارِد/Mercury)

পরিচিতি	সূর্যের নিকটতম গ্রহ।
ব্যাস	৪,৮৭৮ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	৫ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০০ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব	৪ কোটি ৭০ লক্ষ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব	৭ কোটি কিলোমিটার।

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকাসমূহ)

১. হাইড্রোজেন হচ্ছে এক ধরনের গ্যাস, যা মহাবিশ্বের সবচেয়ে হালকা গ্যাস হিসেবে স্বীকৃত।

২. হিলিয়ামও এক ধরনের হালকা গ্যাস। হালকা গ্যাসের বিচারে হিলিয়ামের স্থান দ্বিতীয়।

৩. ফারেনহাইট (বা ফারেনহাইট স্কেল) হচ্ছে তাপমাত্রা পরিমাপের একটি একক। জার্মান পদার্থবিদ ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট (১৬৮৬–১৭৩৬) –এর নামানুসারে এই নামকরণ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য সেলসিয়াস (দ্রষ্টব্য পরবর্তী টীকা) স্কেল ব্যবহৃত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ অল্প কিছু দেশ যেমন: ব্রাজিলে এখনও ফারেনহাইট স্কেল ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছু স্কেলে দুটো বৃত্ত থাকে, যার একটিতে ফারেনহাইট অপরটিতে সেলসিয়াস প্রদর্শিত হয়। ফারেনহাইট বোঝাতে °F –এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

তাপমাত্রা	যে অংশটি সূর্যের দিকে তার তাপমাত্রা ৪২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস আর যে অংশ সূর্যের বিপরীত দিকে তার তাপমাত্রা মাইনাস (-) ১৭৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস।
গতিবেগ	এর কক্ষ পরিক্রমণের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৪১ কিলোমিটার।
উপগ্রহ	বুধ গ্রহের কোন উপগ্রহ নেই।
দর্শনীয় অবস্থা	কখনও সন্ধায় কখনও সকালে দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্যের অধিক নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয় না।
গতির বৈশিষ্ট	সব গ্রহের চেয়ে বুধ গ্রহের গতি বেশি।

তথ্যসূত্র: فهم الفلكيات , فلكيات جديده ও সৌরজগত গ্রন্থসমূহ

ছবি নং ৪৩ – বুধ গ্রহ

শুক্র গ্রহ (زهره/Venus)

পরিচিতি	শুক্র একটি গ্রহ। এটিকে পৃথিবীর যমজ গ্রহ বলা হয়। কেননা এ দুটি গ্রহের আকার ও ভর প্রায় সমান। এটি পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। এটি সূর্য ও চন্দ্রের পর আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ।
ব্যাস	১২ হাজার ১০৩ কিলোমিটার।
পৃথিবী থেকে দূরত্ব	কোন কোন সময় ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যে চলে আসে।
সূর্য থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব	১০ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব	১০ কোটি ৯০ লক্ষ কিলোমিটার।

গতিবেগ	কক্ষ পরিক্রমণের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার কিলোমিটার। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে মাত্র ২২৪ মতান্তরে ২২৫ দিন।
আবর্তনের সময়	নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৪৩ দিন।
দর্শনীয় অবস্থা	শুক্রগ্রহকে বছরের কিছুদিন শেষ রাতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত 'শুকতারা' হিসেবে এবং কিছুদিন সন্ধায় সূর্যাস্তের পরে 'সন্ধাতারা' হিসেবে দেখা যায়। এজন্য এটাকে সকাল সন্ধার তারা বলা হয়।
উপগ্রহ	শুক্রগ্রহের কোন উপগ্রহ নেই।

তথ্যসূত্র: فهم الفلكيات , فلكيات جديده ও সৌরজগত গ্রন্থসমূহ

ছবি নং ৪৪ – শুক্র গ্রহ

পৃথিবী (الأرض/Earth)

পরিচিতি	পৃথিবী একটি গ্রহ। আপাতত কেবল এ গ্রহেই প্রাণী জগতের অস্তিত্ব আছে বলে আমরা জানি।
ব্যাস	১২ হাজার ৭৫৬ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব	১৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব	১৫ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার।
নিজ অক্ষে পৃথিবীর	প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার বেগে প্রতি ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে তার অক্ষের
আবর্তনের গতি ও সময়	উপর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে।
কক্ষপথে পৃথিবীর গতি	ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটার।

সূর্যকে প্রদক্ষিণ	গড়ে প্রতি ৩৬৫.২৫৬ দিনে পৃথিবী সূর্যকে ১বার প্রদক্ষিণ করে।
উপগ্রহ	১টি অর্থাৎ, চাঁদ।

তথ্যসূত্র: فهم الفلكيات ও সৌরজগত গ্রন্থদ্বয়

ছবি নং ৪৫ – পৃথিবী গ্রহ

চাঁদ (قمر/Moon)

পরিচিতি	চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। এটি হচ্ছে সব উপগ্রহের রাণী।
ব্যাস	৩ হাজার ৪৭৫ কিলোমিটার।
আকার	পৃথিবীর ৪৯ ভাগের ১ ভাগ।
ওজন	পৃথিবীর ৮১ ভাগের ১ ভাগ।
পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব	৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার।
চাঁদের রাত ও দিন	চাঁদের রাত ও দিন পৃথিবীর প্রায় ১৫ দিনের সমান। অর্থাৎ, প্রতি চান্দ্র মাসে ১টা দিন ও ১টা রাত দেখা যায়।
চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি	চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ১/৬ অংশ। তাই ৬০ কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষের চাঁদে ওজন হয় মাত্র ১০ কিলোগ্রাম।
নিজ অক্ষের উপর চাঁদের	অক্ষের উপর চাঁদের এক পাক ঘুরতে সময় লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা
আবর্তনের সময়	৪৩ মিনিট ১১.৫ সেকেন্ড। (২৭.৩২২ দিন)

পৃথিবীর চারদিকে কক্ষপথে চাঁদের পরিক্রমণের সময়	পূর্ববৎ– ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১.৫ সেকেন্ড।
কক্ষপথে চাঁদের পরিক্রমণের গতিবেগ	ঘণ্টায় প্রায় ৩ হাজার ৬৭৩ কিলোমিটার।
চাঁদের তাপমাত্রা	দিনের বেলায় চাঁদের পৃষ্ঠে তাপমাত্রা ১০৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস আর রাতের বেলায় তা গড়ে মাইনাস (-) ১৫৩ ডিগ্রীতে নেমে আসে।
চান্দ্র মাস হয়	২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ২.৮ সেকেন্ডে।
চাঁদের দর্শনীয় অংশ	পৃথিবী থেকে চাঁদের একশত ভাগের ৫৯ ভাগ দেখা যায়।
চাঁদের দিন রাত	চাঁদের ১ দিন প্রায় আমাদের ১৪ দিনের সমান। এমনিভাবে চাঁদের ১ রাত প্রায় আমাদের ১৪ রাতের সমান।

তথ্যসূত্র: فلكيات جديده ও সৌরজগত প্রভৃতি

ছবি নং ৪৬ – চাঁদ উপগ্রহ

মঙ্গল গ্রহ (مريخ/Mars)

পরিচিতি	মঙ্গল একটি গ্রহ। অভ্যন্তরীণ গঠনের দিক থেকে মঙ্গল গ্রহ অনেকটা পৃথিবীর মত।
ব্যাস	৬৭ হাজার ৫৭৮ কিলোমিটার।
আকার	পৃথিবীর ৭ ভাগের ১ ভাগ।
পৃথিবী থেকে দূরত্ব	পৃথিবী থেকে তার সর্বোচ্চ দূরত্ব হয় ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার। আবার পৃথিবী ও মঙ্গল যখন একই সরল রেখায় চলে আসে তখন তাদের মধ্যকার দূরত্ব দাঁড়ায় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪৭৫ কিলোমিটার।

সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	প্রায় ২২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৭০০ কিলোমিটার।
নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়	২৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট।
সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণের সময়	৬৮৭ দিন।
কক্ষপথে পরিক্রমণের গতিবেগ	ঘণ্টায় গড়ে ৮৬ হাজার ৮৮৬ কিলোমিটার। (প্রতি সেসেন্ডে ২৪.১৩৫ কিলোমিটার)
উপগ্রহ	মঙ্গলের দুটো উপগ্রহ রয়েছে (১) ফবোস (Phobos/فوبوس) () ডেইমোস (Deimos/ديموس)।

তথ্যসূত্র: فلكيات جديده , فهم الفلكيات ও সৌরজগত প্রভৃতি

ছবি নং ৪৭ – মঙ্গল গ্রহ

বৃহস্পতি গ্রহ (مشتري/Jupiter)

পরিচিতি	সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বৃহত্তম গ্রহ। এটা একটা বলয় বিশিষ্ট গ্রহ।
ব্যাস	১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৮৪ কিলোমিটার।
আকার	পৃথিবী থেকে ১৩০০ গুণ বড়। কিন্তু ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩১৮ গুণ। অর্থাৎ, ওজনের হার কম।
পৃথিবী থেকে দূরত্বসর্বনিম্ন দূরত্ব	৬২ কোটি ৭৫ লক্ষ ১০ হাজার কিলোমিটার। সর্বোচ্চ দূরত্ব ৯২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার।
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	৭৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩০ হাজার কিলোমিটার।
নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়	নিজ অক্ষে আবর্তন করতে সময় লাগে ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট।
সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে পরিক্রমণের সময়	১১ বছর ১০ মাস ১৭ দিন।

কক্ষপথে পরিক্রমণের গতিবেগ	ঘণ্টায় প্রায় ৪৭ হাজার ৫২ কিলোমিটার।
উপগ্রহ	এ পর্যন্ত ১৮টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার অনেকটার বিস্তারিত অবস্থা এখনও জানা যায়নি।
ভর ক্ষমতা	সৌরজগতের আর ৭টি গ্রহের যত ভর[1] ক্ষমতা রয়েছে বৃহস্পতির একারই এককভাবে তার চেয়ে বেশি রয়েছে।[2]

তথ্যসূত্র: فلكيات جديده ও সৌরজগত গ্রন্থদ্বয়

ছবি নং ৪৮ – বৃহস্পতি গ্রহ

শনি গ্রহ (زُحَل/Saturn)

পরিচিতি	এটা বৃহস্পতির মত বলয় বিশিষ্ট একটা সুদৃশ্য গ্রহ। বৃহস্পতির পরই এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ।
ব্যাস	১ লক্ষ ২০ হাজার ৫৩৬ কিলোমিটার।
আকার	পৃথিবীর চেয়ে ৭১৪ গুণ বড়। ভিন্ন বর্ণনামতে ৮২০ গুণ বড়। তবে ওজন পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৯৫ গুণ বেশি। অর্থাৎ, ওজনের হার কম।
সূর্য থেকে দূরত্ব	প্রায় ১৪২ কোটি ৯৪ লক্ষ কিলোমিটার।
নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়	১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট।

---

[1] 'ভর' বলতে কি বুঝায় তার জন্য পূর্বে সূর্য–এর বর্ণনায় একটি টীকা রয়েছে।

[2] এজন্যই অনেকে অনুমান করেন যদি কোনদিন সূর্য ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে বৃহস্পতি একাই সৌরজগতের গ্রহগুলোকে তার চারপাশে ঘুরাতে পারবে। –সৌরজগত।

কক্ষপথে পরিক্রমণের সময়	২৯ বছর ৫ মাস ১৪ দিন।
কক্ষপথে পরিক্রমণের বেগ	প্রতি ঘণ্টায় ৩৪ হাজার ৮১২ কিলোমিটার।
উপগ্রহ	শনি গ্রহের ৬২ টি উপগ্রহ রয়েছে। তার মধ্যে বৃহত্তম ও প্রসিদ্ধ হল টাইটান (تايتان/Titan) যা বুধ গ্রহ থেকেও বড়।

তথ্যসূত্র: فهم الفلكيات , فلكيات جديده ও সৌরজগত প্রভৃতি

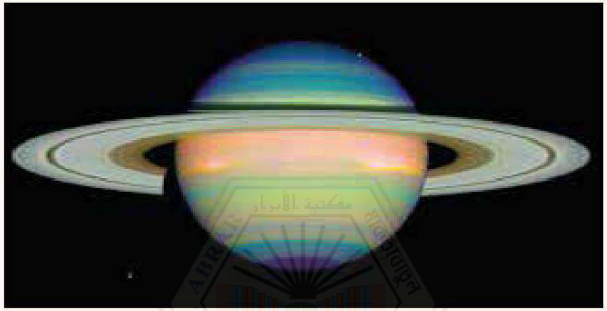

ছবি নং ৪৯ – শনি গ্রহ

ইউরেনাস গ্রহ (أُورانوس/Uranus)

পরিচিতি	ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এটি সরু বলয় বিশিষ্ট গ্রহ।
ব্যাস	প্রায় ৫১ হাজার ১১৮ কিলোমিটার।
আকার	পৃথিবী থেকে ৬৬ গুণ বড়।
ওজন	১৪.৫৪ টা পৃথিবীর সমান।
সূর্য থেকে দূরত্ব	প্রায় ২৮৭ কোটি ১০ লক্ষ কিলোমিটার।
নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়	১৭ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট।
কক্ষপথে পরিক্রমণের সময়	৮৪ বছর।
কক্ষপথে পরিক্রমণের বেগ	প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৪ হাজার ৫১৬ কিলোমিটার।
উপগ্রহ	এ পর্যন্ত ইউরেনাসের ২৭টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে টাইটানিয়া (تيتانيا/ Titania), মিরান্ডা (ميراندا/Miranda) ও অবেরণ (أوبيرون/Oberon)।
দর্শনীয় অবস্থা	এটাকে খালি চোখেও দেখা যায়।

তথ্যসূত্র: فهم الفلكيات , فلكيات جديده ও সৌরজগত প্রভৃতি

ছবি নং ৫০ – ইউরেনাস গ্রহ

নেপচুন গ্রহ (نبتون/Neptune)

পরিচিতি	একটি গ্রহ। এটিকে ইউরেনাসের যমজ গ্রহ বলা হয়। কেননা, এর আয়তন অনেকটা ইউরেনাসের মতই। (নেপচুন কিছুটা বড়) এর পাশেও ছোট ছোট শিলা ও পাথরের বলয়গুচ্ছ রয়েছে। তবে তা খুবই চিকন, পাতলা ও অনুজ্জ্বল।
ব্যাস	প্রায় ৪৯ হাজার ৫২৮ কিলোমিটার।
আকার	পৃথিবী থেকে ৫৭.৭৪ গুণ বড়।
ওজন	পৃথিবীর ওজনের ১৭.১৪৭ গুণ বেশি।
সূর্য থেকে দূরত্ব	প্রায় ৪৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ কিলোমিটার।
নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়	১৯.২০ ঘন্টা।
কক্ষপথে পরিক্রমণের সময়	১৬৫ বছর।
কক্ষপথে পরিক্রমণের বেগ	প্রতি ঘন্টায় ১৯ হাজার ৬২০ কিলোমিটার।
উপগ্রহ	নেপচুনের চারদিকে ১৩টি উপগ্রহ রয়েছে। এর মধ্যে 'ট্রাইটন' (ترايتون/Triton) ও 'নেরেইড' (Nereid/نيريد) প্রসিদ্ধ।

তথ্যসূত্র: فهم الفلكيات ও সৌরজগত প্রভৃতি

ছবি নং ৫১ – নেপচুন গ্রহ

প্লুটো বামন গ্রহ (أفلوطُن/Pluto)

পরিচিতি	এটি হিমায়িত গ্যাস দ্বারা আবৃত একটি বামন গ্রহ।
ব্যাস	প্রায় ২.২৭৪ কিলোমিটার।
সূর্য থেকে দূরত্ব	প্রায় ৫৯১ কোটি ৩৫ লক্ষ কিলোমিটার।
তাপমাত্রা	পৃষ্ঠভাগে তাপমাত্রা প্রায় ২২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।
নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়	৬ দিন ৯ ঘণ্টা ১৭ মিনিট।
কক্ষপথে পরিক্রমণের সময়	২৪৮.৫৩ বছর।
কক্ষপথের বৈশিষ্ট	প্লুটোর কক্ষপথ অতি উপবৃত্তাকার হওয়াতে এটি কোন কোন সময় নেপচুন গ্রহের কক্ষপথের অভ্যন্তরেও ঢুকে যায়। তবে নেপচুনের সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই।
উপগ্রহ	'চ্যারণ' (شارون/Charon) নামের একটি উপগ্রহ রয়েছে যার ব্যাস প্রায় ১২৭০ কিলোমিটার। এ ছাড়াও আরও দুটো উপগ্রহ রয়েছে।

তথ্যসূত্র: فهم الفلكيات ও সৌরজগত প্রভৃতি

ছবি নং ৫২ – প্লুটো বামন গ্রহ

সিরেস বামন গ্রহ (سيريس/Ceres)

পরিচিতি	এটি একটি বামন গ্রহ।
ব্যাস	৯৪৫ কিলোমিটার।
আবিষ্কার	১ জানুয়ারি ১৮০১।
অবস্থান	মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে।
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	৪১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫ হাজার কিলোমিটার।
নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়	৯ ঘণ্টা ৭ মিনিট ২৫ সেকেন্ড।
কক্ষপথে পরিক্রমণের সময়	সাড়ে ৪ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।
কক্ষপথে পরিক্রমণের বেগ	প্রায় ৬৪,৩৭৪ কিলোমিটার।

তথ্যসূত্র: সৌরজগত গ্রন্থ ও নেটে Ceres (dwarf planet)- Wikipedia (2018)

ছবি নং ৫৩ – সিরেস বামন গ্রহ

এরিস বামন গ্রহ (إيريس/Eris)

পরিচিতি	এটি সৌরজগতের বামন গ্রহের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম বামন গ্রহ। এবং এটি সৌরজগতের সবচেয়ে দূরবর্তী বামন গ্রহের একটি।
ব্যাস	প্রায় ২,৬০০ কিলোমিটার।
আকার	প্লুটোর চেয়ে সামান্য ছোট।
আবিষ্কার	২০০৫ সালের জানুয়ারিতে মাইক ব্রাউন-এর নেতৃত্বে একটি টিম।
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	প্রায় ১,০১২ কোটি কিলোমিটার।
তাপমাত্রা	পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা মাইনাস (-) ২৪৩° থেকে (-) ২১৭°–এর মধ্যে উঠানামা করে।
কক্ষপথে পরিক্রমণের সময়	৫৫৮.০৪ বছর।
কক্ষপথে পরিক্রমণের বেগ	প্রতি সেকেন্ডে ৩.৪৩৩৮ কিলোমিটার।
উপগ্রহ	এ পর্যন্ত এরিসের ছোট্ট একটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে যার নাম ডিস্‌নোমিয়া (دايزونميا/ Dysnomia)।

তথ্যসূত্র: সৌরজগত গ্রন্থ ও নেটে Eris (dwarf planet)- Wikipedia (2018)

ছবি নং ৫৪ – এরিস বামন গ্রহ

মেইকমেইক বামন গ্রহ (ميكميك/Makemake)

পরিচিতি	একটি বামন গ্রহ।
ব্যাস	প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার।
অবস্থান	তার কক্ষপথটি নেপচুন থেকে অনেকটা দূরে।
আবিষ্কার	২০০৫ সালের ২১ মার্চ মিচেল ই ব্রাউন-এর নেতৃত্বে একটি টিম।
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	৬৮৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৮ হাজার কিলোমিটার।

তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস (-) ২৪৩.২° সেলসিয়াস।
কক্ষপথে পরিক্রমণের সময়	প্রায় ৩১০ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।
কক্ষপথে পরিক্রমণের বেগ	ঘণ্টায় ১৫ হাজার ৯০৮ কিলোমিটার।

তথ্যসূত্র: সৌরজগত গ্রন্থ ও নেটে Makemake - Wikipedia(2018)

ছবি নং ৫৫ – মেইকমেইক বামন গ্রহ

হৌমিয়া বামন গ্রহ (هاوميا/Haumea)

পরিচিতি	হৌমিয়া একটি ক্ষুদ্রাকৃতির বামন গ্রহ।
আবিষ্কার	২০০৪ সালে মাইক ব্রাউনের নেতৃত্বে একটি টিম এটিকে আবিষ্কার করে।
অবস্থান	এর কক্ষপথ নেপচুনের কক্ষপথ অতিক্রম করে প্লুটোর কাছে।
ব্যাস	১৬৩২ কিলোমিটার।
দর্শণীয় অবস্থা	এটি সরাসরি দেখা যায়নি, তবে তার আলো থেকে হিসাব করে নেয়া হয়েছে।
উপগ্রহ	২টি উপগ্রহ: ১. হাইইয়াকা (Hi'iaka/هياكا) হৌমিয়ার উপরে ২. নেমাকা
	(Namaka/نماكا) হৌমিয়ার সরাসরি নিচে।

তথ্যসূত্র: নেটে هاوميا –كوكب قزم ও Haumea - Wikipedia(2018)

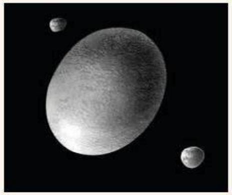

ছবি নং ৫৬ – হৌমিয়া বামন গ্রহ (তার দুটো উপগ্রহসহ)

রাশিচক্র

পৃথিবী তার কক্ষপথে বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য নিজ জায়গায় থাকে, কিন্তু পৃথিবীর পরিক্রমায় মনে হয় সূর্য সরে যাচ্ছে এবং ঘুরছে। এভাবে মনে হয় সূর্য একটা লাইনে বৃত্তাকারে ঘুরছে এবং বার মাসে একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসছে। এই যে সূর্যের চলার লাইন বা বৃত্ত একে বলে ক্রান্তিবৃত্ত। এটাই হচ্ছে রাশিবৃত্ত বা রাশিচক্র। এটা প্রকৃতপক্ষে সূর্যের চলার পথ নয়, তবে বাহ্যত এমনই মনে হয়। তাই আরবিতে একে مَسَارُ الشمس الظاهري (অর্থাৎ, দৃশ্যত সূর্যের চলার পথ)ও বলা হয়।

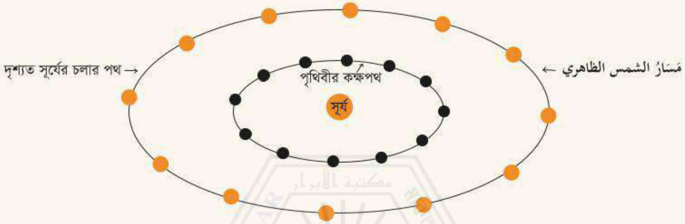
দৃশ্যত সূর্যের চলার পথ →
পৃথিবীর কক্ষপথ
সূর্য
← مَسَارُ الشمس الظاهري

চিত্র নং ৫৭ – দৃশ্যত সূর্যের চলার পথ বা রাশিবৃত্ত

এই রাশিচক্রকে সমান ১২ ভাগে বা ১২ মাসে ভাগ করা হয়, সূর্য এক এক মাসে এক একটি ভাগ পার হয়। সবগুলোর অঞ্চলকে একত্রে বলা হয় منطقة البروج বা অয়নমণ্ডল। এ হিসেবে منطقة البروج বা অয়নমণ্ডল হচ্ছে রাশির গোটা অঞ্চল আর دائرة البروج হচেছ রাশির বৃত্ত।

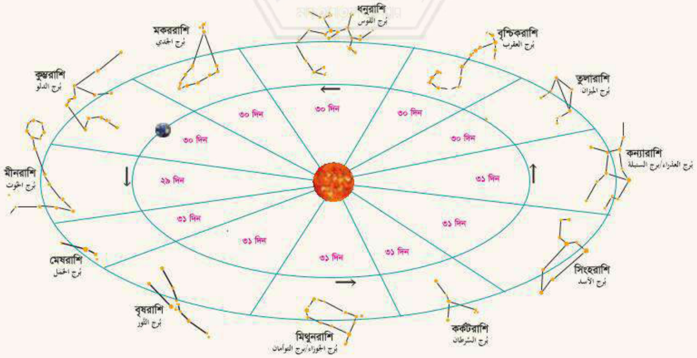
ধনুরাশি
برج القوس
মকররাশি
برج الجدي
বৃশ্চিকরাশি
برج العقرب
কুম্ভরাশি
برج الدلو
তুলারাশি
برج الميزان
কন্যারাশি
برج العذراء/برج السنبلة
মীনরাশি
برج الحوت
সিংহরাশি
برج الأسد
মেষরাশি
برج الحمل
বৃষরাশি
برج الثور
মিথুনরাশি
برج الجوزاء/برج التوأمان
কর্কটরাশি
برج السرطان
৩০ দিন
৩০ দিন
৩০ দিন
৩০ দিন
৩০ দিন
২৯ দিন
৩১ দিন
৩১ দিন
৩১ দিন
৩১ দিন
৩১ দিন
৩১ দিন

চিত্র নং ৫৮ – রাশির বৃত্তে ১২ রাশির অবস্থান

সৌরবিজ্ঞানীরা রাশিচক্রকে যে সমান ১২ ভাগে ভাগ করেছেন, এর প্রত্যেক ভাগ হচ্ছে এক একটা রাশি অর্থাৎ, রাশি হচ্ছে ১২টি। এর ৬টি উত্তর আকাশে আর ৬টি দক্ষিণ আকাশে। নিম্নে ১২টি রাশির চিত্র পূর্বে প্রদর্শিত হয়েছে। তারপরও নিম্নে ১২টি রাশি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর বিবরণ প্রদান করা গেল। উল্লেখ্য, রাশিচক্র সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, المورد, فلكيات جديده ও নেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

১. **মেষরাশি:** উত্তর আকাশের প্রথম রাশি (বিষুব-এর উত্তরে) হচ্ছে মেশরাশি (Aries[১]/بُرْج الحَمَل) মেষ অর্থ ভেড়া। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যার আকার মেষের তথা ভেড়ার মত। অর্থাৎ, নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে সেগুলোকে একটা মেষের মত কল্পনা করা যায়। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত অবস্থান করে।

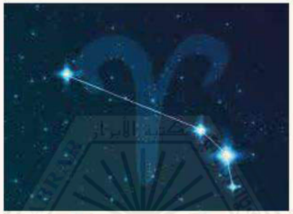

চিত্র নং ৫৯ – মেষরাশি

২. বৃষরাশি: উত্তর আকাশের মেষরাশির পর বৃষরাশি (Taurus[২]/بُرْج الثَّور)। বৃষ অর্থ ষাড়। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যার আকার বৃষ তথা ষাড়ের মত। অর্থাৎ, নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে সেগুলোকে একটা ষাড়ের মত কল্পনা করা যায়। ত্রিভূজাকার ৩টি নক্ষত্র রয়েছে যার আকার বৃষের মাথার মত। রোহিনী নামক নক্ষত্র (Aldebaran[৩]/الدَّبَرَان) কে মনে করা হয় বৃষের উজ্জ্বল লাল চোখ। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২১ এপ্রিল থেকে ২০ মে পর্যন্ত অবস্থান করে।

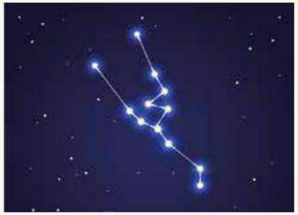

চিত্র নং ৬০– বৃষরাশি

---

[১] উচ্চারণ: এরীজ্।

[২] উচ্চারণ: টরাস্।

[৩] উচ্চারণ: এ্যালডেবারান্।

৩. **মিথুনরাশি:** উত্তর আকাশের বৃষরাশির পর মিথুনরাশি (Gemini[১]/بُرْج الجَوْزاء)। মিথুন অর্থ নারী পুরুষ যুগল। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যার আকার মিথুন তথা যুগল নারী পুরুষ (স্বামী-স্ত্রী)–এর মত। অর্থাৎ, নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে সেগুলোকে যুগল নারী পুরুষের মত কল্পনা করা যায়। সপ্তর্ষীমণ্ডলের তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ নক্ষত্র তিনটি একটি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করে সেটিকে বর্ধিত করলে যে দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে পৌছয় সেই যুগল নক্ষত্রকে মিথুনরাশি বলে। এর প্রথমটির নাম প্রথম পুনর্বসু (Pollux/رأس التوأم المؤخر) ও দ্বিতীয়টির নাম দ্বিতীয় পুনর্বসু (Castor/نيِّر التَّوأمين)। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২১ মে থেকে ২০ জুন পর্যন্ত অবস্থান করে।

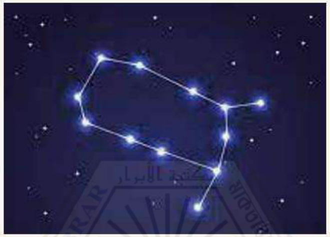

চিত্র নং ৬১– মিথুনরাশি

৪. **কর্কটরাশি:** উত্তর আকাশের মিথুনরাশির পর কর্কটরাশি (Cancer[২]/برج السَّرْطان)। কর্কট অর্থ কাঁকড়া। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যার আকার কর্কট তথা কাঁকড়ার মত। অর্থাৎ, নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে সেগুলোকে কাঁকড়ার মত কল্পনা করা যায়। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২১ জুন থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত অবস্থান করে।

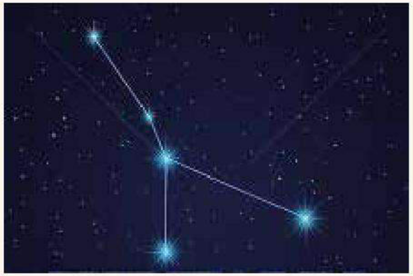

চিত্র নং ৬২– কর্কটরাশি

---

[১] উচ্চারণ: জেমিনাই।

[২] উচ্চারণ: ক্যান্সার্।

৫. **সিংহরাশি:** উত্তর আকাশের কর্কটরাশির পর সিংহরাশি (Leo[১] বা Lion[২]/برج الأَسَد)। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যার আকার সিংহের মত। অর্থাৎ, নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে সেগুলোকে সিংহের মত কল্পনা করা যায়। সপ্তর্ষীমণ্ডলের শেষ দুইটি নক্ষত্র (ক্রতু ও পুলহ)কে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করে সেটিকে বর্ধিত করলে যে নক্ষত্রমণ্ডলীতে পৌছয় তার নাম সিংহরাশি। এর উত্তর ফাল্গুনী (Denebola/ذَنَب الأسد) ও মঘা (Regulus/قلب الأسد) নক্ষত্রদ্বয় সবচেয়ে উজ্জ্বল। সিংহের লেজের নক্ষত্র উত্তর ফাল্গুনী এবং ডান পায়ের থাবার নক্ষত্র মঘা। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২১ জুলাই থেকে ২১ আগস্ট পর্যন্ত অবস্থান করে।

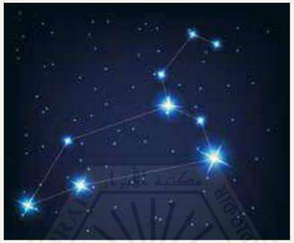

চিত্র নং ৬৩– সিংহরাশি

৬. **কন্যরাশি:** উত্তর আকাশের সপ্তর্ষমণ্ডলীর নিচের দিকে এবং সিংহরাশির দক্ষিণ-পশ্চিমে কন্যারাশি (Virgo[৩]/برج العَذراء/ برج السُّنْبُلَة)। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যার আকার একটা মেয়ে মানুষের মত। অর্থাৎ, নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে, সেগুলোকে একটা মেয়ে মানুষের মত কল্পনা করা যায়। এর একদিকে বুয়েটিস ও অপরদিকে স্বাতী নামক দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২২ আগস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করে।

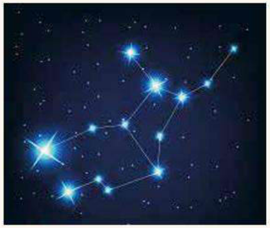

চিত্র নং ৬৪ – কন্যারাশি

---

[১] উচ্চারণ: লীও।
[২] উচ্চারণ: লাইয়ন্।
[৩] উচ্চারণ: ভারগো।

৭. **তুলারাশি:** দক্ষিণ আকাশের প্রথম রাশি (বিষুব সংলগ্ন) হচ্ছে তুলারাশি (Libra[১]/برج الميزان) তুলা অর্থ দাড়িপাল্লা। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যার আকার জোড়া দাড়িপাল্লার মত। অর্থাৎ, নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে সেগুলোকে একটা জোড়া দাড়িপাল্লার মত কল্পনা করা যায়। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত অবস্থান করে।

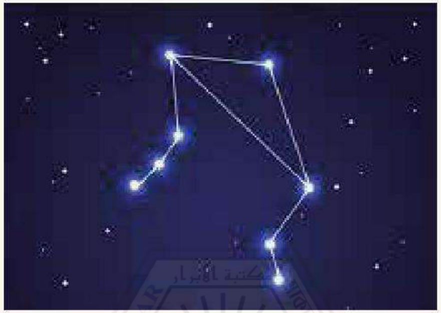

চিত্র নং ৬৫ – তুলারাশি

৮. **বৃশ্চিকরাশি:** দক্ষিণ আকাশের দ্বিতীয় রাশি হচ্ছে বৃশ্চিকরাশি (Scorpio[২]/برج العقرب)। বৃশ্চিক অর্থ বিছা। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যার আকার বিছার মত। অর্থাৎ, নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সাজানো যে সেগুলোকে একটা বিছার মত কল্পনা করা যায়। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২৪ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করে।

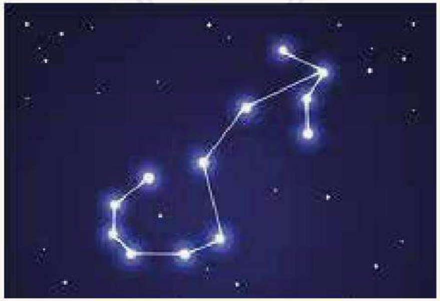

চিত্র নং ৬৬ – বৃশ্চিকরাশি

---

[১] উচ্চারণ: লাইব্রা।
[২] উচ্চারণ: স্কর্পিয়ো।

৯. **ধনুরাশি:** দক্ষিণ আকাশের তৃতীয় রাশি হচ্ছে ধনুরাশি (Sagittarius[1]/برج القوس)। ধনু অর্থ ধনুক। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যেগুলোকে মিলিতভাবে সেনটরে নামক একটা পৌরাণিক জীবের মত কল্পনা করা যায়, যা একটি ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২৩ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করে।

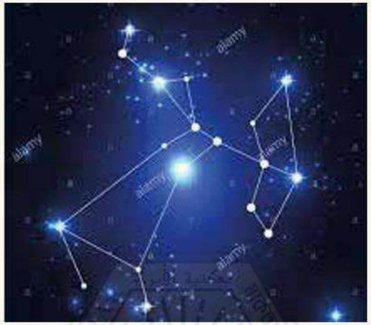

চিত্র নং ৬৭ – ধনুরাশি

১০. **মকররাশি:** দক্ষিণ আকাশের চতুর্থ রাশি হচ্ছে মকররাশি (Capricorn[2]/برج الجدْي)। মকর হচ্ছে এক ধরনের কল্পিত শুঁড়ওয়ালা মাছ। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যেগুলোকে মিলিতভাবে শুঁড়ওয়ালা মাছের মত কল্পনা করা যায়। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করে।

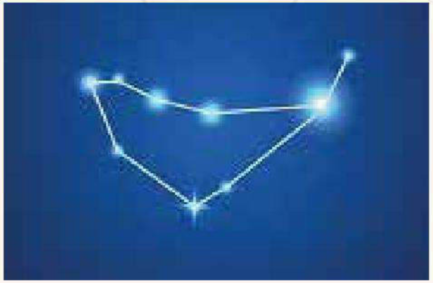

চিত্র নং ৬৮ – মকররাশি

---

[1] উচ্চারণ: স্যাজিটেরিয়াস্।

[2] উচ্চারণ: ক্যাপ্রিকর্ন্।

---

১১. **কুম্ভরাশি:** দক্ষিণ আকাশের পঞ্চম রাশি হচ্ছে কুম্ভরাশি (Aquarius[1]/برج الدلو)। কুম্ভ হচ্ছে কুজোর মত মাটির পাত্র। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যেগুলো দেখলে মনে হয় একজন মানুষ তার বাম হাত উপর দিকে তুলে রেখেছে, এবং তার ডান হাতে রয়েছে কুজোর মত একটি পাত্র যার মধ্য থেকে শ্রোতের ন্যায় পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ২০ জানুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করে।

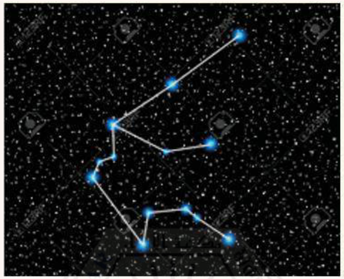

চিত্র নং ৬৯– কুম্ভরাশি

১২. **মীনরাশি:** দক্ষিণ আকাশের ষষ্ট রাশি হচ্ছে মীনরাশি (Pisces[2]/برج الحُوت)। মীন হচ্ছে মাছ। এই রাশিতে একটা নক্ষত্রমণ্ডলী রয়েছে যেগুলো দেখলে মনে হয় একজোড়া মাছ একটার উপর আর একটা বিপরীত দিকে মুখ করে রয়েছে।। সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলীতে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত অবস্থান করে।

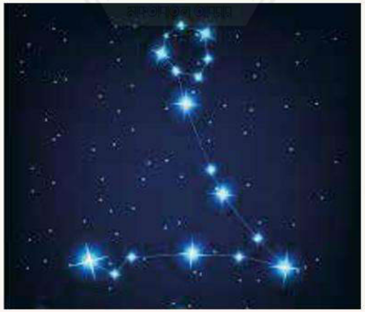

চিত্র নং ৭০ – মীনরাশি

---

[1] উচ্চারণ: অ্যাকোয়েরিয়াস্।

[2] উচ্চারণ: পিসীজ্।

রাশি ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা

রাশি বলা হয় সৌরজগতের কতকগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীককে, যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রতীকগুলো কল্পিত। এরূপ বারটা রাশি কল্পনা করা হয়। যথা:– মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র (অর্থাৎ, ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology[১]) -এর ধারণা অনুযায়ী এসব গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ সংঘটিত হয়ে থাকে। নিউমারোলজি বা সংখ্যা-জ্যোতিষের উপর ভিত্তি করে এই শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোনো প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে এই আকীদা রাখা শির্ক। গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে, কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, গ্রহ-নক্ষত্রের ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহ্রই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।[২]

বর্তমান যুগে জ্যোতিষঃশাস্ত্র বা Astrology-এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটায় এবং এ ব্যাপারে বহু লোকের আকীদা ও আমলগত বিভ্রান্তি ঘটায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত একটি প্রবন্ধ পেশ করা হল।

জ্যোতিঃশাস্ত্র ও ইসলাম

অধুনা জ্যোতিঃশাস্ত্রের চর্চা বেশ ব্যাপকতা লাভ করেছে। ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষ সর্বশেষ পন্থা হিসাবে জ্যোতিষীদের দারস্থ হচ্ছেন এবং তাদের দেয়া পাথর বা অন্য কোন পরামর্শকে ভাগ্য ফেরানোর নিয়ামক ভেবে শেষ রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। অনেকে বিবাহ-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া, বিদেশ গমন, ঘর-বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি জীবনের অনেক ক্ষেত্রের ভবিষ্যত শুভ-অশুভ জানার জন্য জ্যোতিষীদের আগাম ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং সাফল্য লাভ করবেন বলে আত্মস্থ থাকছেন। এভাবে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে তারা জীবন পরিচালনার গাইড বানিয়ে চলছেন। জ্যোতিষীদের ব্যবসাও ভাল চলছে। জ্যোতিঃশাস্ত্র চর্চায় ব্যবসা ভাল দেখে এ বিদ্যা শিক্ষার হারও তাই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এ শাস্ত্রের হিসাব-নিকাশ ও তার ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন বা এ শাস্ত্র চর্চা ইসলামে কতটুকু অনুমোদিত তা ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে প্রয়াসী এবং জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী একজন সচেতন মুসলমানকে অবশ্যই জানতে হবে।

জ্যোতিঃশাস্ত্র বলতে দুটো শাস্ত্রকে বুঝানো হয়।

(এক) নক্ষত্রবিদ্যা অর্থাৎ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, আকৃতি ও গতি সম্পর্কে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। এ শাস্ত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় Astronomy[৩]। আরবিতে বলা হয় علم الهيئة (দুই) গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। এ শাস্ত্রে নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ বিচার করা হয়। ভবিষ্যত শুভ-অশুভ নিরূপণ বিষয়ক এ শাস্ত্রকে ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology বলা হয়।

'আরবীতে ইলমুন্নুজূম' (علم النجوم) বলতে বিশেষভাবে এই ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology

---

১. উচ্চারণ: অ্যাস্ট্রলজি। ২. فتح الملهم ج/١ ও آپ کے مسائل اور انکا حل গ্রন্থদ্বয় থেকে গৃহীত। ৩. উচ্চারণ: অ্যাস্ট্রনমি।

কেই বুঝানো হয়। আরবীতে বিশেষভাবে এটাকে ইলমু আহ্কামিন্নুজূম (علم أحكام النجوم) বলা হয়। তবে সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের তারতম্যে আবহাওয়া এবং শীত গ্রীষ্মের অর্থাৎ, মৌসুমের যে পরিবর্তন, চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাটা ইত্যাদির যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন, এটাকেও সাধারণভাবে ইলমুন্নুজূম-এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এটাকে বিশেষভাবে 'ইল্মুন্নুজূম তাবিয়ী' বলা হয়। বাংলা ইংরেজিতে এ শাস্ত্রের বিষয়গুলো ভূগোল শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চলাচল সম্পর্কিত বিদ্যা যা সাধারণত Astronomy-তে আলোচিত হয়ে থাকে, আরবিতে এটাকেও 'ইল্মুন্নুজূম'-এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এটাকে বিশেষভাবে 'ইল্মুন্নুজূম হিছাবী' বলা হয়।

Astronomy (নক্ষত্র বিদ্যা) শিক্ষা করা অর্থাৎ, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, আকৃতি ও গতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ হল ভাগ্যের ক্ষেত্রে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষা করা বা তাতে বিশ্বাস করা। আল্লামা ইব্নে রজব বলেন,

فالمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل مُحَرَّمٌ قليلُه وكثيرُه. (فتح الملهم ج/١)

অর্থাৎ, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চলাচল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার অনুমতি রয়েছে, তবে (ভাগ্যের শুভ-অশুভের ক্ষেত্রে) তার প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা (অল্প হোক বা বিস্তর) নিষিদ্ধ এবং হারাম। (ফাত্হুল মুল্হিম: ১খ.)

যাহোক Astronomy শিক্ষা করা নিষিদ্ধ নয় বরং এর কিছু কিছু অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ে উপকারে আসে। অজানা স্থানে রাতের বেলায় কেবলা নির্ধারণের জন্য উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা (North Star[১]/النجم القطبي) চেনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর ধ্রুবতারা চিনতে হলে প্রয়োজন হয় সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa major[২]/Great Bear[৩]/الدُّب الأكبر) চেনার এবং সন্ধার আকাশে, মধ্যরাতের আকাশে এবং শেষ রাতের আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থান কেমন থাকে তা জানার। দক্ষিণ আকাশেও এমন কিছু নক্ষত্র আছে যা দ্বারা দিক চেনা যায়। আর রাত কতটা গভীর হল তা বুঝা যায় 'কালপুরুষ' (Orion[৪]/الجوزاء) নামক তারকামণ্ডলের অবস্থান দেখে। কুরআনে কারীমে বাণিজ্যিক সফরের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.

অর্থাৎ, তারকারাজি দ্বারাও তারা পথের (দিকের) পরিচয় লাভ করে থাকে। (সূরা: ১৬-নাহ্ল: ১৬)

এ বক্তব্য দ্বারা এদিকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, পথের (দিকের) পরিচয় লাভ এবং দিক-নির্ণয় করতে পারাও তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল অন্যতম উপকারিতা।

সহীহ্ বোখারীতে হযরত কাতাদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে,

خُلِقَ هذِهِ النُّجومُ لِثلاثٍ جَعَلَها زِينَةً لِلسَّمَاءِ ورُجُومًا لِلشَّياطِينِ وعَلاماتٍ يُهْتَدى بها فَمَنْ تَأَوَّلَ فيها بِغَير ذلكَ أَخْطَأَ وأضاعَ نَصيبَه وتَكَلَّفَ ما لا عِلمَ له بِه. (رواه البخاري في كتاب بدأ الخلق ـ باب في النجوم)

অর্থাৎ, এই নক্ষত্রগুলো তিন উদ্দেশ্যে- আল্লাহ এগুলোকে আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানদের জন্য

---

১. উচ্চারণ: নর্থ স্টার্।

২. উচ্চারণ: আর্স্যা মেজর্।

৩. উচ্চারণ: গ্রেট্ বেয়ার্।

৪. উচ্চারণ: ওরাইয়ন্।

ক্ষেপণাস্ত্রবৎ এবং পথ লাভ করার নিদর্শন বানিয়েছেন। এই তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো রকম ব্যাখ্যা যে প্রদান করবে সে ভুল করবে, নিজের সময় ও লিপ্ততাকে নষ্ট করবে এবং যে বিষয়ে জানা নেই এমন বিষয় চর্চায় অযথা কষ্ট করবে। (বোখারী)

গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের দূরত্ব এবং আকৃতির বিশালতা সম্পর্কে পরিজ্ঞান আল্লাহ্র কুদরত অনুধাবনে সহায়ক হয় এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ ঘটে। হাজার হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা একটা নক্ষত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ হলে তার চেয়ে উপরের বিশাল অবস্থানে জুড়ে থাকা জান্নাতের পরিধির বিশালতায় বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ লাগে, আর তখন সর্বনিম্ন জান্নাতীর জন্য জান্নাতে কমপক্ষে দশ দুনিয়া পরিমাণ স্থান থাকার কথা আর আলেমদের অন্ধবিশ্বাস বলে মনে হয় না এই যুক্তিতে যে, জান্নাতে এত স্থান আসবে কোত্থেকে?

আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে যে চিন্তা করার নির্দেশ হাদীছে এসেছে, Astronomy-এর বিদ্যা সে চিন্তাকে বিকশিত করতে সহায়ক হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিভংগিতে এ শাস্ত্র শিক্ষা করা গর্হিত হবে না বরং প্রশংসিত হবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

تَفَكَّرُوْا فِيْ خَلْقِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِي اللهِ. (قال السخاوي : واه أبو نعيم في الحلية وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة والمعنى صحيح. كذا في المقاصد الحسنة)

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর, আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর না। (হিল্য়া)

'ইল্মুন্নুজূম তবীয়ী' (علم النجوم الطبيعي) অর্থাৎ, সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের তারতম্যে আবহাওয়া ও মৌসুমের পরিবর্তন এবং শীত গ্রীষ্মের আবর্তন সম্পর্কিত বিদ্যাও ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। (فتح الملهم ج/١) এ বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইসলামে নিষেধাজ্ঞাও নেই আবার তাতে তেমন ধর্মীয় উপকারিতাও নেই, শুধু এতটুকু যে, এর দ্বারা আল্লাহর কুদরত অনুধাবিত হয়ে থাকে। এক মৌসুমে দিন ছোট রাত বড়, আবার অন্য মৌসূমে দিন বড় রাত ছোট হয়ে থাকে, এটাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের আলামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ.

অর্থাৎ, তুমি রাতকে দিনের ভিতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করাও। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ২৭)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّموتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে (কুদরতের) নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা: ৩-আলে ইমরান: ১৯০)

এখানে রাত ও দিনের আবর্তন (اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) বলতে যেমন একের গমন ও অপরের আগমন অর্থ বুঝায়, তেমনি কম-বেশি হওয়ার অর্থও বুঝায়। যেমন: শীতকালে রাত দীর্ঘ এবং দিন খাটো হয়, গরমকালে তার বিপরীত। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে রাত দিনের দৈর্ঘে তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন: উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তরমেরু থেকে দূরবর্তী দেশের

তুলনায় দীর্ঘ হয়। এসব কিছুই আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন।

'ইল্মুন্নুজূম হিছাবী' (علم النجوم الحسابي) অর্থাৎ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির গতি, কক্ষপথ ও চলাচল সম্পর্কিত হিসাব-নিকাশের বিদ্যা। জ্যোতিঃশাস্ত্র (Astronomy, Astrology) ও ভূগোলে সবটাতেই এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। ইসলাম এরূপ একটা হিসাব-নিকাশের তথ্য মৌলিকভাবে স্বীকার করেছে, তবে তার বিস্তারিত বিবরণ এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রদান থেকে বিরত রয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ.

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র হিসাব মত চলে। (সূরা: ৫৪-আর রহমান: ৫)

এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল– সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটা বিশেষ হিসাব ও পরিমাণ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমনের আলাদা আলাদা হিসাব রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবের উপর সৌরব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয়নি। (মাআরেফুল কুরআন)

এক আয়াতে বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ.

অর্থাৎ, তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল আলোকময় আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময়। অতঃপর নির্ধারিত করেছেন তার জন্য মনযিলসমূহ যাতে তোমরা জানতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। (সূরা: ১০-ইউনুস: ৫)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা চন্দ্র সূর্যের চলাচলের জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। যার প্রত্যেকটাকে একেক মনযিল বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতিমাসে তার নিজস্ব কক্ষপথে পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটা। তবে যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে একদিন লুকায়িত থাকে, তাই সাধারণত চাঁদের মনযিল আঠাশটা বলা হয়। আরবের প্রাচীন জাহেলী যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনযিলগুলোর নাম সেসব নক্ষত্রের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যেগুলো সেসব মনযিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কুরআন-হাদীছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। কেননা এগুলোর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবাদির উপর নির্ভরশীল। আর ইসলাম তার বিধি-বিধানের ভিত্তি অঙ্কশাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের ওপর রাখেনি। যেমন: চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন তারিখ নির্ধারিত হয় এবং এর সাথে ইসলামের অনেক বিধি-বিধানের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু চাঁদ হল কি হল না তার ভিত্তি গাণিতিক হিসাবের উপর নয় বরং কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার ওপর রাখা হয়েছে।

যেহেতু এসব খুঁটিনাটি হিসাবের সঙ্গে ইসলামী কোন বিধানের সম্পর্ক রাখা হয়নি। তাই এগুলো সম্পর্কে বিদ্যার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে অনর্থক। চাঁদ কেন বাড়ে কমে, এরকম বৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য কী? এ সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে তার জওয়াবে নাযিল হয়–

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, এটা মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম। (সূরা: বাকারা: ১৮৯)

মুফতী শফী সাহেব (রহ.) লিখেছেন যে, এ জওয়াব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোনো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে– এমন প্রশ্নই করা দরকার। (মাআরিফুল কুরআন)

'ফলিত জ্যোতিঃশাস্ত্র' (Astrology) যাতে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, স্থিতি, সঞ্চার অনুসারে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ নিরূপণ করা হয়, ভবিষ্যত শুভ-অশুভ বিচার করা হয়। এ শাস্ত্র সম্পর্কে ইসলাম কঠোর নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ-অশুভ গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাবে ঘটে– এরূপ বিশ্বাস রাখা শির্‌ক ও কুফ্‌র। গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় তা সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত, গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ-অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহ্‌রই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে মারফূ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ.(رواه أبو داود في باب في النجوم)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটা জ্ঞান শিক্ষা করল, সে যাদুর একটা শাখা শিক্ষা করল। (আবূ দাউদ)

এ হাদীছে জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রকে যাদুর ন্যায় কুফ্‌র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য এক হাদীছে জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাস করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

أخاف على أمتي بعدي خصلتين : تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. (إسناده حسن ، أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في الكامل والخطيب في كتاب النجوم عن أنس . (كذا في الإتحاف ج/١)

অর্থাৎ, আমার পরে আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি দুটো বিষয়ের আশংকা করছি: তাকদীরে অবিশ্বাস ও গ্রহ-নক্ষত্রের বিশ্বাস।

অন্য এক হাদীছে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

لا تسألوا عن النجوم إلخ. (أخرجه الديلمي في الفردوس وابن حصر في أماليه والسيوطي في الجامع الكبير. (كذا في الإتحاف ج/١)

অর্থাৎ, তোমরা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইবে না। (আল-ইতহাফ–দাইলামী)

অন্য এক হাদীছে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

إذا ذكر القدر فأمسكوا ، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. (أخرجه الطبراني بإسناد حسن. كذا في الإتحاف ج/١)

অর্থাৎ, তাকদীর সম্পর্কে চুলচেরা আলোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে। আমার সাহাবীদের সমালোচনা উঠলে তা থেকে বিরত থাকবে। (আল-ইতহাফ–তাবারানী)

উপরোক্ত চারটি হাদীছ থেকে প্রমাণিত হল গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বাস করা, এ সম্পর্কিত বিদ্যা শিক্ষা করা, এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া এবং এ সবের চুলচেরা আলোচনা ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া সবই নিষিদ্ধ।

গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা কুফরী। তবে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন, যদি কেউ আল্লাহ্‌কেই মূল নিয়ন্তা বলে বিশ্বাস করে, তবে আসবাব বা উপকরণের মাধ্যমে সবকিছু সংঘটনের চিরাচরিত খোদায়ী নিয়মানুসারে গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে কোন প্রভাব তিনি সংঘটিত করছেন বলে মনে করলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। সেক্ষেত্রে হাদীছের নিষেধাজ্ঞা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে যে গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করে। তবে বিশ্বাস যা-ই থাকুক কোনো অবস্থাতেই কোন প্রভাবকে কোন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করার অনুমতি নেই। তা ছাড়া যে ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিয়ী (রহ.) গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করার অনুমতি দিয়েছেন সাধারণভাবে উলামায়ে কেরাম অনুরূপ ব্যাখ্যা সহকারেও তা বিশ্বাস করাকে হারাম বলেছেন। আর বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করাকে কুফ্‌র বলে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের পশ্চাতে আল্লাহকে মূল নিয়ন্তা মেনে নেয়ার পরও জ্যোতিঃশাস্ত্র (Astrology) চর্চার ব্যাপারে পূর্বোক্ত কঠোর নেতিবাচক মনোভাব অব্যাহত থাকবে। ইমাম গাযালী (রহ.) এহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে তার তিনটা কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা:–

১. গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের আলোচনা শুনতে শুনতে ক্রমান্বয়ে অন্তরে তার নিজস্ব প্রভাব থাকার ধারণা জন্ম নিবে, এভাবে ঈমান বিনষ্ট হবে।

২. এ বিদ্যায় কোনো উপকারিতা নিহিত নেই। অতএব এটা একটা অনর্থক বিষয়ে মূল্যবান সময় অপচয় করার নামান্তর।

৩. এ শাস্ত্রের কোনোকিছু যুক্তি, চাক্ষুস প্রমাণ বা কুরআন-হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং এ শাস্ত্রের সবকিছুই আনুমানিক ও কাল্পনিক।

এ শাস্ত্রের সবকিছুই যে কাল্পনিক, যুক্তি বা বিজ্ঞাননির্ভর নয় ও দলীল-প্রমাণবিহীন, তার কিছু ব্যাখ্যা আমার রচিত 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে।

আকাশ ও মহাকাশ প্রসঙ্গ

জ্যোতিঃবিজ্ঞানীদের কথামত রাতের বেলায় তারকাখচিত যে মহাশূন্য দেখতে পাওয়া যায় তাকেই বলে আকাশ (Sky[১])। আর অনন্ত মহাশূন্য জুড়ে যে জায়গা ছড়িয়ে রয়েছে তাকে বলে মহাকাশ (Space[২])। জ্যোতিঃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য হল মহাকাশের শুরু এবং শেষ কোথায় তা তাদের জানা নেই।

---

১. উচ্চারণ: স্কাই।

২. উচ্চারণ: স্পেস্।

জ্যোতিঃবিজ্ঞানীদের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী আকাশের স্বতন্ত্র কোন দেহবিশিষ্ট অস্তিত্ব নেই, বরং আকাশ হল এক মহাশূন্যতা এবং অনন্ত মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত মহাকাশের একটি ক্ষুদ্র অংশ হচ্ছে আমাদের এই আকাশ। কিন্তু ইসলাম প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আকাশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন হাদীছে যে বক্তব্য পাওয়া যায়, তা লক্ষ করুন। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا.

অর্থাৎ, যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা মুল্‌ক: ৩)

এ আয়াতের বক্তব্যে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ সাত আকাশ সৃষ্টির কথা বলেছেন এবং সেই সাত আকাশকে একের পর এক স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করার কথা বলেছেন। এ কথাগুলো আকাশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা বোঝায়। আকাশ যদি শূন্যতার নাম হত, তাহলে সাত শূন্যতা সৃষ্টি করা আবার সেই শূন্যতাগুলোকে একের পর এক স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করা– এ কথাগুলো হাস্যকর হয়ে দাঁড়াত।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.

অর্থাৎ, তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিনতর না আকাশকে? তিনি সেটা (আকাশ) নির্মাণ করেছেন। তিনি সেটাকে সমুন্নত ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (সূরা নাযিআত: ২৭–২৮)

এ আয়াতের বক্তব্যে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ আকাশকে নির্মাণ করা এবং সমুন্নত ও সুবিন্যস্ত করার কথাগুলো বলেছেন। এ কথাগুলো আকাশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা বুঝায়। আকাশ যদি শূন্যতার নাম হত, তাহলে শূন্যতাকে নির্মাণ করা আবার সেই শূন্যতাকে সমুন্নত ও সুবিন্যস্ত করার কথাগুলো হাস্যকর হয়ে দাঁড়াত। 'শূন্যতা'-এর সঙ্গে নির্মাণ, সমুন্নতকরণ ও বিন্যস্তকরণ বিষয়গুলো প্রযোজ্য নয়।

এ ছাড়াও কুরআনে কারীমের কোন আয়াতে বলা হয়েছে, "যখন আকাশ ফেটে যাবে" (সূরা ইনশিক্বাক্ব : ১), কোন আয়াতে বলা হয়েছে, "যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে" (সূরা তাকভীর : ১১), কোন আয়াতে বলা হয়েছে, "যেদিন আকাশ হয়ে যাবে তেলের গাদের ন্যায়" (সূরা মাআরিজ : ৮) ইত্যাদি। এসব আয়াতের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেও প্রমাণিত হবে যে, আকাশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। কেননা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকলে তা ফাটার প্রশ্ন ওঠে না। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকলে তার আবরণ অপসারিত করারও প্রশ্ন ওঠে না। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকলে তেলের গাদের ন্যায় হবে কি জিনিস? শূন্যতা তো আর তেলের গাদের ন্যায় হয় না। গাদ তো বলাই হয় কোন তরল জিনিসের ময়লাকে। এখন জিনিসই যদি না থাকে, তাহলে ময়লা বা গাদ হবে কিসের?

তারপর বোখারী শরীফসহ বিভিন্ন হাদীছের কিতাবে মেরাজ সম্পর্কিত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উর্দ্ধজগতে আরোহণ করতে থাকেন, তখন প্রত্যেক আকাশের দর্জা বন্ধ পান। প্রতি আকাশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করেছেন, কে? উত্তরে হযরত জিব্রাঈল (আ.) বলেছেন, আমি জিব্রাঈল। আবার প্রশ্ন হয়েছে, সঙ্গে কে? উত্তর দেয়া হয়েছে, মুহাম্মাদ। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে কি? ইত্যাদি। এখন লক্ষণীয় বিষয় হল আকাশ যদি শূন্যতার নাম হবে, তাহলে তার দর্জা থাকারই বা কী অর্থ, আবার শূন্যতার একটা স্তরে

গিয়ে এইসব জিজ্ঞাবাদেরই বা কী অর্থ? তিনি তো এসব জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তার নিচের শূন্যতাগুলো পার হয়ে এসেছেন। যাহোক কুরআন-হাদীছ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আকাশ শূন্যতার নাম নয়। বরং আকাশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে।

কুরআন-হাদীছ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী জ্যোতিঃবিজ্ঞানীদের কথিত মহাকাশ-এর ধারণাও সমর্থিত নয়। কারণ, কুরআন-হাদীছের ভাষ্যমতে প্রথম আকাশের উপর একে একে আরও ছয়টি আকাশ রয়েছে। আর সপ্তম আকাশের উপর জান্নাতসমূহের অবস্থান, আর তার উপর হচ্ছে আরশ যা জান্নাতের ছাদ স্বরূপ। অতএব জ্যোতিঃবিজ্ঞানীদের কথিত আমাদের আকাশের উপর অনন্ত শূন্যতা বিরাজ করার ধারণা কুরআন-হাদীছে সমর্থিত নয়। কেননা কুরআন-হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের এই আকাশের উপর আরও কয়েকটি আকাশ ও জান্নাত ইত্যাদি রয়েছে। অবশ্য আরশের উপরে কি আছে তা আমাদের জানা নেই। সে ক্ষেত্রে আমরা জ্যোতিঃবিজ্ঞানীদের মত বলতে পারি যে, তার উপরে কি আছে এবং তার শেষ কোথায় কিংবা আদৌ শেষ বলে কিছু আছে কি না তা আমাদের জানা নেই।

জান্নাত ও আরশের অবস্থান

এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

তাপবলয় (الحلقة الحرارية)

এ সম্বন্ধে ষষ্ট অধ্যায়ে আলোচনা আসবে।

সূর্যগ্রহণ (كُسوف الشمس)

চাঁদ নিজের উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে করতে যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আসে, তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর এসে পড়ে। ফলে পৃথিবীর যেখানে চাঁদের ছায়া পড়ে সেখান থেকে সূর্যকে পূর্ণ বা আংশিক দেখা যায় না। একেই সূর্যগ্রহণ (Eclipse of the Sun[১]) বলে। তবে চাঁদ আকারে ছোট হওয়ায় এর ছায়া পৃথিবীর সব জায়গা আবৃত করতে পারে না। ফলে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে একই সময় সূর্যগ্রহণ দেখা যায় না। যেখানে চাঁদের ছায়া পড়ে সেখান থেকেই কেবল সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায়।

একমাত্র অমাবশ্যার দিন চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে এসে থাকে। তাই একমাত্র অমাবশ্যার দিনই সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে। এ হিসেবে প্রত্যেক অমাবশ্যার দিনই সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা। কারণ, প্রত্যেক অমাবশ্যাতেই চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে এসে থাকে। কিন্তু তা হয় না। কারণ, পৃথিবীর কক্ষপথ ও চন্দ্রের কক্ষপথ একই সমতলে অবস্থিত নয়। বরং পাঁচ ডিগ্রীর মত তির্যকভাবে রয়েছে। তাই অমাবশ্যায় চন্দ্র একটু উঁচু নিচুতে থাকলে তার ছায়া পৃথিবীর উপর পড়বে না এবং সূর্যগ্রহণও হবে না। বছরে ২ থেকে ৫ বার চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সমসূত্রে আসে বলে একমাত্র ঐ সময়েই সূর্যগ্রহণ হতে পারে।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণ খুবই কম হয়। বেশির ভাগ সূর্য গ্রহণ হয় আংশিক গ্রহণ বা খণ্ডগ্রহণ। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ খুব বেশি ৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।

---

[১] উচ্চারণ: ইক্লিপ্‌স্ অব দ্যা সান্।

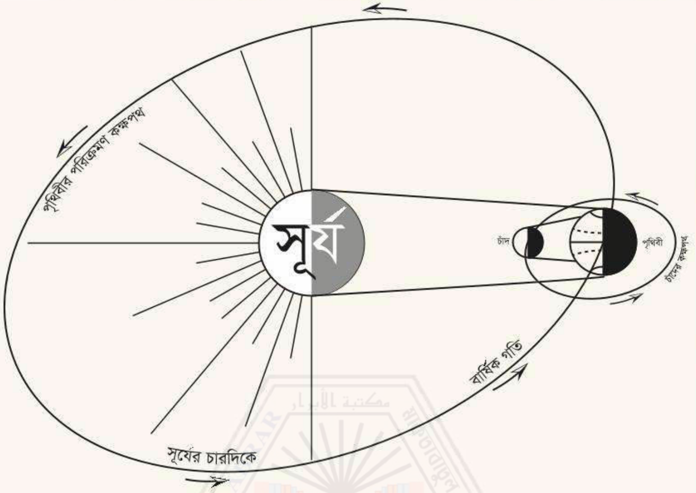

চিত্র নং ৭১ – সূর্যগ্রহণের চিত্র

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে ইসলামের কিছু তথ্য

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম কুসংস্কারমূলক ধারণা ছিল, এখনও রয়েছে। জাহেলি যুগে ধারণা ছিল সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ হলে অচিরেই দুর্যোগ বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিংবা এমন ধারণাও ছিল যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারও মৃত্যুর কারণে ঘটে থাকে। আমাদের সমাজে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বেলায় যেসব কুসংস্কার রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় গর্ভবতী মা যদি কিছু কাটাকাটি করে, তাহলে গর্ভস্থ সন্তান কান-কাটা বা ঠোঁট-কাটা অবস্থায় জন্ম নেয়। অনেকের ধারণা এ সময় গর্ভবতী নারীদের ঘুম বা পানাহার থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এ সময় গর্ভবতী মায়েরা কিছু খেলে সন্তান পেটুক হয়। অনেকে মনে করেন এ সময় গাছের ডাল ভাঙ্গলে বা বাঁকালে হাত-পা-বাঁকানো সন্তানের জন্ম হয়। অনেকের ধারণা সূর্যগ্রহণের ১২ ঘণ্টা এবং চন্দ্রগ্রহণের ৯ ঘণ্টা আগ থেকে খাবার গ্রহণ করা বারণ। এ সময় যৌন সংসর্গে বারণ, মলমূত্র ত্যাগেও বারণ। ইত্যাদি অনেক ধারণা বা বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবেই এসব ধারণার অনুকূলে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। কুরআন-হাদিসেও এসব ধারণা-বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় কিছু করণীয় রয়েছে কি না– এ ব্যাপারে সাধারণ ও স্থূল যুক্তিতে কিছু করণীয় আছে বলে মনে হয় না। তাই দেখা যায় সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় কিছু মানুষ আনন্দ ও কৌতুহল নিয়ে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করে থাকে। কিন্তু ইসলাম সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময়

---

৪ টি আমল রেখেছে। সেগুলো হল–

১. ভীত হওয়া।
২. বিশেষ নামায আদায় করা।
৩. যিকির, দুআ ও ইস্তেগফার করা। এবং
৪. সদকা প্রদান করা। এ চারটি বিষয়ের দলীল পরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেত। তিনি সাহাবীদের নিয়ে জামাতে নামাজ পড়তেন, কান্নাকাটি করতেন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এই নামাযকে বলা হয় যথাক্রমে সালাতুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণের নামায) ও সালাতুল খুসূফ (চন্দ্রগ্রহণের নামায)। কিন্তু সাধারণ অনেক মানুষ মনে করে চাঁদ যখন পরিভ্রমণ অবস্থায় কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে, তখন পৃথিবীর কোনো দর্শকের কাছে কিছু সময়ের জন্য সূর্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটাই সূর্যগ্রহণ। আর পৃথিবী যখন তার পরিভ্রমণ অবস্থায় চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে, তখনই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে চাঁদ কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। এটাই চন্দ্রগ্রহণ। ব্যাস এতটুকুই! এখানে ভীত হওয়ার কী কারণ আছে? নামায, কান্নাকাটি, দুআ সদকা ইত্যাদির কী যৌক্তিকতা আছে?

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ মুহূর্তে ভীত হওয়া এবং নামায, কান্নাকাটি, দুআ, সদকা ইত্যাদির যৌক্তিকতা রয়েছে। যৌক্তিকতা রয়েছে বলেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণে আতঙ্কিত হয়ে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। কান্নাকাটি, দুআ ও সদকা ইত্যাদির শিক্ষা দিয়েছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মুহূর্তকে আশঙ্কার মুহূর্ত বিবেচনা করেই ভীত হয়েছেন, নামায, কান্নাকাটি, দুআ, সদকা ইত্যাদির প্রবর্তন করেছেন। নামায, কান্নাকাটি, দুআ সদকা ইত্যাদির মাধ্যমেই সম্ভাব্য অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যমতেও চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত পৃথিবীর জন্য আশঙ্কার মুহূর্ত। কীভাবে আশঙ্কার মুহূর্ত তার দু'টো কারণ নিম্নে উল্লেখ করছি।

১. সৌরজগতে মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যবলয়ে অ্যাস্টেরয়েড (Asteroid), মিটিওরাইট (Meteorite), উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি পাথরের এক সুবিশাল বেল্ট রয়েছে। এ বেল্টে ঝুলন্ত একেকটা পাথরের ব্যাস ১২০ থেকে ৪৫০ মাইল। গ্রহাণুপুঞ্জের এ পাথরখণ্ডগুলো পরস্পর সংঘর্ষের ফলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরখণ্ড প্রতিনিয়ত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে। কিন্তু সেগুলো বায়ুমণ্ডলে এসে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। এই গ্রহাণুপুঞ্জের বৃহদাকারের পাথরগুলো যদি পৃথিবীতে আঘাত করে, তাহলে ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন হবে পৃথিবী। বিজ্ঞানীদেরই বর্ণনামতে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সমান্তরালে থাকে। ফলে তিনটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একত্রিত হয়ে ত্রিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এমনি মুহূর্তে যদি কোনো পাথর বেল্ট থেকে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহলে এই ত্রিশক্তির আকর্ষণের ফলে সেই পাথর প্রচণ্ড শক্তিতে, প্রবল বেগে পৃথিবীর দিকে চলে আসবে। এ প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আসা পাথরকে প্রতিহত করা তখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ফলে পৃথিবী ধ্বংস হবে। আর এ সময়ই গ্রহাণুপুঞ্জের ঝুলন্ত বড় পাথরগুলো পৃথিবীতে

আঘাত হানার আশঙ্কা বেশি। বিজ্ঞানীরা আজ পাথরের এই ঝুলন্ত বেল্ট নিয়ে শঙ্কিত কখন জানি এ বেল্ট থেকে কোন্ পাথর নিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীর বুকে আঘাত হানে, আর তা পৃথিবীর জন্য ধ্বংসের কারণ হয়। তাহলে দেখা গেল চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত পৃথিবীর জন্য একটা আশঙ্কাজনক মুহূর্ত। তাই এরকম মুহূর্তে সম্ভাব্য কোন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হয়তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরকম মুহূর্তে ভীত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন, সালাতুল কুসূফ ও সালাতুল খুসূফ-এর বিধান প্রবর্তন করেছেন, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও দুআ ও সদকার বিধান প্রবর্তন করেছেন।

২. আলো ও তাপের উৎস হলো সূর্য। আর আলো ও তাপের সঙ্গে রয়েছে পৃথিবী ও জীবজগতের সুনিবিড় সম্পর্ক। জীবজগতের বেঁচে থাকার একটা উৎস হল তাপ। সূর্যের তাপের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সবকিছুকে সতেজ ও সজীব রেখেছেন। উদ্ভিদ এই সূর্যালোক থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। তাপ ও আলোর সুবাদেই প্রাণীকুল জীবন বিপন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পায়। যদি পৃথিবীতে সূর্যের তাপ ও আলো না আসত, তাহলে প্রাণীকুলের জীবন বিপন্ন হত। পুরো পৃথিবী বরফে পরিণত হত। অন্যদিকে সূর্য যদি তার ভেতরকার সব তাপ পৃথিবীর ওপর উগরে দিত, তাহলেও পৃথিবী ধ্বংস হত, সবকিছু জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত। চন্দ্রের আলোর সাথেও পৃথিবীর অনেক কিছুর সম্পর্ক রয়েছে। জোয়ার ভাটা ইত্যাদি তার অন্যতম। অতএব সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় যখন স্বাভাবিক আলো ও তাপ ব্যাহত হতে দেখা যায়, তখনই মনের মধ্যে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা জাগা স্বাভাবিক। আর এরূপ কোন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হয়তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরকম মুহূর্তে ভীত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন, সালাতুল কুসূফ ও সালাতুল খুসূফ-এর বিধান প্রবর্তন করেছেন, আল্লাহর কাছে দুআ, কান্নাকাটি ও সদকার বিধান প্রবর্তন করেছেন।

উপরোক্ত দু'টো কারণ ছাড়াও অন্য কারণেও এসময়টা পৃথিবীর জন্য আশঙ্কাজনক হতে পারে, যার বিস্তারিত আমাদের জানা নেই, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বর্ণনা করে যাননি। হয়তো অন্য এমন কোন কারণও রয়েছে যা এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছেও ধরা পড়েনি। যে কারণই হোক চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত পৃথিবীর জন্য কোন না কোনভাবে পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের জন্য আশঙ্কাজনক বিধায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়েছেন এবং চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। নামায, দুআ ও সদকার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল, তার সারকথা হল সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায, দুআ, সদকা ইত্যাদির প্রবর্তন করেছেন সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কা থেকে। এমনও হতে পারে যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য ও চন্দ্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে দেখে এগুলোর ধ্বংসের দিকে চিন্তা ধাবিত হয়েছে। আর এগুলোর ধ্বংসের কথা চিন্তায় আসা থেকে পৃথিবীর ধ্বংস ও কেয়ামতের দিকে চিন্তা ধাবিত হয়েছে। আর তাই তিনি নামায, দুআ ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর দিকে রুজু হয়েছেন, রুজু হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময়ে ইস্তেগফারের কথা বলেছেন, যা থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এ সময় তার বিশেষভাবে পরকালের কথা স্মরণ হত।

যারা উপরোল্লিত কারণগুলো বুঝে না তারাই বলে, এ সময় ভয়ের কী আছে? এ সময় নামায, কান্নাকাটি, দুআ সদকা ইত্যাদির কী যৌক্তিকতা আছে? তারাই বলে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ একটা প্রাকৃতিক নিয়মঘটিত বিষয়। কিংবা বলা যায়, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। ব্যাস এতটুকুই! এখানে নামায, কান্নাকাটি, দুআ সদকা ইত্যাদির কী যৌক্তিকতা আছে?

এবার সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় যে ৪ টি আমলের কথা বলা হয়েছে তার দলীল পেশ করা হচ্ছে।

এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .» (رواه البخاري في صحيحه برقم ١٠٥٨)

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ কারও মৃত্যু বা জীবনের কারণে ঘটে না। বরং এ দু'টো আল্লাহর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা তিনি তাঁর বান্দাদের দেখান। অতএব যখন তোমরা (সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ) দেখবে ভীত হয়ে নামায পড়বে। (বোখারী: হাদীছ নং ১০৫৮)

এ হাদীছে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায ও ভীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আর এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ. » (رواه البخاري في صحيحه برقم ١٠٤٣)

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ কারও মৃত্যু বা জীবনের কারণে ঘটে না। অতএব যখন তোমরা (সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ) দেখবে নামায পড়বে এবং দুআ করবে। (বোখারী: হাদীছ নং ১০৪৩)

এ হাদীছে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায ও দুআর কথা বলা হয়েছে।

আর এক হাদীছে এসেছে–

«هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ {يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ} فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. » (رواه البخاري في صحيحه برقم ١٠٥٩)

অর্থাৎ, এসব নিদর্শন যা আল্লাহ দেখান তা কারও মৃত্যু বা জীবনের কারণে নয় বরং আল্লাহ এর দ্বারা তার বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। অতএব যখন তোমরা তার কিছু দেখবে ভীত হয়ে তার যিকির, দুআ ও ইস্তেগফারের দিকে ধাবিত হবে। (বোখারী: হাদীছ নং ১০৫৯)

এ হাদীছে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় ভীত হয়ে যিকির, দুআ ও ইস্তেগফারের কথা বলা হয়েছে।

আর এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

« إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. » (رواه مسلم في صحيحه برقم ٢١٢٧)

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ দু'টোর গ্রহণ কারও মৃত্যু বা জীবনের কারণে ঘটে না। অতএব যখন তোমরা সে দু'টো (সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ) দেখবে আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করবে, দুআ করবে, নামায পড়বে এবং সদকা করবে। (মুসলিম: হাদীছ নং ২১২৭)

এ হাদীছে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায ও দুআর সাথে সাথে সদকার কথাও বলা হয়েছে।

সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধান

সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধান রয়েছে ১৬ টি। নিম্নে উক্ত ১৬টি বিধান সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করা হল।

(১) সুবহে কাযেব প্রসঙ্গ

ভোরের দিকে সূর্য যখন ২১-১৮ ডিগ্রীর মধ্যে অবস্থান করে, তখনকার সময় হল সুবহে কাযেব বা সুবহে মুস্তাতীল। তখন সূর্যের আলো পূর্বাকাশে উপর-নিচ লম্বালম্বিভাবে দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলে কিছুটা উত্তর/দক্ষিণে হেলানোও দেখা যায়। সে আলো ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয় না। ভূ-পৃষ্ঠ তখন সম্পূর্ণই অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। সুবহে কাযেব-এর আলো দেখতে অনেকটা পিরামিডের মত দেখায়। এবং সে আলোয় লাল আভা মিশ্রিত থাকে না বরং সে আলো সাদা হয়ে থাকে। এ আলো বিষুব রেখার অঞ্চল থেকে ভাল দেখা যায় এবং শরৎকালে ভালভাবে দৃশ্য হয়। বিষুবীয় অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে এবং শরৎকাল ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতে খুব ভালভাবে দর্শনীয় হয় না। আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে অতি হালকাভাবে দেখা যায়। সুবহে কাযেব শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ, সূর্য ভোরের দিকে ১৮ ডিগ্রীতে প্রবেশ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত ইশা এবং সাহরীর সময় অবশিষ্ট থাকে। সুবহে কাযেব-এর এই আলোকে জ্যোতিঃবিজ্ঞানের পরিভাষায় Zodiacal light (জোডিয়াক্ল লাইট) বলা হয়। হাদীছে সুব্হে কাযেবের বর্ণনায় المستطيل এবং بياض শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[1] যার প্রথমটার অর্থ লম্বালম্বি আর দ্বিতীয়টার অর্থ সাদা। হাদীছে বর্ণিত সুবহে কাযেবের এই দুটো গুণ Zodiacal light -এর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(২) সুবহে সাদেক প্রসঙ্গ

সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার সাথে সাথে একদিকে ইশার ওয়াক্ত ও সাহরীর সময় শেষ হয়ে যায়, অন্যদিকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ভোরের দিকে সূর্য যখন ১৮ ডিগ্রীতে উপনীত হয় তখন সুবহে সাদেক শুরু হয়। তখন থেকে সামনে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত। ১৮ ডিগ্রী থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এই সময়কে জ্যোতিঃবিজ্ঞানীদের পরিভাষায় Astronomical Twilight (এস্ট্রোনোমিক্যাল টুওয়াইলাইট) বলা হয়। অতএব এস্ট্রোনোমিক্যাল টুওয়াইলাইট ও সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার সময় অভিন্ন। আর এস্ট্রোনোমিক্যাল টুওয়াইলাইট-এর শেষ ও সূর্যোদয়ের সময় অভিন্ন। অতএব ফজরের ওয়াক্তের সময়কাল সর্বসাকুল্যে সোয়া ঘণ্টার মত। কেননা প্রতি ডিগ্রী সমান ৪ মিনিট। অতএব ১৮ ডিগ্রী= ৭২ মিনিট তথা ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট। ...

---

১. এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق (رواه الترمذي برقم ٧٠٦ وقال : هذا حديث حسن صحيح)

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عدي بن حاتم قال لما نزلت { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل. رواه الترمذي برقم ٢٩٧٠ وقال : : هذا حديث حسن صحيح.

জ্যোতিঃবিজ্ঞানীরা আবার Astronomical Twilight কে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। পূর্বোক্ত পূর্ণ ১৮ ডিগ্রীর লালিমাকে তারা বলেন, Astronomical Twilight আর ১২ ডিগ্রী থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের লালিমাকে বলেন, Notical Twilight (নোটিক্যাল টুওয়াইলাইট) আর ৬ ডিগ্রী থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের লালিমাকে বলেন, Civil Twilight (সিভিল টুওয়াইলাইট)। ভোরের দিকে যেমন ৩ প্রকার টুওয়াইলাইট, সন্ধার দিকেও সূর্য অস্ত যাওয়ার পর এভাবেই ৩ টি টুওয়াইলাইট রয়েছে। ভোরের দিকের Astronomical Twilight কে Astronomical Dawn ও বলা হয়। এমনিভাবে Notical Dawn, Civil Dawn আর সন্ধার দিকের Astronomical Twilight কে Astronomical Dusk এমনিভাবে Notical Dusk, Civil Dusk বলা হয়। নিম্নের চিত্রে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

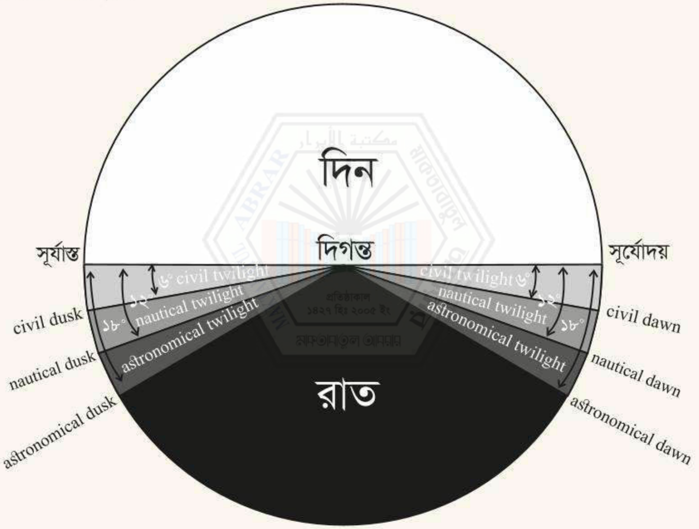

চিত্র নং ৭২ - তিন প্রকার টুওয়াইলাইট

সুবহে কাযেব প্রসঙ্গে বিশেষ কয়েকটি কথা

- সবস্থানে সুবহে কাযেব দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে।
- সব মওসুমে সুবহে কাযেব ভালোভাবে দেখা যায় না। সাধারণত শরৎকালে এটি ভালোভাবে দেখা যায়। এমনিভাবে শাফাকে আবইয়াযও সব মওসুমে ভালো দেখা যায় না। সাধারণত বসন্তকালে এটি ভালো দেখা যায়। যেমন Wikipedia-য় বলা হয়েছে, Zodiacal light is best seen during twilight after sunset in spring and before sunrise in autumn. অর্থাৎ, জোডিয়াক্-

ল্ লাইট সন্ধার আকাশে বসন্তকালে সন্ধার লালিমা শেষ হওয়ার পর ভালোভাবে দেখা যায়। আর শরৎকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্ব আকাশে ভালোভাবে দেখা যায়। অন্যত্র প্রায় এমনই বলা হয়েছে, springtime is the best time to see the zodiacal light in the evening. Autumn is the best time to see it before dawn.

- যারা সুবহে কাযেব দেখে অভ্যস্ত নয় তাদের কাছে প্রথম দিকে সুবহে কাযেবের আলো মালূম হয় না, পরে সুবহে সাদেকের আলো একটু বেশি পরিষ্কার হওয়ায় সেটিকেই তারা সুবহে কাযেব ভেবে ভুল করে।

- সুবহে কাযেবের আলোর আকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। (পশ্চিমাকাশে) অনেকটা উঁচু পিরামিডের ন্যায় দেখা যায়, যার নিচের দিকে কিছুটা ছড়ানো এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে সরু। আবার বলা যায় উঁচু পিলারের ন্যায় দেখা যায়। যেমন Wikipedia-য় বলা হয়েছে, the zodiacal light is a pyramid-shaped glow in the west after dark. অর্থাৎ, জোডিয়্যাক্ল লাইট হচ্ছে যা অন্ধকার হওয়ার পর পিরামিড আকারে উজ্জ্বলভাবে দেখা যায়। অন্যত্র বলা হয়েছে, The zodiacal light appears as a column, brighter at the horizon, অর্থাৎ, জোডিয়্যাক্ল লাইট দিগন্তে উজ্জ্বল স্তম্ভ আকারে দেখা যায়। আরও অন্যান্য আকৃতিও হয়ে থাকে। কোন কোন এলাকা থেকে উপরের সরু অংশ ডানে বা বামের দিকে বাঁকানো দেখা যায়। নিচের ছবিতে zodiacal light তথা সুবহে কাযেবের বিভিন্ন আকৃতি দেখানো হল।

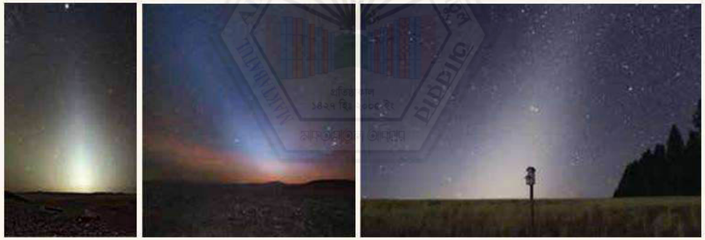

ছবি: ৭৩ – zodiacal light তথা সুবহে কাযেবের বিভিন্ন আকৃতি

- সুবহে কাযেব ও সুবহে সাদেক-এর আলোর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য এই যে, সুবহে কাযেবের আলোর দৈর্ঘ প্রস্থের চেয়ে অধিক। যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, এটি দেখতে অনেকটা উঁচু পিরামিডের ন্যায়, যার নিচের দিকে কিছুটা ছড়ানো এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে সরু। এটাকে অনেকটা ভেড়ার লেজের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। পক্ষান্তরে সুবহে সাদেকের আলো দৈর্ঘের চেয়ে (উপরের দিকের চেয়ে) প্রস্থের দিকে (নিচে ডান বামের দিকে) বেশি ছড়ানো থাকে। লক্ষ করুন তাফসীরে রূহুল মাআনীতে সুবহে সাদেক ও সুবহে কাযেব-এর পার্থক্য এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

هو أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل إنتشاره وحمله على الفجر الكاذب المستطيل الممتد كذنب السرحان وهم إلخ.

অর্থাৎ, সুবহে সাদেকের আলো খুব বেশি ছড়ানোর পূর্বে প্রস্থের দিকে বিস্তৃত দেখা যায়। এটাকে সুবহে কাযেব –যা ভেড়ার লেজের ন্যায় দৈর্ঘে বিস্তৃত দেখা যায়– মনে করা ভুল।

ফাতাওয়া আলামগীরিয়াতে বলা হয়েছে,

وقت الفجر من الصبح الصادق وهو البياض المنتشر في الأفق إللى طلوع الشمس. ولا عبرة بالكاذب الذي يبدو طولا إلخ.

অর্থাৎ, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে সাদেক থেকে। সুবহে সাদেক হচ্ছে সূর্য উদয়ের আগ পর্যন্ত দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া উজ্জ্বলতা। সুবহে কাযেবের কোন ধর্তব্য নেই, যা শুরুতে দৈর্ঘে প্রকাশ পায়।

- সুবহে সাদেক সূর্য ১৮ ডিগ্রী নিচে থাকতে শুরু হয় অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের প্রায় সোয়া ঘণ্টা পূর্বে সুবহে সাদেক শুরু হয়। এর পূর্বে ৩ ডিগ্রী পর্যন্ত অর্থাৎ, প্রায় ১২ মিনিট সুবহে কাযেব। তবে উল্লেখ্য যে, সুবহে সাদেক প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবহে কাযেবের আলো অদৃশ্য হয়ে যায় না, বরং আরও কিছু সময় পর্যন্ত ক্ষীণ হলেও দর্শনীয় থাকে।

সুবহে কাযেব বিষয়ে মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী-র তাহকীক প্রসঙ্গ

হযরত মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী (রহ.)–এর তাহকীক (আহছানুল ফাতাওয়া ২য় খণ্ডে বর্ণিত) অনুযায়ী সুবহে সাদেক শুরু হয় সূর্য ১৫ ডিগ্রী নিচে থাকতে। অর্থাৎ, তার মতে ফজরের ওয়াক্ত সর্বসাকুল্যে ১ ঘণ্টা (প্রতি ডিগ্রী = ৪ মিনিট)। ফাতাওয়া আলামগীরিয়াতেও এরকম একটা মতের দিকে ইশারা রয়েছে। তবে এটা জুমহুরের তাহকীক, জমহুরের মত ও তাআমুলে উম্মত বিরোধী।

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী (রহ.)–এর ১৫ ডিগ্রী বিষয়ক তাহকীক কেন গ্রহণযোগ্য নয় তার বিশেষ কয়েকটা কারণ:

১. عالمی ادارہ تسہیل الحسابات الاسلامیہ –এর مدیر সাইয়্যেদ শাব্বির আহমদ সাহেব কাকাখীল তার ফাহ্‌মুল ফালাকিয়্যাত (فہم الفلکیات) গ্রন্থে বলেছেন, তিনি প্রায় ১ মাস সুবহে সাদেকের বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ পর্যায়ে সপ্তাহ দশ দিন পরই তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, ১৮ ডিগ্রীর মতই সঠিক। আমাদের তাহকীকী টিমের পরিদর্শন মোতাবেকও ১৮ ডিগ্রীর মতই সঠিক।[১] আমাদের টীম সূর্য উদয়ের ১ ঘণ্টারও পূর্বে সুবহে সাদেক দেখেছে।

২. সাইয়্যেদ শাব্বির আহমদ সাহেব উক্ত গ্রন্থে আরও বলেছেন, তিনি সন্ধার আকাশে সূর্য সাড়ে ১৬ ডিগ্রী নিচে যাওয়া পর্যন্ত শাফাকে আহমার দেখতে পেয়েছেন। আমাদের টীমের পরিদর্শনও এমনই। এই টিমের সদস্যগণ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট পর্যন্ত স্পষ্টত শাফাকে আহমার দেখতে পেয়েছে। মুফতী রশীদ আহমদ সাহেবের তাহকীক ঠিক হলে সূর্য ১৫ ডিগ্রী নিচে যাওয়ার পর শাফাকে আবইয়ায শুরু হওয়ার কথা। তারপর আর শাফাকে আহমার-এর অবকাশ থাকে না। উল্লেখ্য, ভোরের আকাশে প্রথমে সুবহে কাযেব, যার আলো সাদা। তারপর সুবহে

---

১. আমাদের টীম ৭/৪/২০১৯ ইং রোজ রবিবার ফজরের সময় মুন্সিগঞ্জ জেলার সৈয়দপুর মাদ্রাসায় থেকে এটা পরিদর্শন করেছে।

২. আমাদের টীম ৬/৪/২০১৯ ইং রোজ শনিবার বাদ মাগরিব মুন্সিগঞ্জ জেলার সৈয়দপুর মাদ্রাসায় থেকে এটা পরিদর্শন করেছে।

সাদেক যার আলো লাল। এর বিপরীত সন্ধা আকাশে প্রথমে শাফাকে আহমার যার আলো লাল, তারপর শাফাকে আবইয়ায যার আলো সাদা। অর্থাৎ, সন্ধার আকাশের শাফাকে আহমার ভোরের আকাশের সুবহে সাদেকের স্থলবর্তী। এবং সন্ধার আকাশের শাফাকে আবইয়ায ভোরের আকাশের সুবহে কাযেবের স্থলবর্তী। আর সুবহে কাযেব ও শাফাকে আবইযায এবং সুবহে সাদেক ও শাফাকে আহমারের সময় ও মূলনীতি একই।

৩. সূর্য ১৫ ডিগ্রী নিচে আসার পূর্বেই যে আলো দেখা যায় তা দৈর্ঘের চেয়ে প্রস্থে অধিক বিস্তৃত। আমাদের টিমের পরিদর্শনও এমনই। সাইয়্যেদ শাব্বির আহমদ সাহেব কাকাখীলও তার ফাহ্‌মুল ফালাকিয়্যাত (فہم الفلکیات) গ্রন্থে এমনই বলেছেন। অতএব সেটা সুবহে সাদেকেরই আলো। ১৫ ডিগ্রী নিচে আসার পূর্বের আলো যদি সুবহে কাযেবের আলো হত, তাহলে অবশ্যই তা প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘের দিকে অধিক বিস্তৃত হত। কেননা পূর্বে আমরা হাদীছের ভাষ্য, মুফাসসির ও মুফতীদের বর্ণনা উল্লেখ করে এসেছি যে, সুবহে কাযেব ও সুবহে সাদেক-এর আলোর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল সুবহে কাযেবের আলোর দৈর্ঘ প্রস্থের চেয়ে অধিক। পক্ষান্তরে সুবহে সাদেকের আলো দৈর্ঘের চেয়ে (উপরের দিকের চেয়ে) প্রস্থের দিকে (নিচে ডান বামের দিকে) অধিক ছড়ানো থাকে।

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী (রহ.) Zodiacal light সুবহে কাযেব নয়– এ মর্মে যে ৩টি যুক্তি পেশ করেছেন সেগুলো সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাসহ নিম্নে পেশ করা হল।

১. মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী (রহ.) Zodiacal light সুবহে কাযেব নয়– এ মর্মে ১ নং যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা হল– এই আলো সুবহে সাদেক পর্যন্ত বাকি থাকে না। (অথচ সুবহে কাযেব সুবহে সাদেক পর্যন্ত বাকি থাকে।)

পর্যালোচনা: এ ব্যাপারে লেটেস্ট তথ্য যা নেটে পাওয়া যায় তা এরূপ– In spring, the zodiacal light can be seen for up to an hour after dusk ends. Or, in autumn, it can be seen for up to an hour before dawn. (অর্থ: বসন্তকালে অথবা শরৎকালে জোডিয়্যাক্‌ল লাইট অন্ধকার শেষ হওয়ারও এক ঘন্টা পর পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।) দেখুন নেটে: What is the zodiacal light?। এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে সুবহে সাদেক হওয়ার পরও এ আলো অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায় না বরং সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকতে পারে। এ আলো কখন থেকে কতক্ষণ বাকি থাকে তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা (২০১৮ সালের) নমুনা স্বরূপ নিম্নে প্রদান করা গেল।

Zodiacal Light 2018

In this year of 2018, the best dates and times for observing the zodiacal light are listed below. The sky must be very clear. The specific times listed are for Dodgeville, Wisconsin.

2018	Begin	End	Direction
Fri. Feb. 2	6:52 p.m.	7:52 p.m.	West
Sat. Feb. 3	6:53 p.m.	7:53 p.m.	West
Sun. Feb. 4	6:54 p.m.	7:54 p.m.	West
Mon. Feb. 5	6:55 p.m.	7:55 p.m.	West
Tue. Feb. 6	6:57 p.m.	7:57 p.m.	West
Wed. Feb. 7	6:58 p.m.	7:58 p.m.	West
Thu. Feb. 8	6:59 p.m.	7:59 p.m.	West
Fri. Feb. 9	7:00 p.m.	8:00 p.m.	West
Sat. Feb. 10	7:01 p.m.	8:01 p.m.	West
Sun. Feb. 11	7:02 p.m.	8:02 p.m.	West
Mon. Feb. 12	7:04 p.m.	8:04 p.m.	West
Tue. Feb. 13	7:05 p.m.	8:05 p.m.	West
Wed. Feb. 14	7:06 p.m.	8:06 p.m.	West
Thu. Feb. 15	7:07 p.m.	8:07 p.m.	West
Fri. Feb. 16	7:08 p.m.	8:08 p.m.	West
Sat. Mar. 3	7:27 p.m.	7:59 p.m.	West
Sun. Mar. 4	7:28 p.m.	8:28 p.m.	West
Mon. Mar. 5	7:29 p.m.	8:29 p.m.	West
Tue. Mar. 6	7:30 p.m.	8:30 p.m.	West
Wed. Mar. 7	7:32 p.m.	8:32 p.m.	West
Thu. Mar. 8	7:33 p.m.	8:33 p.m.	West
Fri. Mar. 9	7:34 p.m.	8:34 p.m.	West
Sat. Mar. 10	7:35 p.m.	8:35 p.m.	West
Sun. Mar. 11	8:37 p.m.	9:37 p.m.	West
Mon. Mar. 12	8:38 p.m.	9:38 p.m.	West
Tue. Mar. 13	8:39 p.m.	9:39 p.m.	West
Wed. Mar. 14	8:41 p.m.	9:41 p.m.	West
Thu. Mar. 15	8:42 p.m.	9:42 p.m.	West
Fri. Mar. 16	8:43 p.m.	9:43 p.m.	West
Sat. Mar. 17	8:44 p.m.	9:44 p.m.	West
Sun. Mar. 18	8:46 p.m.	9:46 p.m.	West
Mon. Mar. 19	9:38 p.m.	9:47 p.m.	West
Mon. Apr. 2	9:06 p.m.	9:56 p.m.	West
Tue. Apr. 3	9:08 p.m.	10:08 p.m.	West

Wed. Apr. 4	9:09 p.m.	10:09 p.m.	West
Thu. Apr. 5	9:11 p.m.	10:11 p.m.	West
Fri. Apr. 6	9:12 p.m.	10:12 p.m.	West
Sat. Apr. 7	9:14 p.m.	10:14 p.m.	West
Sun. Apr. 8	9:15 p.m.	10:15 p.m.	West
Mon. Apr. 9	9:17 p.m.	10:17 p.m.	West
Tue. Apr. 10	9:18 p.m.	10:18 p.m.	West
Wed. Apr. 11	9:20 p.m.	10:20 p.m.	West
Thu. Apr. 12	9:21 p.m.	10:21 p.m.	West
Fri. Apr. 13	9:23 p.m.	10:23 p.m.	West
Sat. Apr. 14	9:25 p.m.	10:25 p.m.	West
Sun. Apr. 15	9:26 p.m.	10:26 p.m.	West
Mon. Apr. 16	9:28 p.m.	10:28 p.m.	West
Tue. Apr. 17	9:43 p.m.	10:29 p.m.	West
Thu. Aug. 9	3:08 a.m.	3:44 a.m.	East
Fri. Aug. 10	3:09 a.m.	4:09 a.m.	East
Sat. Aug. 11	3:11 a.m.	4:11 a.m.	East
Sun. Aug. 12	3:13 a.m.	4:13 a.m.	East
Mon. Aug. 13	3:14 a.m.	4:14 a.m.	East
Tue. Aug. 14	3:16 a.m.	4:16 a.m.	East
Wed. Aug. 15	3:18 a.m.	4:18 a.m.	East
Thu. Aug. 16	3:19 a.m.	4:19 a.m.	East
Fri. Aug. 17	3:21 a.m.	4:21 a.m.	East
Sat. Aug. 18	3:22 a.m.	4:22 a.m.	East
Sun. Aug. 19	3:24 a.m.	4:24 a.m.	East
Mon. Aug. 20	3:26 a.m.	4:26 a.m.	East
Tue. Aug. 21	3:27 a.m.	4:27 a.m.	East
Wed. Aug. 22	3:29 a.m.	4:29 a.m.	East
Thu. Aug. 23	3:30 a.m.	4:30 a.m.	East
Fri. Aug. 24	4:20 a.m.	4:32 a.m.	East
Sat. Sep. 8	3:54 a.m.	4:54 a.m.	East

Sun. Sep. 9	3:55 a.m.	4:55 a.m.	East
Mon. Sep. 10	3:57 a.m.	4:57 a.m.	East
Tue. Sep. 11	3:58 a.m.	4:58 a.m.	East
Wed. Sep. 12	3:59 a.m.	4:59 a.m.	East
Thu. Sep. 13	4:01 a.m.	5:01 a.m.	East
Fri. Sep. 14	4:02 a.m.	5:02 a.m.	East
Sat. Sep. 15	4:03 a.m.	5:03 a.m.	East
Sun. Sep. 16	4:05 a.m.	5:05 a.m.	East
Mon. Sep. 17	4:06 a.m.	5:06 a.m.	East
Tue. Sep. 18	4:07 a.m.	5:07 a.m.	East
Wed. Sep. 19	4:09 a.m.	5:09 a.m.	East
Thu. Sep. 20	4:10 a.m.	5:10 a.m.	East
Fri. Sep. 21	4:11 a.m.	5:11 a.m.	East
Sat. Sep. 22	4:12 a.m.	5:12 a.m.	East
Sun. Sep. 23	5:07 a.m.	5:14 a.m.	East
Sun. Oct. 7	4:30 a.m.	5:04 a.m.	East
Mon. Oct. 8	4:32 a.m.	5:32 a.m.	East
Tue. Oct. 9	4:33 a.m.	5:33 a.m.	East
Wed. Oct. 10	4:34 a.m.	5:34 a.m.	East
Thu. Oct. 11	4:35 a.m.	5:35 a.m.	East
Fri. Oct. 12	4:36 a.m.	5:36 a.m.	East
Sat. Oct. 13	4:37 a.m.	5:37 a.m.	East
Sun. Oct. 14	4:39 a.m.	5:39 a.m.	East
Mon. Oct. 15	4:40 a.m.	5:40 a.m.	East
Tue. Oct. 16	4:41 a.m.	5:41 a.m.	East
Wed. Oct. 17	4:42 a.m.	5:42 a.m.	East
Thu. Oct. 18	4:43 a.m.	5:43 a.m.	East
Fri. Oct. 19	4:44 a.m.	5:44 a.m.	East
Sat. Oct. 20	4:45 a.m.	5:45 a.m.	East
Sun. Oct. 21	4:47 a.m.	5:47 a.m.	East
Mon. Oct. 22	4:57 a.m.	5:48 a.m.	East

২. মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী (রহ.) Zodiacal light সুবহে কাযেব নয়– এ মর্মে ২য় যে যুক্তি পেশ করেছেন তা হল– এই আলো সুবহে সাদেকের ৩ ডিগ্রী নিচে থাকতে শুরু হয় না। বরং আরও আগে প্রকাশ পায় এবং ৩ ডিগ্রীর বহু পূর্বে শেষও হয়ে যায়। (অথচ সুবহে কাযেব সুবহে সাদেকের ৩ ডিগ্রী পূর্বে শুরু হয়।)

পর্যালোচনা: ৩ ডিগ্রীর পূর্বে যে শেষ হয় না তা পূর্বের পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী (রহ.) Zodiacal light সুবহে কাযেব নয়– এ মর্মে ৩য় যে যুক্তি পেশ করেছেন তা হল– এই আলো বছরে মাত্র দুই মাস দেখা যায়। (অথচ সুবহে কাযেব সারা বছর দেখা যায়।)

পর্যালোচনা: এই আলো বছরে মাত্র দুই মাস দেখা যায়– ব্যাপারটা এমন নয় বরং সারা বছরই দেখা যায়, তবে দুই মাস ভালো দেখা যায়। যেমন Wikipedia-য় এ সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, Zodiacal light is best seen during twilight after sunset in spring and before sunrise in autumn. (অর্থাৎ, জোডিয়্যাক্ল্ লাইট সন্ধার আকাশে বসন্তকালে সন্ধার লালিমা শেষ হওয়ার পর ভালোভাবে দেখা যায়। আর শরৎকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্ব আকাশে ভালোভাবে দেখা যায়।) অন্যত্র বলা হয়েছে, springtime is the best time to see the zodiacal light in the evening. Autumn is the best time to see it before dawn. (অর্থ: বসন্তকাল হচ্ছে বিকালে জোডিয়্যাক্ল লাইট দেখার ভালো সময়। আর শরৎকাল হচ্ছে সকালের পূর্বে তা দেখার ভালো সময়।) নেটে দেখুন: What is the zodiacal light?।

(৩) সূর্য উদয়কালীন নিষিদ্ধ সময়

সূর্যের বিভিন্ন ডিগ্রীতে অবস্থানের সঙ্গে যেসব বিধি-বিধান জড়িত রয়েছে তার মধ্যে তৃতীয় হল সূর্য উদয়ের মুহূর্তে ৩ মিনিট সময় নিষিদ্ধ সময়। উল্লেখ্য, সূর্যের চাকতির উপর প্রান্ত দিগন্তের উপরে আসা শুরু হলেই সূর্য উদয়ের সময় ধরা হয়। আর সূর্যের চাকতির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কোন বিন্দু পার হতে সময় লাগে ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড। অতএব সূর্য উদয়ের শুরু থকে উদয় পূর্ণ হতে সময় লাগে ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড। এই পুরো ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড সময়ই হচ্ছে নিষিদ্ধ সময়। সাধারণত মানুষ সেকেন্ডকে হিসেবে আনতে অভ্যস্ত নয়, তদুপরি সতর্কতার বিষয়ও রয়েছে। তাই সূর্য উদয়কালীন ৩ মিনিট পরিমাণ সময়কে নিষিদ্ধ সময় বলা হয়ে থাকে।

(৪) সূর্য উদয়ের পর মাকরূহ সময়

সূর্য উদয়ের পর যতক্ষণ তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় সে সময়টা উদয়ের হুকুমে। সে সময় কোন নামায পড়া জায়েয নয়। এ সময়টা হল মাকরূহ সময়। কথাটিকে এভাবেও বলা যায় যে, সূর্য উদয়ের পর যতক্ষণ তার আলো এতটা প্রখর না হয় যে, তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, ততক্ষণ কোন নামায পড়া জায়েয নয়। যখন তার আলো এতটা প্রখর হয়ে ওঠে যে, তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না তখন নামায পড়া যায় এবং তখনই ইশরাকের সময় শুরু হয়। এই তাকিয়ে থাকা যায় বা যায় না– এটা আকাশ স্বাভাবিক মেঘমুক্ত থাকার সময়ে বিবেচ্য। এ হচ্ছে সূর্য উদয়ের পর কতক্ষণ নামায পড়া যায় না সে ব্যাপারে একটি মূলনীতি, এবং এটিই প্রকৃত মূলনীতি। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেছেন, সূর্য উদয়ের পর সূর্য এক নেযা তথা ৬ হাত

উঁচুতে উঠার আগ পর্যন্ত কোন নামায পড়া জায়েয নয়, তারপর থেকে জায়েয। মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী সাহেব সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখেছেন কোন কোন অঞ্চলে বা কোন কোন মওসুমে সূর্য উদয়ের ৯ মিনিট পর, আবার কোন কোন অঞ্চলে বা কোন কোন মওসুমে সূর্য উদয়ের ১০ কিংবা ১২ মিনিট পর এ সময় হয়ে থাকে। সতর্কতার জন্য এই ১২ মিনিটকে গ্রহণ করা ভাল। আমার দেখা মতেও ১২ মিনিটের মধ্যেই সূর্য এতটুকু উঁচুতে উঠে যায় যে, তার দিকে আর দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে যায় না। ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে মিসর সফরে থাকা অবস্থায় ২২ এপ্রিল তূর পাহাড়ে আরোহণ করা হয়েছিল। তখন সূর্য উদয়ের বিষয়টি খুব সুন্দরভাবেই তাহকীক করেছি। আমার 'সফরনামা–১ মিসরে কয়েকদিন' গ্রন্থে এ বিষয়ে সবিশদ বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। তাই সূর্য উদয়ের পর ১২ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ, সূর্য ৩ ডিগ্রী উপরে ওঠা পর্যন্ত মাকরূহ সময় এবং তার পর থেকেই ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু ধরা যায়।

(৫) ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু

এ সম্বন্ধে পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

(৬) সূর্য মধ্যাহ্ন রেখায় অবস্থানকালীন নিষিদ্ধ সময়

সূর্য মধ্যাহ্ন রেখায় (خط الزوال) থাকাকালীন সময় নিষিদ্ধ সময়। পূর্বে বলা হয়েছে, সূর্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত কোন বিন্দু পার হতে সময় লাগে ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড। অতএব সূর্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত মধ্যাহ্ন রেখা পার হতে সময় লাগে ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড। এই পুরো ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড সময়ই হচ্ছে নিষিদ্ধ সময়। সাধারণত মানুষ সেকেন্ডকে হিসেবে আনতে অভ্যস্ত নয়, তদুপরি সতর্কতার বিষয়ও রয়েছে। তাই সূর্য মধ্যাহ্ন রেখা পার হওয়ার সময় (তথা ঠিক দুপুরের সময়) ৩ মিনিট পরিমাণ সময়কে নিষিদ্ধ সময় বলা হয়ে থাকে।

(৭) দ্বিপ্রহর (نصف النهار)

দ্বিপ্রহর (نصف النهار) দুই প্রকার। যথা: এক. সাধারণ্যে প্রচলিত দ্বিপ্রহর অর্থাৎ, সাধারণভাবে দ্বিপ্রহর বা দুপুর বললে মানুষ যে সময়টা বুঝে (نصف النهار العرفي), দুই. শর্য়ী দ্বিপ্রহর (نصف النهار الشرعي) অর্থাৎ, সাধারণ্যে প্রচলিত দ্বিপ্রহর হল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়। যেমন: ৫ নভেম্বর সূর্যোদয় ৬ টা ৮ মিনিটে আর সূর্যাস্ত ৫টা ২০ মিনিটে। তাহলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় হয় ১১ ঘন্টা ১২ মিনিট। তার অর্ধেক হয় ৫ ঘন্টা ৩৬ মিনিট। অতএব সাধারণ্যে প্রচলিত দ্বিপ্রহর (نصف النهار العرفي) হবে সূর্যোদয়ের ৫ ঘন্টা ৩৬ মিনিট পর তথা ১১ টা ৪৪ মিনিটে। এরপর থেকে (সতর্কতামূলক কিছু সময় পর) যোহরের ওয়াক্ত শুরু। আর শরয়ী দ্বিপ্রহর (نصف النهار الشرعي) হল সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়। যেমন: ৫ নভেম্বর সুবহে সাদেক হয় ৪টা ৪৪ মিনিটে। এখান থেকে সূর্যাস্ত (৫: ২০) পর্যন্ত পূর্ণ সময় হয় ১২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট। অতএব সুবহে সাদেক থেকে ৬ ঘন্টা ১৮ মিনিট পর তথা ১১টা ২ মিনিটে হবে শরয়ী দ্বিপ্রহর বা শরয়ী দুপুর। অর্থাৎ, প্রচলিত দ্বিপ্রহর থেকে শরয়ী দ্বিপ্রহর হবে ৪২ মিনিট পূর্বে। যেসব রোযার ক্ষেত্রে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত নিয়ত রাখার অবকাশ রয়েছে সেই দ্বিপ্রহর বলতে এই শরয়ী দ্বিপ্রহরই উদ্দেশ্য।

এই শর্য়ী দ্বিপ্রহরকে আয্-যাহওয়াতুল কুবরা (الضحوة الكبرى)ও বলা হয়।

(৮) সূর্য মধ্যাহ্ন রেখা পার হওয়ার পর যাওয়াল-এর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

(৯) জোহরের ওয়াক্ত :

সূর্য মধ্যাহ্ন রেখা পার হওয়ার পর জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং প্রতিটি বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। যেমন একটি ১২ ইঞ্চি লম্বা দণ্ড, ঠিক দুপুরের সময় তার ছায়া ৪ ইঞ্চি। এই ৪ ইঞ্চি হল মূল ছায়া। তাহলে যতক্ষণ ঐ দণ্ডের ছায়া ২৮ ইঞ্চি না হবে ততক্ষণ জোহরের ওয়াক্ত থাকবে।

(১০) প্রতিটি বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুণ হওয়া থেকে আসরের সময়:

প্রতিটি বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুণ হওয়ার সময় থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। কোন কোন মাযহাব মতে প্রতিটি বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) একগুণ হওয়ার সময় থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

(১১) সূর্যের বর্ণ পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাকরূহ সময়:

সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে যখন তার আলো হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং সূর্যের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভব হয়– এ সময় থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী। (তবে শুধু ঐ দিনের আসরের নামায না পড়ে থাকলে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পড়ে নিবে।) আমাদের তাহকীকী টিমের দেখা মতে সূর্য অস্ত যাওয়ার ১৬ মিনিট পূর্ব থেকে এই সময় শুরু হয়। আহছানুল ফাতাওয়া গ্রন্থকারও ১৫/১৬ মিনিটের কথা বলেছেন।

(১২) সূর্য অস্তকালীন নিষিদ্ধ সময়:

সূর্যের চাকতির এক প্রান্ত দিগন্তের নিচে যাওয়া শুরু করলে অপর প্রান্ত নিচে যেতে ২ মিনিট ৮ সেকেন্ড সময় লাগে, এ সময় সতর্কতা স্বরূপ ৩ মিনিট সময় নিষিদ্ধ সময়।

(১৩) সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু:

সূর্য অস্তকালীন ৩ মিনিট সময় পার হওয়ার পর মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং শাফাকে আহমার (পশ্চিম আকাশের লাল আভা) শেষ হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকে।

(১৪) ইশতিবাকুন্নুজূম থেকে মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু:

মাগরিবের ওয়াক্ত শাফাকে আহমার (পশ্চিম আকাশের লাল আভা) শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে, তবে ইশতিবাকুন্ নুজূম হওয়ার পর মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। 'আল-বাহরুর রায়েক্ব' গ্রন্থে বলা হয়েছে,

وفي القنية تأخير العشاء إلى ما زاد على نصف الليل والعصر إلى وقت اصفرار الشمس والمغرب إلى اشتباك النجوم يكره كراهة تحريم .

উক্ত ইবারতে ইশতিবাকুন্ নুজূম হওয়ার পর মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'ইশতিবাকুন্ নুজূম' অর্থ ছোট বড় সব নক্ষত্র এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া যেন মনে হয় সবগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িয়ে পড়েছে। আমাদের তাহকীকী টিমের দেখামতে সূর্য অস্ত যাওয়ার ৪০ মিনিট পরই এ অবস্থা হয়ে থাকে। তাই সূর্য অস্ত যাওয়ার ৪০ মিনিট পর থেকে মাগরিবের মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়।

---

(১৫) শাফাকে আহ্মার শেষ হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময়

পূর্বে বলা হয়েছে, সূর্য অস্তকালীন ৩ মিনিট সময় পার হওয়ার পর মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং শাফাকে আহ্মার (পশ্চিম আকাশের লাল আভা) শেষ হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকে। তবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইশতিবাকুন্ নুজূম হওয়ার পর মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়।

(১৬) শাফাকে আবইয়ায থেকে ইশার সময় শুরু

সকালের আকাশে সূর্য উদয়ের পূর্বে সূর্য ১৮ ডিগ্রী নিচে থাকা থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। তদ্রূপ সন্ধার আকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ১৮ ডিগ্রী নিচে যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বাকি থাকে। এই ১৮ ডিগ্রী পর্যন্ত শাফাকে আহমারের সময়। এরপর শাফাকে আবইয়ায শুরু হলে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। এ মত অনুযায়ীই ফতোয়া, যদিও শাফাকে আবইয়ায শেষ হওয়ার পর ইশার ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মতও রয়েছে।

চন্দ্রগ্রহণ (خُسوف القمر)

পৃথিবী নিজ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন চন্দ্র ও সূর্যের মাঝে একই সমতলে এসে পড়ে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে এবং চন্দ্রকে ঢেকে ফেলে। ফলে চন্দ্রকে আর দেখা যায় না। একেই বলে চন্দ্রগ্রহণ (Eclipse of the Moon[১])। যদি পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে তাহলে তাকে পূর্ণগ্রহণ আর চন্দ্রের অংশ বিশেষ ঢাকলে তাকে আংশিক গ্রহণ বলে।

একমাত্র পূর্ণিমার দিন সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে পৃথিবী থাকে। তাই একমাত্র পূর্ণিমার দিনই চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে। বছরে ১২টি পূর্ণিমার মধ্যে ২ বা ৩ বার পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য একই সমতলে আসতে পারে। অন্যান্য পূর্ণিমাগুলোতে চন্দ্র একটু উঁচু নিচু থাকতে পারে, কারণ, পৃথিবীর কক্ষপথ ও চন্দ্রের কক্ষপথ একই সমতলে অবস্থিত নয়। বরং পাঁচ ডিগ্রীর মত তির্যকভাবে রয়েছে। তাই বছরে ২/৩ বারের অধিক চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে না।

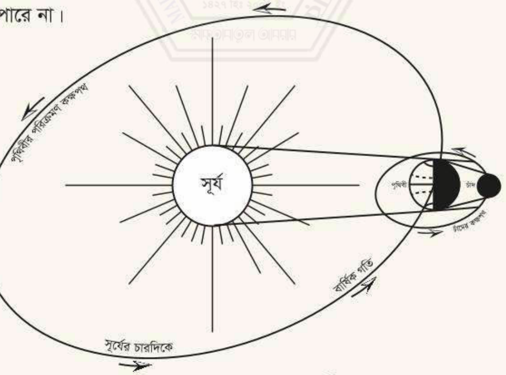

চিত্র নং ৭৪ – চন্দ্রগ্রহণের চিত্র

---

[১] উচ্চারণ: ইক্লিপ্স্ অব দ্যা মুন্।

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ তথ্য

সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গে প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ একটা মূলনীতি বলেছেন যা আজও স্বীকৃত। তা হল যদি আজ সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় তাহলে ১৮ বছর ১১১/৩ দিন পর অর্থাৎ, ৬৬৮৫ দিন ৮ ঘণ্টা পর আবার হবে। তবে সাবেক স্থানেই তা দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরি নয়। এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় হুবহু একই ধরনের গ্রহণ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ একটি তথ্য। এটাকে বলা হয় স্যারস চক্র (سيروس/Saros cycle)। প্রথম ব্যবিলনীয়রা এটি আবিষ্কার করে। (তথ্যসূত্র: فلكيات جديده ও নেটে Saros cycle)

বছরে কয়বার গ্রহণ হতে পারে?

উল্লেখ্য, ১ বছরে ৭ বার গ্রহণ হতে পারে যার মধ্যে ৫টা সূর্যগ্রহণ আর ২টা চন্দ্র গ্রহণ। সাধারণত বছরে ২ বার সূর্যগ্রহণ হয়।

চন্দ্রকলাসমূহ (أوجُه القمر)

প্রতিদিন চাঁদের আকার সমান দেখা যায় না। চাঁদের প্রথম প্রায় ১৫ দিন ধরে চাঁদের আকার ক্রমশ একটু একটু করে বড় দেখা যায়, যাকে ‘শুক্লপক্ষ’ বলে। আবার প্রায় শেষ ১৫ দিন চাঁদের আকার ক্রমশ একটু একটু ছোট করে দেখা যেতে থাকে, যাকে ‘কৃষ্ণপক্ষ’ বলে। প্রতিদিন চাঁদের এই যতটা অংশ বাড়ে বা কমে তাকে বলা হয় ‘চন্দ্রকলা’। এভাবেও বলা যায় যে, প্রতিদিন চাঁদের যতটুকু অংশ দর্শনীয় সেটাই হচ্ছে চাঁদের কলা। অমাবশ্যার পরের থেকে প্রতিদিন চাঁদের এক এক কলা বাড়তে থাকে অর্থাৎ, প্রতিদিনই একটু একটু করে চাঁদের বেশি অংশ দেখা যায় এবং প্রতিদিনই চাঁদ আগের দিনের চেয়ে একটু আগে আকাশে দেখা যায়। আবার পূর্ণিমার পরের রাত থেকে প্রতিদিন চাঁদের এক এক কলা কমতে থাকে অর্থাৎ, প্রতিদিনই আগের দিনের চেয়ে চাঁদের কালো অংশ (অন্ধকার অংশ) একটু একটু করে বাড়তে থাকে এবং প্রতিদিনই চাঁদ আগের দিনের চেয়ে আকাশে একটু দেরিতে দেখা যায়।

চাঁদের কলা বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ হল– চাঁদ তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীও তার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এভাবে নিজ নিজ কক্ষপথে চাঁদ ও পৃথিবী উভয়েই এগিয়ে চলছে। ফলে কখনও চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে এসে যাওয়ায় পৃথিবীর উপর চাঁদের ছায়া পড়ছে আবার কখনও সূর্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী এসে যাওয়ায় চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ছে। আর চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চলার কারণে এই ছায়ার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে। ফলে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে।

চন্দ্র তার কক্ষপথে চলতে চলতে যখন সূর্য আর পৃথিবীর ঠিক মাঝে চলে আসে তখন চন্দ্রের পৃথিবীর দিকের উপর সূর্যের আলো পতিত না হওয়ার কারণে পৃথিবী থেকে চন্দ্র মোটেই দেখা যায় না। এঁকে বলা হয় অমাবশ্যা। ঠিক এর বিপরীত দিকে চন্দ্র অবস্থান কালে চন্দ্রের পৃথিবীর দিকের পূর্ণ অর্ধেকে সূর্যের আলো পতিত হওয়ার কারণে পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে পূর্ণ আলোকিত মনে হয়। একে বলা হয় পূর্ণিমা।

পূর্বে চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ণিমার রাতে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝে পৃথিবী এসে যাওয়ার কারণে চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে চন্দ্রগ্রহণ হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক অমাবশ্যার রাতে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে চন্দ্র এসে যাওয়ায় চন্দ্র পৃথিবী থেকে সূর্যকে আড়াল করে দেয় বিধায় সূর্যগ্রহণ হয়। তাহলে প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতেই চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা এবং প্রত্যেক অমাবশ্যায় সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না এ কারণে যে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ ও পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের পরিক্রমণ পথ অর্থাৎ, পৃথিবীর কক্ষপথ ও চন্দ্রের কক্ষপথ একই সমতলে অবস্থিত নয়। বরং পাঁচ ডিগ্রীর মত তির্যকভাবে রয়েছে। এ কারণে সব পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার রাতে চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবী একমুখী থাকলেও সোজা এক রেখায় থাকে না, একটু উঁচু নিচু হয়ে যেতে পারে। তাই সব পূর্ণিমা রাতে চন্দ্রগ্রহণ হয় না এবং সব অমাবশ্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না।

চন্দ্রকলা ও চন্দ্রের কক্ষপথ সম্বন্ধে কুরআনে কারীমের বর্ণনা নিম্নরূপ–

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.

অর্থাৎ. আর চন্দ্রের জন্য আমি নির্ধারিত করেছি বিভিন্ন মানযিল। অবশেষে সে পুরাতন খেজুর কাধির ডাঁটার ন্যায় হয়ে যায়। (সূরা ইয়াছীন: ৩৯) চাঁদের মানযিল অর্থ হল তার পরিভ্রমণ ও পরিক্রমণের স্থান। চাঁদ এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। যে মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনে হয়, সে মাসে চাঁদ ২৮ মানযিল অতিক্রম করে এবং দু'রাত গোপন থাকে, আর ২৯ দিনে মাস হলে একরাত গোপন থাকে। (জালালাইন) তাই তার মানযিল ত্রিশ বা উনত্রিশটি হয়ে থাকে। যেহেতু চাঁদ দু'রাতও গোপন থাকে, তাই সাধারণভাবে তার মানযিল আটাশটিই বলা হয়।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ.

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় এবং তার মনযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন। যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। (সূরা ইউনুস: ৫) উল্লেখ্য, সূর্য এবং চন্দ্র থাকার ফলেই দিন-রাত-মাস-বছর ইত্যাদি গণনা করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন রকম হিসাব-নিকাশ চন্দ্র-সূর্যের সাথে জড়িত রয়েছে। এ জন্যই বলা হয়েছে, “যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার।” (ফাওয়ায়েদে উছমানী)

নিম্নের চিত্রের সাহায্যে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা ঘটার বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে।

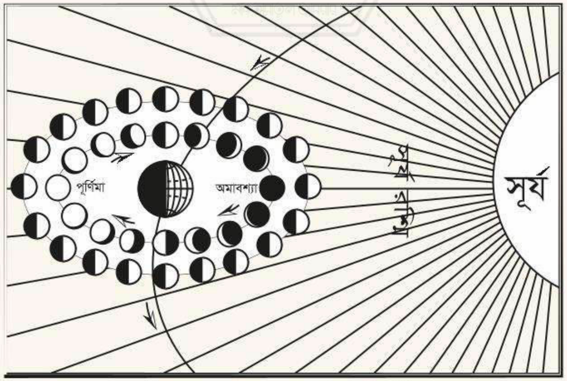

চিত্র নং ৭৫– চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র

উল্লেখ্য, চিত্রে চাঁদের দুটো সারি দেখানো হয়েছে। পৃথিবীর নিকটের সারিতে পৃথিবী থেকে চাঁদ কখন কতটুকু কীভাবে দর্শনীয় হয় তা দেখানো হয়েছে। আর দূরের সারিতে দেখানো হয়েছে চাঁদের উপর সূর্য রশ্মি সবদিনই সমান পতিত হয়ে থাকে। সামনের চিত্রে (চাঁদের ২৮ মানযিলের চিত্রে) চাঁদের ২৮ কলা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

চাঁদের ২৮ মনযিল প্রসঙ্গ

পূর্বের পরিচ্ছেদে চাঁদের ২৮ মানযিল থাকার কথা আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, চাঁদের মনযিল অর্থ হল তার পরিভ্রমণ ও পরিক্রমণের স্থান। চাঁদ এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। যে মাস পূর্ণ ত্রিশ দিনে হয়, সে মাসে চাঁদ ২৮ মনযিল অতিক্রম করে এবং দু' রাত গোপন থাকে, আর ২৯ দিনে মাস হলে এক রাত গোপন থাকে। (জালালাইন) তাই তার মনযিল ত্রিশ বা উনত্রিশটি হয়ে থাকে। যেহেতু চাঁদ দু' রাতও গোপন থাকে, তাই সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়।

উল্লেখ্য, চাঁদের কলা আর চাঁদের মানযিল এক কথা নয়। প্রতিদিন চাঁদের যতটা অংশ বাড়ে বা কমে তাকে বলা হয় চন্দ্রকলা বা চাঁদের কলা। এভাবেও বলা যায় যে, প্রতিদিন চাঁদের যতটুকু অংশ দর্শনীয় সেটাই হচ্ছে চাঁদের কলা। আর চাঁদ প্রতিদিন তার কক্ষপথে যতটুকু জায়গা জুড়ে অবস্থিত থাকে সেটা হচ্ছে চাঁদের মানযিল। চাঁদের কক্ষপথকে ৩০ ভাগে ভাগ করুন, তার প্রতি অংশ হচ্ছে চাঁদের এক এক মানযিল।

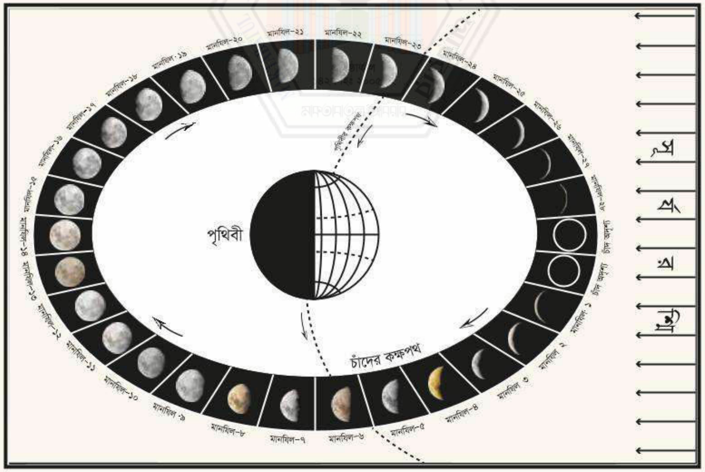
পৃথিবী
চাঁদের কক্ষপথ
পৃথিবীর কক্ষপথ
মানযিল-১
মানযিল-২
মানযিল-৩
মানযিল-৪
মানযিল-৫
মানযিল-৬
মানযিল-৭
মানযিল-৮
মানযিল-৯
মানযিল-১০
মানযিল-১১
মানযিল-১২
মানযিল-১৫
মানযিল-১৬
মানযিল-১৭
মানযিল-১৮
মানযিল-১৯
মানযিল-২০
মানযিল-২১
মানযিল-২২
মানযিল-২৩
মানযিল-২৪
মানযিল-২৫
মানযিল-২৬
মানযিল-২৭
মানযিল-২৮
চাঁদ অদৃশ্য
চাঁদ অদৃশ্য
সূর্যরশ্মি

চিত্র নং ৭৬– চাঁদের ২৮ মানযিলের চিত্র

চান্দ্রমাসের বিবরণ

পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় $২৭\frac{১}{৩}$ দিন (২৭ দিন ৭ ঘন্টা ৪৩ মিনিট ১১.৪৭ সেকেন্ড।) অমাবশ্যার দিন চাঁদ থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে। তাই এই অবস্থান থেকে ঘুরে আবার এই অবস্থানে ফিরে আসতে চাঁদের সময় লাগা উচিত $২৭\frac{১}{৩}$ দিন। অর্থাৎ, চান্দ্রমাস হওয়া উচিত $২৭\frac{১}{৩}$ দিনে। কিন্তু এই অবস্থানে চাঁদের ঘুরে আসতে আসতে ইত্যবসরে পৃথিবী তার কক্ষপথে বেশ কিছু দূর এগিয়ে যায়। তাই পৃথিবী ও সূর্যের সমসূত্রে পৌঁছতে চাঁদকে আরও কিছু পথ অতিক্রম করতে হয় বলে অতিরিক্ত কিছু সময়ের প্রয়োজন পড়ে। এ কারণে $২৭\frac{১}{৩}$ দিনের পরিবর্তে $২৯\frac{১}{২}$ দিন পরে চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য সমসূত্রে এসে পৌঁছে। তাই $২৯\frac{১}{২}$ দিনে এক চান্দ্রমাস হয়। কিন্তু আরবি মাস $২৯\frac{১}{২}$ দিনের স্থলে ২৯ বা ৩০ দিনে কেন হয় তার বিবরণ সামনে "চান্দ্রমাস ২৯ বা ৩০ দিনে কেন হয়?" শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের বেশ কিছু ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব প্রযোজ্য। এদিকে ইংগিত করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ.

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় এবং তার মনযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন। যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। (সূরা ইউনুস: ৫) অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে। তুমি বলে দাও এটা সময় পরিচয়ের চিহ্ন মানুষের জন্য এবং হজ্জ আদায়ের জন্য। (সূরা বাকারা: ১৮৯)

চাঁদ পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখায় কেন?

এখানে পরপর ৪টা বিষয়ে আলোচনা করব। যথা: চাঁদ পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখায় কেন? চাঁদ পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে আগে দেখায় কেন? চান্দ্রমাস একাধারে ২৯ বা ৩০ দিনে কেন হয়? চান্দ্রমাস একাধারে কয়টা ২৯ বা কয়টা ৩০ দিনে হতে পারে? সবগুলো বিষয় বুঝার সুবিধার জন্য নিম্নে ৩টা চিত্র এবং সেগুলোর বিবরণ পেশ করা হবে। তারপর বিষয়দুটো সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হবে।

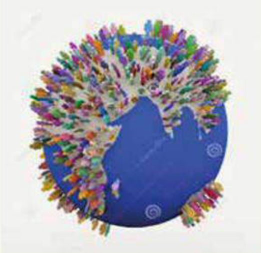

চিত্র নং ৭৭– পৃথিবীর বিভিন্ন সাইডে মানুষের অবস্থান

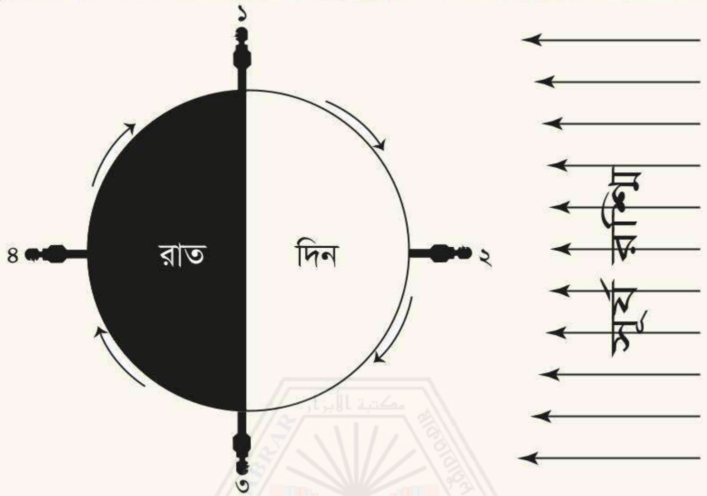

চিত্র নং ৭৮ – দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে মানুষের অবস্থান

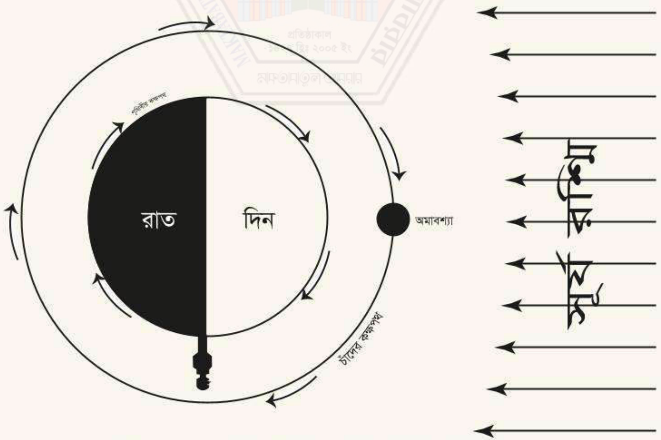

চিত্র নং ৭৯ – সন্ধার দিগন্তে একজন মানুষের অবস্থান

চিত্রসমূহের বিবরণ: 'পৃথিবীর বিভিন্ন সাইডে মানুষের অবস্থান' নামক চিত্রে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর যে সাইডেই যে অবস্থান করছে তার পা ভূমির দিকে এবং মাথা আকাশের দিকে। এতে মনে হতে পারে চিত্রের নিচের দিকে যারা অবস্থান করছে তারা নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে না কেন? বস্তুত পৃথিবীর আকর্ষণই প্রত্যেককে ভূমির দিকে আকর্ষণ করছে। ফলে প্রত্যেকের পায়ের দিক তথা ভূমির দিকই তার কাছে নিচের দিক এবং মাথার দিক তার কাছে উপরের দিক। অতএব বাইরে থেকে তাদের মাথা নিচের দিকে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মাথাও তাদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে উপরের দিকেই রয়েছে। 'দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ে মানুষের অবস্থান' নামক চিত্রে দেখানো হয়েছে সকালে, দুপুরে, সন্ধায় ও রাতে পৃথিবীর পৃষ্ঠে একজন মানুষের অবস্থান কেমন থাকে। মনে রাখতে হবে সূর্য পৃথিবীর পূর্ব দিকে থাকে। তাই চিত্রে লক্ষ করুন পৃথিবীর পূর্বের অর্ধেকে দিন চলছে, কারণ সূর্য সেদিকে। আর পশ্চিমের অর্ধেকে রাত চলছে, কারণ সে অংশে সূর্যের আলো পড়ছে না। আরও মনে রাখতে হবে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে তার অক্ষে আবর্তিত হয়। অতএব উপরে ১ নং মানুষটি সকালের দিগন্তে রয়েছে। সে পৃথিবীর পূর্বের অংশের মাঝে আসবে দুপুরের সময়। তাই ২ মানুষটি রয়েছে দুপুরের অবস্থানে। আর ৩ নং মানুষটি রয়েছে সন্ধান দিগন্তে এবং ৪ নং মানুষটি রয়েছে মধ্যরাতের অবস্থানে। 'সন্ধার দিগন্তে একজন মানুষের অবস্থান' নামক চিত্রে দেখানো হয়েছে একজন লোক সন্ধার দিগন্তে রয়েছে। তার পূর্ব দিকে রয়েছে অমাবশ্যার চাঁদ। বস্তুত সূর্যের দিক বিবেচনায় এ দিকটি পূর্ব দিক, কিন্তু এই লোকটি যখন সকালের দিগন্তে ছিল তখন পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলীয় ভূখণ্ডের দিকে তথা পশ্চিম দিগন্তের দিকে তার মুখ থাকলে যেদিকে তার মুখ থাকত এই সন্ধার দিগন্তেও তার মুখ সেদিকেই রয়েছে বিধায় প্রকৃতপক্ষে সে পশ্চিম দিকেই মুখী হয়ে রয়েছে। তাই অমাবশ্যার চাঁদ আরও একটু আগে বাড়লে সে তার পশ্চিম দিগন্ত থেকেই সে নতুন চাঁদ দেখতে পাবে। তাই তার কাছে মনে হবে পশ্চিম দিকেই চাঁদ দেখছে। যদিও সে চাঁদ সূর্যের দিক বিবেচনায় পূর্ব দিকেই রয়েছে।

চাঁদ পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখায় কেন

এবার আমরা চাঁদ পশ্চিম দিকে উদিত হতে দেখায় কেন– তার আলোচনায় আসছি। 'সন্ধার দিগন্তে একজন মানুষের অবস্থান' নামক চিত্রের বিবরণ থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, আরবি মাসের প্রথম দিকের চাঁদ পশ্চিম দিকে দেখায় কেন? সন্দেহ হয় এভাবে যে, অমাবশ্যার পরই নতুন চাঁদ দেখা যায় আর অমাবশ্যার সময় চাঁদ থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে, অতএব নতুন চাঁদ তো সূর্যের দিকে তথা পূর্বদিকেই দেখা যাওয়ার কথা। চিত্রের বিবরণ থেকে সারকথা যা বুঝা গেল তা হচ্ছে– নতুন চাঁদ যেদিকে দেখা যায় সে দিকটা সূর্যের বিবেচনায় ঠিকই পূর্ব দিক, কিন্তু সন্ধার দিগন্তে অবস্থানকারী মানুষ তাদের পশ্চিম দিগন্ত থেকেই চাঁদ দেখতে পায় বিধায় তাদের কাছে সেটা পশ্চিম দিকেই দেখাচ্ছে বলে অনুভূত হয়ে থাকে।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন– নতুন চাঁদ সূর্যের বিবেচনায় পূর্ব দিকে আর পশ্চিম দিগন্তের দিক থেকে দেখা যায় বিবেচনায় পশ্চিম দিকে, তাহলে আমরা কোন্‌টা বলব– নতুন চাঁদ পূর্ব দিকে দেখা যায় বলব, না কি পশ্চিম দিকে দেখা যায় বলব? এর উত্তর হল– আমরা বলব, পশ্চিম দিকে দেখা যায়। কেননা পৃথিবীর দিক নির্ণিত হয়ে থাকে পৃথিবীর ভূ-পরিমণ্ডলের ভিত্তিতে। পৃথিবীর ভূ-পরিমণ্ডলের বাইরের কোন কিছুর ভিত্তিতে পৃথিবীর দিক নির্ণিত হয় না। এ কারণেই পৃথিবীর একেবারে উত্তর মেরু-বিন্দুতে অবস্থানকারীর পক্ষে উত্তর দিক বলে কিছু নেই। তার পক্ষে দিক রয়েছে মাত্র তিনটি–

দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। যদিও ধ্রুবতারার ভিত্তিতে সেদিককে তার উত্তর দিক বলা যেতে পারত। এমনিভাবে দক্ষিণ মেরু-বিন্দুতে অবস্থানকারীর পক্ষে দক্ষিণ দিক নেই। তার পক্ষে দিক রয়েছে মাত্র তিনটি– উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম। যদিও সাউদার্ণ ক্রস–এর ভিত্তিতে সেদিককে তার দক্ষিণ দিক বলা যেতে পারত।

চাঁদ পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে আগে দেখায় কেন?

চাঁদ পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে আগে দেখায় কেন– এ বিষয়টা বুঝার জন্য 'সন্ধার দিগন্তে একজন মানুষের অবস্থান' নামক চিত্রটি ভালভাবে লক্ষ করুন। মনে করুন চিত্রের মানুষটি বাংলাদেশের। সে যখন সন্ধার দিগন্তে উপনীত হল তখন যদি চাঁদ অমাবশ্যার পর পর্যাপ্ত সময় না পাওয়ায় দর্শনীয় অবস্থানে না আসে, তাহলে সে চাঁদ দেখতে পাবে না। সে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ যেখানে আসলে দেখা যায় তা থেকে আড়ালে চলে যাবে। ইতিমধ্যে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরতে থাকায় পশ্চিম দিকের কোন দেশ সন্ধার দিগন্তে আসবে এবং চাঁদ ইতিমধ্যে আরও সময় পাওয়ায় দর্শনীয় অবস্থানে চলে আসবে, ফলে সেই পশ্চিম দেশের লোকেরা আজ চাঁদ দেখতে পাবে। আর বাংলাদেশের লোকেরা চাঁদ দেখতে পাবে আগামীকাল। এভাবে পশ্চিমের দেশের লোকেরা আগে আর পূর্বের দেশের লোকেরা পরে চাঁদ দেখতে পায়।

চান্দ্রমাস ২৯ বা ৩০ দিনে কেন হয় এবং পরপর কয়মাস ২৯ ও কয়মাস ৩০ দিনের হতে পারে?

সহীহ হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী চান্দ্রমাস ২৯ বা ৩০ দিনে হবে। তার চেয়ে কম বা তার চেয়ে বেশি হবে না। অতএব চান্দ্রমাস ২৮ বা ৩১ দিনের হবে না। ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَلَاثِينَ ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ.(رواه البخاري في صحيحه برقم ٥٣٠٢)

অর্থাৎ, (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ ছড়িয়ে দেখান) মাস এই এই এই অর্থাৎ, ৩০ দিনে। তারপর বলে এবং এই এই এই (তৃতীয় বারে বৃদ্ধাঙ্গুল গুটিয়ে) অর্থাৎ, ২৯ দিনে। একবার তিনি বলেন ৩০ দিনে আরেকবার বলেন ২৯ দিনে। (বোখারী: হাদীছ নং ৫৩০২)

এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত যে, চান্দ্রমাস হয়ত ২৯ কিংবা ৩০ দিনে হবে। এ তো গেল হাদীছ থেকে দলীল। আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুসারে আরবি মাস ২৯ কিংবা ৩০ দিনে কেন হয় তা বুঝার জন্য পূর্বে বর্ণিত কিছু তথ্য আবার স্মরণ করুন– পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় ২৭$\frac{১}{৩}$ দিন (২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ১১.৪৭ সেকেন্ড।) অমাবশ্যার দিন চাঁদ থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে। তাই এই অবস্থান থেকে ঘুরে আবার এই অবস্থানে ফিরে আসতে চাঁদের সময় লাগা উচিত ২৭$\frac{১}{৩}$ দিন। অর্থাৎ, চন্দ্রমাস হওয়া উচিত ২৭$\frac{১}{৩}$ দিনে। কিন্তু এই অবস্থানে চাঁদের ঘুরে আসতে আসতে ইত্যবসরে পৃথিবী তার কক্ষপথে বেশ কিছু দূর এগিয়ে যায়। তাই পৃথিবী ও সূর্যের সমসূত্রে পৌঁছতে চাঁদকে আরও কিছু পথ অতিক্রম করতে হয় বলে অতিরিক্ত কিছু সময়ের প্রয়োজন পড়ে। এ কারণে ২৭$\frac{১}{৩}$ দিনের পরিবর্তে ২৯$\frac{১}{২}$ দিন পরে চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্য সমসূত্রে এসে পৌঁছে। তাই

আগের মাসে যেখানে এসে চাঁদ দর্শনীয় হয়েছিল পরবর্তী মাসে চাঁদের সেখানে ফিরে আসতে সাড়ে ২৯ দিন সময় লাগবে। অতএব এক চন্দ্রমাস হয় সাড়ে ২৯ দিনে।

আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, চাঁদের কক্ষপথের যে কোন স্থান থেকে সেই স্থানে আবার ফিরে আসতে চাঁদের সময় লাগে সাড়ে ২৯ দিন। অতএব এবার ভেবে দেখুন কোন এক অঞ্চলের মানুষ কোন এক মাসে যদি ২৯ দিনে চাঁদ দেখে (অর্থাৎ, সেই মাস তাদের ২৯ দিনে হয়ে থাকে), তাহলে তারা সন্ধার দিগন্তে যখন চাঁদ দেখেছিল সেখান থেকে পরবর্তি সাড়ে ২৯ দিন পর চাঁদ আবার সেই স্থলে পৌঁছবে। কিন্তু সাড়ে ২৯ দিনের সময় তারা থাকবে সকাল বা আরও কিছু পরের দিগন্তে, ফলে তারা সন্ধার দিগন্তে না থাকায় চাঁদ দেখতে পাবে না। তারা চাঁদ দেখতে পাবে আরও আধা দিন পরে যখন তারা সন্ধার দিগন্তে পৌঁছবে। তার অর্থই হল এ মাস তাদের কাছে ৩০ দিনের হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তারা চাঁদের সাড়ে ২৯ দিনের সময়েই স্বাভাবিক অবস্থান থেকে একটু অগ্রসর হয়ে যায়[১] এবং চাঁদ যতটুকু সময় আকাশে স্থায়ী হয় তার মধ্যেই তারা সন্ধার দিগন্তে পৌঁছে যায়, তাহলে এ মাসও তাদের ২৯ দিনের হয়ে যাবে। অর্থাৎ, পরপর ২ মাস ২৯ দিনের হয়ে যাবে। আর এভাবে তারা সন্ধার দিগন্তে পৌঁছতে না পারলে এ মাস ৩০ দিনের হয়ে যাবে। যদি এ মাস ৩০ দিনের হয় আর পরবর্তী সাড়ে ২৯ দিন পর চাঁদ যখন আবার সেই স্থানে পৌঁছে তখন তারা থাকে দুপুরে, ফলে তারা চাঁদ দেখতে না পায়, তারা চাঁদ দেখতে পায় আধা দিন পরে, তাহলে পরের এ মাসও তাদের ৩০ দিনের হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, পরপর ২ মাস ৩০ দিনের হয়ে যাবে।)

---

১. কীভাবে অগ্রসর হতে পারে বিষয়টা বুঝার জন্য অন্য দুটো বিষয় সামনে রাখতে হবে। (১) কক্ষপথে পৃথিবীর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। অর্থাৎ, পূরো ২৪ ঘণ্টা নয় বরং তার চেয়ে ৩ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড কম। তার অর্থ হচ্ছে প্রতি পরবর্তি দিন একজন মানুষ এই ৩ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড আগে সন্ধার দিগন্তে পৌঁছে যায়। তাহলে আলোচনার সুবিধার জন্য বলা যায় প্রতিদিন এই ৩ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড হাতে সঞ্চিত থাকে। (২) পৃথিবীর দিগন্ত কখনও সূর্যের দিকে বেড়ে যায়, তখন একজন মানুষ সন্ধার দিগন্তে আগেই পৌঁছে যায়। এটা হয় যখন মৌসুমের ব্যবধানের কারণে সংশ্লিষ্ট গোলার্ধ সূর্য থেকে একটু দূরবর্তী হয়ে যায় এবং তার ফলে সে গোলার্ধে শীতকাল হয়ে থাকে এবং রাত বড় হয়। এর বিপরীত কখনও পৃথিবীর দিগন্ত সূর্য থেকে একটু পিছে সরে যায়, তখন একজন মানুষ সন্ধার দিগন্তে একটু বিলম্বে পৌঁছে। এটা হয় যখন মৌসুমের ব্যবধানের কারণে সংশ্লিষ্ট গোলার্ধ সূর্যের দিকে একটু অগ্রসর হয়ে যায় হয় এবং সে গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল হয়ে থাকে এবং দিন বড় হয়।

অতএব এবার মূল বিষয়টা বুঝার চেষ্টা করা যাক। কেউ বিগত মাসে ২৯ দিনে চাঁদ দেখল। তারপরে সাড়ে ২৯ দিনে যখন চাঁদ পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসবে তখন তিন চার মাসের সঞ্চিত ৫/৬ ঘণ্টা সময় তার হাতে থাকার কারণে সে ৫/৬ ঘণ্টা পূর্বেই সন্ধার দিগন্তে পৌঁছে যাবে, ফলে এ মাসেও সে ২৯ দিনেই চাঁদ দেখতে পাবে। এভাবে পরপর ২ মাস ২৯ দিনে হয়ে যাবে। তদুপরি তার দিগন্ত ইতিমধ্যে সূর্যের দিকে পূর্বের মাসগুলোর তুলনায় অগ্রসর হয়ে থাকতে পারে। একারণেও সে আগেই চাঁদ দেখে ফেলতে পারে। এদুটো কারণ ছাড়াও চাঁদ আগে বা পরে দেখার বা বলা যায় কোনো দিন দেখার আর কোনো দিন না দেখার আরও বহু কারণ রয়েছে, যেগুলো পরিবর্তনশীল। সেগুলোকে বলা হয় চাঁদ দেখার ভেরিয়্যাব্‌ল। এ রকম ভেরিয়্যাব্‌ল রয়েছে কয়েক হাজার। তাই সবগুলো ভেরিয়্যাব্‌লকে সমন্বয় করে এবং যোগ/বিয়োগ করে চূড়ান্ত ফল দাঁড় করানো এখনও সম্ভব–এর পর্যায়ে আসেনি যে, কোন্ মাসে কয় তারিখে চাঁদ দেখা যাবে। বিজ্ঞানীরাও নিশ্চিত করে বলতে পারেন না যে, কোন্ মাস ২৯ বা কোন্ মাস ৩০ দিনের হবে। তারা যে লুনার ক্যালেন্ডার (চান্দ্র ক্যালেন্ডার) বের করেন তা সম্ভাবনাভিত্তিক, নিশ্চিত নয়। একারণেই বাস্তবেও অনেক মাস লুনার ক্যালেন্ডারের বর্ণনা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে, যা আমরা নিত্য দেখতে পাই। স্বয়ং একাধিক লুনার ক্যালেন্ডারেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

যাহোক এভাবে পরপর একাধিক মাস ২৯ এবং একাধিক মাস ৩০ দিনের হতে পারে। পূর্বের পরিচ্ছেদে সহীহ হাদীছের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চান্দ্রমাস ২৯ বা ৩০ দিনের হবে। তার চেয়ে কম বা তার চেয়ে বেশি হবে না। অতএব চান্দ্রমাস ২৮ বা ৩১ দিনের হবে না। কিন্তু পরপর কয় মাস ২৯ দিনে হতে পারে বা কয়মাস ৩০ দিনে হতে পারে সে সম্বন্ধে হাদীছে কিছু বলা হয়নি। তবে মাওলানা মূসা বাযী রূহানী রহ. الهيئة الكبرى (আল-হাইয়াতুল কুবরা) গ্রন্থের ১ম খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, চন্দ্রকলার নিয়মানুসারে পরপর ৩ মাস ২৯ এবং পরপর ৪ মাস ৩০ দিনের হতে পারে।

চান্দ্রমাস যে পরপর ৩ মাস ২৯ এবং ৪ মাস ৩০ দিনের হয় তার একটা বাস্তব প্রমাণ পেশ করছি। আমি ঢাকার ইসলামিয়া মাদ্রাসায় (জামিআ ইসলামিয়া তাঁতীবাজার) প্রায় এক যুগ উস্তাদ হিসেবে খেদমত করেছি। উক্ত মাদরাসায় উস্তাদদের হাজিরা, বেতন ইত্যাদি আরবি মাস অনুসারেই দেয়া হত। একবার আমরা কয়েকজন উস্তাদ (আমি, মাওলানা আতহার আলী মোমেনশাহী ও মাওলানা মাসউদুর রহমান খুলনাভী) মিলে ১৪১৪ হিজরী সন থেকে ১৪৩০ হিজরী সন পর্যন্ত ১৭ বছরের শিক্ষক হাজিরা খাতা যাচাই করে একটি তালিকা তৈরি করলাম। তাতে পরপর ৩ মাস ২৯ দিনে যাওয়ার ২টা বাস্তবতা এবং পরপর ৪ মাস ৩০ দিনে যাওয়ার ২টা বাস্তবতা দেখতে পেলাম। সেই তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশটুকু দেখুন।

হিজরী	মুহাররম	সফর	রবি: আ:	রবি: ছা:	জুমা: উ:	জুমা: ছা:	রজব	শাবান	রমজান	শাওয়াল	যীকা'দা	যিলহজ্জ
১৪১৫	২৯	৩০	২৯	৩০	২৯	২৯	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০	৩০
১৪২৩	৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	২৯	২৯	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০
১৪২৪	৩০	৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	২৯	৩০	২৯	২৯	৩০	২৯
১৪২৫	৩০	৩০	৩০	৩০	২৯	২৯	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	২৯

অমাবশ্যা-এর বয়স কতটুকু হলে চন্দ্র খালি চোখে দেখার যোগ্য হয়

শরীয়তের হুকুম চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল, নতুন চাঁদের জন্মের উপর নয়। হাদীছ ইরশাদ হয়েছে,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.

অর্থাৎ, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ, চাঁদ দেখে ঈদ কর। (বোখারী: হাদীছ নং ১৯০৯) এই "দেখা" দ্বারা খালি চোখেই দেখা উদ্দেশ্য, দূরবীন দ্বারা কিংবা প্লেনে আরোহণ করে দেখা উদ্দেশ্য নয়। কেননা ইসলামের বিধান সর্বকালের সকলের জন্য প্রযোজ্য বিধান। কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি সর্বকালের সকলের জন্য প্রযোজ্য বিষয় নয়। যেমনিভাবে দূরবীন দ্বারা কিংবা প্লেনে আরোহণ করে দেখা উদ্দেশ্য নয় তেমনি বৈজ্ঞানিক হিসাবমতে চাঁদের জন্ম হওয়াও উদ্দেশ্য নয়, বরং খালি চোখে দেখা উদ্দেশ্য। অতএব বৈজ্ঞানিক হিসাব মোতাবেক নতুন চাঁদ (New moon[১])-এর জন্ম হয়ে গেলেও যদি তা খালি চোখে দেখা না যায়, তাহলে নতুন মাস গণ্য হবে না, সেই চাঁদের ভিত্তিতে রোযা শুরু করা বা ঈদ করা হবে না। মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানীদের পরিভাষার New moon আর ইসলামী পরিভাষার

---

১. উচ্চারণ: নিউ মুন্।

"হেলাল" (নতুন চাঁদ) এক কথা নয়। New moon চাঁদের বয়সের হিসাব-ভিত্তিক, আর হেলাল দর্শন-ভিত্তিক। রয়ে গেল অমাবশ্যা (New moon)-এর বয়স কতটুকু হলে চাঁদ খালি চোখে দেখার যোগ্য হয়, তারও দ্ব্যর্থহীন কোন সীমা নেই।

অমাবশ্যা (New moon)-এর বয়স কতটুকু হলে চন্দ্র খালি চোখে দেখার যোগ্য হয় এ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতবিরোধ রয়েছে, সাধারণভাবে সূর্য থেকে চন্দ্রের ৮ ডিগ্রী, ১০ ডিগ্রী, ১২ ডিগ্রী ব্যবধানের পূর্বে দেখা সম্ভব না হওয়ার মত বর্ণনা করা হয়। (النجوم النشطى شرح الهيئة الوسطى لموسى البازي) কেউ কেউ ৮ ডিগ্রী ব্যবধানের পূর্বেও দেখা যেতে পারে বলে মত দিলেও সাধারণভাবে ৮ ডিগ্রী ব্যবধানের পূর্বে খালি চোখে চন্দ্র দেখা প্রায় অসম্ভব বলেই মন্তব্য করা হয়ে থাকে। সে হিসেবে বলা যায় ১৫ ঘণ্টা হওয়ার পূর্বে খালি চোখে তা দেখাই প্রায় অসম্ভব। "ইসলামী মাহ আওর রূইয়াতে হিলাল" (اسلامی ماہ اور رویت ہلال، ناشر : مجلس تحقیقات شرعیہ ،برطانیہ) গ্রন্থে (প্রকাশকাল ১৯৯০ ইং, পৃষ্ঠা নং ৬১) বলা হয়েছে, বিগত নব্বই বৎসরে সর্বনিম্ন বয়সের যে চাঁদ সুন্দরভাবে দেখা সম্ভব হয়েছে তা হল ১৪ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটের চাঁদ। তাও যন্ত্রের সাহায্যে এবং ২ মিনিটেরও কম সময়ের জন্য।

উল্লেখ্য, চন্দ্রের এক ডিগ্রী পথ পার হতে সময় লাগে প্রায় ১.৯৬ ঘণ্টা।

চান্দ্র ক্যালেন্ডার প্রসঙ্গ

কেউ কেউ স্থূল চিন্তা থেকে বলে থাকেন, যদি সোলার ক্যালেন্ডার (Solar calendar[১]/ সূর্য-ভিত্তিক ক্যালেন্ডার বা সৌর-পঞ্জিকা) বের করা যায় এবং তার অনুসরণ করা যায়, তাহলে কেন লুনার ক্যালেন্ডার (Lunar calendar[২]/চন্দ্র-ভিত্তিক ক্যালেন্ডার বা চান্দ্র-পঞ্জিকা) তৈরি করে তার অনুসরণ করা যাবে না? বস্তুত সোলার ক্যালেন্ডার আর লুনার ক্যালেন্ডার-এর বিষয় এক রকম নয়। সোলার ক্যালেন্ডার তৈরি হয় সূর্য দেখে। ফলে বাস্তব দর্শন-ভিত্তিক হওয়ায় তাতে অবাস্তবতা কিছু আসে না এবং সেটা নিশ্চিত বাস্তবতা-ভিত্তিক হয়। পক্ষান্তরে লুনার ক্যালেন্ডার তৈরি হয় বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে, যে হিসাব-নিকাশ স্বয়ং বৈজ্ঞানিকদের বাচনিকই পূর্ণ নিশ্চয়তা-ভিত্তিক নয়। আর বাস্তবেও আমরা লুনার ক্যালেন্ডার-এর বর্ণনা থেকে নিত্যই ব্যতিক্রম ঘটতে দেখতে পাই। অতএব সন্দেহপূর্ণ হিসাব-নিকাশ ভিত্তিক এবং অনিশ্চয়তা-ভিত্তিক লুনার ক্যালেন্ডার শরয়ী বিধানের অবলম্বন হতে পারে কী করে? যেখানে রমজানের চাঁদ দেখলে রোযা রাখা ফরয হয়ে দাঁড়ায় আর ঈদের চাঁদ দেখলে রোযা রাখা হারাম হয়ে দাঁড়ায়- একটা সন্দেহপূর্ণ ও অনিশ্চিত তথ্যভিত্তিক ক্যালেন্ডার কী করে এমন একটা অকাট্য ও দৃঢ় বিধানের ভিত্তি হতে পারে?

পূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি- চাঁদ আগে বা পরে দেখার বহুবিধ কারণ রয়েছে, যেগুলো পরিবর্তনশীল। সেগুলোকে বলা হয় চাঁদ দেখার ভেরিয়্যাব্ল। এরকম ভেরিয়্যাব্ল রয়েছে হাজারের উপর। এতসব ভেরিয়্যাব্লকে সমন্বয় করে এবং যোগ/বিয়োগ করে চূড়ান্ত ফল দাঁড় করানো কঠিন

---

১. উচ্চারণ: সোল্যার্ ক্যালেন্ডার্।

২. উচ্চারণ: লূন্যার্ কালেন্ডার্।

যে, কোন্ মাসে কয় তারিখে চাঁদ দেখা যাবে। বিজ্ঞানীরাও নিশ্চিত করে বলতে পারেন না যে, কোন্ মাস ২৯ বা কোন্ মাস ৩০ দিনের হবে। তারা যে লুনার ক্যালেন্ডার (চান্দ্র ক্যালেন্ডার) বের করেন তা সম্ভাবনা ভিত্তিক, নিশ্চিত নয়। একারণেই বাস্তবেও অনেক মাস লুনার ক্যালেন্ডারের বর্ণনা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে, যা আমরা নিত্য দেখতে পাই। স্বয়ং একাধিক লুনার ক্যালেন্ডারের বর্ণনায়ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

চাঁদ প্রতিরাতে কতটুকু সময় দর্শনীয় হয়?

জ্যোতিঃবিজ্ঞানের সাধারণ হিসাবমতে চাঁদ প্রতি রাতে তার পূর্বের রাতের চেয়ে গড়ে ৪৮.৮১৩ মিনিট (পৌনে উনপঞ্চাশ মিনিটের চেয়ে সামান্য একটু বেশি) সময় অধিক স্থায়ী হওয়ার কথা। কেননা চাঁদ পৃথিবীর এক বরাবর থেকে পুনরায় সেই বরাবর ফিরে আসতে সময় লাগে ২৯ $^{১}/_{২}$ দিন (যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি)। তাহলে বলা যায়, পৃথিবীর ৩৬০ ডিগ্রী সমপরিমাণ ঘুরতে তার সময় লাগে ২৯ $^{১}/_{২}$ দিন। অতএব ৩৬০ কে ২৯.৫০ দিয়ে ভাগ দিলে হয় (৩৬০÷২৯.৫০=) ১২.২০৩ ডিগ্রী। আর প্রতি ১ ডিগ্রী সমান ৪ মিনিট। তাহলে প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে (১২.২০৩ ৪=) ৪৮.৮১৩ মিনিট অধিক স্থায়ী হওয়ার কথা। হযরত মাওলানা তাকী উছমানী সাহেব 'দরসে তিরমিযী'তে প্রায় ৪৮ মিনিটের কথা বলেছেন।[১] উপরোক্ত হিসাবের ভিত্তিতেই সম্ভবত তিনি এমনটা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা এমন নয়। চাঁদ প্রতিরাতে পূর্বের রাতের তুলনায় কতটা দেরিতে অস্ত যায় সেটা নির্দিষ্ট নয়, তার মধ্যে কম বেশ হয়। কোনদিন সময় বেশি হয়, কোন দিন কম হয়। ৩৮ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হয়ে থাকে। মাসের শুরু এবং শেষের দিকে সময়ের ব্যবধান তুলনামূলক বেশি এবং মাসের মাঝের দিকে কম থাকে। সামনে দুই মাসের হিসাব প্রদান করা হল, তা দেখে বিষয়টা বুঝে নেয়া যাবে। বাস্তবেও সরেজমিনে যে কেউ মাসের শুরুতে কয়েক দিন চাঁদ অস্ত যাওয়া লক্ষ করলে দেখবেন প্রতিদিনই ৪৮ মিনিট পরে অস্ত যাচ্ছে না। আমি (লেখক) নিজেও একাধারে পাঁচ ছয় রাত চাঁদ অস্ত যাওয়া দেখে বিষয়টা যাচাই করেছি। Sunrise Sunset সফটওয়্যারে PLANETS অপশনে গিয়ে কোন তারিখ চন্দ্রকলা কত পার্সেন্ট দর্শনীয় হওয়ার থাকে এবং প্রতি রাতে কখন অস্ত যায় তার বিস্তারিত বিবরণ দেখে নেয়া যেতে পারে। এর বিবরণ থেকে স্পষ্ট হবে যে, ৩৮ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হয়ে থাকে। এখন ৩৮ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ৫ মিনিট (৬৫ মিনিট)–এর ব্যবধানের গড় বের করলে (৩৮+৬৫ = ১০৩÷২=) ৫১.৫০ হয়। সম্ভবত এ কারণেই মাওলানা মূসা বাযী রূহানী الهيئة الوسطى গ্রন্থের ৪০১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, إحدى وخمسين دقيقةً تقريبا অর্থাৎ, প্রায় ৫১ মিনিট।[২] আনওয়ার আব্দুল গনী আল-আক্কাদ الجغرافيا الفلكية গ্রন্থের ১৪৭ ও ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৫২ মিনিটের কথা বলেছেন। সম্ভবত তিনি ৫১.৫০–এর .৫০ কে পূর্ণ ১ ধরে এমনটা বলেছেন।

---

[১] তার কথায় .৮১৩ মিনিটের ভগ্নাংশটুকু বাদ পড়েছে। আর সংখ্যা বা পরিমাণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে বলার স্বাভাবিক প্রচলন রয়েছে।

[২] তিনি যদি সর্বনিম্ন সময় ৩৮ মিনিট এবং সর্বোচ্চ সময় ১ ঘণ্টা ৪ মিনিট তথা ৬৪ মিনিট ধরে থাকেন তাহলে গড় (৩৮+৬৪ = ১০২÷২=) ৫১ হয়।

এবার দুই মাসের চাঁদের উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় লক্ষ করুন।

শাবান/১৪৩৯ হিজরির চাঁদ উদয় ও অস্ত যাওয়ার হিসাব

ইংরেজি তারিখ	আরবি তারিখ	চন্দ্রকলার পরিমাণ	উদয়	অস্ত	পূর্বের রাতের চেয়ে
					... পর অস্ত
১৭ এপ্রিল/২০১৮	সন্ধা থেকে শাবান শুরু	১%		৭: ৪৪ PM	
১৮ এপ্রিল/ ,,	১ শাবান/১৪৩৯	৪%	৭: ৩০ AM	৮: ৪৪ PM	১ ঘ.
১৯ এপ্রিল/ ,,	২ শাবান/ ,,	১০%	৮: ১৪ AM	৯: ৪৫ PM	১ঘ.১ মি.
২০ এপ্রিল/ ,,	৩ শাবান/ ,,	১৮%	৯: ০৩ AM	১০: ৪৮ PM	১ঘ.৩ মি.
২১ এপ্রিল/ ,,	৪ শাবান/ ,,	২৭%	৯: ৫৬ AM	১১: ৫০ PM	১ঘ.২ মি.
২২ এপ্রিল/ ,,	৫ শাবান/ ,,	৩৮%	১০: ৫৩ AM	১২: ৪৯ AM	৫৯ মি.
২৩ এপ্রিল/ ,,	৬ শাবান/ ,,	৫০%	১১: ৫৩ AM	১: ৪৫ AM	৫৬ মি.
২৪ এপ্রিল/ ,,	৭ শাবান/ ,,	৬১%	১২: ৫৫ PM	২: ৩৬ AM	৫১ মি.
২৫ এপ্রিল/ ,,	৮ শাবান/ ,,	৭২%	১: ৫৭ PM	৩: ২৩ AM	৪৭ মি.
২৬ এপ্রিল/ ,,	৯ শাবান/ ,,	৮১%	২: ৫৭ PM	৪: ০৭ AM	৪৪ মি.
২৭ এপ্রিল/ ,,	১০ শাবান/ ,,	৮৮%	৩: ৫৬ PM	৪: ৪৮ AM	৪১ মি.
২৮ এপ্রিল/ ,,	১১ শাবান/ ,,	৯৪%	৪: ৫৪ PM	৫: ২৭ AM	৩৯ মি.
২৯ এপ্রিল/ ,,	১২ শাবান/ ,,	৯৮%	৫: ৫০ PM	৬: ০৬ AM	৩৯ মি.
৩০ এপ্রিল/ ,,	১৩ শাবান/ ,,	৯৯%	৬: ৪৬ PM	৬: ৪৫ AM	৩৯ মি.
১ মে/ ,,	১৪ শাবান/ ,,	৯৮%	৭: ৪১ PM		
২ মে/ ,,	১৫ শাবান/ ,,	৯৫%	৮: ৩৫ PM	৮: ২৫ AM	
৩ মে/ ,,	১৬ শাবান/ ,,	৯০%	৯: ২৯ PM	৯: ০৭ AM	৪২ মি.
৪ মে/ ,,	১৭ শাবান/ ,,	৮৪%	১০: ২১ PM	৯: ৫১ AM	৪৪ মি.
৫ মে/ ,,	১৮ শাবান/ ,,	৭৭%	১১: ১১ PM	১০: ৩৭ AM	৪৬ মি.
৬ মে/ ,,	১৯ শাবান/ ,,	৬৮%	১১: ৫৯ PM	১১: ২৫ AM	৪৮ মি.
৭ মে/ ,,	২০ শাবান/ ,,	৬০%	১২: ৪৪ AM	১২: ১৪ AM	৪৯ মি.
৮ মে/ ,,	২১ শাবান/ ,,	৫০%	১২: ২৭ AM	১: ০৫ AM	৫১ মি.
৯ মে/ ,,	২২ শাবান/ ,,	৪১%	১:০৭ AM	১: ৫৬ PM	৫১ মি.
১০ মে/ ,,	২৩ শাবান/ ,,	৩২%	১: ৪৬ AM	২: ৪৮ PM	৫৩ মি.
১১ মে/ ,,	২৪ শাবান/ ,,	২৩%	২: ২৪ AM	৩: ৪১ PM	৫৩ মি.
১২ মে/ ,,	২৫ শাবান/ ,,	১৫%	৩: ০২ AM	৪: ৩৫ PM	৫৪ মি.
১৩ মে/ ,,	২৬ শাবান/ ,,	৯%	৩: ৪১ AM	৫: ৩০ PM	৫৫ মি.
১৪ মে/ ,,	২৭ শাবান/ ,,	৪%	৪: ২২ AM	৬: ২৮ PM	৫৮ মি.
১৫ মে/ ,,	২৮ শাবান/ ,,	১%	৫: ০৬ AM	৭: ২৮ PM	১ ঘ.
১৬ মে/ ,,	২৯ শাবান/ ,,	১%	৫: ৫৩ AM		
১৭ মে/ ,,	৩০ শাবান/ ,,	৪%			

রমজান/১৪৩৯ হিজরির চাঁদ উদয় ও অস্ত যাওয়ার হিসাব

ইংরেজি তারিখ	আরবি তারিখ	চন্দ্রকলার পরিমাণ	উদয়	অস্ত	পূর্বের রাতের চেয়ে ... পর অস্ত
১৭ মে/২০১৮	সন্ধা থেকে রমজান শুরু	৪%		৮: ৩৪ PM	
১৮ মে/ ,,	১ রমজান/১৪৩৯	৯%	৭: ৪৬ AM	৯: ৩৮ PM	১ঘ.৪ মি.
১৯ মে/ ,,	২ রমজান/ ,,	১৭%	৮: ৪৪ AM	১০: ৪১ PM	১ঘ.৩ মি.
২০ মে/ ,,	৩ রমজান/ ,,	২৬%	৯: ৪৫ AM	১১: ৪০ PM	৫৯ মি.
২১ মে/ ,,	৪ রমজান/ ,,	৩৭%	১০: ৪৮ AM	১২: ৩৪ AM	৫৪ মি.
২২ মে/ ,,	৫ রমজান/ ,,	৪৮%	১১: ৫০ AM	১: ২৩ AM	৪৯ মি.
২৩ মে/ ,,	৬ রমজান/ ,,	৫৮%	১২: ৫২ PM	২: ০৮ AM	৪৫ মি.
২৪ মে/ ,,	৭ রমজান/ ,,	৬৯%	১: ৫১ PM	২: ৪৯ AM	৪১ মি.
২৫ মে/ ,,	৮ রমজান/ ,,	৭৮%	২: ৪৯ PM	৩: ২৮ AM	৩৯ মি.
২৬ মে/ ,,	৯ রমজান/ ,,	৮৫%	৩: ৪৪ PM	৪: ০৬ AM	৩৮ মি.
২৭ মে/ ,,	১০ রমজান/ ,,	৯১%	৪: ৩৯ PM	৪: ৪৪ AM	৩৮ মি.
২৮ মে/ ,,	১১ রমজান/ ,,	৯৫%	৫: ৩৩ PM	৫: ২৩ AM	৩৯ মি.
২৯ মে/ ,,	১২ রমজান/ ,,	৯৭%	৬: ২৭ PM	৬: ০৩ AM	৪০ মি.
৩০ মে/ ,,	১৩ রমজান/ ,,	৯৭%	৭: ২১ PM	৬: ৪৬ AM	৪৩ মি.
৩১ মে/ ,,	১৪ রমজান/ ,,	৯৫%	৮: ১৪ PM		
১ জুন/ ,,	১৫ রমজান/ ,,	৯২%	৯: ০৫ PM	৮: ৩১ AM	
২ জুন/ ,,	১৬ রমজান/ ,,	৮৭%	৯: ৫৪ PM	৯: ১৯ AM	৪৮ মি.
৩ জুন/ ,,	১৭ রমজান/ ,,	৮১%	১০: ৪১ PM	১০: ০৮ AM	৪৯ মি.
৪ জুন/ ,,	১৮ রমজান/ ,,	৭৪%	১১: ২৪ PM	১০: ৫৮ AM	৫০ মি.
৫ জুন/ ,,	১৯ রমজান/ ,,	৬৬%	১২: ০৫ AM	১১: ৪৮ AM	৫০ মি.
৬ জুন/ ,,	২০ রমজান/ ,,	৫৭%	১২: ৪৪ AM	১২: ৪০ AM	৫২ মি.
৭ জুন/ ,,	২১ রমজান/ ,,	৪৮%	১২: ২১ AM	১: ৩২ PM	৫২ মি.
৮ জুন/ ,,	২২ রমজান/ ,,	৩৮%	১২: ৫৮ AM	২: ২৩ PM	৫২ মি.
৯ জুন/ ,,	২৩ রমজান/ ,,	২৯%	১: ৩৫ AM	৩: ১৬ PM	৫৩ মি.
১০ জুন/ ,,	২৪ রমজান/ ,,	২০%	২: ১৪ AM	৪: ১২ PM	৫৬ মি.
১১ জুন/ ,,	২৫ রমজান/ ,,	১৩%	২: ৫৫ AM	৫: ১০ PM	৫৮ মি.
১২ জুন/ ,,	২৬ রমজান/ ,,	৭%	৩: ৪১ AM	৬: ১০ PM	১ ঘ.
১৩ জুন/ ,,	২৭ রমজান/ ,,	৩%	৪: ৩১ AM	৭: ১৪ PM	১ ঘ. ৪ মি.
১৪ জুন/ ,,	২৮ রমজান/ ,,	২%	৫: ২৭ AM	৮: ১৯ PM	১ ঘ. ৫ মি.
১৫ জুন/ ,,	২৯ রমজান/ ,,	৪%		৮: ২৪ PM	

চন্দ্রের ৫২ মিনিট প্রসঙ্গে একটা কথা

চন্দ্র প্রতি পরবর্তী দিন ৫২ মিনিট পর পূর্বের স্থানে আসে– এর অর্থ হচ্ছে প্রতি পরবর্তী দিন ৫২ মিনিট পর মধ্যাহ্ন রেখায় আসে। অর্থাৎ, আজ ৯টায় মধ্যাহ্ন রেখায় আসলে আগামীকাল ৯টা ৫২ মিনিটে মধ্যাহ্ন রেখায় আসবে। কিন্তু প্রতিদিন চন্দ্রের উদয় অস্তের পার্থক্য ৫২ মিনিটের চেয়ে কমবেশ হয়ে থাকে। (উদয় অস্তের পার্থক্য কেমন হয় তার দুই মাসের নমুনা পূর্বে প্রদান করা হয়েছে।) যদি চন্দ্রের কক্ষপথ উপর-নিচ সোজা হত তাহলে নিয়মমত প্রতি পরবর্তী দিন আগের দিনের চেয়ে ৫২ মিনিট পরই উদয় অস্ত ঘটত। কিন্তু চন্দ্রের কক্ষপথ বক্র হওয়ার কারণে তা হয় না। মনে রাখতে হবে চন্দ্রের গতি পূর্বমুখী বা দক্ষিণমুখী থাকলে উদয়ে বিলম্ব ঘটে। পক্ষান্তরে গতি উত্তর মুখী থাকলে উদয় আগে ঘটে। আর পূর্ব ও উত্তর/দক্ষিণ কোনো মুখী না থাকলে পূর্বের দিনের সময়েই উদয় ঘটে। ফলে যদি ২২ সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা হয় তাহলে ২৩ সেপ্টেম্বর চন্দ্রের উদয় ঘটবে ঠিক সেই সময়ে ২২ সেপ্টেম্বর যখন উদয় হয়েছিল। কেননা ২৩ সেপ্টেম্বর শারদীয় বিষুব (Autumnal Equinox[1]/اعتدال خريفى)। সূর্য তখন বিষুব রেখার উপরই থাকে। আবার চন্দ্রও তখন বিষুব বরাবর থাকে। ফলে উদয় বিলম্বে ঘটার কিংবা আগে ঘটার- কোনটারই কারণ পাওয়া যায় না। আবার চিন্তা করুন ২১ মার্চ তথা বাসন্তী বিষুব (Spring Equinox[2]/اعتدال ربيعى) -এর সময় চন্দ্রের উদয়ে বেশকিছু দিন পৌনে ১ ঘণ্টা–১ ঘণ্টার মত ব্যবধান ঘটে। কেননা তখন চন্দ্রের গতি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকে। ফলে পূর্বদিকে সরার কারণে উদয়ে বিলম্ব, সেইসাথে দক্ষিণ দিকে সরার কারণে আরও বিলম্ব হয়ে থাকে।

চাঁদ প্রতি রাতে তার পূর্বের রাতের চেয়ে কতক্ষণ বেশি সময় অবস্থান করে– বেশ কিছু হাদীছ ও শর্‌য়ী বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে এ তথ্য কাজে আসে। যেমন: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার নামায কখন পড়তেন সে ব্যাপারে সহীহ হাদীছে এসেছে–كان يصليها لسقوط القمر لثالثة (আবূ দাউদ: হাদীছ নং ৪১৯, তিরমিযী: হাদীছ নং ১৬৫) অর্থাৎ, তিনি তৃতীয় রাতে চাঁদ অস্ত যাওয়ার যে সময় হয় সে রকম সময়ে ঈশার নামায পড়তেন। অতএব এখন হিসাব করলে দেখা যাবে প্রথম রাতে যেহেতু কতক্ষণ চাঁদ দেখা যাবে তার নির্দিষ্ট সীমা নেই। তবে দ্বিতীয় রাতের কাছাকাছি অবশ্যই হবে। আর দ্বিতীয় রাতে ১ ঘণ্টার মত এবং তৃতীয় রাতেও ১ ঘণ্টার মত ব্যবধান হয়ে থাকে। তাহলে তৃতীয় রাতে চাঁদ অস্ত যায় প্রায় ৩ ঘণ্টা পর। তাহলে বলা যায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈশার নামায পড়তেন সূর্যাস্তের প্রায় ৩ ঘণ্টা পর।

আরও একটি হাদীছ লক্ষ করুন যা বুঝতে উপরোক্ত তথ্যের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিবে। বোখারী শরীফের ১৬৭৭ ও ১৬৭৮ নং হাদীছে এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে মুযদালিফার রাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)–এর সঙ্গে পরিবারের দুর্বলদেরকে (তথা নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে) রাতেই মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাত কতটার সময় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়ের বর্ণনায় ১৬৭৯ নং হাদীছে এসেছে– হযরত আসমা (রা.) মুযদালিফার রাতে অবস্থান করে কিছুক্ষণ নামায পড়লেন, তারপর তার গোলাম আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা

---

[1] উচ্চারণ: অটাম্‌ন্যাল্‌ ঈকুয়িনক্‌স্‌।

[2] উচ্চারণ: স্প্রিং ঈকুয়িনক্‌স্‌।

করলেন, প্রিয় বাছা! هل غاب القمر؟ (অর্থাৎ, চাঁদ অস্ত গিয়েছে কি?) তিনি জওয়াব দিলেন, না। হযরত আসমা (রা.) আরও কিছু সময় নামায পড়লেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, প্রিয় বাছা! هل غاب القمر؟ (অর্থাৎ, চাঁদ অস্ত গিয়েছে কি?) তিনি বললেন, হাঁ। তখন হযরত আসমা (রা.) বললেন, তোমরা সকলে রওয়ানা দাও। তারপর তারা রওয়ানা দিলেন। এসময় রওয়ানা দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে হযরত আসমা (রা.) বলেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। (আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য অনুমতির কথা ১৬৭৭ ও ১৬৭৮ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১]) এ হাদীছে চাঁদ অস্ত যাওয়ার পর নারীদের মুযদালিফা থেকে রওয়ানা দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাহলে রাতের কোন্ সময়ে তারা রওয়ানা দিয়েছিলেন– সুবহে সাদিকের পূর্বে না কি সুবহে সাদিকের পরে? এবার আমরা হিসাব করে বের করতে পারি তখন রাতের কোন্ সময় ছিল। যেহেতু এটা ছিল ১০ম রাতের চাঁদ। আর আমাদের প্রদত্ত প্রথম মাসের হিসাব অনুসারে ১০ম রাতের চাঁদ অস্ত যায় প্রায় সাড়ে ৯ ঘণ্টা পর। আর দ্বিতীয় মাসের হিসেবে সাড়ে ৮ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পর। দ্বিতীয় মাসের মত হিসাব ধরলে ১০ম রাতের চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় সুবহে সাদিক হয় না। কারণ সবচেয়ে ছোট রাতেও (২১ জুন রাতেও) সন্ধা থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত প্রায় ৯ ঘণ্টা সময় হয়ে থাকে। (কেননা ২১ জুন সন্ধা হয় ৬: ৪৭ মি. আর পরবর্তী সুবহে সাদিক হয় ৩: ৪৪ মি.) অতএব ১০ তারিখে চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় রওয়ানা দেয়ার অর্থ হল সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই রওয়ানা দেয়া হয়েছিল। আর প্রথম মাসের মত হিসাব ধরা হলে বড় রাতের দিনগুলোতে সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই রওয়ানা দেয়া প্রমাণিত হবে। সুতরাং এসব হাদীছ থেকে নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মুযদালিফার রাতে উকূফ ওয়াজিব না হওয়ার সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়। কেননা মুযদালিফার রাতে উকূফ ওয়াজিব হওয়ার সময় হচ্ছে সুবহে সাদিকের পর থকে সূর্যোদয়ের মধ্যে কিছু সময়।

---

১. হাদীছ দুটো হল–

١٦٧٧– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ. (صحيح البخاري)

١٦٧٨– حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. (صحيح البخاري)

ষষ্ট অধ্যায়

(আবহাওয়া ও সমুদ্র তত্ত্ব)

আবহাওয়া ও জলবায়ুর সংজ্ঞা

শাব্দিক অর্থে আবহাওয়া (Weather[১]/طَقْس) ও জলবায়ু (Climate[২]/المُنَاخ) কথাদু'টো এক হলেও ভূগোলের পরিভাষায় কথাদু'টো এক নয়। ভূগোলের পরিভাষায় কোন স্থানের বায়ুর উষ্ণতা, শৈত্য, চাপ, বায়ুর গতি, বায়ুর দিক, বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রভৃতির দৈনিক বা কয়েক দিনের গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আর সারা বছরের সবদিনে আবহাওয়ার উষ্ণতা ও শীতলতা, শুষ্কতা ও আদ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণে তারতম্য ইত্যাদি পরিবর্তনগুলো একত্র করলে কোন স্থানের আবহাওয়ার সমষ্টিগত যে অবস্থা পাওয়া যায় তাকে বলে সেই স্থানের জলবায়ু।

---

১. উচ্চারণ: ওয়েদার্।

২. উচ্চারণ: ক্লাইমেট্।

বায়ুমণ্ডলের প্রয়োজন ও উপকারিতা

মানুষ, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ জগতের জীবন ধারণের জন্য বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুতে থাকে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইড প্রভৃতি উপাদান। এ উপাদানগুলো মানুষ, প্রাণীকুল ও উদ্ভিদ জগতের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। নাইট্রোজেন জীবের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতেও নাইট্রোজেন সহায়ক। অক্সিজেন মানুষসহ সব ধরনের প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসে ও দহনের কাজে সহায়ক। কার্বন-ডাই অক্সাইড উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সূর্যের তাপ সংরক্ষণ ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাণীকূল যে শ্বাস ত্যাগ করে তার মধ্যে অধিক পরিমাণে কার্বন-ডাই অক্সইড থাকে, যা উদ্ভিদকুলের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। আবার উদ্ভিদ কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে, যা প্রাণীকুলের জন্য প্রয়োজনীয়।

উপরের বর্ণনা থেকে বায়ুর প্রয়োজনীয়তার সাথে সাথে বায়ুর ফায়দা ও উপকারিতাও সামনে এসে গেল। এছাড়াও বায়ুর আরও বহু বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। বায়ুর ওজন ও চাপ প্রাণীকুলকে দাঁড়িয়ে থাকতে ও চলাফেরা করতে সাহায্য করে। বায়ুমণ্ডলের ইথারে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় বলে আমরা একে অপরের কথা শুনতে পারি। ইথারে শব্দ প্রতিফলিত হয়ে আবার ফিরে আসে। বায়ুমণ্ডল সৌরশক্তি ও সৌরতাপ নিরোধক আবরণ হিসেবেও কাজ করে। বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। বায়ু জলীয়বাষ্প বিতরণে সাহায্য করে, যা বৃষ্টিপাত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। বায়ু মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। যার ফলে প্রয়োজনীয় স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটে ভূমির উর্বরতা সাধিত হতে পারে এবং প্রাণীর পানীয়ের সংস্থান হয়। আকাশে যে উল্কাপাত ঘটে তা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুমণ্ডল তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে পৃথিবীকে ব্যাপক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

এভাবে বায়ু জীবন ও জগতের বহুবিধ উপকার সাধন করে। বায়ু তাই জীবন ও জগতের জন্য আল্লাহর এক সাক্ষাত রহমত। বায়ু জীবন ও জগতের জন্য সু-সংবাদ বহনকারী এক উপাদান। কুরআনে কারীমে তাই বায়ুকে সু-সংবাদবাহী আখ্যা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.

অর্থাৎ, তিনিই ঐ সত্তা যিনি তার রহমত (তথা বৃষ্টি)-এর পূর্বে সু-সংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। (সূরা আ'রাফ: ৫৭)

মৌসুমের ভিন্নতায় বায়ুর দিক পরিবর্তন

মৌসুম বা ঋতুর পরিবর্তনে বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয়। এই যে বিশেষ বিশেষ মৌসুমে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় একে বলে 'মৌসুমী বায়ু'। পৃথিবীর যেসব দেশে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় সেসব দেশকে বলা হয় 'মৌসুমী অঞ্চল'। আর সেসব দেশের জলবায়ুকে বলা হয় 'মৌসুমী জলবায়ু'। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যে এই দেশগুলো অবস্থিত বলে এই অঞ্চলকে 'ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল' নামেও অভিহিত করা হয়।

বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তনের মধ্যে বহুবিধ উপকারিত নিহীত। এরই ফলে মৌসুমী অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মের বিশেষ পার্থক্য ঘটে, যার ফলে জীবন ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র আসে। এরই ফলে মৌসুমী অঞ্চলে একেক মৌসুমে একের ধরনের ফলমুলের সৃষ্টি হয়। মৌসুমী অঞ্চলের প্রত্যেকটা এলাকায় প্রতি মৌসুমে এমন ধরনের ফল-মুল ও শাক-সব্জি তৈরি হয় যা ঐ মৌসুমে শাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-বালাই প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কোন মৌসুমে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায়, যা মিষ্ট পানীয়ের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে, গাছপালা ও প্রকৃতিকে ধুয়ে-মুছে সজীব রূপ দান করে। কোন মৌসুমে গাছপালা তার পুরাতন পাতা ঝেড়ে ফেলে নতুন সাজে সজ্জিত হয়। এভাবে বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তনের ফলে জীবন ও জগতে নানান বৈচিত্র ও উপকারিতা সাধিত হয়। তাই বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তনের বিষয়ে চিন্তা করলে আল্লাহর কুদরত ও রহমতের নিদর্শন দেখাতে পাওয়া যায়। এজন্যই কুরআনে কারীমে تصريف الريح। তথা বায়ুর দিক পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন থাকার কথা বলা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: সূরা বাকারা: ১৬৪)

মৌসুমী বায়ু (জুলাই) {الرياح الفصولي–يوليو}

জুলাই মাসে সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ অঞ্চলে (উত্তর গোলার্ধে) তাপ বৃদ্ধি পায় বলে এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল হয়। গ্রীষ্মের উত্তাপে উত্তর গোলার্ধের পানিরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয়। ফলে সাধারণভাবে অবস্থিত উচ্চ ও নিম্নচাপ বলয়গুলোর অবস্থানস্থল বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়।

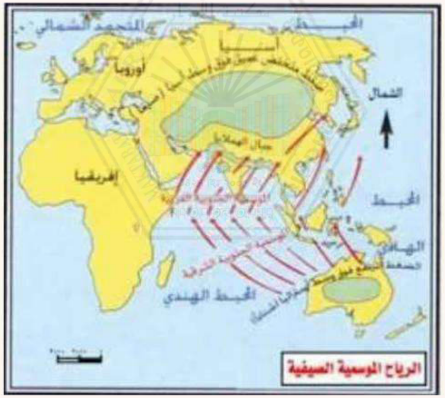

চিত্র নং ৮০ – মৌসুমী বায়ু (গ্রীষ্ম)-এর চিত্র

মৌসুমী বায়ু (জানুয়ারী){الرياح الفصولي–يناير}

জানুয়ারী মাসে সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ অঞ্চলে (দক্ষিণ গোলার্ধে) তাপ বৃদ্ধি পায় বলে এ সময় দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধে শীতকাল হয়। সূর্যের দক্ষিণায়ণের ফলে চাপবলয়গুলো দক্ষিণ দিকে সরে যায়। তখন নিরক্ষীয় নিম্নচাপবয়ল ৫° থেকে ১০° দক্ষিণে সরে অবস্থান করে।

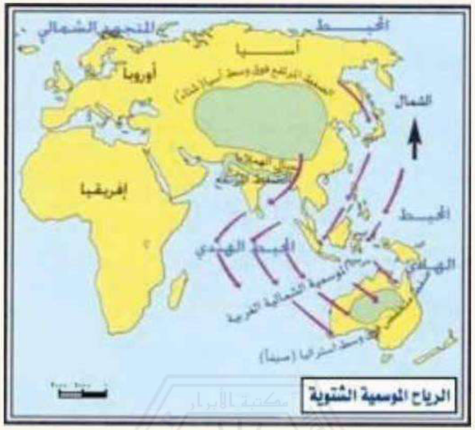

চিত্র নং ৮১– মৌসুমী বায়ু (শীত)-এর চিত্র

চাপবলয় (حلقة الضغط الجوي)

বায়ুর চাপের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদেরকে বলা হয় চাপবলয়। ভূ-পৃষ্ঠে সুনির্দিষ্ট ৭টি উচ্চ ও নিম্ন চাপবলয় রয়েছে।

(১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়। নিরক্ষ অঞ্চলে সূর্যকিরণ লম্বালম্বিভাবে পড়ার কারণে এ অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ হয় এবং বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়। আবার এ অঞ্চলের বিশাল পানিরাশি থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়ে বায়ুর সাথে মিলিত হয়ে বায়ু আরও লঘু হয়। ফলে এ অঞ্চলে নিম্ন চাপবলয় বর্তমান।

(২–৩) দুই মেরু দেশীয় উচ্চচাপ বলয়দ্বয়। অধিক শীতের কারণে দুই মেরু অঞ্চলের বায়ু সব সময় ভারি থাকে। আর এ অঞ্চলদ্বয়ে সূর্যকিরণের প্রখরতা না থাকায় জলীয় বাষ্পও নেই। ফলে বায়ু কোনভাবেই লঘু হতে পারে না। তাই দুই মেরু অঞ্চলদ্বয়ে দুটো উচ্চচাপ বলয় বর্তমান।

(৪–৫) দুই মেরু বৃত্তীয় অঞ্চলের নিম্নচাপ বলয়দ্বয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উভয় মেরুবৃত্তীয় অঞ্চলের বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। তাই উভয় মেরুবৃত্তীয় অঞ্চলে দুটো নিম্নচাপ বলয় বর্তমান।

(৬–৭) দুই ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়দ্বয়। নিরক্ষ অঞ্চলের বায়ু মেরুর দিকে প্রবাহিত হতে হতে ক্রমশ ভারি ও শীতল হয়ে ক্রান্তীয় অঞ্চলে নেমে আসে। আবার উভয় মেরু থেকে শীতল ও ঘন বায়ু ভূ-পৃষ্ঠ ঘেসে নিরক্ষ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়। এই উভয় প্রবাহ ক্রান্তীয় অঞ্চলে মিলিত হয়ে উচ্চচাপের সৃষ্টি করে।

মেঘ, বৃষ্টি ও শিলা প্রসঙ্গ

খাল-বিল, নদ-নদী, পুকুর, হ্রদ, সাগর-মহাসাগর প্রভৃতি থেকে সূর্যের তাপে যে জলীয়বাষ্প উৎপন্ন হয় তা বায়ু অপেক্ষা হালকা হওয়ায় উর্দ্ধে উঠে যায়। সেখানে শৈত্যের প্রভাবে ঐ জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। সাধারণত ২০,০০০ ফুটের উপরে উঠলে মেঘের পানিকণাগুলো তীব্র শীতে তুষার কণায় পরিণত হয়। সেই কণাগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে ভারি হলে আর বাতাসে ভাসতে পারে না, ফলে তা বৃষ্টি আকারে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়।

আবার ৪০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগের প্রবল উর্দ্ধগতির ঝড়ের ফলে বৃষ্টির পানিকণাগুলো অনেক উপরে শীতল স্থানে (-২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস) পৌছে যায় এবং এই পানিকণাগুলো অধিক ঠাণ্ডার প্রভাবে জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয় আর বায়ুর বেগ কমে গেলে শিলার আকারে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। অনেক সময় অত্যধিক শীতল বায়ুস্তরের মধ্য দিয়ে বৃষ্টিবিন্দু পতিত হওয়ার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জমে কঠিন হয়ে শিলায় পরিণত হয়। আর শিলা-বৃষ্টি হওয়ার সময় বৃষ্টিবিন্দুগুলো শিলার সংস্পর্শে আসলে তা শিলার সঙ্গে জমে যাওয়ার ফলে ক্ষুদ্র শিলা বৃহদাকার শিলায় পরিণত হয়। প্রচুর পরিমাণে শিলা পতিত হলে তাকে বলে শিলা-বৃষ্টি।

বৃষ্টিপাতের জন্য জলীয়বাষ্প, তাপের হ্রাস হেতু জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুর ঘনীভূত হওয়া এবং বায়ুরাশির উপরে ওঠা প্রয়োজন। এসবের তারতম্যের ভিত্তিতেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণে তারতম্য ঘটে থাকে। উষ্ণমণ্ডলে তথা নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে তাপ বেশি থাকায় সেখান থেকে জলীয়বাষ্প বেশি আহরিত হয় এবং উত্তাপের ফলে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু হালকা হওয়ায় উর্দ্ধগামী হয় আর উর্দ্ধে গিয়ে এ জলীয়বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টি তৈরি হয়। ফলে উষ্ণমণ্ডলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। সমুদ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের তুলনায় সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে জলীয়বাষ্প বেশি আহরিত হয় বিধায় দেশের অভ্যন্তরভাগের তুলনায় উপকূলবর্তী স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। উষ্ণ অঞ্চল থেকে শীতল অঞ্চলে বায়ু প্রবাহিত হলে তাপের হ্রাসহেতু বায়ু দ্রুত ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পক্ষান্তরে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতল অঞ্চল থেকে উষ্ণ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হলে ঘনীভূত না হয়ে প্রসারিত হয় বিধায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। অরণ্য অঞ্চলের বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে। কারণ উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে পাতার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বায়ুতে জলীয়বাষ্প ছড়িয়ে দেয়। আবার অরণ্যের অভ্যন্তরে সূর্যতাপ প্রবেশ করতে পারে না। সূর্যতাপের অভাবে সেখানে বায়ু শীতল থাকে। এসবের কারণে অরণ্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। যত বেশি গভীর অরণ্য অঞ্চল হয় সেখানে বৃষ্টিপাত তত বেশি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হল যে, মেঘ তৈরি হওয়া এবং বৃষ্টিপাত হওয়া– উভয়টার ক্ষেত্রে বায়ুর প্রধান ভূমিকা থাকে। বায়ুর মাধ্যমেই জলীয়বাষ্প উর্দ্ধে নীত হয় এবং সেখানে মেঘ তৈরি হয়। বায়ুর মাধ্যমেই মেঘ এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। তারপর যেখানে বৃষ্টিপাত হওয়ার বৃষ্টিপাত হয়। তাহলে বলা যায়, মেঘ নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ, বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কুরআনে কারীমের এক আয়াতেও মেঘকে নিয়ন্ত্রিত বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الاية.

অর্থাৎ, আর (কুদরতের নিদর্শন রয়েছে) মেঘ (–এর মধ্যেও) যা পৃথিবী ও উর্দ্ধ অঞ্চলের মাঝে নিয়ন্ত্রিত।

মেঘ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اللّٰهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا. الاية

অর্থাৎ, আল্লাহ ঐ সত্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন অতঃপর বায়ু মেঘকে সঞ্চালিত করে। (সূরা ফাতির: ৯)

বজ্রপাত কি ও কেন?

প্রথমে আলোর (বিদ্যুৎ) ঝলকানি, তারপর প্রচণ্ড শব্দ– এটাকে বলা হয় বজ্রপাত (Thunder[১]/ الرعد)। বজ্রপাত কীভাবে তৈরি হয়? বজ্রপাতের সময় কেন আলো দেখা যায়? কেন বিকট শব্দ শোনা যায়? তাহলে শুনুন– বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশে নিচের তুলনায় তাপমাত্রা কম থাকে। এ কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে, নিচের দিক থেকে উপরের দিকে মেঘের প্রবাহ হয়। এ ধরনের মেঘকে থান্ডার ক্লাউড (Thunderclouds/ السحابة الرعدية) অর্থাৎ, বজ্রমেঘ বলে। এই বজ্রমেঘ-ই হল বজ্রপাতের ব্যাটারি। বজ্রপাতের জন্য দায়ী এই মেঘ বৈদ্যুতিক চার্জের আধান[২]-এর মত আচরণ করে। যার উপরের অংশ পজিটিভ এবং নিচের অংশ নেগেটিভ চার্জে চার্জিত থাকে। মেঘে অবস্থিত বিদ্যুতক্ষেত্র যখন যথেষ্ঠ শক্তিশালী হয় (প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ১০,০০০ ভোল্ট), তখন তার আশেপাশের বাতাস পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জে বিভক্ত হয়ে যায়।

কীভাবে বৈদ্যুতিক আধানের সৃষ্টি হয়? তাহলে শুনুন– অন্যান্য মেঘের মত এ মেঘেও থাকে ছোট ছোট পানির কনা। আর উপরে উঠতে উঠতে পানির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই পানির পরিমাণ যখন ৫ মি. মি. এর বেশি হয়, তখন পানির অণুগুলো আর পারস্পরিক বন্ধন ধরে রাখতে পারে না। তখন এরা আলাদা (Disintegrate[৩]) হয়ে যায়। ফলে সেখানে (উপরের অংশে) বৈদ্যুতিক আধান (Electric Charge[৪])-এর সৃষ্টি হয়। আর এ আধানের মান নিচের অংশের চেয়ে বেশি হয়। এরকম প্রচ্ছন্ন শক্তিবিশিষ্ট্য পার্থক্য (Potential difference[৫])-এর কারণেই ওপর হতে নিচের দিকে বৈদ্যুতিক আধানের চালান (Transmission[৬]) হয়। এ সময় উক্ত এলাকার বাতাসের প্রসারণ (Expansion[৭]) এবং সংকোচনের (Contraction[৮]) ফলে আমরা বিকট শব্দ শুনতে পাই। বাতাসের যে চ্যানেলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তার তাপমাত্রা প্রায় ২৭০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে উন্নীত হয় এবং বাতাসের চাপ স্বাভাবিক চাপ থেকে ১০ থেকে ১০০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এ চাপ এবং তাপমাত্রায় পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র এক সেকেন্ডের কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ। এত কম

---

১. উচ্চারণ: থান্ডার্।
২. আধান অর্থ চার্জ।
৩. উচ্চারণ: ডিস্ইন্টিগ্রেট্।
৪. উচ্চারণ: ইলেক্ট্রিক্ চার্জ্।
৫. উচ্চারণ: পোটেন্শল্ ডিফারেন্স।
৬. উচ্চারণ: ট্রান্জ্মিস্ন।
৭. উচ্চারণ: এক্স্প্যান্শন্।
৮. উচ্চারণ: কন্ট্র্যাক্শন্।

সময়ে তাপমাত্রা ও চাপের এত ব্যাপক পরিবর্তন চারপাশের বায়ুমণ্ডলকে প্রচণ্ড গতিতে (বিস্ফোরণের মত) সম্প্রসারিত করে। এ সময় যে শব্দ তরঙ্গ উৎপন্ন হয় সেটাই আমরা শুনতে পাই।

বজ্রপাতের সময় বাতাসের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। আমরা জানি বাতাস বিদ্যুৎ অপরিবাহী। কিন্তু মেঘে জমা হওয়া স্থির বিদ্যুৎ এত উচ্চ বিভব শক্তি (১০ মিলিয়ন ভোল্ট পর্যন্ত) উৎপন্ন করে যে, তা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার জন্য বাতাসের একটা সরু চ্যানেলকে আয়নিত (অর্থাৎ, বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত।) করে পরিবাহী পথ (conductive path[১]) তৈরি করে নেয়। এই আয়নিত পরমাণু থেকে বিকীর্ণ শক্তিতে তিব্র আলোক-ছটা তৈরি হয়। ফলে এ সময় আমরা আলোর ঝলকানি (Lightning[২]) দেখতে পাই।

এবার বজ্রমেঘ (Thunder Clouds) কীভাবে তৈরি হয় তার বর্ণনা পেশ করছি। মার্চ থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত বিহারের মালভূমি অঞ্চলে নিম্নচাপের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। তখন বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ু প্রবাহ এই নিম্নচাপ ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যায়। এই ছুটে আসা আদ্র বায়ু প্রবাহ এই দুয়ের সংঘাতে একটি দুটি করে বজ্রমেঘের সৃষ্ট হয়। আর সেগুলো তীব্র গতিতে মাথা তুলতে থাকে। এই মেঘগুলো থেকে নিঃসৃত শীতল ঝড়ের ঝাপটা সামনের দিকে আঘাত করে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা আর্দ্র বায়ুস্তর ঐ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা খেয়ে ওপরে উঠে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেসব জায়গায় নতুন করে বজ্রমেঘ সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে প্রথম যে একটি দুটি মেঘ তৈরী হয় তাদেরকে জননী (Mother Thunder Storm[৩]) বলা হয়। তবে সামনের দিকে সৃষ্ট হওয়া নতুন বজ্রমেঘগুলোকে বলা হয় কন্যা (Daughter Thunder Storm[৪])।

বজ্রপাতের সময় আগে বজ্রের আলো দেখা যায় তারপর বজ্রের ধ্বনি শোনা যায়। কারণ শব্দের চেয়ে আলোর গতি অনেক বেশি। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল আর শব্দের গতি হচ্ছে সেকেন্ডে মাত্র ৩৩১ বা ৩৩২ মিটার। শব্দের চেয়ে আলোর গতি বেশি তা কুরআনে কারীমের একটি আয়াত থেকেও বুঝা যায়। ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ...إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

অর্থাৎ, আর তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহের একটি হল তিনি তোমাদেরকে দেখান (বজ্রের) বিদ্যুত ভয় এবং আশা রূপে। ... নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। (সূরা রূম: ২৪) এখানে ভয় বলে বজ্র আর আশা বলে বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, বুঝানো হয়েছে বজ্রের বিদ্যুত তথা বজ্রের আলো দেখে বজ্রের ভয় হয় আবার বৃষ্টির আশাও হয়। তাহলে আলো দেখাটা আগে হয় তা বুঝা গেল। অতএব শব্দের চেয়ে আলোর গতি বেশি তা প্রমাণিত হল।

বজ্রপাত বিষয়ে কুরআন-হাদীছের কিছু কথা

এতক্ষণ বজ্রপাতের বাহ্যিক ও বস্তুগত কিছু কারণ ও বজ্র কীভাবে তৈরি হয় এবং কীভাবে তার পাত হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল। তবে কুরআন হাদীছের দৃষ্টিতে বজ্রপাতের বাহ্যিক ও

---

১. উচ্চারণ: কন্ডাক্টিভ্ পাথ্।
২. উচ্চারণ: লাইট্নিং।
৩. উচ্চারণ: মাদার্ থান্ডার্ স্টর্ম্।
৪. উচ্চারণ: ডটার্ থান্ডার্ স্টর্ম্।

বস্তুগত কারণের বাইরেও কিছু কারণ রয়েছে। তা হল মানুষের পাপাচার। পাপাচারের কারণেও আল্লাহ তাআলা বজ্রপাতের মাধ্যমে মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করলে বজ্রপাতের মাধ্যমে শাস্তি দিতে পারেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ.

অর্থাৎ, রা'দ[১] ফেরেশতা তাঁরই তাসবিহ ও হাম্‌দ জ্ঞাপন করে এবং তাঁর ভয়ে (অন্য) ফেরেশতাগণও (তাসবিহরত রয়েছে)। তিনিই পাঠান বজ্রসমূহ, তারপর যার ওপর ইচ্ছা একে বিপদরূপে পতিত করেন। আর তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ সম্পর্কেই তর্কবিতর্ক করছে, অথচ তাঁর শক্তি অতি প্রচণ্ড। (সূরা রা'দ : ১৩)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে[২] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

قال ربكم عز وجل لو ان عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد.

অর্থাৎ, তোমাদের প্রবল পরাক্রমশালী প্রভু বলেছেন, যদি আমার বান্দারা আমার বিধান মেনে চলত, তবে আমি তাদের রাতের বেলায় বৃষ্টি দিতাম, সকাল বেলায় সূর্য দিতাম এবং কখনো তাদের বজ্রপাতের আওয়াজ শোনাতাম না। (মুসনাদে আহমদ : ৮৬৯৩)

হাদীছে বজ্রপাতের সময় যে দুআ পাঠ করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে দুআর মধ্যেও বজ্রপাত আযাব– এ কথা বুঝা যায়। দুআটি এই–

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٧٩٣٥ وقال : صحيح الإسناد ، وأقره عليه الذهبي في التلخيص.)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলো না। তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ো না। তার পূর্বেই আমাদেরকে শান্তি দাও। (মুস্তাদরকে হাকিম : ৭৯৩৫)

তাপবলয় (الحلقة الحرارية)

তাপের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে। এদেরকে বলা হয় তাপবলয় বা তাপমণ্ডল। তাপবলয় বা তাপমণ্ডল ৫টি। কর্কটক্রান্তি (২৩.৫০ ডিগ্রী উত্তর) ও মকরক্রান্তি (২৩.৫০ ডিগ্রী দক্ষিণ)–এর মধ্যবর্তী স্থানে সূর্য কোন না কোন সময়ে লম্বভাবে কিরণ দিয়ে থাকে। ফলে এ অঞ্চলে উষ্ণতা বেশি দেখা দেয়। এ কারণে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যবর্তী অঞ্চলকে উষ্ণমণ্ডল বা গ্রীষ্মমণ্ডল (المنطقة الحارة/Torrid Zone[৩]) বলে। কর্কটক্রান্তি থেকে সুমেরুবৃত্ত (৬৬.৫০° উত্তর)

---

১. রা'দ (الرَّعْدُ) শব্দের অর্থ বজ্রধ্বনি, মতান্তরে মেঘমালার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। এখানে الْمَلَائِكَةُ শব্দটি (অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ) الرَّعْدُ-এর পাশাপাশি উল্লেখিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, এখানে الرَّعْدُ শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে তথা ফেরেশতার নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। (বয়ানুল কুরআন)

২. এ হাদীছের সনদ জয়ীফ হলেও পূর্বে পেশকৃত কুরআনের বক্তব্য এর সমর্থনে রয়েছে। পরে বর্ণিত হাদীছও এর অর্থের সমর্থক। অতএব এ হাদীছের অর্থ সহীহ হওয়ায় এটি দলীল হওয়ার যোগ্য।

৩. উচ্চারণ: টরিড্ জোন্।

পর্যন্ত এবং মকরক্রান্তি থেকে কুমেরুবৃত্ত (৬৬.৫০° দক্ষিণ) পর্যন্ত অঞ্চলে সূর্যকিরণ খুব লম্বভাবে বা খুব তীর্যকভাবে পড়ে না বিধায় এই অঞ্চলদ্বয়ে উষ্ণতা ও শীতের তীব্রতা অনুভূত হয় না। এই অঞ্চলদ্বয়কে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল (المنطقة المعتدلة/Temperate Zone[১]) বলে। উত্তর গোলার্ধের এই অঞ্চল উত্তর নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল এবং দক্ষিণ গোলার্ধের এই অঞ্চল দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল। আর উত্তর মেরুবৃত্ত (৬৬.৫০° উত্তর) থেকে উত্তরে এবং দক্ষিণ মেরুবৃত্ত (৬৬.৫০° দক্ষিণ) থেকে দক্ষিণে সূর্যকিরণ খুব তীর্যকভাবে পড়ে বিধায় এই দুই অংশে উত্তাপ সবচেয়ে কম হয়। ফলে এই দুই অঞ্চল সবচেয়ে শীতল। এই দুই অঞ্চলকে বলা হয় হিমমণ্ডল (المنطقة القُطبية المنجَمِدة/Frigid Zone[২])। উত্তর মেরুর কাছে উত্তর হিমমণ্ডল এবং দক্ষিণ মেরুর কাছে দক্ষিণ হিমমণ্ডল।

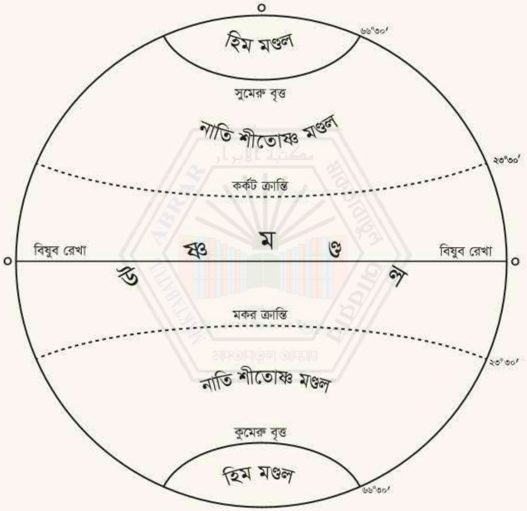

চিত্র নং ৮২ – তাপবলয়ের চিত্র

নদী (نهر)-এর সংজ্ঞা

পাহাড়,হ্রদ, প্রস্রবন প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন ও নানা জনপদের বিপুল পরিমাণ জলের স্রোত প্রবাহিত হওয়ার প্রাকৃতিক খালকে বলা হয় নদী (River[৩])।

---

১. উচ্চারণ: ট্যাম্পারেট্ জোন্।

২. উচ্চারণ: ফ্রিজ্ড্ জোন্।

৩. উচ্চারণ: রিভার্।

কয়েকটা দীর্ঘতম নদী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য

নদীর নাম	মহাদেশ	দেশ	দৈর্ঘ (কি. মি.)
নীল (Nile/النيل)	আফ্রিকা	মিসর, সুদান ও উগান্ডা	৬৬৭০
আমাজন (Amazon/نهر الأمَزون)	দক্ষিণ আমেরিকা	ব্রাজিল	৬৪৩০
ইয়াংসি (Yantze/ نهر يانجتسي)	এশিয়া	চীন	৬৩৮০
মিসিসিপি (Mississippi/نهر المسيسبي)	উত্তর আমেরিকা	যুক্তরাষ্ট্র	৬০২০
ইনিসি (Yenisey/نهر يِنِسي)	এশিয়া	রাশিয়া	৫৫৫০
ওব (Ob/نهر أوب)	এশিয়া	রাশিয়া	৫৪১০
হুয়াংহো (Huang Ho/ هوانج هو/النهر الأصفر)	এশিয়া	চীন	৪৮৪০
জায়ার (Zair/نهر زائر)	আফ্রিকা	জায়ার	৪৬৭০
আমুদরিয়া (Amudarya/نهر أموداريا)	এশিয়া	উজবেকিস্তান	৪৫১০
মেকং (Mekong/نهر ميكونج)	এশিয়া	কম্পুচিয়া ও ভিয়েতনাম	৪৫০০
সিন্ধু (Indus/نهر السند/نهر الإندوس)	এশিয়া	পাকিস্তান	২৮৯৬
ব্রহ্মপুত্র (Brahmaputra/نهر براهمابترا)	এশিয়া	তিব্বত, ভারত, বাংলাদেশ	২৮৯৬
গঙ্গা/পদ্মা (Padma/الغانغ)	এশিয়া	ভারত, বাংলাদেশ	২৫১০

সূত্র: গ্রাফোসম্যানের নতুন ভূচিত্রাবলী, The Oxford school Atlas, The penguin map of the world أطلس المملكة العربية السعودية

সাগর (البحر)-এর সংজ্ঞা

মহাসাগরের প্রান্তভাগে অংশিক স্থলবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ছোট পানিরাশিকে সাগর বা সমুদ্র (Sea[১]) বলে। যে কোন সাগর একটি প্রধান মহাসাগরের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন: ভূমধ্য সাগর (البحر المتوسط), লোহিত সাগর (.بحر قلزم/البحر الأحمر), মৃত সাগর (البحر الميت/ Dead Sea[২]) প্রভৃতি। কোন কোন সাগর অন্য পানি রাশি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও থাকে।

উপসাগর (الخليج) -এর সংজ্ঞা

যে সাগরের প্রায় চতুর্দিকে স্থল, তাকে উপসাগর (Bay[৩]) বলে। উপসাগরের পানিরাশি স্থলভাগ দ্বারা প্রায় বেষ্টিত হলে তাকে উপসাগর (Gulf[৪]) বলে। যেমন পারশ্য উপসাগর (خليج فارس), সুয়েজ উপসাগর (خليج السويس), আকাবা উপসাগর (خليج العقبة), বঙ্গোপসাগর (خليج بنغال) প্রভৃতি।

---

১. উচ্চারণ: সী।
২. উচ্চারণ: ডেড্ সী।
৩. উচ্চারণ: বে।
৪. উচ্চারণ: গাল্ফ।

মহাসাগর (المحيط) -এর সংজ্ঞা

অতি বিশাল পানিরাশিকে মহাসাগর, মহাসমুদ্র, মহাসিন্ধু (Ocean[১]) বলে। সমস্ত পৃথিবীর পানিভাগ প্রধানত ৪টি বিভাগে বিভক্ত, এগুলোর এক একটা হল এক একটা মহাসাগর। মহাসাগর ৪টা হল (আয়তনের বিচারে বড় থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট হিসেবে যথাক্রমে) (১) প্রশান্ত মহাসাগর (المحيط الهادي /Pacific Ocean[২])। (২) আটলান্টিক মহাসাগর (المحيط الأطلنطي /Atlantic Ocean) আটলান্টিক মহাসাগরকে আরবিতে আরও বলা হয় , المحيط الأطلسي , بحر الظلمات , البحر المظلم , البحر المحيط , بحر الأوقيانوس , بحر الأقيانس , البحر الأخضر ইত্যাদি। (৩) ভারত মহাসাগর (المحيط الهندي /Indian Ocean)। (৪) আর্কটিক মহাসাগর বা উত্তর মহাসাগর (المحيط القطبي /Arctic Ocean[৩])।

চারটা মহাসাগর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য

নাম	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	সর্বোচ্চ গভীরতা (মি.)
প্রশান্ত (Pacific Ocean / المحيط الهادي)	১৭৯,৬৭৯,০০০	১১০৩৩
আটলান্টিক (Atlantic Ocean /المحيط الأطلنطي)	৯২,৩৭৩,০০০	৮৩৮১
ভারত (Indian Ocean / المحيط الهندي)	৭৩,৯১৭,০০০	৮০৪৭
আর্কটিক (Arctic Ocean / المحيط القطبي)	১৪,০৯০,০০০	৫৪৫০

সূত্র: গ্রাফোসম্যানের নতুন ভূচিত্রাবলী, The Oxford school Atlas, أطلس المملكة العربية السعودية

হ্রদ (بُحيرة) -এর সংজ্ঞা

চতুর্দিকে স্থলবিশিষ্ট বৃহৎ স্বাভাবিক জলাশয়কে হ্রদ (Lake[৪]) বলে। অনেক বড় হ্রদ হলে সেটাকে সাগর বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যেমন: কাস্পিয়ান সাগর, আরাল সাগর। এগুলো প্রকৃতপক্ষে হ্রদ হলেও অতি বৃহৎ হওয়ায় এগুলোকে সাগর বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর প্রধান কয়েকটা হ্রদ

হ্রদ-এর নাম	মহাদেশ	দেশ	আয়তন (বর্গ কি.মি.)
কাস্পিয়ান সাগর (Caspian Sea/بحر قَزوين)	এশিয়া	ইরানের উত্তরে	৩৭১,০০০
সুপিরিয়র হ্রদ (L. Superior/بحيرة سوبيريور)	উত্তর আমেরিকা	যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	৮২,২০০
ভিক্টোরিয়া হ্রদ (L. Victoria/بحيرة بكتوريا)	আফ্রিকা	কেনিয়া, উগান্ডা ও তাঞ্জানিয়া	৬৮,০০০
হিউরণ হ্রদ (L. Huron/بحيرة هورن)	উত্তর আমেরিকা	যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	৫৯,৬০০
মিসিগান হ্রদ (L. Michigan/بحيرة مِشيغن)	উত্তর আমেরিকা	যুক্তরাষ্ট্র	৫৮,০০০
আরাল সাগর (Aral Sea/بحر آرال)	এশিয়া	উজবেকিস্তান	৩৬,০০০
টাঙ্গানাইকা হ্রদ (L. Tanganyika/بحيرة تنجانيقا)	আফ্রিকা	জায়ার	৩৩,০০০
গ্রেট বিয়ার হ্রদ (G. Bear L./بحيرة غريت بير)	উত্তর আমেরিকা	কানাডা	৩১,৫০০
বৈকাল হ্রদ (L. Baikal/بحيرة بيكال)	এশিয়া	রাশিয়া	৩১,৫০০
মালাউই হ্রদ (L. Malawi/بحيرة ملاوي)	আফ্রিকা	মালাউই	২৯,০০০

সূত্র: গ্রাফোসম্যানের নতুন ভূচিত্রাবলী, The Oxford school Atlas, أطلس المملكة العربية السعودية

---

১. উচ্চারণ: ওশ্‌ন্। ২. উচ্চারণ: প্যাসিফিক্ ওশ্‌ন্। ৩. উচ্চারণ: আর্কটিক্ ওশ্‌ন্। ৪. উচ্চারণ: লেক্।

প্রণালী (مُضِيق) -এর সংজ্ঞা

যে সংকীর্ণ পানিরাশি দুই বিশাল পানিরাশিকে যোগ করে তাকে বলে প্রণালী (Strait[১]/Channel[২])। যেমন: পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের পানিরাশিকে যোগ করছে "হুরমুয প্রণালী" (مُضِيق هرمز)। কৃষ্ণসাগর ও মর্মর সাগরের পানিরাশিকে যোগ করছে "বসফরাস প্রণালী" (مُضِيق البوسفور)। লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের পানিরাশিকে যোগ করছে "বাবেল মান্দেব" প্রণালী (مُضِيق باب المندب) প্রভৃতি।

জোয়ার-ভাটা তত্ত্ব (نظرية المَدِّ والجَزْرِ)

জোয়ার-ভাটা (Tide[৩] & Ebb[৪])-এর ক্ষেত্রে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের আকর্ষণের ভূমিকা রয়েছে। তবে সূর্য আকারে চন্দ্রের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু অনেক দূরে রয়েছে তাই চন্দ্রের তুলনায় তার আকর্ষণের প্রভাব অর্ধেকও নয়। চন্দ্র পৃথিবীর ভূ-ভাগ ও জল-ভাগ উভয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। ভূ-ভাগের যে অংশ চন্দ্রের দিকে থাকে সে অংশকে অধিক জোরে আকর্ষণ করে। ফলে ভূ-ভাগের এ অংশের সমুদ্রে জোয়ার সৃষ্টি হয়। এটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ জোয়ার। ভূ-ভাগের অপর দিকে সরাসরি চন্দ্রের আকর্ষণ প্রভাব ফেলতে না পারলেও সেদিকেও কিছুটা জোয়ার সৃষ্টি হয়। কেননা ভূ-ভাগের একদিক যখন চন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হবে, তখন অপরদিকের ভূ-ভাগও সমুদ্র থেকে পৃথক হয়ে চন্দ্রের দিকে আকর্ষিত হবে এবং সমুদ্রের পানি যেন কিছুটা পিছে সরে আবার জড় হবে। এটাও এক ধরনের জোয়ার। এই জোয়ারকে বলা হয় পরোক্ষ জোয়ার। আর এ অবস্থায় চন্দের মুখোমুখী দিকের অংশ এবং বিপরীত দিকের অংশ বাদে পৃথিবীর দুই পাশের অংশে তখন ভাটা সৃষ্টি হবে। প্রত্যক্ষ জোয়ার ও পরোক্ষ জোয়ারের মাঝেই ভাটা সংঘটিত হয়।

জোয়ার-ভাটা আবার দুই প্রকার। (১) হেলাল (তথা নতুন চাঁদ) এবং পূর্ণিমার সময় সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র প্রায় এক লাইনে থাকে বিধায় সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের আকর্ষণ একদিকে থাকে। আর তাই পৃথিবীর উপর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ফলে তখন জোয়ারের অংশে জোয়ারের মাত্রা বেড়ে যায়। আর জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পানি সেদিকে বেশি অপসারিত হওয়ায় বিপরীত দিকে ভাটার অংশেও ভাটার মাত্রা বেড়ে যায়। সেই বর্ধিত মাত্রার জোয়ারকে বলা হয় মুখ্য জোয়ার, ভরা জোয়ার, ভরা কটাল, তেজ কটাল (المَدُّ الأعلى/Spring tide[৫])। ভরা জোয়ারের সময় নদী বা উপসাগরে ৭ ফুট পর্যন্ত পানি উঁচু হয়ে যায়। তবে সাগরে সাধারণত ২/৩ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। (২) চান্দ্র মাসের ৭ ও ২১ তারিখে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের দিক ভিন্ন হয়ে যায়। ফলে এই দুই তারিখে জোয়ার ও ভাটার মাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এই কম মাত্রার জোয়ারকে বলা হয় গৌণ জোয়ার, মরা জোয়ার, মরা কটাল (المد المنخفض/Neap Tide[৬])।

---

১. উচ্চারণ: স্ট্রেট্।
২. উচ্চারণ: চ্যান্ল্।
৩. উচ্চারণ: টাইড্।
৪. উচ্চারণ: এব্।
৫. উচ্চারণ: স্প্রিং টাইড্।
৬. উচ্চারণ: নীপ্ টাইড্।

নদী ও সমুদ্রে প্রতিদিন একই সময়ে জোয়ার/ভাটা হয় না। বরং প্রতি পরবর্তী দিন আগের দিনের স্থানে আগের দিনের চেয়ে ৫২ মিনিটের মত পরে জোয়ার/ভাটা হয়। এর কারণ হচ্ছে চন্দ্রের গতি। যদি চন্দ্র স্থির হত এবং শুধু পৃথিবীই ঘুরত, তাহলে প্রতি পরবর্তী দিন পৃথিবী ঘুরে আগের দিনের স্থানে একই সময়ে চলে আসত। ফলে জোয়ার/ভাটাও একই সময়ে হত। কিন্তু পৃথিবী ২৪ ঘন্টা ঘুরে যখন আগের দিনের অবস্থানে আসছে, তখন ইতিমধ্যে চন্দ্র ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১৩ ডিগ্রী সামনে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। আর প্রতি ডিগ্রী সমান ৪ মিনিট। তাই পৃথিবীর আগের দিনের অবস্থান এই ১৩ ডিগ্রী অগ্রসর হয়ে চন্দ্রের সমসূত্রে আসতে (১৩×৪=) ৫২ মিনিটের মত সময় নেয়। ফলে প্রতি পরবর্তী দিন আগের দিনের স্থানে ৫২ মিনিট পর জোয়ার-ভাটা হয়।

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ যেমন পানির উপর প্রভাব ফেলে, যার কারণে জোয়ার/ভাটা হয়। তেমনি ভূ-ভাগের উপরও চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাব পড়ে। ফলে এই কঠিন ভূ-ভাগও জোয়ার-ভাটায় লিপ্ত হয়। তবে পানি তরল বিধায় চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাব তার উপর বেশি পড়ে। পক্ষান্তরে ভূ-ভাগ কঠিন হওয়ায় তার উপর প্রভাব কম পড়ে। বিজ্ঞানীদের হিসাবমতে ভরা জোয়ারের সময় পৃথিবী ৫ ইঞ্চির চেয়ে কিছু বেশি চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয় আর মরা জোয়ারের সময় ৫ ইঞ্চির চেয়ে কিছু কম। (তথ্যসূত্র: فلكيات جديده , প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট)

জোয়ার-ভাটার উপকারিতা (فوائد المد والجزر)

জোয়ার-ভাটার মধ্যে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও প্রকৃতির জন্য বহু উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

- ভাটার টানে নদীর আবর্জনাদি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, ফলে নদীর পানি নির্মল থাকে। আবার এসব আবর্জনার অনেকটা সামুদ্রিক প্রাণীর খাবারও হয়।
- জোয়ারের ফলে নদীর পানি স্বল্প লবণাক্ত হয় এবং এ জন্যই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে শীতকালে সহজে পানি জমে না।
- জোয়ার-ভাটার ফলে পলিমাটি পড়ে নদীর মুখ বন্ধ হতে পারে না বরং নদীখাত গভীর হয়।
- জোয়ার-ভাটা নদীর মোহনা থেকে স্রোতবাহিত তলানি অপসারিত করে নদীমুখকে জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখে।
- জোয়ার-ভাটার ফলে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক হয়, ফলে বাণিজ্যের সুবিধা হয়।
- জোয়ার-ভাটার ফলে মৎস শিকার সহজ হয়। কেননা, জোয়ারের ফলে বহু মাছ উপকূলের দিকে চলে আসে।
- জোয়ারের ফলে শামুক ঝিনুকসহ বহু রকম সামুদ্রিক জিনিস, অনেক মরা মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী কূলে চলে আসে, যেগুলো অনেক প্রাণীর খাদ্য হয় বা বহু রকম অর্থনৈতিক উপকরণ সঞ্চয়ের উৎস হয়।
- জোয়ার-ভাটার সঞ্চালন থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরিত হয়।

স্রোতের কারণসমূহ

বিভিন্ন কারণে স্রোতের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন:

১. পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। এটা পৃথিবীর আহ্নিক গতি। এই আহ্নিক গতির ফলে সমুদ্রের পানি পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি করে।

২. পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সে স্বাভাবিক সমুদ্রস্রোত ঘটে, মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রস্রোতও পরিবর্তিত হয়ে বায়ুর গতিপথ অনুসরণ করে। এভাবেও সমুদ্রস্রোতে পরিবর্তন ঘটে।

৩. মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে পানিরাশি কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ নিরক্ষীয় অঞ্চলের চেয়ে মেরুদ্বয়ের দিকে বেশি। এমনিভাবে সমুদ্রের গভীরতম অংশগুলো কেন্দ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় সেখানেও এই আকর্ষণ বেশি। এই আকর্ষণের তারতম্যের কারণে অন্তঃস্রোতগুলো স্থানভেদে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হয়।

৪. সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময় এর সামনে কোন স্থলভাগ পড়লে তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে স্রোতের গতি পরিবর্তিত হয়।

৫. সমুদ্রের গভীরতার তারতম্যে সমুদ্রের পানিতে উষ্ণতার তারতম্য হয়। অল্প গভীর স্থানে পানি সহজে উষ্ণ হয়ে উপরে উঠে আসে এবং শীতল পানি নিচে নেমে যায়। এভাবে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী স্রোতের ফলে সমুদ্রের নিয়মিত প্রবাহ প্রভাবিত হয়।

৬. উষ্ণতা ও লবণাক্ততার তারতম্যে পানির ঘনত্বে যে তারতম্য ঘটে এবং তার ফলে পানির চাপের যে তারতম্য ঘটে, তার কারণেও সমুদ্রস্রোত নিয়ন্ত্রিত হয়।

৭. সমুদ্রের যে অংশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয়, সেখানে পানির সমতা রক্ষা করার জন্য চারদিক থেকে শীতলস্রোত সেদিকে প্রবাহিত হয়। একারণেও সেখানের স্রোত প্রভাবিত হয়। এটাকে বলা হয় বাষ্পীভবনের[১] তারতম্যে সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তি হওয়া।

৮. বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতিকে বলা হয় অধঃক্ষেপন। যেসব অঞ্চলে সমুদ্রের ওপর প্রবল অধঃক্ষেপন ঘটে, সেসব অঞ্চল থেকে অধঃক্ষেপনহীন অঞ্চলের দিকে সমুদ্রের স্রোত অগ্রসর হয়ে পানির সমতা রক্ষা করে। এভাবেও স্বাভাবিক সমুদ্রস্রোত পরিবর্তিত হয়।

লবণাক্ততার তারতম্যে পানির স্রোতের গতিভিন্নতা

বেশি লবণাক্ত পানি কম লবণাক্ত পানি অপেক্ষা ঘন ও ভারি হয়ে থাকে। তাই কম লবণাক্ত পানির তুলনায় বেশি লবণাক্ত পানির চাপ বেশি। এর ফলে বেশি লবণাক্ত পানি কম লবণাক্ত পানির চেয়ে নিচের দিকে নেমে যায় এবং হালকা ও অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত পানি উপরের দিকে উঠে আসে। অর্থাৎ, এক রকম পানির গতি নিম্নমুখী হয় আরেক রকম পানির গতি উর্ধ্বমুখী হয়। তাই মিঠা ও লবণাক্ত পানি কিংবা বেশি লবণাক্ত ও অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত পানির স্রোত মুখোমুখী হলে একই স্থানে উর্ধ্বস্রোত বা পৃষ্ঠপ্রবাহ এবং নিম্নস্রোত বা অন্তঃপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এভাবে দুই রকম পানির মাঝে এক প্রাকৃতিক অন্তরায় থাকায় দুই রকম পানির প্রবাহে ভিন্নতা বহাল থাকে। ভূমধ্যসাগরের পানি আটলান্টিক মহাসাগর ও কৃষ্ণসাগরের পানির তুলনায় বেশি লবণাক্ত, ফলে আটলান্টিক মহাসাগর ও কৃষ্ণসাগর থেকে কম লবণাক্ত পানি পৃষ্ঠপ্রবাহ রূপে ভূমধ্যসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়।

---

[১] উত্তাপে পানিরাশি বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে বাষ্পীভবন বলা হয়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি সোজাসুজি এবং মেরু অঞ্চলে তীর্যকভাবে পড়ার ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের পানি মেরু অঞ্চলের পানির তুলনায় উষ্ণ ও হালকা হয় এবং মেরু অঞ্চলের পানি তুলনামূলক বেশি শীতল ও ভারি হয়। এ কারণে নিরক্ষীয় এলাকার উষ্ণ পানি মেরু অঞ্চলে গিয়ে মেরু অঞ্চলের শীতল পানির সাথে মিশে ক্রমশ ভারী হওয়ায় নিম্নপ্রবাহে পরিণত হতে থাকে। পক্ষান্তরে মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারি পানি নিরক্ষীয় উষ্ণ অঞ্চলের দিকে এসে সেই স্থানের উষ্ণ পানির সাথে মিশে পৃষ্ঠপ্রবাহে পরিণত হয়।

উল্লেখ্য, এভাবে দুই রকম পানির মাঝে অন্তরায় না থাকলে এবং দুই রকম পানির প্রবাহে ভিন্নতা বহাল না থাকলে পৃথিবীর সব পানি লবণাক্ত হয়ে যেত, যার ফলে পৃথিবীর বহু রকম গাছপালা ও খাদ্য-শস্যের উদ্ভিদ ধ্বংস হয়ে পড়ত। অতএব দুই রকম পানির প্রবাহে এই অন্তরায় থাকা আল্লাহর বড় এক নেয়ামত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. (٢١)

অর্থাৎ, তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়াকে, যা পরস্পর মিলিত হয়। কিন্তু এই দুই দরিয়ার মাঝে রয়েছে এমন অন্তরায় যা এরা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে? (সূরা আর-রহমান: ১৯–২১)

সমুদ্র সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত বিশেষ তথ্যাবলি

সমুদ্র সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে বিশেষ ৮টি তথ্য বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে–

১. দুই রকম পানি (মিঠা ও লোনা)-এর মাঝে এক রকম প্রাকৃতিক অন্তরায় রয়েছে। যার ফলে দুই রকম পানির প্রবাহে ভিন্নতা বহাল থাকে। এ সম্বন্ধে পূর্বের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

২. সমুদ্রকে আল্লাহ মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। যেমন: এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ الآية.

অর্থাৎ, আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি তোমাদের কল্যাণে সমুদ্রকে (কুদরতের) আয়ত্তাধীন করেছেন। (সূরা জাছিয়া: ১২)

৩. সমুদ্র মানুষের বহুবিধ উপকারে আসে। যেমন: সমুদ্রে নৌযান চলাচল করে যা দ্বারা মানুষের চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আনুকুল্য লাভ হয়। যেমন পূর্বের আয়াতই পূর্ণাঙ্গ এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি তোমাদের কল্যাণে সমুদ্রকে (কুদরতের) আয়ত্তাধীন করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর কিছু অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। আর যেন তোমরা (তাঁর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা জাছিয়া: ১২)

৪. সমুদ্রে মৎস শিকার করা হয়, যা জীবিকার সরবরাহ ঘটায়, যা বহু মানুষের জীবিকা উপার্জনের উপায় হয়। মৎস ছাড়াও আরও বহু রকমের মূল্যবান ধাতু ও পদার্থ সমুদ্র থেকে আহরিত হয়। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ.

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং মুসাফিরদের জন্য। (সূরা মায়েদা: ৯৬)

৫. সমুদ্র থেকে মণিমুক্তা আহরিত হয়। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا.

অর্থাৎ, আর তিনি ঐ সত্তা যিনি সমুদ্রকে কর্মে বাধ্যগত করে রেখেছেন, যাতে তোমরা সেখান থেকে তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার গয়না –যা তোমরা পরিধান কর–। (সূরা নাহ্ল: ১৪)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ.

অর্থাৎ, উভয় (দরিয়া) থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (সূরা আর-রহমান: ২২) উল্লেখ্য, এখানে উভয় দরিয়া বলা হলেও উদ্দেশ্য লবণাক্ত দরিয়া। আরবি ভাষার বিশেষ রীতি অনুসারে এখানে দ্বিবচন শব্দ ব্যবহৃত হলেও একবচন উদ্দেশ্য। বস্তুত মিঠা পানির দরিয়ায় মুক্তা তৈরি হয় না বরং লবণাক্ত দরিয়াতেই মুক্তা উৎপন্ন হয়।

৬. সমুদ্রের ঢেউ, বিশালতা সবকিছু সত্ত্বেও তাতে নির্বিঘ্নে নৌযান চলাচলের ব্যবস্থা রাখা আল্লাহর কুদরত ও নেয়ামতের নিদর্শন। যেমন: এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ .

অর্থাৎ, আর তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ থেকে (অন্যতম নিদর্শন) হচ্ছে সমুদ্রে অবস্থিত পর্বতসদৃশ নৌযানসমূহ। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন। ফলে সেগুলো তার (সমুদ্রের) পৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়বে। (সূরা শূরা: ৩২–৩৩)

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.

অর্থাৎ, আর তাঁরই অধীনে রয়েছে দরিয়ায় (চলমান) পাহাড়ের মত উঁচু নৌযানসমূহ। (সূরা আর-রহমান: ২৪)

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ.

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে। উদ্দেশ্য, তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন? (সূরা লুকমান: ৩১)

৭. সমুদ্রের পানি চলাচলের স্বভাবধর্মও আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। যেমন ঘটেছিল হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রের পানি বিদীর্ণ হয়ে রাস্তা বের হওয়ার মাধ্যমে এবং হযরত মূসা (আ.) যখন খিয্র–এর সাক্ষাতে গিয়েছিলেন তখন সমুদ্রের পানি ফাঁক হয়ে সুড়ং আকার ধারণ করা এবং ভুনা মাছ তাজা হয়ে সেই সুড়ং পথে চলার মাধ্যমে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ .

অর্থাৎ, অতঃপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম, তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। (সূরা শুআরা: ৬৩)

অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তারা সাগরদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে পৌছল, তখন তারা নিজেদের মাছটির কথা ভুলে গেল এবং মাছটি সাগরের মধ্যে নিজের সুড়ং পথ বানিয়ে নিল।[১] (সূরা কাহাফ: ৬১)

৮. সমুদ্রের নিচে আগুন রয়েছে। এক সহীহ হাদীছে আছে– রসূল সাল্লাল্লাম ইরশাদ করেছেন, إِنَّ الْبَحْرَ هُوَ جَهَنَّم অর্থাৎ, সমুদ্রই হচ্ছে জাহান্নাম। (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٨٩٤٢ وقال : صحيح الإسناد، وأقره عليه الذهبي في التلخيص) আর এক সহীহ হাদীছে আছে– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস (রা.) বলেছেন, إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا অর্থাৎ, সমুদ্রের নিচে জাহান্নাম। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীছ নং ১৪০৪) এসব হাদীছের এক ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, সমুদ্রের নিচে তথা ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে জাহান্নাম অবস্থিত। (এ সম্বন্ধে পূর্বে 'জাহান্নাম কোথায় অবস্থিত' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।) এক ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যেমন মুস্তাদরকে হাকিমে হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ নিশাপূরী (রহ.) বলেছেন, সমুদ্রকে জাহান্নাম আখ্যায়িত করে বুঝানো হয়েছে সমুদ্র অত্যন্ত ভয়াবহ।

---

[১] فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا বাক্যের তর্জমা এভাবেও হতে পারে– মাছটি সাগরের মধ্যে নিজের পথ ধরল এবং চলে গেল। তবে 'মাছটি সাগরের মধ্যে নিজের সুড়ং পথ বানিয়ে নিল'– এই অর্থের অনুকূলে বুখারী মুসলিমের হাদীছ থেকে সমর্থন পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়

(আঞ্চলিক ভূগোল বিষয়ক)

মক্কা মুকাররমা-র ভূগোল-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

হরমের সীমানা (حدود الحرم)

বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে একটা সীমানা বা চৌহদ্দী রয়েছে যেটাকে হরম বা সম্মানিত এলাকা বলা হয়। আল-মাওসূআহ আল-ফিক্‌হিয়্যাহ (الموسوعة الفقهية)-এর বর্ণনা অনুযায়ী হরমের সীমানা (حدود الحرم) নিম্নরূপ :

মদীনার দিকে বনু নিফার গোত্রের ঘর-বাড়ি পর্যন্ত। বর্তমান তানঈম (التَّنْعِيم)-এর শুরু পর্যন্ত। তানঈম হরমের সীমানার বাইরে হিল্‌-এর অন্তর্ভুক্ত। মক্কা থেকে তানঈম পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার। তানঈম-এর শুরুতে মসজিদে আয়েশা রয়েছে। তাই মসজিদে আয়েশা পর্যন্ত হরমের সীমানা।

ইয়ামানের দিকে আযাতে লিব্‌ন (أَضَاة لِبْن) পর্যন্ত। মক্কা থেকে আযাতে লিব্‌ন ১১.২৬৩ কিলোমিটার।

জেদ্দার দিকে হুদাইবিয়ার শেষ প্রান্ত– মুন্‌ক্বাতিউল আ'শাশ (مُنْقَطِع الأَعْشَاش) পর্যন্ত। মক্কা থেকে ১৬ কিলোমিটার। হুদাইবিয়া (বর্তমান নাম শুমাইছী) হরমের অন্তর্ভুক্ত।

জি'রানা (الجِعْرَانة)-র দিকে শিআবে আব্দুল্লাহ ইবনে খালেদ পর্যন্ত। মক্কা থেকে ৩২.৩৩৬ কিলোমিটার। এখানে মসজিদে জি'রানা রয়েছে। এ পর্যন্ত হরমের সীমানা।

ইরাকের দিকে জাবালুল মুকাত্তা' (جَبَل الْمُقَطَّع) পর্যন্ত। মক্কা থেকে ১১.২৬৩ কিলোমিটার।

তায়েফের দিকে আরাফার বাত্‌নে উরানা (بطن عُرَنَة) পর্যন্ত। মক্কা থেকে হাঁটা পথে ১৭ কিলোমিটার। গাড়ি পথে ২৩ কিলোমিটার। বাত্‌নে উরানা আরাফার মসজিদে নামিরার পশ্চিম পাশে একটি নিচু উপত্যকা।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত পরিমাপের শুরু হজরে আসওয়াদ থেকে ধরা হবে। আরও উল্লেখ্য যে, হরমের সীমানা-সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত স্থানসমূহে উঁচু পিলার গাড়া রয়েছে, যার উপরে সাইনবোর্ড রয়েছে। যার ভেতরের দিকে লেখা আছে نهاية حد الحرم আর বাইরের দিকে লেখা আছে بداية حد الحرم। ইংরেজিতেও কথা দু'টো লেখা আছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জমানা থেকেই এ স্থানসমূহে নিশানা গাড়া ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পুনরায় এ স্থানসমূহে নতুন করে নিশানা গাড়েন। এ স্থানসমূহের মাঝেও এঁকে বেঁকে বিভিন্ন পাহাড় ও উপত্যকার মাঝ দিয়ে হরমের সীমানা চিহ্নিত রয়েছে। হযরত ওমর (রা.)–এর শাসনামলে এভাবে গোটা সীমানা পুনঃচিহ্নিত করা হয়। তিনি বলেছিলেন, যে স্থান থেকে পানি কা'বার দিকে গড়িয়ে যাবে সেটা হরমের অন্তর্ভুক্ত। আর যে স্থান থেকে পানি বিপরীত দিকে গড়াবে সেটা হিল্‌ (হরমের বার)-এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। সে মোতাবেক গোটা হরমের সীমানা পুনঃচিহ্নিত করা হয়। সৌদি আরবের 'হরমে মক্কার নিশানা চিহ্নিতকরণ সংস্থা' (لجنة تحديد أعلام الحرم المكي) গোটা সীমানায় নিশানা গেড়ে দিয়েছে। সর্বমোট ১১০০ নিশানা গাড়া হয়েছে।

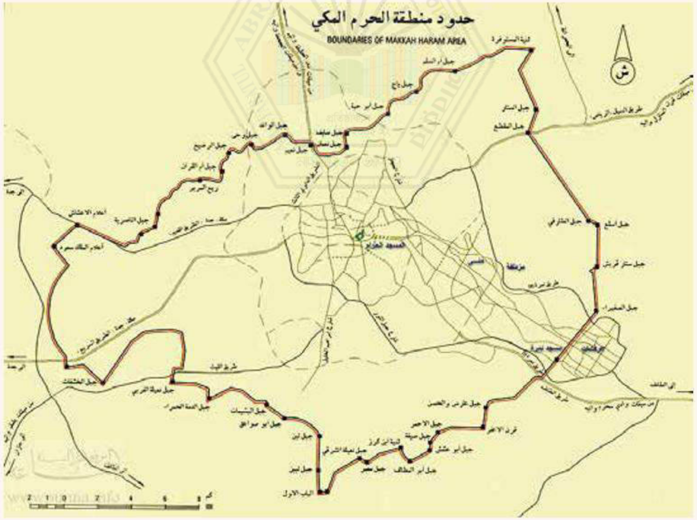

চিত্র নং ৮৩ – হুদূদে হরম (হরমের সীমানা)

হজ্জের মীকাতসমূহ (مواقيت الحج)

হজ্জের 'মীকাত' বলতে বুঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের ঐসব স্থানকে, মক্কা মুকাররমায় গমনকারীদের জন্য ইহরাম ব্যতীত যেসব স্থান অতিক্রম করা নিষেধ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব মীকাত নির্ধারণ করে গেছেন। নিম্নে মীকাতসমূহের বর্ণনা পেশ করা হল।

মদীনা থেকে মক্কায় আগমনকারীদের জন্য মীকাত হল যুলহুলাইফা (ذو الحليفة)। যুলহুলাইফার বর্তমান নাম 'আবইয়ারে আলী' (أبيار علي)। লোকমুখে 'বীরে আলী'ও কথিত হয়ে থাকে। স্থানটি ওয়াদিল আকীকের পশ্চিম পাশে অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদ রয়েছে, যার নাম মসজিদে আবইয়ারে আলী। এটি 'মসজিদুশ শাজারাহ', 'মসজিদে যুল হুলাইফা' ও 'মসজিদুল মীকাত' নামেও পরিচিত। মসজিদে নববী থেকে আবইয়ারে আলী-র দূরত্ব প্রায় ১৪ কিলোমিটার।

শাম, মিসর ও পশ্চিম দিক থেকে মক্কায় আগমনকারীদের জন্য মীকাত হল জুহ্ফা (الجحفة)। বর্তমানে জুহ্ফার রাস্তা পরিত্যাক্ত হওয়ায় জুহ্ফার নিকটস্থ এবং জুহ্ফার সমান্তরালস্থ 'রাবেগ' (رابغ) নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা হয়ে থাকে। রাবেগ মক্কা মুকাররমা থেকে ১৯৫ কিলোমিটার দূরে।

ইরাক ও সেই দিক থেকে মক্কায় আগমনকারীদেন জন্য মীকাত হল যাতু ইর্ক' (ذات عرق)। এ স্থানটি মক্কা মুকাররমা থেকে ৯২ কিলোমিটার উত্তরে। বর্তমান নাম 'আদ-দারীবাহ' (الضريبة)। বর্তমানে এটি পরিত্যাক্ত- মীকাত হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

নজ্দ (সৌদি আরবের মধ্যবর্তী অঞ্চল) থেকে মক্কায় আগমনকারীদের জন্য মীকাত হচ্ছে কারনুল মানাযিল (قرن المنازل), যার বর্তমান নাম আস-সাইলুল কাবীর (السيل الكبير)। এ স্থানটি তায়েফ থেকে উত্তর দিকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মক্কা মুকাররমা থেকে দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার।

ইয়ামান ও সেই দিক থেকে মক্কায় আগমনকারীদের জন্য মীকাত হল ইয়ালামলাম (يلملم)। ইয়ালামলাম মক্কা মুকাররমা থেকে ৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। বর্তমানে ইয়ালামলামের কেন্দ্র থেকে দক্ষিণে সা'দিয়া (السعدية) এলাকার কেন্দ্র মীকাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

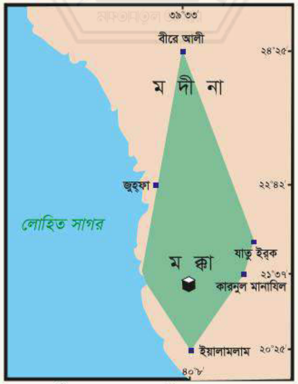

চিত্র নং ৮৪ – মীকাতসমূহ

মক্কা মুকাররমার ঐতিহাসিক স্থানসমূহ

১. মাওলিদুন্নবী

'মাওলিদুন্নবী' অর্থ নবীর জন্মস্থান। এটি মারওয়া বরাবর হারাম শরীফের পূর্ব দিকের চত্বরের পূর্বে রাস্তার পাশে অবস্থিত। বর্তমানে এখানে একটি ঘর দেখা যায়, এ স্থানটিই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ। আব্বাসী খলীফা হারূনুর রশীদ-এর মাতা খাইযুরান এ স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে (১৩৭০ হিজরী মোতাবেক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে) শায়খ আব্বাস ক্বাত্তান (রহ.) সেটিকে ভেঙ্গে একটি পাঠাগার বানান। বর্তমানে সেই পাঠাগারটি রয়েছে। আবরিতে সাইনবোর্ড লেখা আছে 'মাকতাবাতু মক্কাহ আল মুকার্‌রমাহ' অর্থাৎ, মক্কা মুকাররমার পাঠাগার। এটিই মাওলিদুন্নবী তথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থান। (تاريخ مكة المكرمة)

চিত্র নং ৮৫ – মাওলিদুন্নবী

২. হযরত খাদীজা (রা.)–এর গৃহ

হযরত খাদীজা (রা.)-এর ঘরেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ের পর থেকে হিজরত পর্যন্ত ছিলেন। এই ঘরেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার কন্যা– যায়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মে কুলছুম ও ফাতেমার জন্ম হয়। এক সময় এটিকে 'মাওলিদে ফাতেমা' (ফাতেমার জন্মস্থান)ও বলা হত। এ ঘরেই হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাত হয়। বহুবার এ ঘরে থাকা অবস্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহী নাযেল হয়েছে। এই ঘর থেকেই শুরু হয়েছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের যাত্রা। মক্কার কাফেররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘরটির চতুর্দিকে বেষ্ঠন করে অপেক্ষা করছিল যে, তিনি ঘর থেকে বের হলেই তাঁকে হত্যা করা হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী মারফত অবগত হয়ে হযরত আলী (রা.)কে বিছানায় শুইয়ে রেখে, তাকে সকলের আমানাত বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান। তিনি এক মুষ্ঠি বালু নিয়ে নিক্ষেপ করেন, যা মু'জিযা স্বরূপ বেষ্টনকারী সকল কাফেরের চোখে গিয়ে পড়ে। ইত্যবসরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে যান।

হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর ঘরের কাছেই ছিল এ ঘরটি। হযরত মুআবিয়া (রা.) খলীফা থাকাকালীন এটি ক্রয় করে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং পিতা আবূ সুফিয়ানের ঘর থেকে মসজিদের দিকে একটা দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে মসজিদটির সংস্কার হতে থাকে। অবশেষে ১৩৬৯ হিজরীতে সাইয়্যেদ আব্বাস কাত্তান সেখানে একটা বালিকা

বিদ্যালয় বানান। পরবর্তীতে ১৩৮৫ হিজরী সনে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণ কালে স্থানটি পূর্বদিকের চত্বরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ স্থানটি ছিল মাওলিদুন্নবীর উত্তর পশ্চিম দিকে। মসজিদে হারামের পূর্বদিকে সাফা ও মারওয়ার মাঝামাঝি বাবুস সালাম নামক একটি দরজা ছিল। এর দক্ষিণে বাবুন্নবী নামক আর একটি দরজা ছিল। (২০০৯ ইং সনে পূর্ব দিকে সায়ীর স্থান সম্প্রসারিত করার সময় এ দরজাগুলো আর রাখা হয়নি।) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদীজা (রা.)-এর এ ঘর থেকে মসজিদে আসা এবং সেই ঘরে যাওয়ার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এই বাবুন্নবীর স্থান দিয়েই যাতায়াত করতেন। (تاريخ مكة المكرمة وأخبار مكة وغيرها)

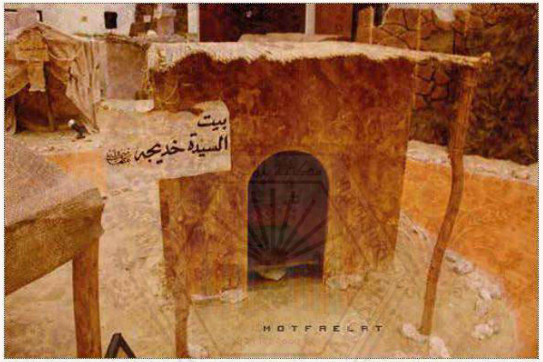

চিত্র নং ৮৬ – হযরত খাদীজা (রা.)-এর গৃহ (প্রাচীন ছবি)

৩. মসজিদুর রায়াহ

"রায়াহ" শব্দের অর্থ ঝাণ্ডা। মসজিদুর রায়াহ অর্থ ঝাণ্ডার মসজিদ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার উঁচু দিক তথা জান্নাতুল মুআল্লার দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তাঁবু গাড়া হয়েছিল এবং যেখানে ঝাণ্ডা স্থাপন করা হয়েছিল, সেই স্থানেই পরবর্তীতে হযরত আব্বাস (রা.)-এর বংশধরের এক ব্যক্তি (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা.]) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই মসজিদুর রায়াহ। মসজিদটি জুদরিয়া মহল্লায় অবস্থিত হওয়ায় এটিকে 'মসজিদে জুদরিয়া'-ও বলা হত। মাওলিদুন্নবী থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে যে রাস্তা (গায্যা রোড) জান্নাতুল মুআল্লার দিকে গিয়েছে সে রাস্তায় কিছুদূর অগ্রসর হলে রাস্তার ডান (পূর্ব) পাশে মসজিদটি অবস্থিত ছিল। মারওয়া পাহাড় থেকে এর দূরত্ব ৫৫০ মিটার। ২০১৩ ইং সনে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। (تاريخ مكة المكرمة وغيرها)

চিত্র নং ৮৭ – মসজিদুর রায়াহ (ভেঙ্গে ফেলার সময়কার ছবি)

৪. মাক্ববারাতুল মুআল্লাত/জান্নাতুল মুআল্লা

এটা মক্কার কবরস্থান। এটাকে "মাকবারাতুল মুআল্লাত" বলা হয়। সাধারণ্যে এটা 'জান্নাতুল মুআল্লা' নামে প্রসিদ্ধ। এ কবরস্থানটা হারাম শরীফ থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। মসজিদুর রায়াহ থেকে আরও কিছুদূর উত্তর দিকে অগ্রসর হলেই সামনে রাস্তার বাম পাশে পাহাড়ের পাদদেশে এ কবরস্থানটা অবস্থিত। কবরস্থানের উত্তর দিকে পাহাড়ের কোলের মধ্যে যে অংশ সেটাই প্রাচীন অংশ, সেখানেই রয়েছে হযরত খাদীজা (রা.)-এর কবর, যার সামনে জানালাযুক্ত একটা দেয়াল রয়েছে।

এ কবরস্থানে হযরত খাদীজা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে ওমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে যুবায়ের (রা.), প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মুজাহিদ, আতা, ফুযায়ল ইব্নে ইয়ায, সুফইয়ান ইব্নে উইয়াইনা (রহ.) এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)সহ হাজার হাজার সাহাবী, তাবিয়ী ও বুযুর্গের কবর রয়েছে। (ہندوستان سے دیار حرم تک و مناسك ملا علي القاري)

চিত্র নং ৮৮ – মাকবারাতুল মুআল্লাত

চিত্র নং ৮৯ – হযরত খাদীজা [রা.]-এর কবর (সবুজ গেটের পাশে)

৫. মসজিদে জিন

এখানে জিনগণ হাজির হয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিল। আর এক বর্ণনামতে এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে জিনদের এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাওয়ার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইব্নে মাসউদ (রা.)কে এখানে রেখে যান। উল্লেখ্য, এর পূর্বে নবুয়তের দশম বর্ষে তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নাখ্লা নামক স্থানেও কিছু সংখ্যক জিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করে। মসজিদটি ১৪২১ হিজরীতে পুনঃনির্মাণ করা হয়। এ মসজিদের আর এক নাম 'মসজিদে হার্ছ'। (مناسك ملا علي القاري وتاريخ مكة المكرمة)

এ মসজিদটি জান্নাতুল মুআল্লার গেটের নিকটে অবস্থিত। গেটকে বাম দিকে রেখে গেট সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে আনুমানিক ১০০ কদম সামনের দিকে (উত্তর দিকে) অগ্রসর হলেই মসজিদে জিনে পৌছে যায়।

مسجد الجن بالحجون

চিত্র নং ৯০ – মসজিদে জিন/মসজিদে হার্ছ

৬. জাবালে আবী কুবায়ছ

জাবাল অর্থ পাহাড়। জাবালে আবী কুবায়ছ অর্থ 'আবূ কুবায়ছ'-এর পাহাড়। এ পাহাড়টা ১২০ মিটার উঁচু। এটা ছাফা পাহাড়ের পূর্বপাশে অবস্থিত (যার কিছু অংশের উপর রাজপ্রাসাদ রয়েছে আর কিছু অংশ কেটে পূর্বের চত্বরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)। আবূ কুবায়ছ নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ পাহাড়ের উপর গৃহ নির্মাণ করেন বিধায় তার নামেই এ পাহাড়ের নামকরণ হয়। জাহেলী যুগে এ পাহাড়কে বলা হত 'আমীন'। আমীন অর্থ আমানতদার। এরূপ নামকরণের হেতু জানা যায় তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত একটি সহীহ রেওয়ায়েতের বর্ণনা থেকে। তাতে বলা হয়েছে, হাজরে আসওয়াদ পাথরটি আসমান থেকে (জান্নাত থেকে) নামিয়ে ৪০ বৎসর এ পাহাড়ের উপর রাখা হয়। তারপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) নির্মিত বায়তুল্লাহর দেয়ালে গাঁথা হয়। (تاريخ مكة المكرمة) আর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় থেকে হাজরে আসওয়াদ এ পাহাড়ের উপর রাখা ছিল। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত 'মুজাহিদ' (রহ.)-এর বর্ণনামতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাহাড়ের মধ্যে সর্বপ্রথম এ পাহাড়টা সৃষ্টি করেন। (معلم الحجاج)

বোখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তায়েফে আশ্রয় দেওয়া এবং সাহায্য করার জন্য তায়েফনিবাসী) আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলালের পুত্রের নিকট নিজেকে পেশ করলে তারা রসূলের আবেদন অগ্রাহ্য করে। উপরন্তু তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে দেয়। এরপর পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি চান তাহলে দুই বিশাল কঠিন পাহাড় (أخشبين) চাপা দিয়ে এদেরকে শেষ করে দেই! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাদের বংশধর থেকে এমন লোক বের করবেন যারা শির্‌কমুক্ত হয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ইবাদত করবে। (صحيح البخاري، بدء الخلق حديث رقم ٣٢٣١) এ হাদীছে উল্লেখিত ‘দুই বিশাল কঠিন পাহাড়’ বলে একমতে জাবালে আবী কুবায়ছ ও জাবালে কুআইকিআনকে (দ্রষ্টব্য পরের শিরোনাম) বুঝানো হয়েছে। (فتح الباري ج/٦)

চিত্র নং ৯১ – জাবালে আবী কুবায়ছ (তার উপর বাদশাহর প্রাসাদ)

৭. জাবালে কুআইকিআন (قعَيقِعان)

এটি মসজিদে হারামের সঙ্গে লাগোয়া উত্তর পশ্চিম দিকের একটা উঁচু পাহাড়। এটা শামিয়া এলাকা থেকে ‘হার্‌রাতুল বাব’ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পাহাড়ের অনেক নাম রয়েছে। যে মহল্লায় এই পাহাড়ের যে অংশটুকু পড়েছে সেই অংশটুকুকে সেই মহল্লা হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। এর উত্তর পশ্চিম অংশকে জাবালুল ইবাদী বলা হয়। হাজূন ও জান্নাতুল মুআল্লা কবরস্থান লাগোয়া অংশকে জাবালে সুলাইমানিয়া বলা হয়। দিহলার দিককে জাবালুস সূদান, ক্বারারাহ ও ফালাক্বের মধ্যবর্তী অংশকে জাবালুল ক্বারারাহ এবং দক্ষিণের অংশকে জাবালুল হিন্দী বলা হয়। কারণ, এদিকের অংশের পাদদেশে এক সময় হিন্দুস্তানী লোকদের বসবাস ছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে পাহাড়টার উচ্চতা ৪১০ এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১১০ মিটার। (تاريخ مكة المكرمة)

২০১০/১১ সাল থেকে গাযযা মার্কেটের পশ্চিম থেকে মসজিদে হারামের বাবে ফাতাহ্ ও বাবে উমরা লাগোয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় এ পাহাড়ের যে অংশ ছিল তা কেটে সেদিকে মসজিদ ও চত্বর সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। যেটা বাদশাহ আব্দুল্লাহর সম্প্রসারণ (توسعة الملك عبد الله) নামে পরিচিত। এই সম্প্রসারণের কাজে পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অংশ কাটা পড়ে। বেশ কিছু অংশ এখনও রয়েছে। এ পাহাড়ের সঙ্গে একটা বিশেষ ইতিহাস জড়িত রয়েছে। দেখুন পূর্বের শিরেনাম ‘জাবালে আবী কুবায়ছ’।

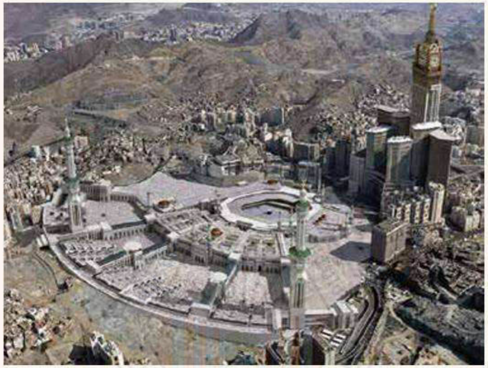

চিত্র নং ৯২ – জাবালে কুআইকিআন

৮. শি‘আবে আবী তালিব

‘শি‘আবে আবী তালিব’ হল একটা ঘাটি, যার আশপাশেই ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খান্দান বনূ হাশিম-এর ঘর-বাড়ি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মস্থানও এই ঘাটিরই পাশে। (দেখুন শিরোনাম ‘মাওলিদুন্নবী’।) শি‘আবে আবী তালিবকে শি‘আবে আলী এবং শি‘আবে বনূ হাশিমও বলা হয়। কুরায়শ ও বনূ কিনানা গোত্রের লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ বনু মুত্তালিব ও বনু হাশেমকে মক্কা থেকে বের করে আনার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। এক পর্যায়ে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বনূ মুত্তালিব এবং বনূ হাশেমকে সামাজিকভাবে বয়কট করে। ফলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বনূ মুত্তালিব ও বনূ হাশেম নবুয়তের ৭ম সনে শি‘আবে আবী তালিবে অন্তরীণ হয়ে পড়েন। বায়তুল্লাহর গায়ে বয়কটনামা ঝুলিয়ে রাখা হয়। অবশেষে ৩ বছর পর উই পোকায় এ বয়কটনামাটা খেয়ে ফেলে। এরপর তারা বয়কট থেকে মুক্তি লাভ করেন।

শি‘আবে আবী তালিব এলাকাটি জাবালে আবী কুবায়ছ ও জাবালে খানাদিম-এর মাঝ দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে বাতহায়ে মক্কা (সূকুল লাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। জাবালে আবী কুবায়ছ-এর পরিচয় ও

অবস্থান পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর মক্কা দিয়ে সুড়ং পথে মিনায় গমনকারী ব্যক্তি সুড়ং পার হওয়ার পর কিছুদূর অগ্রসর হলে বাম দিকে জাবালে খানাদিম অবস্থিত। আর মারওয়া পাহাড় থেকে উত্তর পূর্ব দিকে ৩০০ মিটার দূর হতে বাতহায়ে মক্কা (সূকুল লাইল) এলাকাটার শুরু। (تاريخ مكة المكرمة وخريطة مكة)

৯. দারে আরকাম

এটি সাহাবী হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা.)-এর বাড়ি। দীর্ঘকাল এটি ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী দাওয়াতের গোপন কেন্দ্র। এখানে সাহাবাগণ সমবেত হতেন, নামায পড়তেন এবং দ্বীনী তা'লীম অর্জন করতেন। এখানেই হযরত ওমর (রা.) মুসলমান হয়েছিলেন। এটি ছিল সাফা পাহাড় থেকে ৩৬ মিটার পূর্বে সায়ীর স্থানের বাইরে অবস্থিত। ১৭১ হিজরী মোতাবেক ৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আব্বাসী খালীফা হারূনুর রশীদের মাতা খাইযুরান এই বাড়ির স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে মুসলিম খলীফাগণ এর সংস্কার করতে থাকেন। অবশেষে ১৩৭৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে এদিকে হারামের সম্প্রসারণ কার্য করার ফলে মসজিদটি তার আওতায় চলে আসে। (تاريخ مكة المكرمة)

دار الأرقم بن أبي الأرقم

চিত্র নং ৯৩ – দারে আরকাম যুগে যুগে

১০. দারুন্নাদ্ওয়া

দারুন্নাদওয়া অর্থ সভাকক্ষ, ক্লাবঘর। এটা ছিল কুরায়শদের বহুমুখী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা স্থান। বর্তমান যুগের পরিভাষায় বলা যায় এটা ছিল কুরায়শদের পার্লামেন্ট ভবন। এখানেই যুদ্ধ-বিগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হত, ঝাণ্ডা বিতরণ হত। হিজরতের পূর্বক্ষণে কুরায়শরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাও এখানে বসেই নেওয়া হয়েছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে সর্বপ্রথম কুসাই ইবনে কিলাব এটা নির্মাণ করেন। বায়তুল্লাহর খুব কাছে হওয়ায় পরবর্তীতে বহু মুসলমান আমীর ও খলীফা হজ্জ-উমরা করার সময় এখানে অবস্থান করতেন। একবার হযরত ওমর (রা.)ও এখানে অবস্থান করেছিলেন। আব্বাসী খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহ ২৮৪ হিজরী মোতাবেক ৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এ জায়গাটাকে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কা'বা শরীফের উত্তর পশ্চিম দিকে যেখানে মাতাফ[1]

ও ছাদ বিশিষ্ট স্থানের সম্মিলন ঘটেছে এখানেই ছিল দারুন্নাদওয়া। যার আয়তন ছিল ৩৭×৩৬ = ১৩৩২ বর্গমিটার। স্মৃতি স্বরূপ এদিকের একটা দরজার নামও রেখে দেওয়া হয়েছে বাবুন্নাদওয়া। (تاريخ مكة المكرمة)

১১. সাফা, মারওয়া ও মাসআ

● **সাফা:** সাফা একটি ছোট্ট পাহাড়। কা'বা শরীফ থেকে ১৩০ মিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। এখান থেকে সায়ী শুরু করা হয়। কেয়ামতের পূর্বে এই পাহাড় থেকে দাব্বাতুল আর্‌দ নামক প্রাণী বের হবে। যে সম্বন্ধে কুরআনে কারীমে এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.

অর্থাৎ, যখন তাদের সঙ্গে ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে, তখন আমি তাদের জন্য জমিন থেকে এক জন্তু বের করব, যে তাদের সঙ্গে কথা বলবে যে, (কাফের) লোকেরা আমার (অর্থাৎ, আল্লাহর) নিদর্শন-সমূহকে বিশ্বাস করত না। (সূরা নাম্‌ল: ৮২)

চিত্র নং ৯৪ – সাফা পাহাড়

● **মারওয়া:** মারওয়া-ও একটি ছোট্ট পাহাড়। কা'বা শরীফের রুক্‌নে ইরাকী থেকে উত্তরপূর্ব দিকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত। সাফা পাহাড় থেকে শুরু করে মারওয়া পর্যন্ত এলে সায়ীর একটি চক্কর পূর্ণ হয় এবং এখানেই সায়ীর সপ্তম চক্কর সমাপ্ত হয়। সায়ীতে চলাচলের সুবিধার জন্য মারওয়া পাহাড়ের সামনে ও আশপাশ ভরাট করে দেওয়ার কারণে বর্তমানে মারওয়া পাহাড়ের সামান্য একটু চূড়া-ই দেখতে পাওয়া যায়।

---

[1] ১. উল্লেখ্য, ২০১৭ সাল থেকে মাতাফ পূর্বের চেয়ে আরও বড় হয়েছে। সে হিসেবে এখন দারুন্নাদওয়ার স্থান মাতাফের বেশ কিছু ভিতরে পড়েছে।

চিত্র নং ৯৫ – মারওয়া পাহাড়

● **মাসআ:** সাফা ও মারওয়া-র মাঝে সায়ী করা হয় বিধায় এ স্থানকে বলা হয় 'মাসআ' অর্থাৎ, সায়ীর স্থান। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে হযরত হাজেরা-র দৌড়ানোর কাহিনী প্রসিদ্ধ। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে দূরত্ব অর্থাৎ, মাসআ (সায়ীর স্থান)–এর দৈর্ঘ ৩৯৪.৫ মিটার। এ হিসেবে ৭ চক্করে পরিমাণ দাঁড়ায় (৩৯৪.৫×৭=)২৭৬১.৫ মিটার তথা পৌনে তিন কিলোমিটার থেকে সামান্য বেশি। (تاريخ مكة المكرمة و في خدمة ضيوف الرحمن)

চিত্র নং ৯৬ – সায়ীর স্থান

১২. কা'বা শরীফ ও কা'বা শরীফ সংলগ্ন কিছু জিনিস

● **কা'বা:** কা'বা শরীফকে 'বাইতুল্লাহ', 'আল-বাইতুল হারাম', 'আল-বাইতুল আতীক' ও 'কেবলা'ও বলা হয়। সর্বপ্রথম ফেরেশতারা কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। তার পর যুগে যুগে এটির সংস্কার হতে থাকে। ফেরেশতাসহ এ পর্যন্ত নির্মাণ ও সংস্কার কর্মে ১২ জনের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। যদিও এ সম্পর্কিত কোন কোন রেওয়ায়েতের উপর পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। আবার কিছু রেওয়ায়েত অকাট্যও রয়েছে। উক্ত ১২ জন হলেন–

১	ফেরেশতা	৭	কুসাই ইবনে কিলাব
২	হযরত আদম (আ.)	৮	মক্কার কুরায়শ
৩	হযরত শীছ (আ.)	৯	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ৬৫ হি.
৪	হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ.)	১০	হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ৭৪ হি.
৫	আমালেকা গোত্র	১১	সুলতান মুরাদ তুর্কী ১০৪০ হি.
৬	জুরহুম গোত্র	১২	ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয ১৪১৭ হি.

কুরায়শরা হিজরী সনের ১৮ বৎসর পূর্বে বাইতুল্লাহর নির্মাণকাজ করার সময় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা কোনো অন্যায় অর্থ এ কাজে ব্যবহার করবে না। এর ফলে তাদের বাজেট কমে যায়। এ কারণে তারা হাতীমের দিকে বাইতুল্লাহর প্রায় ৩ মিটার জায়গা নির্মাণকর্মে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বাদ দেয়। এছাড়াও তারা আরও কয়েকটা পরিবর্তন আনে। তারা বাইতুল্লাহর দরজাকে মাতাফ থেকে এতটা উঁচু করে দেয় যে, কেউ যেন তাদের ইচ্ছা ব্যতীত বাইতুল্লায় প্রবেশ করতে না পারে। বাইতুল্লাহর বর্তমান দরজার বিপরীত দিকে (পশ্চিম দিকে) আরও একটি দরজা ছিল, তারা সে দরজাটি বন্ধ করে দেয়। ইতিপূর্বে বাইতুল্লাহর ছাদ ছিল না, তারা ছাদ নির্মাণ করে। এর পূর্বে বাইতুল্লাহর উচ্চতা ছিল ৪.৩২ মিটার, তারা এটির উচ্চতা করে দেয় ৮.৬৪ মিটার।

অবশেষে বাদশাহ ফাহাদ বিন আব্দুল আযীযের সময়ে (১৪১৭ হিজরীতে) বাইতুল্লাহর ভিত মজবূত করা ও দেয়ালের মধ্যকার পুরাতন মসলা সরিয়ে সিমেন্টের মসলা লাগানোসহ ছোট-খাটো আরও কিছু সংস্কার আনা হয়। তার মধ্যে রয়েছে, বাইতুল্লাহর দুটো ছাদকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়, বাইতুল্লাহর ভিতরের ৩টি পিলারকে নতুন করে কাঠ দিয়ে বানানো হয়।

বাইতুল্লাহর বর্তমান পরিমাপ নিম্নরূপ:

উচ্চতা	১৪ মিটার
মুলতাযামের দিকের দৈর্ঘ	১২.৮৪ মিটার
হাতীমের দিকের দৈর্ঘ	১১.২৮ মিটার
রুকনে ইয়ামানী ও হাতীমের দিকের দৈর্ঘ	১২.১১ মিটার
রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের দিকের দৈর্ঘ	১১.৫২ মিটার

(تاريخ مكة المكرمة و في خدمة ضيوف الرحمن)

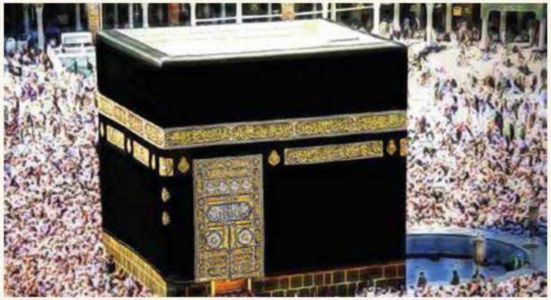

চিত্র নং ৯৭ – কা'বা শরীফ

● **হাতীম:** পূর্বে 'কা'বা' শিরোনামের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরায়শরা কা'বা শরীফ নির্মাণকালে বাজেট সংকটের কারণে বাইতুল্লাহর উত্তর দিক থেকে প্রায় ৩ মিটার বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু নির্মাণ করে। বাইতুল্লাহর এই বাদ দেওয়া অংশটুকুকে বলা হয় "হাতীম"। হাতীম শব্দের অর্থ খণ্ডিত অংশ। বাইতুল্লাহ থেকে এ অংশটুকু খণ্ডিত করে দেয়া হয়েছে বিধায় এমন নামকরণ হয়েছে। এই স্থানটুকু ১.৩২ মিটার উঁচু অর্ধবৃত্ত দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা আছে। এ স্থানটুকুও বাইতুল্লাহর অংশ বিধায় তওয়াফের সময় হাতীমের বাইরে দিয়েই তওয়াফ করতে হয়। তবে উল্লেখ্য যে, হাতীমের পুরোটাই বাইতুল্লাহর অংশ নয় বরং বাইতুল্লাহ সংলগ্ন ৩ মিটার পরিমাণ স্থান বাইতুল্লাহর অংশ। অবশিষ্টটুকু বাইতুল্লাহর অংশ নয়। হাতীমকে 'হিজ্‌রে ইসমাঈল'ও বলা হয়। হিজ্‌র অর্থ অন্তরায়, বাধা প্রদান করা। হাতীমের গোল আকৃতির দেয়াল বাধার সৃষ্টি করে থাকে বিধায় এমন নামকরণ হয়ে থাকবে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইসমাঈল ও তার মাতা হাজেরার জন্য এখানেই একটি কুড়ে ঘরের মত নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এ হিসেবেই হিজ্‌রে ইসমাঈল নামকরণ হয়েছে। (تاريخ مكة المكرمة)

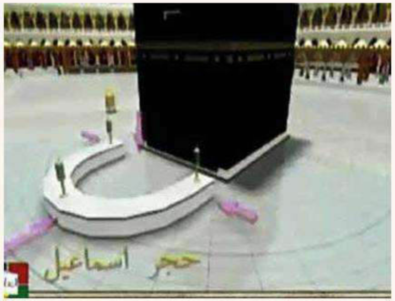

চিত্র নং ৯৮ – হাতীম

● **মীযাবে রহমত:** কুরায়শরা যখন বাইতুল্লাহ নির্মাণ করে, তখন তারাই সর্বপ্রথম বাইতুল্লায় ছাদ সংযোগ করে। ইতিপূর্বে বাইতুল্লায় ছাদ ছিল না। ছাদ নির্মাণের সময় তারা ছাদের পানি সরানোর জন্য হাতীমের দিকে একটি পরনালা সংযোগ করে। এই পরনালাকেই বলা হয় 'মীযাবে রহমত' বা 'মীযাবুল কা'বা'। এই মীযাবে রহমত ২.৫৩ মিটার লম্বা, যার ৫৮ সেন্টিমিটার অংশ দেয়ালের মধ্যে রয়েছে। মীযাবে রহমতে স্বর্ণের খোল পরানো আছে এবং যেন এর উপর পাখী বসতে না পারে তাই উপর দিকের দুই পাশে ধাঁরালো পেরেক বসানো আছে।

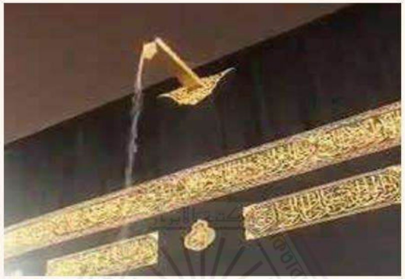

চিত্র নং ৯৯ – মীযাবে রহমত

● **বাইতুল্লাহর দরজা:** হযরত ইব্রাহীম (আ.) নির্মিত বাইতুল্লাহর দরজা ছিল দু'টো এবং দরজা ছিল মাতাফ (মাটি) বরাবর। সে দরজা ছিল খোলা, বন্ধ করার কোনো ব্যবস্থা তাতে ছিল না। মানুষ সহজে পূর্ব দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করত এবং পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে বের হত। পরবর্তীতে ইয়ামানের বাদশাহ আসআদ তুব্বা' তৃতীয় তাতে এক পাল্লার দরজা লাগান, যাতে প্রয়োজনে বন্ধ করা বা খোলা যায়। কুরায়শরা বাইতুল্লাহ নির্মাণ করার সময় পশ্চিম দিকের দরজা তুলে দেয় এবং পূর্ব দিকের দরজা দুই পাল্লা বিশিষ্ট করে দেয় আর সেটিকে উঁচু করে দেয়।

চিত্র নং ১০০ – বাইতুল্লাহর দরজা

উল্লেখ্য, বাইতুল্লাহর মধ্যে ছাদে উঠার একটি সিড়ি রয়েছে। এই সিড়ি বাইতুল্লাহর মধ্যে উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত। সিড়িটি একটি ঘেরার মধ্যে রয়েছে, যার একটি দরজা রয়েছে। এ দরজাটির নাম 'বাবে তওবা'। পূর্বে এ সিড়িটি ছিল কাঠের। ১৩৯৭ হিজরীতে কাঠের সিড়ির পরিবর্তে এলুমিনিয়ামের গোল সিড়ি বানানো হয়। সিড়ির উপরে ছাদে একটি ছিদ্র রয়েছে, যার উপর কাচের ঢাকনা রয়েছে। এই কাচ দিয়ে বাইতুল্লাহর মধ্যে স্বাভাবিক আলো এসে থাকে। কা'বা শরীফকে গোসল দেওয়ার দিন বা গেলাফ পরানোর সময় উপরের ঢাকনা তুলে ছাদে আসা-যাওয়া করা হয়।

বাইতুল্লাহর উভয় দরজাই মূলত কাঠের তৈরী। ১৩৯৮ হিজরীতে বাদশাহ খালেদ বিন আব্দুল আজীজের সময় ২৮০ কিলোগ্রাম খাঁটি স্বর্ণের পাত দ্বারা দরজা দুটিতে কারুকার্য করা হয়।

উভয় দরজা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য:

কা'বার দরজার দৈর্ঘ	৩.১০ মিটার
কা'বার দরজার প্রস্থ	১.৯০ মিটার
কা'বার দরজার পুরুত্ব	৫০ সে. মি.
মাতাফ থেকে দরজার উচ্চতা	২.২৫ মিটার
বাবে তওবার দৈর্ঘ	২.৩০ মিটার
বাবে তওবার প্রস্থ	৭০ সে. মি.

(تاريخ مكة المكرمة)

● **বায়তুল্লাহর গেলাফ:** সর্বপ্রথম হযরত ইসমাঈল (আ.) কা'বা শরীফে গেলাফ পরিধান করান। একটা ঐতিহাসিক বর্ণনামতে আসআদ হিম্‌য়ারী তুব্বা' গেলাফের সূচনা করেন। ইসলামী যুগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খলীফাগণ নিজ নিজ যুগে কা'বা শরীফকে গেলাফ পরিধান করান। ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১২৫৮ সনে আব্বাসী খেলাফতের যুগ শেষ হওয়ার পর কা'বা শরীফের গেলাফ মিসর বা ইয়ামান থেকে আসত। পরবর্তীতে শুধু মিসর থেকেই এই গেলাফ আসত। ১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৯২৪ সালে কিছু কারণে মিসর থেকে গেলাফ আসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন সৌদী আরবের বাদশাহ আব্দুল আযীযের নির্দেশে গেলাফ তৈরি করার জন্য মক্কা মুকাররমায় একটা কারখানা বানানো হয়। ১৩৪৬ হিজরীতে সর্বপ্রথম এই কারখানায় গেলাফ তৈরী হয়। তার পর ১৩৫৫ হিজরীতে সৌদী আরব ও মিসরের মধ্যে একটা চুক্তির ভিত্তিতে পুনরায় মিসর থেকে গেলাফ তৈরী হয়ে আসতে থাকে। ১৩৮১ হিজরীতে আবার এ ধারা থেমে যায়। তখন থেকে আবার সৌদী সরকার স্থানীয় কারখানায় গেলাফ তৈরির কাজ চালু করে। ১৩৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৭ সালে এর জন্য একটা নতুন কারখানা তৈরী হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ কারখানাতেই গেলাফ তৈরি করা হচ্ছে।

উন্নত মানের রেশমসুতা দিয়ে গেলাফ তৈরি করা হয়। কাল রং দিয়ে সেটিকে আরও উজ্জ্বল করা হয়। গেলাফে কালেমা তাইয়্যেবা, আল্লাহর বেশ কয়েকটি নাম ও বিভিন্ন আয়াত লিখিত থাকে। প্রত্যেকটি নতুন গেলাফের নিচে নতুন সাদা কাপড়ের আস্তর লাগানো থাকে।

প্রতি বৎসর ৯ যিলহজ্জ কা'বা শরীফের গেলাফ পরিবর্তন করা হয়। ঈদুল আযহার দিন কা'বা শরীফ থাকে নতুন গেলাফ পরিহিত। (تاريخ مكة المكرمة)

● **হজরে আসওয়াদ:** হজরে আসওয়াদ মাতাফ থেকে ১.১০ মিটার উঁচুতে বাইতুল্লাহর দক্ষিণপূর্ব কোণে স্থাপিত একটি পাথর। পাথরটি জান্নাত থেকে আনা হয়। পাথরটি দুধের চেয়ে সাদা ছিল। বনী আদমের গোনাহ এটিকে কালো করে দিয়েছে। এই কাল হওয়ার কারণেই এটিকে হজরে আসওয়াদ বলা হয়। উল্লেখ্য, আসওয়াদ শব্দের অর্থ কালো। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর সময় বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ কালে যখন বায়তুল্লাহর দেয়াল ভাঙ্গা হয়, তখন আমি হজরে আসওয়াদের যে অংশ দেয়ালের মধ্যে ছিল তা সাদা দেখতে পাই।

৩১৯ হিজরী (মতান্তরে ৩১৭ হিজরী) সনে কারাম্‌তা নামক শিআদের একটা দলের লোকেরা আবূ তাহের কারাম্‌তীর নেতৃত্বে মক্কায় প্রচুর লুটতরাজ চালায়, বহু হাজীকে হত্যা করে এবং হজরে আসওয়াদকে আঘাত দিয়ে বাইতুল্লাহর দেয়াল থেকে তুলে "আহ্‌সা" এলাকায় নিয়ে যায়। দীর্ঘ ২০ (মতান্তরে ২২) বৎসর পর ৩৩৯ হিজরী সনে আব্বাসী খলীফা মুতী' লিল্লাহর মধ্যস্ততায় কারাম্‌তাদের কাছ থেকে পাথরটি উদ্ধার করে পুনরায় বায়তুল্লাহর গায়ে স্থাপন করা হয়।

হজরে আসওয়াদ পাথরটি শুরুতে একটি টুকরো ছিল। কারামতাদের আঘাত ও পরবর্তী কিছু দুর্ঘটনার কারণে পাথরটি ভেঙ্গে যায়। এখন এটির ছোট ছোট বিভিন্ন সাইজের ৮টি টুকরো রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় টুকরোটি খেজুরের সাইজের। এই টুকরোগুলোকে বড় একটা পাথরের মধ্যে স্থাপন করে রাখা হয়েছে এবং সেই বড় পাথরটাকে রূপার ফ্রেমে এঁটে রাখা হয়েছে। বস্তুত ঐই রূপার ফ্রেম নয়, বড় পাথরটাও নয় বরং ঐই ক্ষুদ্র টুকরোগুলোই হজরে আসওয়াদ; সেই টুকরোগুলোকেই চুমু দেয়া সুন্নাত। (تاريخ مكة المكرمة و وصف الكعبة المشرفة وتاريخ الإسلام)

চিত্র নং ১০১ – হাজরে আসওয়াদ

● মাকামে ইব্রাহীম: ‘মাকামে ইব্রাহীম’ একটি পাথরকে বলা হয় যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন এবং দেয়াল গাঁথার সময় প্রয়োজনে অলৌকিকভাবে পাথরটি আপনা আপনি উঁচু-নিচু হত। সহীহ ইব্নে হিব্বানের এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী (لإحسان في تقريب برقم ٣٧١٠) হজরে আসওয়াদের ন্যায় এ পাথরটিও জান্নাত থেকে আসে।

পাথরটিতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পায়ের নিশানা রয়েছে। ২২ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১১ সেন্টিমিটার চওড়া পায়ের চিহ্ন রয়েছে। একটি কদমের চিহ্নের গভীরতা ১০ সেন্টিমিটার আর একটির গভীরতা ৯ সেন্টিমিটার। তবে আঙ্গুলের চিহ্ন নেই। সম্ভবত আগের যুগে পাথরটি কোনো ফ্রেম ছাড়াই উন্মুক্তভাবে থাকায় সুদীর্ঘকাল যাবত মানুষের হাতের ছোয়ায় আঙ্গুলের চিহ্ন মুছে গিয়ে থাকবে।

পাথরটি একটি পিতলের জালির মধ্যে রাখা অবস্থায় রয়েছে। পাথরটির অবস্থান কা'বা শরীফ থেকে প্রায় ১৩.৫০ মিটার পূর্বে হজরে আসওয়াদ থেকে ১৪.৫ মিটার ও রুকনে ইরাকী থেকে ১৪ মিটার দূরে। একাধিক বর্ণনায় জানা যায়, প্রাচীন যুগ থেকে পাথরটি বাইতুল্লাহর খুব নিকটে রাখা ছিল। তওয়াফকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পদদলিত হওয়ার আশংকায় হযরত ওমর (রা.) পাথরটি বর্তমান স্থানে এনে রাখেন।

পাথরটি হলুদ লালের মাঝে সাদাটে রংয়ের। পাথরটি প্রায় চতুর্কোণ বিশিষ্ট। ২০ সেন্টিমিটার উঁচু। আগের যুগে পাথরটি একটি রূপার সিন্দুকে রেখে তার উপর (৬×৩=) ১৮ বর্গমিটার বিশিষ্ট একটা গম্বুজ সদৃশ ইমারত নির্মাণ করে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে তওয়াফকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাবেতা আলমে ইসলামীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সৌদী সরকার ১৮/৭/১৩৮৭ হি. মোতাবেক ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ইমারতটা ভেঙ্গে ফেলে এবং কাচের খোল তৈরি করে তার মধ্যে পাথরটি রাখে। কাচের খোলের চতুপার্শে লাগানো হয় লোহার জালি। ১৪১৮ হিজরীতে লোহার জালি সরিয়ে লাগানো হয় পিতলের জালি। তখন এমন কাচ লাগানো হয় যা আঘাতেও ভাঙ্গে না এবং কঠিন তাপও সইতে পারে। এ কাচের মধ্য দিয়ে মাকামে ইব্রাহীম পাথরটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। (تاريخ مكة المكرمة و وصف الكعبة المشرفة)

চিত্র নং ১০২ – মাকামে ইব্রাহীম

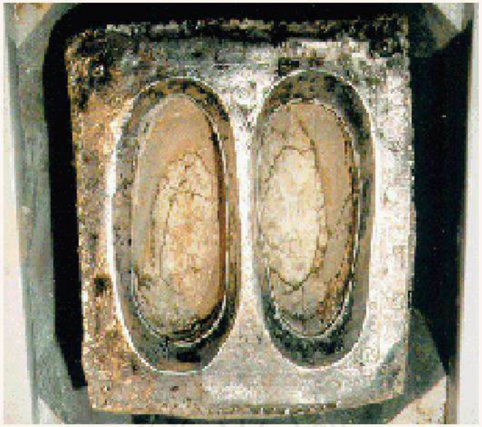

চিত্র নং ১০৩ – হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পদচিহ্নযুক্ত পাথর

● যমযম কুয়া: যমযম কুয়া সৃষ্টির ইতিহাস প্রায় সকল মুসলমানেরই জানা। কা'বা শরীফ থেকে ২১ মিটার পূর্বে কুয়াটির অবস্থান। মাকামে ইব্রাহীম থেকে এর দূরত্ব ১২.৫ মিটার। আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা মোতাবেক কুয়ার গায়ের বিভিন্ন উৎসমুখ থেকে প্রতি সেকেন্ডে ১১ থেকে ১৮.৫ লিটার পানি বের হয়। এভাবে প্রতি মিনিটে তার পরিমাণ কমপক্ষে ৬০×১১= ৬৬০ লিটার এবং ১ ঘণ্টায় ৬৬০×৬০= ৩৯৬০০ লিটার। এই উৎসমুখগুলোর মধ্যে একটি বের হয়েছে হজরে আসওয়াদের দিক থেকে, যার দৈর্ঘ ৭৫ সেন্টিমিটার ও উচ্চতা ৩০ সেন্টিমিটার। এ উৎসমুখ থেকেই সবচেয়ে অধিক পানি নির্গত হয়। আর একটি ৭০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ ও ৩০ সেন্টিমিটার উচ্চতা সম্পন্ন উৎসমুখ রয়েছে আযান দেয়ার জায়গার দিকে। আর কয়েকটি ছোট ছোট উৎসমুখ রয়েছে সাফা পাহাড়ের দিকে।

যমযম কুয়ার পানির স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪ মিটার নিচে। পানির উৎসমুখ (শ্রোত) ১৩ মিটার নিচে এবং কুয়ার গভীরতা ৩০ মিটার। (تاريخ مكة المكرمة)

যমযম কুয়ার উপর ৮.৩×১০.৭= ৮৮.৮১ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে একটা ইমারত বানানো ছিল। মাতাফ (তওয়াফের স্থান)কে প্রশস্ত করার জন্য ১৩৮১–১৩৮৮ হিজরীর মধ্যে ইমারতটা ভেঙ্গে ফেলা হয়। তখন থেকে যমযম পান করার জন্য ভূগর্ভে কুয়ার কাছে গিয়ে পান করার ব্যবস্থা করা হয়। কুয়া থেকে বেশ পূর্বে বর্তমান মাতাফের প্রায় শেষ দিক দিয়ে ভূগর্ভস্থ স্থানে যাওয়ার সিড়ি ছিল। ২৩টি ধাপ নেমে নিচে যেতে হত। নারী পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ছিল। সেখানে বহু সংখ্যক টেপ দিয়ে পানি পান করার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে সকলেই কাচের ঘেরার মধ্যে সহজে কুয়াটি দেখতে পেত। ১৪২৩ হিজরীর হজ্জের পর তাওয়াফের স্থানকে আরও প্রশস্ত করার জন্য ভূগর্ভে কুয়ার কাছে যাওয়ার এ পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

منظر لبئر زمزم حالياً

চিত্র নং ১০৪ – যমযম কুয়া

داخل بئر زمزم

চিত্র নং ১০৫ – যমযম কুয়ার অভ্যন্তর

● **মসজিদে হারাম:** 'মসজিদে হারাম' বলে বুঝানো হচ্ছে কা'বা শরীফের চতুর্দিকস্থ মসজিদকে। এই মসজিদ শুরু থেকে ছিল না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে ঘোরানো এই মসজিদে হারাম ছিল না। চতুর্দিকে ছিল বসতবাড়ি। হযরত ওমর (রা.)–এর যুগে মুসল্লী-দের স্থান সংকুলানের অভাব বোধ হওয়ায় তিনি আশপাশের বাড়ি-ঘর ক্রয় করে মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বাইতুল্লাহর পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে মসজিদে হারামের ইমারত নির্মাণ করেন। দক্ষিণ দিকে প্রচণ্ড শ্রোতবাহী একটা উপত্যকা (ওয়াদি ইব্রাহীম) থাকায় তিনি এদিকে নির্মাণ কাজ করতে পারেননি। পরবর্তীতে আব্বাসী খলীফা মাহ্দী (মৃত–১৬৯ হি.) প্রচুর অর্থ ব্যয় করে দক্ষিণ দিকে মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হন। এর পর যুগে যুগে অনেকের দ্বারা মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ ঘটেছে। আব্বাসী খলীফা মাহ্দীর কর্ম এত মজবূত ছিল যে, সুদীর্ঘ আটশত দশ বৎসর পর্যন্ত (অর্থাৎ, ১৬৯ হি. মোতাবেক ৭৮৫ খৃ. থেকে ৯৭৯ হি. মোতাবেক ১৫৭১ খৃ. পর্যন্ত) তা স্থায়ী থাকে। ৯৭৯ হি. মোতাবেক ১৫৭১ খৃস্টাব্দে মসজিদে হারামের পূর্ব দিকের ছাদে ফাটল দেখা দেওয়ায় তুর্কী সুলতান সালীম উছমানী মসজিদে হারাম পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। সেমতে ৯৮০ হি. মোতাবেক ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তার পুত্র সুলতান মুরাদের যুগে (৯৮৪ হি. মোতাবেক ১৫৭৬ খৃ.) সমাপ্ত হয়। এটাকেই তুর্কী নির্মাণ বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এই নির্মাণে মসজিদে হারামের পরিধিতে সম্প্রসারণ ঘটেনি। এরপর বাদশাহ ফাহাদের যুগে (১৪০৯ হি./১৯৮৮ খৃ.) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ হয়। তারপর বাদশাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আযীয-এর যুগে (২০০৫–২০১৫) উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ হয় এবং মাতাফও বড় করা হয়। বর্তমানে (২০১৯ ইং সনে) বাদশাহ সালমানের যুগে এই সম্প্রসারণের কাজ পরিসমাপ্তি লাভ করছে।

যুগে যুগে যাদের দ্বারা মসজিদে হারামের পরিধিতে সম্প্রসারণ ঘটেছে নিম্নে তাদের একটা তালিকা প্রদান করা হল।

ক্রমিক নং	যাদের দ্বারা সম্প্রসারণ ঘটেছে	সম্প্রসারণকাল (শুরু)
১	হযরত ওমর (রা.)	১৭ হি./৩৯ খৃ.
২	হযরত উছমান (রা.)	২৬ হি./৬৪৮ খৃ.
৩	আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)	৬৫ হি./৬৮৫ খৃ.
৪	আবূ জাফর মানসূর আব্বাসী	১৩৯ হি.
৫	ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক	১৩৭ হি./৭৫৫ খৃ.
৬	মুহাম্মাদ মাহ্দী আব্বাসী	১৬০ হি./৭৭৭ খৃ.
৭	মু'তাযিদ বিল্লাহ আব্বাসী	২৮৪ হি./৮৯৭ খৃ.
৮	মুক্বতাদির বিল্লাহ আব্বাসী	৩০৬ হি./৯১৮ খৃ.
৯	শাহ সুউদ বিন আব্দুল আযীয	১৩৭৫ হি./১৯৫৫ খৃ.
১০	ফাহাদ বিন আব্দুল আযীয	১৪০৯ হি./১৯৮৮ খৃ.
১১	বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয	২০০৫–২০১৫ খৃ.

(تاريخ مكة المكرمة و في خدمة ضيوف الرحمن)

বর্তমানে (২০১৯ ইং সনে) মসজিদে হারামে (প্রথম তলা, দ্বিতীয় তলা, ছাদ, আণ্ডারগ্রাউন্ড এবং চত্বরসহ) ভিড়ের সময় একসঙ্গে ১৮/১৯ লক্ষ মুসল্লী নামায আদায় করতে পারেন।

চিত্র নং ১০৬ – মসজিদে হারাম (২০১৯ সাল)

● **মাতাফ:** 'মাতাফ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে কা'বা শরীফের চতুর্দিকস্থ খোলা আঙিনা, যেখানে তওয়াফের চক্কর লাগানো হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) সর্বপ্রথম মাতাফকে পাকা করেন। যা আনুমানিক ৫ মিটার প্রশস্থ ছিল। পরবর্তীতে যুগে যুগে এটি প্রশস্থ হতে হতে সর্বশেষ ১৩৭৫ হিজরী-তে ৪০ থেকে ৫০ মিটার প্রশস্থ করে মাতাফকে গোল আকৃতির করে দেয়া হয়। প্রথম দিকে চতুর্দিকস্থ মসজিদে হারাম থেকে মাতাফে আসার জন্য বহু রাস্তা ছিল, এসব রাস্তা তুলে দেয়া হয়। মিম্বর ও আযানের স্থানও মাতাফ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। মাকামে ইব্রাহীম (দ্রষ্টব্য) ও যমযম কুয়া (দ্রষ্টব্য)–-এর উপর নির্মিত ইমারতও অপসারণ করা হয়। এভাবে মাতাফের স্থান মুক্ত ও প্রশস্থ হয়ে যায়। সর্বশেষ সম্প্রসারণের সময় মাতাফে এমন উন্নতমানের পাথর লাগানো হয় যা রোদের তাপ সইতে পারে, সর্বদাই ঠাণ্ডা থাকে। ফলে তওয়াফকারীগণ প্রচণ্ড রোদের সময়ও খালি পায়ে তওয়াফ করতে পারেন। বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয (২০০৫–২০১৫ ইং)-এর আমলে সর্বশেষ মাতাফকে বড় করা হয়।

চিত্র নং ১০৭ – মাতাফে মানুষ তাওয়াফ রত

১৩. জাবালে ছওর ও গারে ছওর

জাবালে ছওর মসজিদে হারাম থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটা পাহাড়। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৭৪৮ মিটার এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৪৫৮ মিটার। সাধারণভাবে এ পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঠতে সময় লাগে দেড় ঘণ্টা। হিজরতের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)সহ তিন রাত এ পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। সে গুহাকে বলা হয় 'গারে ছওর'। গুহাটির মধ্যে উচ্চতা ১.২৫ মিটার এবং দৈর্ঘ-প্রস্থ ৩.৫⊠৩.৫ মিটার। গুহাটির পশ্চিম দিকে একটি মুখ আছে, যে মুখ দিয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করেছিলেন। এ মুখটি তৎকালীন যুগে অত্যন্ত সংকুচিত ছিল, যার ফলে তা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হলে শুয়ে প্রবেশ করতে হত। পরবর্তীতে হিজরী নবম শতাব্দি থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দি পর্যন্ত সময়ে ক্রমান্বয়ে এটিকে বেশ প্রশস্ত করা হয়েছে। এ গুহার আর একটা দরজা আছে পূর্ব দিকে। এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে ছিল না, পরবর্তীতে মানুষের প্রবেশ ও বের হওয়ার সুবিধার্থে বানানো হয়েছে। (تاريخ مكة المكرمة)

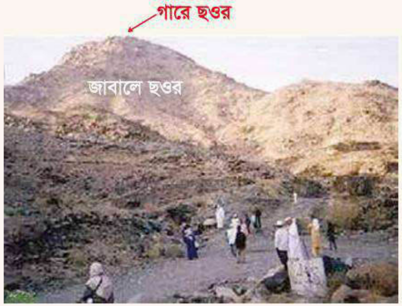

চিত্র নং ১০৮ – জাবালে ছওর

গারে ছওরের মুখ (সামনের দিক)

গারে ছওরের অভ্যন্তর

চিত্র নং ১০৯ – গারে ছওর

১৪. জাবালে নূর ও গারে হেরা

মসজিদে হারাম থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটা পাহাড়ের নাম জাবালে নূর। এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহাকে বলা হয় 'গারে হেরা' বা হেরা গুহা। নবুয়ত লাভের পূর্বে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এখানেই সর্বপ্রথম ওহী নাযেল হয়েছিল।

পাহাড়টা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৬২১ মিটার ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ২৮১ মিটার উচুঁ। ভূমি থেকে পাহাড়ের চূড়ার উঠতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। গুহার উত্তর দিকে গুহার মুখ। গুহার মধ্যে উচ্চতা ২ মিটার। গুহাটির দৈর্ঘ ৩ মিটার। প্রস্থ কোথাও কম কোথাও বেশি। সর্বোচ্চ প্রস্থ ১.৩০ মিটার। গুহাটির মধ্যে দুজন মানুষ আগে পিছে হয়ে নামায পড়তে পারে। ডান দিকেও সামান্য একটু জায়গা আছে যেখানে একজন মানুষ বসে নামায পড়তে পারে। (تاريخ مكة المكرمة)

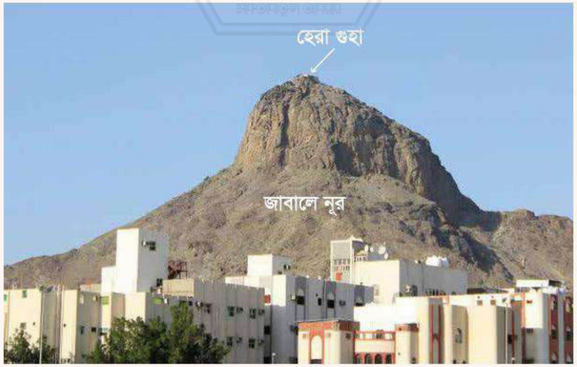

চিত্র নং ১১০ – জাবালে নূর

চিত্র নং ১১১ – হেরা গুহা

১৫. আরাফার ময়দান

আরাফাত মসজিদে হারাম থেকে দক্ষিণ পূর্বে হারামের সীমানার বাইরে অবস্থিত একটা বিশাল ময়দান। ৯ই যিলহজ্জ এই আরাফাতে অবস্থান করা হজ্জের প্রধানতম ফরয। এ ময়দানের সবদিকে সীমানা নির্দেশক সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে। যে সাইনবোর্ডগুলোর ভিতরের দিকে আরবীতে লেখা আছে 'নিহায়াতু আরাফাত' (আরাফাতের সীমানা শেষ) আর বাইরের দিকে লেখা আছে 'বিদায়াতু আরাফাত' (আরাফাতের সীমানা শুরু)।

উল্লেখ্য, তরীকুল মুশাত (হাঁটা পথ) দিয়ে আরাফাতের দূরত্ব:

মক্কা–আরাফাত	১৭ কি. মি.।
জামারাত–আরাফাত	১৩ কি. মি.।
মিনার পূর্ব দিকের শেষ সীমানা–আরাফাত	৯.৮ কি. মি.।
মুযদালিফার পূর্ব দিকের শেষ সীমানা–আরাফাত	৬ কি. মি.।

'আরাফাত' শব্দের অর্থ পরিচিতি। এক বর্ণনামতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাত থেকে পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবতরণের পর এ ময়দানে দু'জনের মধ্যে সাক্ষাত ও পরিচিতি ঘটেছিল বলে এ ময়দানকে আরাফার ময়দান বলা হয়। (القاموس المحيط)

তাবারানী কাবীর ও মুসনাদে আহমদ কিতাবে উল্লেখিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে (হজ্জের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেয়ার পর) এখানে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ও যাবতীয় স্থানের পরিচিতি লাভ করেছেন কি? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ থেকেই এখানের নাম হয় আরাফাত। (قال الهيثمي : ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ج/٣ باب رمي الجمار)

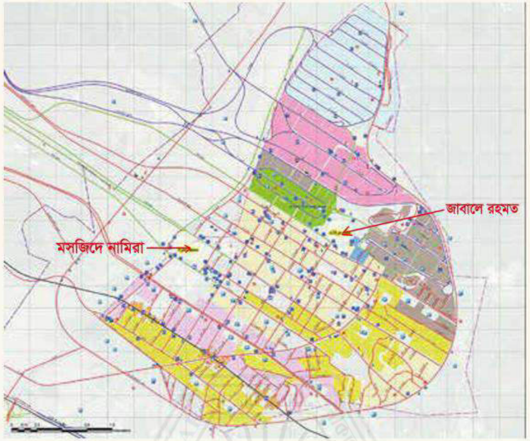

চিত্র নং ১১২ – আরাফাত-এর মানচিত্র

চিত্র নং ১১৩ – আরাফাত-এর ছবি

১৬. মসজিদে নামিরা

আরাফার মসজিদের নাম হল মসজিদে নামিরা। আরাফার ময়দানের পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে এ মসজিদ। মসজিদের পশ্চিম পাশে ছোট্ট একটি পাহাড় রয়েছে, যার নাম নামিরা। এ প্রেক্ষিতেই এ মসজিদের নাম হয়েছে মসজিদে নামিরা। আরাফার দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাঁবু

এখানেই স্থাপন করা হয়েছিল। সূর্য ঢলার পর তিনি এরই নিকটবর্তী ওয়াদি উরানা (উরানা উপত্যকা)–য় হজ্জের খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন এবং নামাযের ইমামত করেন। এটাই হল বিদায় হজ্জের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভাষণ।

যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা প্রদান করেন এবং ইমামত করেন, সেখানেই দ্বিতীয় হিজরী শতকে এই মসজিদ (মসজিদে নামিরা) নির্মাণ করা হয়। এই উপত্যকাটি (ওয়াদি উরানা) আরাফার সীমানার বাইরে, ফলে এখানে নির্মিত মসজিদটিও আরাফার সীমানার বাইরে ছিল। পরবর্তীতে মসজিদটি পেছন দিকে প্রশস্ত হতে থাকে। এভাবে মসজিদের পিছনের অংশ আরাফার সীমানার মধ্যে বিস্তৃত হয়। একারণেই মসজিদে নামিরার কিছু অংশ (পুরাতন অংশ) আরাফার সীমানার বাইরে আর কিছু অংশ আরাফার সীমানার মধ্যে পড়েছে। মসজিদের ভেতরে দুই সীমানার মাঝে বোর্ড ঝুলানো রয়েছে, যাতে লেখা আছে 'এখান থেকে আরাফার সীমানার বাইরে।' যাতে জোহর ও আসরের নামায একসঙ্গে আদায় করার পর আরাফার বাইরের অংশে নামায আদায়কারী হাজীগণ পিছে সরে আরাফার সীমানার মধ্যে এসে উকূফে আরাফা করতে পারেন। বর্তমানে (২০১৯ সালে) মসজিদের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দৈর্ঘ ৩৪০ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে প্রস্থ ২৪০ মিটার। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক এতে নামায আদায় করতে পারেন। (تاريخ مكة المكرمة)

ছবি নং ১১৪ – মসজিদে নামিরা

১৭. জাবালে রহমত

মসজিদে নামিরা থেকে দেড় কিলোমিটার পূর্ব দিকে (আরাফার ময়দানের পূর্ব দিকে বর্তমান ৭ ও ৮ নং সড়কের মাঝে) রয়েছে জাবালে রহমত। এটি কঠিন পাথরের চাঁই বিশিষ্ট ছোট একটি পাহাড়। পাহাড়টি সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৩৭২ মিটার এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬৫ মিটার উঁচু। এই পাহাড়ের উপরিভাগের সমতল স্থানে ৮ মিটার উঁচু একটি চতুষ্কোণী পিলার রয়েছে, যা দেখে দূর থেকে পাহাড়ের

অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। পাহাড়টির আরও কয়েকটা নাম রয়েছে। যথা:– ইলাল (إلال), নাবিত (نابت) ও কুরাইন (قُرين)।

বিদায় হজ্জে আরাফার দিন শুক্রবার এই পাহাড়ের পাদদেশে একটু উঁচুতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থান করেছিলেন। ওয়াদী উরানায় (মসজিদে নামিরার সামনের অংশের স্থলে) হজ্জের খুতবা প্রদান ও নামাযের ইমামত করার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাসওয়া নামক উটনীতে আরোহণ করে জাবালে রহমতের কাছে চলে আসেন এবং এর পাদদেশে ডান দিকে (দক্ষিণ দিকে) একটু উঁচুতে উক্ত উটনীর উপর আরোহণ করা অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুআ ইত্যাদিতে মশগুল থাকেন। (صحيح مسلم، كتاب الحج) এখানেই সূরা মায়িদার প্রসিদ্ধ এই আয়াতটি নাযিল হয়–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম। (সূরা মায়িদা: ৩)

চিত্র নং ১১৫ – জাবালে রহমত (যার মাঝখানে একটি সাদা স্তম্ভ)

১৮. নহ্‌রে যুবাইদা

এটা একটা পানির নহর (ড্রেন)। আব্বাসী খলীফা হারূনুর রশীদ (মৃত ১৭৪ হি./৭৯১ খৃ.)-এর স্ত্রী যুবাইদা মসজিদে হারাম থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হুনায়ন এলাকার ওয়াদি না'মান (না'মান নামক একটি উপত্যকা) থেকে মক্কা মুকাররমায় পানি আনার জন্য এ নহর বা ড্রেনটা তৈরি করেন। আরাফার জাবালে রহমতের পাদদেশ হয়ে ওয়াদী উরানা হয়ে মিনার নিচু এলাকা হয়ে নহরটা মক্কা মুকাররমায় এসেছিল। প্রায় বারশত বৎসর যাবত মক্কাবাসীরা এই নহরের পানি দ্বারা উপকৃত হন। (تاريخ مكة المكرمة) আরাফা এলাকা থেকে বের হওয়ার একটি পথের পাশে এখনও এই নহরের দেয়ালের কিছু নমূনা দেখতে পাওয়া যায়। দেখুন ছবি–

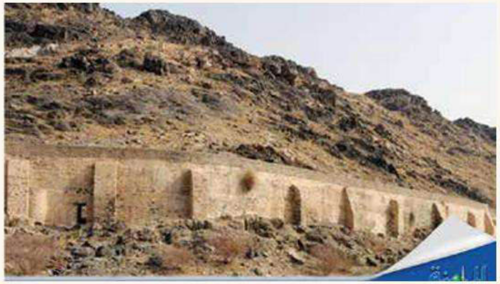

চিত্র নং ১১৬ – নহরে যুবাইদার নমুনা

১৯. মুযদালিফার ময়দান

এটা মিনার পূর্ব দিকে মিনার সঙ্গে লাগোয়া একটা ময়দান। মসজিদে হারাম থেকে হাঁটা পথে ৭.২ কিলোমিটার দূরে। ময়দানটার পূর্ব পশ্চিমের দৈর্ঘ ৩.৮ কিলোমিটার। পুরো ময়দানের আয়তন ১২.২৫ বর্গ কি. মি.। মুযদালিফা অঞ্চল হারামের সীমানার অন্তর্গত। মুযদালিফা ময়দানের চতুর্দিকে সীমানা নির্দেশক বোর্ড লাগানো আছে।

মুয্‌দালিফা শব্দের অর্থ নিকটবর্তী বা রাতের অংশ। সম্ভবত ময়দানটা মিনার নিকটবর্তী হওয়ায় বা হাজীগণ এখানে রাতের এক অংশে আগমন করেন বিধায় এর নাম হয়েছে মুয্‌দালিফা। (القاموس المحيط) হতে পারে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) দুনিয়ায় অবতরণের পর এখানেই একে অপরের নিকটবর্তী হয়েছিলেন, এ কারণেই এমন নামকরণ হয়েছে। (تاريخ مكة المكرمة)

জাহিলী যুগের লোকেরা এখানে জড় হয়ে বংশীয় গৌরবগাথা ও বীরত্ব বর্ণনায় লিপ্ত হত। ইসলাম তার পরিবর্তে এখানে জড় হয়ে যিক্‌র তথা আল্লাহ্‌র বড়ায়ী বর্ণনা করার শিক্ষা দিয়ে সেই কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেছে। (احکام اسلام عقل کی نظر میں)

ছবি নং ১১৭ – মুযদালিফার ময়দান-এর একাংশ

২০. মুযদালিফার মসজিদ

মুযদালিফা ময়দানের এক প্রান্তে রয়েছে ‘মসজিদে মাশআরুল হারাম’। যাকে সহজ পরিচয়ে ‘মুযদালিফার মসজিদ’ বলা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফা থেকে এসে এই মসজিদের স্থানে মাগরিব ও ইশার নামায একসঙ্গে আদায় করেছেন। পরবর্তীতে এখানে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান ছিল বর্তমান মসজিদের কেবলার দিকে। (تاريخ مكة المكرمة)

মসজিদটার আয়তন ৫০৪০ বর্গমিটার। এ মসজিদে একসঙ্গে ১২ হাজারের অধিক মুসল্লী নামায আদায় করতে পারেন। (أيضا)

মসজিদে মাশআরুল হারাম থেকে মসজিদে খায়ফের দূরত্ব ৫ কি. মি. আর মসজিদে নামিরার দূরত্ব ৭ কি. মি.। (أيضا)

www.alriyadh.com

চিত্র নং ১১৮ – মুযদালিফার মসজিদ

২১. মিনা

মিনা মক্কা থেকে পূর্ব দিকে একটা পাহাড় ঘেরা ময়দানের নাম, যেখানে হজ্জের সময় হাজীগণ ৮, ১০, ১১ ও ১২ যিলহজ্জ এবং কেউ কেউ ১৩ যিলহজ্জও অবস্থান করেন। বর্তমানে এটাকে ময়দান মনে হয় না। গোটা ময়দান অসংখ্য ফায়ারপ্রুফ তাঁবু দিয়ে ঘেরা। ময়দানের চতুর্দিকে সীমানা নির্দেশক বোর্ড লাগানো আছে।

মসজিদে হারাম থেকে মিনার দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। পায়ে হাঁটা পথ (সুড়ং পথ) দিয়ে ৪ কিলোমিটার। ময়দানটা পূর্ব পশ্চিমে সোয়া তিন কিলোমিটার দৈর্ঘ্য। এ ময়দানের পূর্বপাশেই মুযদালিফা।

‘মিনা’ শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া। হাজীগণ এখানে কুরবানী করেন, এতে রক্ত প্রবাহিত হয়। এ হিসাবে এর নামকরণ হয়েছে মিনা। একমতে আরবগণ লোক সমবেত হওয়ার স্থানকে মিনা বলে থাকে। সে হিসাবে এখানে হজ্জের সময় লোক সমবেত হয় বিধায় এখানকে মিনা বলা হয়।

এই মিনাতেই রয়েছে মসজিদে বাই‘আত, যার সঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ ইতিহাস জড়িত রয়েছে। (দেখুন শিরোনাম ‘মসিজদে বাই‘আতে আকাবা।) এই মিনাতেই আরও রয়েছে জামারাত ও মসজিদে খায়ফ, যার রয়েছে আকর্ষণীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য। (সামনে পড়ুন।)

চিত্র নং ১১৯ – তাঁবুঘেরা মিনার ময়দান-এর একাংশ

২২. মসজিদে খায়ফ

মিনার পশ্চিম দিকে রয়েছে মসজিদে খায়ফ। মসজিদটা ময়দানের দক্ষিণ পাশের পাহাড়ের পাদদেশে জামরাতুস্ সুগ্‌রার কিছুটা পূর্বে অবস্থিত। এ মসজিদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ অনেক নবী নামায পড়েছেন। (تاريخ مكة المكرمة)

মুসনাদে বায্‌যার কিতাবে হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এসেছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মসজিদে খায়ফে ৭০ জন নবীর কবর রয়েছে। (قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات. مجمع الزوائد كتاب الحج ـ باب في مسجد الخيف)

www.alriyadh.com

চিত্র নং ১২০ – মসজিদে খায়ফ

২৩. জামারাত

মিনা ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে শয়তানের উদ্দেশে কংকর নিক্ষেপের ৩টা স্থান রয়েছে, এগুলোকে বলা হয় জামারাত। 'জামারাত' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হল জামরাহ। জামরাহ অর্থ ছোট্ট পাথর বা কংকর। পশ্চিম দিক থেকে ৩টা জামরাহ যথাক্রমে (১) জামরাতুল কুবরা বা বড় জামরা। এটাকে জামরাতুল আক্বাবাও বলা হয়। (সাধারণ মানুষ এটাকে বড় শয়তান বলে থাকে।) (২) জামরাতুল উস্‌ত্বা বা মধ্যম জামরা, (সাধারণ মানুষ এটাকে মেজ শয়তান বলে থাকে।) (৩) জামরাতুস্ সুগ্‌রা বা ছোট জামরা (সাধারণ মানুষ এটাকে ছোট শয়তান বলে থাকে)। হজ্জের সময় এসব স্থানে কংকর নিক্ষেপের সুবিধের জন্য এই তিনটা জামরা ঘিরে বিশাল ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে গ্রাউন্ডফ্লোরসহ মোট ৪ তলা থেকে কংকর নিক্ষেপ করা যায়।

জামরাতুল কুবরা থেকে জামরাতুল উস্‌ত্বার দূরত্ব ২৪৭ মিটার। আর জামরাতুল উস্‌ত্বা থেকে জামরাতুস্ সুগ্‌রার দূরত্ব ২০০ মিটার। (تاريخ مكة المكرمة)

তাবারানী কাবীর ও মুসনাদে আহমদ কিতাবে উল্লেখিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে হজ্জের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে জামরাতুল আক্বাবার কাছে নিয়ে যান তখন শয়তান হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সামনে দৃশ্যমান হলে তিনি তাকে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। ফলে সে সরে যায়। তারপর জামরাতুল উসতার কাছে দৃশ্যমান হলে তিনি আবার ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। এখানেই তিনি পুত্রকে যবেহ করার জন্য (কাত করে) শুইয়েছিলেন। ...। (قال الهيثمي: ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ج/٣ باب رمي الجمار) আর এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী জামরাতুস সুগরার স্থানে আবার শয়তান দৃশ্যমান হলে তিনি আরও ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন।

এই তিনটা জামারাতের পিলারের নিচের দিকে যে দেয়াল ঘেরা গোলাকার বেষ্টনী রয়েছে এই বেষ্টনী বানানো হয় ১২৯২ হিজরীতে। এর উদ্দেশ্য ছিল ভিড়ের সময় কংকর নিক্ষেপের স্থানকে প্রশস্থ করা, সেই সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষিপ্ত কংকরসমূহ যাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষের অধিক কষ্টের কারণ না ঘটে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মেজ ও ছোট জামরার বেষ্টনী পূর্ণ গোলাকার হলেও বড় জামরার নিচের বেষ্টনী অর্ধ গোলাকার। এর কারণ হল বড় জামরাটা মূলত একটা পাহাড়ের গায়ে ছিল, যার ফলে জামরাটাতে শুধু মাত্র দক্ষিণ দিক থেকেই কংকর নিক্ষেপ করা হত। ভিড়ের কারণে স্থানটা প্রশস্থ করার জন্য যখন সেই (প্রায় ১০০ মিটার উঁচু) পাহাড়টা ভেঙ্গে অপসারণ করা হয়, তখন বেষ্টনীটাকে অর্ধ গোলাকারই রাখা হয়, যাতে পূর্বের ন্যায় এখনও এই জামরাতে এক দিক থেকেই কংকর নিক্ষেপ করা হয়। (تاريخ مكة المكرمة) তবে উল্লেখ্য, পরবর্তীতে বেষ্টনী গোলাকার করা হয়। এখন উত্তর দিক থেকেও কংকর নিক্ষেপ করা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, বর্তমানে জামারাতের পিলারগুলো যত চওড়া দেখা যায় তা ২০০৬-এর পর করা হয়েছে। এর পূর্বে পিলারগুলো সরু ছিল।

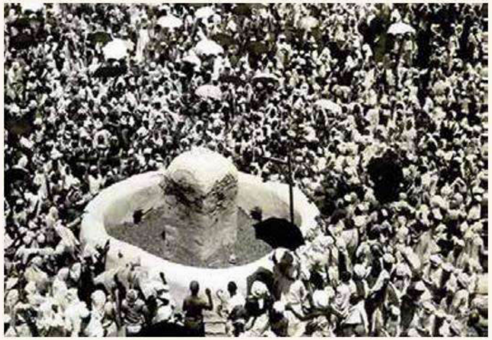

চিত্র নং ১২১ – সাবেক জামারাতের চিত্র

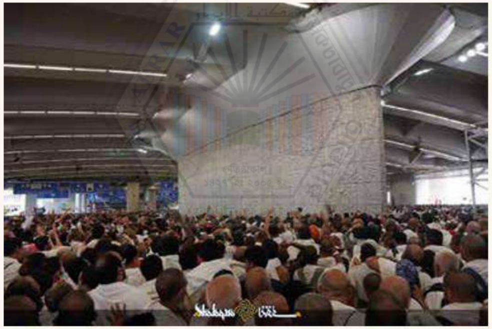

চিত্র নং ১২২– বর্তমান জামারাতের চিত্র

২৪. মসজিদে বাই'আতে আক্বাবা

এ মসজিদটি মিনায় জামারাতের উত্তর দিকে অবস্থিত। জামরাতুল কুবরা বা বড় শয়তান থেকে ৩০০ মিটার দূরত্বে। মক্কা থেকে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করতে আগমনকারী ব্যক্তি বা ঐ দিক থেকে আগমনকারী ব্যক্তি জামারাতের ৩য় তলায় উঠতে উত্তর দিকের পুল ব্যবহার করলে কিছু দূর উঠার পর বাম দিকে তাকালেই মসজিদটি দেখতে পাবেন। মসজিদটি ঐ স্থানে নির্মিত হয়েছে যেখানে মদীনার কতিপয় আনসারী সাহাবী নবুয়তের দ্বাদশ সনে (৬২১ খৃষ্টাব্দে) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর দস্ত মুবারকে বাই'আত হয়েছিলেন। যার মধ্যে আউস ও খাযরাজ গোত্রের ১২ ব্যক্তি শরীক ছিলেন। পরবর্তী বছর এখানেই বাই'আত হন আনসারদের ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী। এটাকে

বলে বাইআতে আক্বাবায়ে ছানিয়া (পাহাড়িয়া ঘাটিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাইআত) বা বাইআতে আক্বাবায়ে কুব্‌রা। এবার আনসারগণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মদীনা যাওয়ার দাওয়াতও দেন। এর ৩ মাস পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করেন।

১৪৪ হিজরী মোতাবেক ৭৬১ খৃষ্টাব্দে আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর মানসূর এখানে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন যুগে মসজিদটির সংস্কার হতে থাকে। বর্তমানে (২০১২ ইং) চুন ও পাথরের যে নির্মাণ দেখা যাচ্ছে তা তুর্কী আমলের। (تاريخ مكة المكرمة)

চিত্র নং ১২৩ – মসজিদে বাই'আতে আক্বাবা

২৫. ওয়াদী মুহাছ্‌ছার

মিনার পূর্ব পাশে লাগোয়া মুযদালিফার ময়দান। মাঝখানে শুধু একটা ওয়াদি বা উপত্যকার ব্যবধান। এই ওয়াদির নাম ওয়াদি মুহাছ্‌ছার। দুই ময়দানের মাঝে উত্তর দক্ষিণে এঁকে বেঁকে এই ওয়াদিটার অবস্থান। এই ওয়াদির পশ্চিম পাশে মিনার শেষ সীমান্তে বোর্ড রয়েছে যা মিনার সীমানা জ্ঞাপন করে। আবার কয়েক গজ দূরে পূর্ব দিকে অনুরূপ আরও বোর্ড রয়েছে যা মুযদালিফার সীমানা জ্ঞাপন করে। মিনা ও মুযদালিফার সীমানা নির্দেশক এই দুই বোর্ডের মাঝখানের স্থান হল ওয়াদি মুহাছ্‌ছার। এটা সেই স্থান, যেখানে আবরাহা বাদশার হস্তিবাহিনী আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়েছিল। ঘটনাটা প্রসিদ্ধ। সূরা ফীলে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে। স্থানটা আযাবের স্থান হওয়ায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত এ স্থান পার হয়েছিলেন। হাজীদের জন্যও তাই এ স্থানটুকু দ্রুত পার হওয়া সুন্নাত। ওয়াদি মুহাছ্‌ছার হারাম এলাকার অন্তর্ভুক্ত হলেও এ স্থানটুকু মাশআর (যে স্থানের সম্মান করা হয়) নয়।

২৬. মুহাস্‌সাব

এটা মক্কার একটা স্থান। জান্নাতুল মুআল্লার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এখানে কুরায়শ ও বনূ কিনানা গোত্রের লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ বনু মুত্তালিব ও বনু হাশেমকে মক্কা থেকে বের করে আনার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বনূ মুত্তালিব ও বনূ হাশেম শি'আবে আবী তালিবে (যাকে শি'আবে আলী এবং শি'আবে বনূ হাশেমও বলা হয়।) অন্তরীণ হয়ে পড়েন।

বর্তমানে মুহাস্‌সাব এলাকার নাম মুআবাদা। এ স্থানের প্রাচীন অনেকগুলো নাম ছিল। সেগুলো হল- আব্‌তাহ, বাত্‌হা, বাত্‌নে মুহাস্‌সাব ও খায়ফে বনী কিনানা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে মিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায এখানে আদায় করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের পরও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে অবস্থান করেছিলেন। বর্তমানে সেখানে একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটির নাম মসজিদে মুহাস্‌সাব। মসজিদে মুআবাদা তথা মুআবাদার মসজিদও বলা হয়। 'মসজিদে খায়ফে বনী কিনানাহ'ও বলা হয়।

চিত্র নং ১২৪ – মুআবাদার মসজিদ

২৭. মসজিদে তানঈম/মসজিদে আয়েশা

এ মসজিদটি মসজিদে হারাম থেকে উত্তর দিকে মদীনা রোডে মসজিদে হারাম থেকে ৭.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। হারাম এলাকার সবচেয়ে নিকটবর্তী সীমানা এটি। মসজিদটি ঐ স্থানে নির্মিত যেখান থেকে ৯ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় হযরত আয়েশা (রা.) উমরার এহ্‌রাম বেঁধে উমরা করেছিলেন। হাজীগণ সাধারণত এখানে গিয়ে এহরাম বেঁধে এসে উমরা করে থাকেন। এটিকে মসজিদে তানঈম বা মসজিদে আয়েশা বলা হয়। মসজিদটির আয়তন ৬ হাজার বর্গমিটার। এতে একসঙ্গে ১৫ হাজার লোক নামায আদায় করতে পারে। (تاريخ مكة المكرمة)

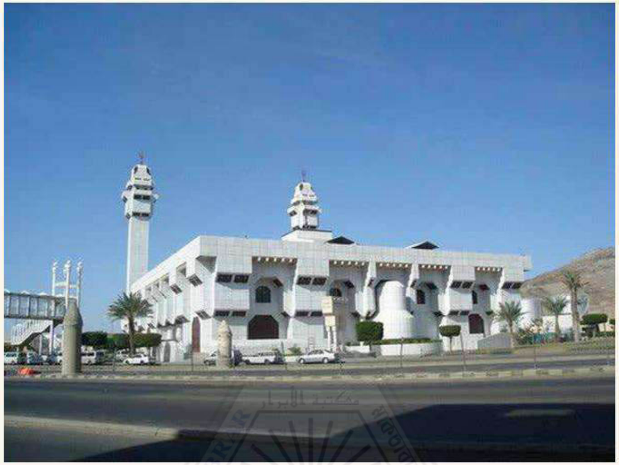

চিত্র নং ১২৫ – মসজিদে তানঈম বা মসজিদে আয়েশা

২৮. হযরত খুবায়ব (রা.)–এর শাহাদাতের স্থান

মসজিদে আয়েশা থেকে প্রায় ২০০ মিটার উত্তরে হিল্ (হারামের সীমানার বাইরের অঞ্চল)-এর দিকে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত খুবায়ব (রা.)-এর শাহাদাতের স্থান। তার শাহাদাতের ঘটনা মর্মবিদারক ঘটনা। তার শাহাদাতের স্থানে টাওয়ারের মত একটা মিনারা বানিয়ে রাখা হয়েছিল, ১৩৭৭ হিজরী পর্যন্ত সেটা ছিল, তারপর তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। (تاريخ مكة المكرمة)

২৯. মসজিদে ফাতাহ

জুমূম নামক স্থানে রয়েছে মসজিদে ফাতাহ। এ মসজিদটি তরীকুল হিজরায় (মদীনা রোডে) মসজিদে আয়েশা থেকে ১৮ কি. মি. (তাহলে মসজিদের হারাম থেকে ২৫ কি. মি.) উত্তরে অবস্থিত। এই জুমূম এলাকায় বনূ সালীম গোত্র বাস করত। ৬ষ্ট হিজরীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারিছার নেতৃত্বে একটি দলকে বনূ সালীমের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের অভিযানে গমনের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় ১০ হাজার সাহাবাসহ এখানে অবস্থান করেছিলেন। তখন বনূ সালীম গোত্রের বহু লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হন। এখানেই হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। জুমূমের যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থান করেছিলেন এবং নামায আদায় করেছিলেন সেখানেই পরবর্তীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, যার নাম মসজিদে ফাতাহ। তরীকুল হিজরা দিয়ে গমনের সময় এ মসজিদের সাদা উঁচু মিনারা দৃষ্টিগোচর হয়। (تاريخ مكة المكرمة)

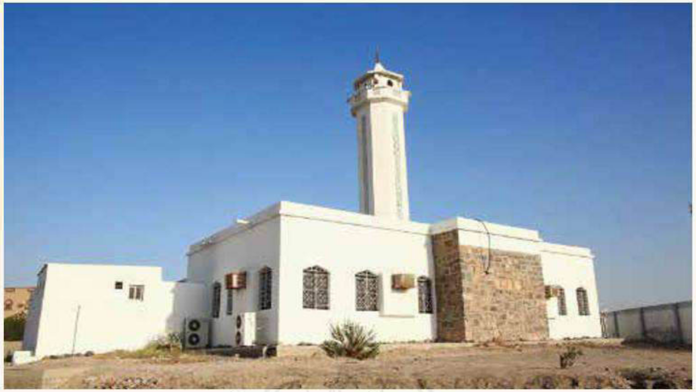

চিত্র নং ১২৬ – মসজিদে ফাতাহ

৩০. সারিফ

‘সারিফ’ একটা স্থানের নাম, যেখানে ৭ম হিজরী সনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়মূনা (রা.)কে বিয়ে করেন এবং কিছু সময় অবস্থান করেন। আবার এখানেই (বাসর-ঘর-পালন-করা সেই গৃহেই) ৫১ হিজরীতে হযরত মায়মূনা (রা.)-এর ওফাত হয় এবং এখানেই তাকে দাফন করা হয়। কবরটি তরীকুল হিজরায় (মদীনা রোডে) মক্কা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে মক্কার দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার ডান পাশে এবং মদীনার দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার বাম পাশে অবস্থিত।

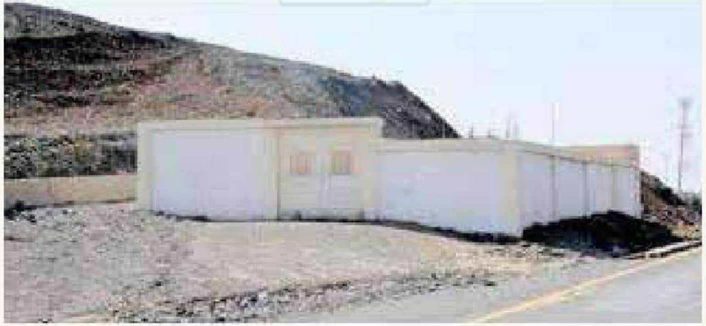

চিত্র নং ১২৭ – হযরত মায়মূনা (রা.)-এর কবর

গোল্ডেন রেশিও এবং কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি কি না– এ প্রসঙ্গ

'গোল্ডেন রেশিও' (Golden ratio) অর্থ সোনালী অনুপাত/স্বর্ণানুপাত। এটা হচ্ছে একটা চমৎকার গাণিতিক অনুপাত যা কোন চিত্রকর্ম, স্থাপত্যকলা ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা হলে সেই চিত্রকর্ম ও স্থাপত্যের চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পায়। মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল, আইফেল টাওয়ার, হোয়াইট হাউজ ইত্যাদিতে এই 'গোল্ডেন রেশিও' তথা সোনালী অনুপাতের প্রয়োগ ঘটেছে বলেই বোদ্ধাদের কাছে এগুলোর চমৎকারিত্বই ভিন্ন। এতে নাকি আরকিটেকচারাল ডিজাইনের সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্যামিতির অনেক কিছুতেও এই গোল্ডেন রেশিও-এর প্রয়োগ থাকে। অনেকে সৃষ্টির মধ্যে গাছপালা, ফল-ফুল, বিভিন্ন প্রাণী, মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি উর্দ্ধ জগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র ও গ্যালাক্সি (ছায়াপথ)-এর বাহুগুলোর মাঝেও এই গোল্ডেন রেশিও বা সোনালী অনুপাত রক্ষা হয়েছে বলে দেখিয়ে থাকেন। এমনকি শামুকের খোলস, ঘুর্ণিঝড়ের ঘুর্ণন, বৃক্ষের কাণ্ড-বিন্যাস, ফল, ফুল ইত্যাদিতেও এই গোল্ডেন রেশিও বা সোনালী অনুপাত রক্ষা হয়েছে বলে দেখিয়ে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ মানুষের মাথা থেকে পা পর্যন্ত অংশের মধ্যে মাথা থেকে নাভি এবং নাভি থেকে পা পর্যন্ত যে মানটি পাওয়া যাবে তা হল ১.৬১৮ অর্থাৎ, সোনালী অনুপাত। কনুই থেকে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত এবং আঙ্গুলের মাথা থেকে কবজি পর্যন্ত এই সোনালী অনুপাত পাওয়া যায়। কাঁধ থেকে হাঁটু এবং হাঁটু থেকে পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত দূরত্বের মাঝেও এই সোনালী অনুপাত পাওয়া যায়। এমনিভাবে চেহারা হৃদপিণ্ডসহ অন্যান্য অনেক অঙ্গের বিভিন্ন অংশে এই অনুপাত পাওয়া যায়। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ প্রকৃতির অনেক কিছুর মাঝে এই অনুপাত পাওয়া যায় বলে কেউ কেউ এটাকে Divine proportion (স্বর্গীয় অনুপাত বা ঐশ্বরিক অনুপাত) বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। গোল্ডেন রেশিওকে 'গোল্ডেন মিন' (Golden mean), 'গোল্ডেন সেকশন' (Golden section)ও বলা হয়।

খ্রিস্টের জন্মেরও পাঁচশ বছর পূর্বে এই গোল্ডেন রেশিও বা সোনালী অনুপাত প্রথমে আবিষ্কার করেন পিথাগোরাস। তারপর প্লেটো, ইউক্লিড, ফিবোনাক্কি, কেপলারসহ অনেকে এই সোনালী অনুপাতের জগতে গবেষণায় অগ্রসর হন।

আমরা গোল্ডেন রেশিও-এর বিষয়টা আলোচনায় আনছি এজন্য যে, অনেককে ইদানিং বলতে শোনা যাচ্ছে, পৃথিবীর মাঝে বায়তুল্লাহ বা কা'বা শরীফের যে অবস্থান তাতেও এই অনুপাত রক্ষা করা হয়েছে। তারা বলতে চান, গোল্ডেন রেশিও হিসেবে কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি। এ সম্পর্কিত প্রচুর লেখা নেটে দেখতে পাওয়া যায়। বিচিত্র নয় যে, এই ধারায় অনেক বইয়েও বিষয়টা এসে থাকবে বা এসে যাবে। তা বক্তব্য যদি এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত যে, কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভির অবস্থানে রয়েছে তাহলে তা আমাদের তেমন কিছু উদ্বেগের কারণ ছিল না। কিন্তু যেহেতু অনেকে বক্তব্যকে আরও আগে বাড়িয়ে বলতে চাচ্ছেন, কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি আর নাভি হচ্ছে শরীরের মাঝখান, অতএব সেই কা'বা শরীফ যে মক্কায় অবস্থিত সেই মক্কাকে কেন্দ্র করেই সারা পৃথিবীর রোযা রাখা ও ঈদ করার প্রবর্তন হওয়া চাই। সোজা কথায় বলতে গেলে তারা বলতে চান, মক্কা শরীফের সাথেই একসাথে রোযা ও ঈদ করতে হবে। একারণেই এ বিষয়টার প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হচ্ছে। এটা ভিন্ন কথা যে, কা'বা শরীফ বা মক্কা রোযা রাখা ও ঈদ করার ভিত্তি কি না। এ ব্যাপারে অত্যন্ত পরিষ্কার কথা হল শরীয়তে রোযা রাখা বা রোযা ছাড়ার তথা ঈদ করার ভিত্তি বানানো হয়েছে কেবল হেলাল (নতুন চাঁদ) দেখাকে। কা'বা শরীফ বা মক্কা মুকাররমাকে রোযা রাখা বা রোযা ছাড়ার তথা ঈদ করার ভিত্তি বানানো হয়নি। তা ছাড়া পৃথিবীর কোন একটা স্থান নাভির স্থলে হলেই সে স্থানকে সকলের জন্য অন্য কোন আমলের ভিত্তি বানাতে হবে এর পেছনে কোন যুক্তিও নেই। (এমন বলাটা কি যুক্তিযুক্ত হবে যে, মক্কা শরীফ যেহেতু নাভি তাই সকলের বিয়ে-শাদি মক্কাতেই হতে হবে, সকলের কবরও সেখানেই হতে হবে, ইত্যাদি?) আরও কথা হল নাভি তো প্রস্থের মাঝখানে হয়, অথচ কা'বা শরীফ পৃথিবীর প্রস্থের দিকের মাঝখানে তথা বিষুব রেখাতে অবস্থিত নয়। আল্লাহ পাক যদি কা'বা শরীফকে নাভির স্থলেই রাখতেন তাহলে কা'বা শরীফ হত বর্তমান দ্রাঘিমার বরাবর দক্ষিণে বিষুব রেখায় তথা আফ্রিকার কেনিয়ায়। এখন কা'বা শরীফ তথা নাভি এক সাইডে হয়ে গেল এটা কি বেখাপ্পা হয়ে যায় না, এতে কি আল্লাহর শিল্প ডিজাইন জ্ঞানের ত্রুটি প্রকাশ পায় না? নাউযু বিল্লাহ! যাহোক আমি এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত আর কিছু এখানে লিখতে চাই না। এখানে শুধু গোল্ডেন রেশিও হিসেবে কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি কি না– এ প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে চাই। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে যারা গোল্ডেন রেশিও সম্বন্ধে মোটেই জানেন না, তাদের সুবিধার্থে প্রথমে গোল্ডেন রেশিও-এর পরিচয় সম্বন্ধে কিছু কথা বলে নিতে চাই।

সহজে গোল্ডেন রেশিও-এর পরিচয় হল– গোল্ডেন রেশিও হচ্ছে একটি বিশেষ গাণিতিক অনুপাত। সেই অনুপাতটি হল ১.৬১৮। একটা রেখাকে যদি এমন দুই ভাগে ভাগ করা হয় যার বড় অংশকে ছোট অংশ দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় উভয় অংশের যোগফলকে বড় অংশ দ্বারা ভাগ করলেও সেই ফল পাওয়া যায়, আর সেই ভাগফল হবে ১.৬১৮ (প্রকৃত সংখ্যা হচ্ছে ১.৬১৮০৩৩৯৮৮৭৫) তাহলে সেটা হচ্ছে গোল্ডেন রেশিও। যেমন ৬১০ ইঞ্চি একটা রেখাকে দুই ভাগে ভাগ করুন। বড় অংশ (এটাকে বলা যায় A অংশ) করুন ৩৭৭ ইঞ্চি আর ছোট অংশ (এটাকে বলা যায় B অংশ) করুন ২৩৩ ইঞ্চি। এবার বড় অংশ তথা A অংশকে ছোট অংশ তথা B অংশ দ্বারা ভাগ দিন ফল হবে ১.৬১৮ (৩৭৭÷২৩৩=১.৬১৮) আবার A+B–র টোটালকে অর্থাৎ ৬১০ কে A অংশ দ্বারা ভাগ দিন তাহলেও ফল হবে ১.৬১৮ (৬১০÷৩৭৭=১.৬১৮)। তাই সংক্ষেপে গোল্ডেন রেশিওর পরিচয় এভাবেও দেয়া হয়– a+b is to a as a is to b অর্থাৎ, a+b÷a= a÷b। বিষয়টিকে চিত্রে এভাবে দেখানো যায়–

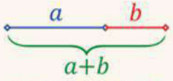

$a+b$ is to a as a is to b

আবার চিত্রে এভাবেও দেখানো যায়–

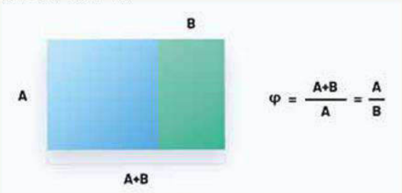

গোল্ডেন রেশিওকে সাধারণত তিন প্রকারে ভাগ করা হয়। **(এক)** সাধারণ গোল্ডেন রেশিও। এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। **(দুই)** ১.৬১৮ রেশিও রক্ষা করে কোন আয়তক্ষেত্র তৈরি করলে (যে আয়তের দৈর্ঘ প্রস্থ উভয়টার রেশিও হবে ১.৬১৮) সেটাকে বলে গোল্ডেন রেকট্যাংগ্‌ল্ (Golden Rectangle) বা আয়তক্ষেত্রের গোল্ডেন রেশিও। যেমন দ্বিতীয় চিত্রে দেখানো হয়েছে। (উল্লেখ্য, চার সমকোণবিশিষ্ট চতুর্ভূজকে আয়তক্ষেত্র বলা হয়।) (তিন) আবার যদি উভয় আয়তক্ষেত্রের পিঠে ফিবোনাক্কি ক্রম অনুযায়ী (এ বিষয়ে পরে বর্ণনা আসছে।) আরও একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করা হয়, তারপর সবগুলোর পিঠে অনুরূপভাবে আরও একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করা হয়। এভাবে কয়েকটা আয়তক্ষেত্র তৈরি করার পর সবগুলো আয়তের কোণা একের পর এক প্যাঁচানো রেখা দিয়ে যুক্ত করা হয়, তাহলে সেটাকে বলে গোল্ডেন স্পাইরাল (Golden Spiral) বা শঙ্খিল গোল্ডেন রেশিও। এই স্পাইরালের বক্ররেখাতেও গোল্ডেন রেশিও থাকে। স্পাইরাল হল সমুদ্রের এক ধরনের শামুক যা প্যাঁচানো আকৃতিতে গড়ে ওঠে। সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ি এবং হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের ছাপের দিকে লক্ষ্য করলেও এই গোল্ডেন স্পাইরাল দেখতে পাওয়া যায়। নিচের ছবিতে গোল্ডেন স্পাইরাল লক্ষ্য করুন।

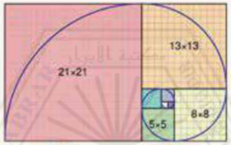

গোল্ডেন রেশিওর সঙ্গে ফিবোনাক্কি (Fibonacci কেউ কেউ উচ্চারণ লেখেন ফিবোনেসি/ফিবোনাচ্চি/ফিবোনোচ্চি) সিরিজের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই ফিবোনাক্কি সিরিজ সম্বন্ধেও কিছু কথা জানতে হয়। ইটালিয়ান গণিতবিদ লিওনার্দ ফিবোনাক্কি (Leonardo Fibonacci) এই সিরিজটি আবিস্কার করেন বলে একে 'ফিবোনাক্কি সিরিজ' বলা হয়। এই সিরিজে কতগুলো সংখ্যা দেখানো হয়, যেগুলোর প্রতিটি সংখ্যা তার আগের দুইটি সংখ্যার যোগফলের সমান। সিরিজভুক্ত সংখ্যাগুলোর প্রত্যেকটিকে তার আগের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল ১.৬১৮–এর কাছাকাছি হবে এবং ১৩ তম সংখ্যা এর পরে (৬১০ থেকে) সবগুলোর ভাগফল হুবহু ১.৬১৮ হবে। এবার ফিবোনাক্কি সিরিজটি লক্ষ্য করুন– ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১৪৪, ২৩৩, ৩৭৭, ৬১০, ৯৮৭, ১৫৯৭, ২৫৮৪, ৪১৮১ ...। এর পরবর্তী আরও সংখ্যা আপনি বের করতে পারবেন। শেষ সংখ্যাকে তার পূর্বের সংখ্যার সাথে যোগ দিলেই পরবর্তী সংখ্যা বের হবে।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, প্রতিটি সংখ্যার A ও B অংশ কি হবে তা বের করা আজকাল সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেটে Golden ratio calculator পাওয়া যায়, তার সহযোগিতা নিলেই হয়। এমনকি একটা চিত্রে গোল্ডেন রেশিও কীভাবে অবস্থিত তা বের করাও এখন সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ফাইমেট্রিক্স'–এর সহযোগিতা নিন। ফাইমেট্রিক্স হচ্ছে এক ধরনের সফটওয়ার যা দ্বারা কোন ছবির গোল্ডেন রেশিও পয়েন্ট মাপা হয়।

গোল্ডেন রেশিও বুঝানোর জন্য Φ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এরূপ লেখা হয় Φ১.৬১৮ ।Φ হচ্ছে একটি ল্যাটিন ভাষার অক্ষর। এটাকে বলা হয় Phi (ফাই) এটা হচ্ছে বড় হাতের ফাই। আবার ছোট হাতের

ফাই অর্থাৎ, φ ও ব্যবহৃত হয়। তখন লেখা হয় φ০. ৬১৮। দেখা গেল ছোট হাতের ফাই ব্যবহার করলে দশমিকের পূর্বের ১ লেখা হয় না। কখনও কখনও এরূপও লেখা হয় Phi ১.৬১৮ আবার এরূপও লেখা হয় G ১.৬১৮ এই G হচ্ছে Golden ratio–এর সংক্ষেপ। তবে বেশিরভাগ Phiই লেখা হয়।

এতক্ষণ গোল্ডেন রেশিও-র পরিচয় সম্বন্ধে মোটামুটি বর্ণনা পেশ করা হল। এবার আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি। যারা কা'বা শরীফকে পৃথিবীর নাভি বলতে চান তারা অক্ষের বিচারে দুইভাবে গোল্ডেন রেশিও দেখান এবং দ্রাঘিমার বিচারে দুইভাবে তা দেখান। এ ছাড়াও আরও একভাবে (কো অর্ডিনেট পদ্ধতিতে) তা দেখান। সর্বমোট ৫টা পদ্ধতিতে তারা কা'বা শরীফকে গোল্ডেন রেশিও পয়েন্টে দেখাতে চান। আর কেউ কেউ অন্য একভাবে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর মাঝখান বলে দেখাতে চান। এই মোট ৬টা পদ্ধতি। নিম্নে পদ্ধতি ষষ্ট ও সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা পেশ করা গেল।

১ম পদ্ধতি: (অক্ষের বিচারে)

তারা দেখান–

A অংশ ১১১.৮২/১৮০=১.৬০৯।

পর্যালোচনা:

এখানে নিখুঁত গোল্ডেন রেশিও হয়নি। কেননা নিখুঁত গোল্ডেন রেশিও হতে হলে দু'টো অনুপাতই (B/A এবং A/A+B) ১.৬১৮ হতে হবে। এখানে দ্বিতীয় অংশে অনুপাতটি কাছাকাছি হলেও প্রথমটি গোল্ডেন রেশিওর ধারে-কাছেও যায়নি। কেননা A অংশ ১১১.৮২ হলে B অংশ হবে (১৮০-১১১.৮২=) ৬৮.১৮। অতএব A অংশকে B অংশ দ্বারা ভাগ দিলে হবে (১১১.৮২÷৬৮.১৮=) ১.৬৪০। ১.৬৪০ কে কাছাকাছি ধরা হলেও উভয় অনুপাত এক সমান হয়নি। অতএব সঠিক গোল্ডেন রেশিও হল না। সঠিক গোল্ডেন রেশিও হতে গেলে উভয় অনুপাত সমান হতে হবে। এতএব অক্ষের বিচারে এখানে গোল্ডেন রেশিও দেখানোর যে চেষ্টা করা হয়েছে তা নিখুঁত নয়। আল্লাহ পাক কা'বা শরীফকে পরিকল্পিতভাবে গোল্ডেন রেশিও পয়েন্টে রাখলে নিখুঁত গোল্ডেন রেশিওই থাকত। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন খুঁত থাকে না।

বস্তুত মক্কার সঠিক অবস্থান (২১.৪২২° উত্তর অক্ষাংশ) হিসাবে A অংশ হওয়া চাই ১১১.৪২ এবং B অংশ হওয়া চাই ৬৮.৫৮। তাহলে ১১১.৪২÷৬৮.৫৮=১.৬২৪ এবং ১৮০÷১১১.৪২= ১.৬১৫। দেখা গেল কোনভাবেই সঠিক গোল্ডেন রেশিও হচ্ছে না।

২য় পদ্ধতি: (অক্ষের বিচারে)

তারা বলেন, দক্ষিণ মেরু থেকে কা'বার দূরত্ব ১২৩৪৮.৩২ কি. মি। এটা হচ্ছে A অংশ। আর উত্তর মেরু থেকে কা'বা শরীফের দূরত্ব হচ্ছে ৭৬৩১.৬৮ কি. মি। এটা হচ্ছে B অংশ। টোটাল– ১৯৯৮০ কি. মি.। এখানে সবভাবেই গোল্ডেন রেশিও তথা ১.৬১৮ পাওয়া যায়।

পর্যালোচনা:

কা'বা শরীফের উত্তর দক্ষিণে যে দূরত্ব দেখানো হয়েছে, (১২৩৪৮.৩২+৭৬৩১.৬৮=১৯৯৮০ কি. মি.) তা ভুল। প্রকৃত দূরত্ব হচ্ছে ১২৪২৯.৯ মাইল= ২০০০৩.৯৩ কি. মি। (নেটে Length of

Prime meridian সাইটে সার্চ দিলে বিষয়টি পাওয়া যাবে।) সম্ভবত তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ ভুল তথ্য দিয়ে গোল্ডেন রেশিও দেখিয়ে ধোঁকা দিতে চেয়েছেন।

৩য় পদ্ধতি (দ্রাঘিমার বিচারে)

তারা দেখান– A অংশ ২১৯.৮২/৩৬০=১.৬১ (অর্থাৎ, তারা বুঝাতে চান কা'বা শরীফ যেহেতু ৩৯.৮২৬^{o}E য়ে অবস্থিত তাহলে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা থেকে আমেরিকা আফ্রিকার দিক হয়ে কা'বা শরীফ পর্যন্ত হয় ২১৯.৮২^{o})

পর্যালোচনা:

(এক) হিসাবে ভুল হয়েছে। সঠিক ফলাফল হবে ১.৬৩৭ আর এটা সঠিক গোল্ডেন রেশিও নয়।

(দুই) এখানে দ্বিতীয় অংশে ১.৬৩৭ তথা গোল্ডেন রেশিওর কাছাকাছি হলেও প্রথম অংশে গোল্ডেন রেশিওর ধারে-কাছেও যায়নি। কেননা A অংশ ২১৯.৮২ হলে B অংশ হবে (৩৬০-২১৯.৮২=) ১৪০.১৮ আর ২১৯.৮২÷ ১৪০.১৮=১.৫৬৮। তাহলে গোল্ডেন রেশিওর ধারে-কাছেও গেল না। এ জন্যই সম্ভবত তারা এই প্রথম অংশ হিসেবে দেখান না। অথচ নিখুঁত গোল্ডেন রেশিও প্রমাণ করতে হলে উভয় অংশেই সমান অনুপাত ১.৬১৮ (বা অন্তত এর কাছাকাছি) থাকতে হবে।

বস্তুত সঠিক গোল্ডেন রেশিওর হিসাব মিলাতে হলে কা'বার শরীফের অবস্থান হতে হবে ২২২.৪৯২^{o}E তথা ৪২.৪৯^{o}E। তাহলে A অংশ হবে ২২২.৪৯২ আর B অংশ হবে ১৩৭.৫০৮। তাহলে ৩৬০÷২২২.৪৯২=১.৬১৮ এবং ২২২.৪৯২÷১৩৭.৫০৮=১.৬১৮। উল্লেখ্য, উক্ত ৪২.৪৯^{o}E (এবং ২১.২৪^{o}N)-এর অবস্থানে রয়েছে তুরবা ও রনিয়্যা নামক দুটো অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থান। এ স্থানটি মক্কা শরীফ থেকে তায়েফের অবস্থান যত দূরে তায়েফ থেকে তার চেয়ে প্রায় দেড়গুন দূরে পূর্বদিকে অবস্থিত। আল্লাহ তাআলা যদি কা'বা শরীফকে গোল্ডেন রেশিও পয়েন্টে রাখার পরিকল্পনা রাখতেন তাহলে গোল্ডেন রেশিওর এই নিখুঁত পয়েন্টেই কা'বা শরীফকে রাখতেন। তাও যদি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পৃথিবীর শুরু বলে কোন শরয়ী বা প্রাকৃতিক দলিল থাকত।

(তিন) দ্রাঘিমার বিচারে কা'বা শরীফকে নাভির স্থানে দেখাতে গিয়ে গ্রীনিচ রেখাকে মূল মধ্যরেখা এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে পৃথিবীর দৈর্ঘের শুরু মেনে নেয়া হয়েছে। অথচ গ্রীনিচ রেখা পৃথিবীর দৈর্ঘের মধ্যখান এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পৃথিবীর দৈর্ঘের শুরু– এ বিষয়টা না কোন শরয়ী দলীলে স্বীকৃত বিষয় না বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। এ দু'টো স্থানে প্রাকৃতিক এমন কোন নিদর্শনও নেই যার ভিত্তিতে বিষয় দু'টো সর্বজনস্বীকৃত হতে পারে। এটা তো নিছক বিশেষ একটা হিসেবের সুবিধের জন্য মেনে নেয়া হয়েছে।। কেউ এটা না মেনে ভিন্ন রকম মানচিত্রও দাঁড় করাতে পারে। যেমন ফ্রান্স প্যারিসের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত দ্রাঘিমা রেখাকেই মূল মধ্যরেখা গণ্য করে থাকে।

৪র্থ পদ্ধতি (দ্রাঘিমার বিচারে)

শোনা যায় তাদের অনেকে প্রশান্ত মহাসাগরকে চন্দ্রের প্রথম উদয়স্থল বলতে চান। এ হিসেবে তারা কা'বা শরীফকে নাভি প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন।

পর্যালোচনা:

তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে, চন্দ্রের প্রথম উদয়স্থল ১৭৭.৩৩৬ পূর্ব দ্রাঘিমায়। কেননা পূর্ব দ্রাঘিমার B অংশ হতে হবে ১৩৭.৫১। আর কা'বা শরীফ ৩৯.৮২৬^{o}Eতে অবস্থিত। অতএব ৩৯.৮২৬ + ১৩৭.৫১ = ১৭৭.৩৩৬ তে চন্দ্রের প্রথম উদয় ঘটতে হবে। অথচ ১৭৭.৩৩৬ তে চন্দ্রের

প্রথম উদয় ঘটার বিষয় না শরয়ীভাবে প্রমাণিত না বৈজ্ঞানিকভাবে।

৫ম পদ্ধতি

তারা বলতে চান, কো অর্ডিনেট পদ্ধতিতে কা'বা শরীফ গোল্ডেন রেশিও পয়েন্টে অবস্থিত। তারা বলতে চান, পূর্ব দ্রাঘিমাংশ + ৩৯.৮২ এবং উত্তর অক্ষাংশ + ২১.৪২। এতে কা'বা শরীফে গোল্ডেন রেশিও প্রমাণিত হয়। এভাবে– ৯০ + ৩৯.৮২ = ১১১.৪২

সুতরাং ১১১.৮২/১৮০ = ০.৬১...

এবং ১৮০ + ৩৯.৮২ = ২১৯.৮২

সুতরাং ২১৯.৮২/৩৬০ = ০.৬১...

পর্যালোচনা:

(এক) পুরো হিসেবটাই ভুলে ভরা। কারণ, (১) ৯০ + ৩৯.৮২ = ১১১.৪২ ভুল বরং সঠিক হল ৯০ + ৩৯.৮২ = ১২৯.৮২ (২) অতএব অনিবার্য কারণে পরবর্তী লাইন ১১১.৮২/১৮০ = ০.৬১... এটাও ভুল। বরং এটা হবে ১২৯.৮২/১৮০ = ১.৩৮৬। তাহলে গোল্ডেন রেশিও পাওয়া গেল না। (৩) শেষ লাইনে দেখানো হয়েছে ২১৯.৮২/৩৬০ = ০.৬১... এটাও ভুল। হবে ২১৯.৮২/৩৬০ = ০.৬৩৭...।

(দুই) ৩য় পদ্ধতির পর্যালোচনায় যা বলা হয়েছিল আবারও তাই বলতে চাই যে, এখানে গ্রীনিচ রেখাকে মূল মধ্যরেখা এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে পৃথিবীর দৈর্ঘের শুরু মেনে নিয়ে হিসেব দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ গ্রীনিচ রেখা পৃথিবীর দৈর্ঘের মধ্যখান এবং আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা পৃথিবীর দৈর্ঘের শুরু– এ বিষয়টা না কোন শরয়ী দলীলে স্বীকৃত বিষয় না বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। প্রাকৃতিক এমন কোন নিদর্শনও নেই যার ভিত্তিতে বিষয় দুটো সর্বজনস্বীকৃত হতে পারে। এটা তো নিছক বিশেষ একটা হিসাবের সুবিধার জন্য মেনে নেয়া হয়েছে। অতএব এই কল্পিত বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোল্ডেন রেশিও দেখানো হচ্ছে তা কাল্পনিক গোল্ডেন রেশিও হতে পারে বাস্তব গোল্ডেন রেশিও নয়।

৬ষ্ট পদ্ধতি

তারা বলেন, কা'বা শরীফ পৃথিবীর মাঝখান। কেননা– **(এক)** কা'বা শরীফ থেকে আলাস্কা এবং নিউজিল্যান্ড মাপলে সমান দূরত্ব পাওয়া যায়। **(দুই)** কা'বা শরীফ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে অবস্থিত।

পর্যালোচনা:

১. নিউজিল্যান্ড ছাড়াও তো তার পূর্বে চ্যাথাম দ্বিপ, বাউন্টি দ্বিপ ইত্যাদি রয়েছে, সেগুলোকে হিসেবে কেন ধরা হল না। তাছাড়া আলাস্কা কা'বা শরীফ থেকে (গ্লোবে) সোজা উত্তরে– এদিকটা ধরা হল, সোজা দক্ষিণের মাপ কেন আনা হল না। কা'বা শরীফ থেকে সোজা পূর্ব পশ্চিমের মাপও কেন আনা হল না? এ সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. কা'বা শরীফ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে অবস্থিত হলে তার বিপরীত দিকের অঞ্চলও তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে অবস্থিত হবে, তাহলে সেটাকেও কি পৃথিবীর মাঝখান বলতে হবে? এ সম্বন্ধেও পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সারকথা, কা'বা শরীফকে পৃথিবীর নাভি দেখাতে গিয়ে গোল্ডেন রেশিওর যে বর্ণনাগুলো পেশ করা হয়ে থাকে তা হয় ভুল না হয় খুঁতযুক্ত, যা পূর্বে বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। আর কা'বা শরীফকে

পৃথিবীর মাঝখান দেখানোর যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে তা একটা খাপছাড়া বিষয়। অবশ্য কেউ কেউ কয়েকটি হাদীছের বরাত দিয়ে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর মাঝখান প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আসলে কোন দেশ বা স্থানকে শরীরের কোন অংগের সঙ্গে উপমা দিলে বহু বিড়ম্বনা দেখা দিবে। আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে পৃথিবীর শুরু ধরে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর নাভি বানানোর চেষ্টা করা হল। তাহলে জাপানকে মানুষ সূর্যোদয়ের দেশ বলে। এ হিসেবে জাপানকে শুরু ধরলে জাপানের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার মধ্যে একটা হল কুশিরো। এর মধ্যে ১৪৪.৪৯ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার অবস্থান রয়েছে। তাহলে শরীরের স্তন যেহেতু একদিক থেকে (মাথার দিক থেকে) ৭–এর ২ অংশ পরে। আর ৩৬০ এর ৭–এর ২ অংশ হয় (৩৬০÷৭ = ৫১.৪২×২ =) ১০২.৮৫৭ আর কা'বা শরীফ যেহেতু ৪২.৪৯°Eতে অবস্থিত। এ হিসেবে কা'বা শরীফ কুশিরো থেকে ১০২ ডিগ্রী (১৪৪.৪৯ – ৪২.৪৯=১০২) দূরে তথা স্তনের দূরে অবস্থিত। তাহলে নাউযু বিল্লাহ কা'বা শরীফ হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবীর স্তন। এভাবে হিসেব করলে কোন দেশ হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর লিংগ, কোনটা হয়ে দাঁড়াবে নিতম্ব ইত্যাদি। আর এগুলো হবে বিড়ম্বনাকর বিষয়! নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।

কা'বা শরীফ বা মক্কা মুকাররমা পৃথিবীর কেন্দ্র কি না

কা'বা শরীফ বা বাইতুল্লাহ শরীফ বা মক্কা মুকাররমা পৃথিবীর মধ্যখান তথা পৃথিবীর কেন্দ্র কি না– এ বিষয়ে সম্প্রতি বেশ লেখালেখি হচ্ছে। কেউ কুরআন-হাদীছের আলোকে, কেউ ভূগোলের আলোকে– বিভিন্নজন বিভিন্ন আলোকে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছেন। কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন কা'বা শরীফ বা বাইতুল্লাহ শরীফ পৃথিবীর মধ্যখান তথা কেন্দ্র, আবার কেউ প্রমাণ করছেন তার বিপরীত। নেটে مكة المكرمة هي مركز الأرض (মক্কা মুকাররমা পৃথিবীর কেন্দ্র) এবং مكة ليست مركز الأرض (মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্র নয়)–এ জাতীয় শিরোনামে এসব বিপরীতমুখী লেখা দেখতে পাওয়া যায়। আমরা কুরআন-হাদীছের আলোকে এবং ভূগোলের আলোকে– উভয়ভাবেই বিষয়টা নিয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করব ইনশা আল্লাহ। তবে মূল আলোচনার প্রবেশের পূর্বে দু'টো বিষয় উল্লেখ করে নিতে চাই। যারা কা'বা শরীফকে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রমাণিত করতে চান, তাদের অনেকের মনেই দু'টো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে বলেই সে সম্বন্ধে শুরুতেই বলে নিতে চাই। আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্যেও এ দুটো বিষয় খণ্ডন করা। বিষয় দু'টো হচ্ছে– (১) অনেকে মনে করেন কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র বলেই সেটা সারা বিশ্বের কেবলা। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল– কেবলার সাথে কেন্দ্র হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই। হিজরতের পর ষোল/সতের মাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসই কেবলা ছিল। অথচ বাইতুল মুকাদ্দাস পৃথিবীর কেন্দ্র নয় (বাইতুল মুকাদ্দাস বা বায়তুল মুকাদ্দাসের বিশেষ পাথর الصخرة পৃথিবীর কেন্দ্র বলে একটি মত থাকলেও তা অসমর্থিত।)। বুঝা গেল কেবলা হওয়ার সাথে পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার সম্পর্ক নেই। (২) অনেকে মনে করেন কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র। অনিবার্য কারণেই মক্কা মুকাররমাকেও পৃথিবীর কেন্দ্র বলা হবে। অতএব মক্কা মুকাররমায় চাঁদ দেখাই সারা পৃথিবীর চাঁদ দেখা বলে গণ্য হবে। তাই মক্কা মুকাররমায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা রাখা শুরু হবে এবং মক্কা মুকাররমায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই

সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ উদযাপিত হবে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল– সহীহ হাদীছে চাঁদ দেখাকেই রোযা রাখা ও ঈদ উদযাপনের ভিত্তি বানানো হয়েছে, মক্কা মুকাররমার চাঁদ দেখা সারা বিশ্বের জন্য চাঁদ দেখা বলে গণ্য হবে– এমনটা কুরআন-হাদীছের কোথাও বলা হয়নি। কিংবা মক্কা মুকাররমা রোযা ও ঈদ উদযাপনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র বলে গণ্য– এমনটাও কুরআন-হাদীছে কোথাও বলা হয়নি। যাহোক, এবার আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি। আমরা দুইভাবে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। যথা: ১. কুরআন-হাদীছের আলোকে কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র কি না। ২. ভৌগোলিক বিচারে কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র কি না।

১. কুরআন-হাদীছের আলোকে কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র কি না।

প্রথমেই দেখা যাক কুরআনে কারীমে এ ব্যাপারে কিছু দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় কি না। যারা কা'বা শরীফ বা মক্কা-র পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার ব্যাপারে কুরআন থেকে দলীল দিয়ে থাকেন, তারা প্রধানত দু'টো আয়াত পেশ করে থাকেন। আয়াত দু'টো এবং কীভাবে তারা তা দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন তার সারকথা নিম্নরূপ:

প্রথম আয়াত:

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ (الآية ١٤٣ من سورة البقرة)

অর্থাৎ, এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। (সূরা বাকারা: ১৪৩) আয়াতটি কেবলা প্রসঙ্গে নাযেল হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ হবে– কা'বা যেমন মধ্যবর্তী তোমাদেরকেও তেমনি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। এর দ্বারা বুঝা গেল কা'বা শরীফ পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অতএব কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র।

দ্বিতীয় আয়াত:

﴿وَهَذا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا.﴾ (الآية ٩٢ من سورة الأنعام)

অর্থাৎ, এই কিতাব আমি নাযেল করেছি, এটি বরকতময়, তার সম্মুখস্থ কিতাবের সত্যায়নকারী। আর এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি যেন নগরীমাতা ও তার আশপাশের লোকজনকে সতর্ক করতে পার। (সূরা আন্‌আম: ৯২) আয়াতে মক্কাকে أُمّ الْقُرَى (উম্মুল কুরা) তথা নগরীমাতা বলা হয়েছে। বুঝা গেল, প্রথমে মক্কা শরীফের স্থান সৃষ্টি করা হয়েছে, অতঃপর সেখান থেকে সারা পৃথিবীকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যেমন মা থেকে বংশ ছড়িয়ে থাকে। যেহেতু মক্কা শরীফ-এর স্থান থেকে সারা পৃথিবীর বিস্তার, তাই মক্কা শরীফ-এর স্থানই হল সারা পৃথিবীর কেন্দ্র। এ হচ্ছে উপরোক্ত দুটি আয়াত থেকে কীভাবে কা'বা শরীফ বা মক্কা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র প্রমাণিত হয় তার সারকথা। এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই,

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত 'এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি' কথাটার মধ্যে 'এভাবেই' বলে কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে মুফাসসিরীনে কেরামের ৬টি উক্তি রয়েছে। এর মধ্যে একটি উক্তি হল যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কা'বা যেমন মধ্যবর্তী তোমাদেরকেও তেমনি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। এ উক্তিটি কুরতুবীর। (আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন: ২/১৫৩) সাদৃশ্য প্রসঙ্গে এ উক্তিটিকে কা'বা শরীফের কেন্দ্র হওয়ার স্পষ্ট দলীল বলা না গেলেও তাতে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু সাদৃশ্য প্রসঙ্গে অন্য পাঁচটি উক্তি এরূপ নয়। যেমন: একটা উক্তি সম্বন্ধে বলছি, ইবনে জারীর তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন, এর অর্থ

হচ্ছে– যেমন তোমাদেরকে আমি মুহাম্মাদ ও তার আনীত দ্বীনের প্রতি দিক-নির্দেশনা দান করেছি, সেমতে তোমাদেরকে ইব্রাহীমের মিল্লাত ও তার কেবলা অনুসরণের তাওফীক দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি এবং এভাবে অন্যান্য মিল্লাত-অনুসারীদের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তদ্রূপ অন্যান্য দ্বীন অনুসারীদের উপরও তোমাদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি এভাবে যে, তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। (তাফসীরে তাবারী: ৩/১৪১) এ উক্তিতে মধ্যপন্থী উম্মত হওয়াকে কা'বা শরীফের মধ্যবর্তী হওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য বিধান করা হয়নি। এভাবে মুফাসসিরীনে কেরামের অন্য উক্তিগুলোতেও তা করা হয়নি। এ ব্যাপারে আরও দেখা যেতে পারে তাফসীরে ইবনে কাছীর (১/৪৫৪) ও তাফসীরে কাবীর (২/৩৮৭)। অতএব এ আয়াতকে কা'বা শরীফের পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার স্পষ্ট দলীল তো বলা যায়ই না, ইঙ্গিত বলা গেলেও তাও অকাট্য বা নিশ্চিত নয়, যেহেতু ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত মক্কাকে أُمَّ الْقُرَى (উম্মুল কুরা) তথা নগরীমাতা বলা প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই, এখানে ভূমির বিস্তারের দিক থেকে মক্কা নগরীমাতা– এমন ব্যাখ্যার কোন আবশ্যকতা নেই। বরং মক্কা নগরী থেকে আদর্শ ছড়িয়েছে, এ হিসেবেও মক্কাকে নগরীমাতা বলা হয়ে থাকতে পারে অর্থাৎ, মক্কা নগরী আদর্শিক বিচারে নগরীমাতা তথা মূল নগরী। এভাবে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখান থেকেই আদর্শের বিস্তার ঘটবে। যদি মেনে নেয়া হয় যে, মক্কাকে নগরীমাতা বলার কারণ হচ্ছে প্রথমে মক্কা শরীফের স্থান সৃষ্টি করা হয়েছে, অতঃপর সেখান থেকে সারা পৃথিবীকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, তাহলেও এটা আবশ্যক হয় না যে, মক্কা শরীফ-এর স্থানই হল সারা পৃথিবীর কেন্দ্র তথা মধ্যখান। কেননা প্রথমে যে অংশ সৃষ্টি করা হয় এবং তা থেকে অন্যান্য অংশের বিস্তার ঘটানো হয়, সেটা কেন্দ্রে তথা মাঝখানে হওয়া আবশ্যক হয় না। কেননা, সবদিকে যে বিস্তার ঘটানো হয়েছে, সে বিস্তৃতি সবদিকে সমান না-ও হতে পারে। কোন একদিকের বিস্তৃতি কম অন্য একদিকের বিস্তৃতি বেশি হলেই তো সেটা আর কেন্দ্র তথা মধ্যখান থাকল না। তাহলে দেখা গেল এই দ্বিতীয় আয়াতকেও মক্কা শরীফের পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার স্পষ্ট দলীল তো বলা যায়ই না, ইঙ্গিত বলা গেলেও তাও অকাট্য বা নিশ্চিত নয়, যেহেতু ভিন্ন রকম ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে।

কেউ কেউ মক্কা (مكة) শব্দ দ্বারাও দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্র। যেমন: অভিধান বিশারদ খলীল বলেছেন,

سميت بذلك لأنها وسط الأرض ، كالمخ الذي هو أصل ما في العظم.

অর্থাৎ, (মক্কা শব্দের অর্থ মগজ) এই নামে নামকরণ হয়েছে কারণ, মক্কা হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র। যেমন মগজ হচ্ছে হাড়ের মূল বা কেন্দ্র। আমরা এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, মক্কা শব্দের মূল ধাতুগত অর্থ ও তার উদ্দেশ্য ভিন্ন রকমও বলা হয়েছে। যেমন: রাগেব ইস্পাহানী বলেছেন,

اشتقاق مكة من تَمَكَّكْتُ العظم : أخرجت مخه.

এ বক্তব্যের সারকথা হল– মক্কা শব্দের মূল অর্থ হাড়ের মগজ বের করা। তারপর বলেছেন,

وعبَّر عن الاستقصاء بالتمكُّكِ .وتسميتها بذلك لأنها كانت تَمُكُّ مَن ظلم بها : أي تدقُّه وتهلكه.

অর্থাৎ, 'হাড়ের মগজ বের করা' বলে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, ধবংস করা। এই নামে নামকরণ হয়েছে কারণ, মক্কা নগরীর প্রতি যে অবিচার করে, মক্কা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, ধবংস করে দেয়। (আল-মুফরদাত ফী গারীবিল কুরআন)

অতএব মক্কা শব্দের মূল অর্থ থেকেও মক্কাকে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রমাণিত করা নিশ্চিত নয়, কেননা এ ব্যাপারে একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

যাহোক এতক্ষণের আলোচনায় প্রমাণিত হল, কুরআনে কারীমে মক্কাকে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রমাণিত করার কোন স্পষ্ট দলীল তো নেইই, কিছু ইঙ্গিত থাকলেও তা-ও অকাট্য বা নিশ্চিত নয়। কারণ সেখানে ভিন্ন রকম ব্যাখ্যার অবকাশও রয়েছে এবং শুধু অবকাশ নয় বাস্তবেও ভিন্ন মত রয়েছে।

এবার আমরা হাদীছে এ ব্যাপারে কিছু দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় কি না– সে সম্বন্ধে আলোচনায় আসছি। এ ব্যাপারে একটি মাত্র মারফু' হাদীছ পাওয়া যায়, যেটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন এবং হাদীছটি শুআবুল ঈমান (হাদীছ নং ৩৯৮৪), মুসনাদুল ফিরদাউছ (১/১/১১), তারীখে দামেশক (৩১/১০) প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি হচ্ছে–

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أَوَّلُ بقْعَة وُضِعَتْ فِي الأَرْضِ مَوْضِعُ البَيْتِ ثم مُدَّتْ مِنْها الأَرْضُ وإنَّ أَوَّلَ جَبَلٍ وَضَعَهُ الله تعالى على الأَرْضِ أبُوقبَيْسٍ ثُمَّ مُدَّتْ مِنْهُ الجِبالُ.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে ভূখণ্ড বানানো হয়েছে তা হচ্ছে বাইতুল্লাহর স্থান। তারপর সেখান থেকেই ভূমিকে বিস্তৃত করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে পাহাড় নির্মাণ করেছেন সেটা হচ্ছে আবূ কুবায়ছ। তারপর অন্যান্য পাহাড়-পর্বতকে বিস্তৃত করা হয়েছে।

এ হাদীছের ব্যাপারে আমাদের প্রথমত বক্তব্য হচ্ছে হাদীছটি জয়ীফ। (বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনে আলী ও সুলাইমান ইবনে আব্দুর রহমান–এর কারণে হাদীছটি জয়ীফ।) দ্বিতীয়ত হাদীছে বাইতুল্লাহর স্থান প্রথমে নির্মাণ করার কথা বলা হলেও সেটা কেন্দ্র হওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায় না। আমরা পূর্বেও বলেছি, প্রথমে যে অংশ সৃষ্টি করা হয় এবং তা থেকে অন্যান্য অংশের বিস্তার ঘটানো হয়, সেটা কেন্দ্রে হওয়া আবশ্যক হয় না। কেননা, সবদিকে যে বিস্তার ঘটানো হয়েছে, সে বিস্তৃতি সবদিকে সমান নাও হতে পারে। কোন একদিকের বিস্তৃতি কম অন্য একদিকের বিস্তৃতি বেশি হলেই তো সেটা আর কেন্দ্র তথা মধ্যখান থাকে না। হাদীছে প্রথমে বাইতুল্লাহর স্থান সৃষ্টি করার পর সেখান থেকে অন্য দিকে ভূমিকে বিস্তৃত করার যে কথা বলা হয়েছে তাতে সবদিকের বিস্তৃতি সমান তা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব এ হাদীছকে মক্কা শরীফের পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার স্পষ্ট দলীল মেনে নেয়া যায় না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল এ হাদীছে আবূ কুবায়স পাহাড়কে সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং তা থেকে অন্যান্য পাহাড়-পর্বত বিস্তৃত করার কথাও বর্ণিত হয়েছে, অথচ আবূ কুবায়স পাহাড়কে সব পাহাড়-পর্বতের কেন্দ্র কেউই বলছেন না। নতুন করে কেউ তা বলতে চাইলে আবূ কুবায়সের কেন্দ্রীয় অবস্থান কীভাবে তাও অবশ্যই তাকে প্রমাণিত করতে হবে।

এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করছি। তা হল– কেউ কেউ 'কেন্দ্র' (مركز) শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, মক্কা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র। আবার কেউ কেউ 'মধ্যখান' (وسط/منتصف) শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, কা'বা শরীফ পৃথিবীর মধ্যখান। অবশ্য এ সংক্রান্ত হাদীছ ও রেওয়ায়েতসমূহে এ শব্দগুলোর কোনটিই ব্যবহৃত হয়নি। তারপরও এ শব্দগুলো ব্যবহারকারীদের মধ্যে যারা কেন্দ্র শব্দ ব্যবহার করেছেন, তারাও হয়তো কেন্দ্র শব্দ দ্বারা মধ্যখানই বুঝাতে চেয়েছেন, যদিও কেন্দ্র আর মধ্যখান কথা দু'টো এক নয়। যেমন কেন্দ্রীয় আর মধ্যবর্তী কথা দুটো এক নয়। উদাহরণস্বরূপ: কেন্দ্রীয় ঈদগাহ

বলতে যে ঈদগাহকে বোঝানো হয় তা কিন্তু দেশের সব ঈদগাহগুলোর ঠিক মাঝখানে সে রকম বোঝানো উদ্দেশ্য হয় না। এমনিভাবে কেন্দ্রীয় মসজিদ বলতে অন্যসব মসজিদের মধ্যবর্তী তা বোঝানো হয় না।

মারফূ হাদীছের বাইরে দু' একজন সাহাবী ও কতিপয় তাবিয়ী থেকেও প্রথমে বায়তুল্লাহ শরীফের স্থান সৃষ্টি তারপর তা থেকে সারা ভূখণ্ডের বিস্তৃতি ঘটানোর উক্তি পাওয়া যায়। এসব উক্তির মধ্যে দু'একটির সনদ গ্রহণযোগ্য পর্যায়েরও রয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য হল– বাইতুল্লাহর স্থান প্রথমে নির্মাণ এবং তা থেকে অন্য দিকে ভূখণ্ডের বিস্তৃতির কথা বলা হলেও সেটা কেন্দ্র তথা মধ্যখান হওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়ায় না। তদুপরি সেসব উক্তি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত নয়। কেননা ইয়াহূদীদের রেওয়ায়েতে এ জাতীয় সৃষ্টি-বিষয়ক প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশেষ করে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনায় প্রসিদ্ধ কা'ব আহবার থেকেও যখন অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রথমে বাইতুল্লাহ সৃষ্টি করা হয় ... তারপর (রেওয়ায়েতের ইবারত এরূপ– ثم دحيت الأرض من تحت البيت অর্থাৎ, তারপর) বাইতুল্লাহর নিচ থেকে ভূখণ্ডকে বিস্তৃত করা হয়। রেওয়ায়েত দু'টো তাফসীরে তাবারীতে নির্ভরযোগ্য রাবীদের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাবিয়ীদের মধ্যে মুজাহিদ, আতা ও আম্‌র ইবনে দীনার প্রমুখ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, যা তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম-য়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও আমাদের বক্তব্য তা-ই যা কেবলমাত্র সাহাবীদের থেকে বর্ণিত এরূপ রেওয়ায়েত-এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ভৌগোলিক বিচারে কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র কি না।

কুরআন-হাদীছের আলোকে কা'বা শরীফ বা মক্কা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র কি না– এ পর্যায়ের আলোচনার পর এবার ভৌগোলিক বিচারে কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র কি না– সে আলোচনায় আসা যাক। যারা ভৌগোলিক বিচারে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রমাণিত করার পক্ষে, তারা সাধারণত চারভাবে বিষয়টা উত্থাপন করে থাকেন।

(১) গোল্ডেন রেশিও হিসেবে কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি। আর নাভি হচ্ছে শরীরের মধ্যখান। অতএব কা'বা শরীফও পৃথিবীর মধ্যখান। এ ব্যাপারে পূর্বে 'গোল্ডেন রেশিও এবং কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি কি না– এ প্রসঙ্গ' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, গোল্ডেন রেশিও হিসেবেও কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি নয়। এ ব্যাপারে যারা বিভিন্ন বক্তব্য ও দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন তা গোলমেলে ও গোঁজামিলে ভরা।

(২) কা'বা শরীফ পৃথিবীর মাঝখান। কেননা–

(এক) কা'বা শরীফ স্থলভাগের মধ্যবর্তী। কেননা কা'বা শরীফ থেকে পশ্চিম দিকে উত্তর আমেরিকার আলাস্কা পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত মাপলে সমান দূরত্ব পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রাচীন ম্যাপেও কা'বা শরীফকে মধ্যবর্তী পাওয়াা যায়। মিসরের ডক্টর হুসাইন কামালুদ্দীন ও ডক্টর আহমদ শালতুত (Shaltout/شلتوت) এভাবে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। মিসরের ডক্টর ফারূক আব্দুল বাদী' ও যুগলূল আন-নাজ্জার প্রমুখও কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার

পক্ষে মত দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল– নিউজিল্যান্ড ছাড়াও তো তার পূর্বে চ্যাথাম দ্বিপ, বাউন্টি দ্বিপ ইত্যাদি রয়েছে, সেগুলোকে হিসেবে কেন ধরা হল না? তাছাড়া আলাস্কা কা'বা শরীফ থেকে (গ্লোবে) সোজা উত্তরে– এদিকটা ধরা হল, সোজা দক্ষিণের মাপ কেন আনা হল না। সোজা দক্ষিণের মাপ দেখলে তো আর কা'বা শরীফকে মধ্যখান বলা যাবে না। তাছাড়া কা'বা শরীফ থেকে সোজা পূর্ব পশ্চিমের মাপ কেন আনা হল না? উপরের ডক্টরগণ মানচিত্রের হিসাব-নিকাশ করে যেমন কা'বা শরীফ বা মক্কাকে পৃথিবীর কেন্দ্র দেখানোর চেষ্টা করেছেন, ভিন্নরকম চেষ্টাও অনেকে করেছেন। নেটে مكة ليست بمركز এবং Mecca is not the Center of Earth শিরোনামে প্রচুর মানচিত্রের হিসাব-নিকাশ দেখে নেয়া যেতে পারে, যেগুলোতে দেখানো হয়েছে যে, ভৌগোলিক হিসাব-নিকাশেও কা'বা শরীফ বা মক্কা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র নয়। আর পৃথিবীর প্রাচীন ম্যাপ তো একটা কাল্পনিক বিষয়ের চেয়ে বেশি মর্যাদা রাখে না।

(দুই) কা'বা শরীফ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে অবস্থিত।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল– কা'বা শরীফ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে অবস্থিত হলে তার বিপরীত দিকের অঞ্চলও তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে অবস্থিত হবে, তাহলে সেটাকেও কি পৃথিবীর মাঝখান বলতে হবে?

(তিন) কেউ কেউ এক ধরনের ভিডিও দিয়ে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর কেন্দ্র প্রমাণ করতে চান। নেটে এ জাতীয় প্রচুর ভিডিও দেখা যায়। এসব ভিডিওতে বিশেষ সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে যা দেখানো হয় তাকে মোটামুটি এভাবে বর্ণনা করা যায়– যেন পৃথিবীর গ্লোবকে ক্যামেরার সামনে রাখা হয়। গ্লোবের যেখানে বাইতুল্লাহ সেই বরাবর স্থানকে ক্যামেরার কেন্দ্র বরাবর রেখে ক্রমান্বয়ে গ্লোবকে বড় করা হয়। আর এক পর্যায়ে গিয়ে বাইতুল্লাহই চোখের সামনে বড় হয়ে শেষ হয়, আর মনে হয় এ-ই তো বাইতুল্লাহই পৃথিবীর মধ্যখান। এই ভিডিও-র জবাব হচ্ছে– একটু চিন্তা করলেই যে কেউ বুঝবেন এই ভিডিও একটা ছেলেখেলা! এভাবে সলিমুদ্দীন কলিমুদ্দীনের গৃহ কিংবা কোন ফকির সন্নাসীর আশ্রমকেও পৃথিবীর কেন্দ্র দেখানো সম্ভব। এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। তা হল– এই ভিডিও প্রদর্শনের সময় বলা হয়, দেখুন বিজ্ঞান বলছে, কা'বা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র। কিন্তু এখানে বিজ্ঞানের কী রয়েছে তা তো বোধগম্য নয়। বিজ্ঞান শব্দ ব্যবহার করলেই কি তা বিজ্ঞানসম্মত হয়ে যায়? কোন্ বৈজ্ঞানিক কী বলেছে তা তো তারা মোটেই উল্লেখ করেন না। আবার এই ভিডিও প্রদর্শনের সময় কখনও কখনও গোল্ডেন রেশিওর কথাও উল্লেখ করা হয়। কিন্তু গোল্ডেন রেশিও আর কেন্দ্র কি এক জিনিস? কী দেখানো হয় আর কী দাবি করা হয়– এ তো সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলানো। আসলে এটাকে মানুষের সস্তা ধর্মীয় আবেগ কুড়ানোর চেষ্টা বৈ আর কিছু বলা যায় না। আর ধর্মীয় এই সস্তা আবেগ থেকেই গোল্ডেন রেশিওর ভিত্তিতে কা'বা শরীফ পৃথিবীর নাভি, মক্কা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র– এ জাতীয় কথা ও ভিডিও-র বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই-বাছাই ছাড়াই একজন থেকে আরেকজন অবলিলায় প্রচার করে যাচ্ছে। আর সহজ সরল বহু মানুষ তা দ্বারা আপ্লুত হচ্ছে। এভাবে আপ্লুত ও ভক্ত হওয়ার পর ভবিষ্যতে যদি কোনদিন সত্যিকারভাবেই শক্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এর ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয় তাহলে তখন কী হবে? তখন কি একথা প্রমাণিত হবে না যে, মুসলমানরা

ভুয়া আবেগে পরিচালিত হয়। ইসলামের শত্রুরা এমনতর উদ্দেশ্যেও অনেক কিছু প্রচার করে থাকে। মুসলমানদের এ বিষয়টা মাথায় রেখেই সব ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিত।

(৩) কেউ কেউ গুগল ম্যাপের বরাত দিয়ে কা'বা শরীফকে পৃথিবীর কেন্দ্র বা মাঝখান বলতে চান। কিন্তু গুগল ম্যাপের বরাত দিয়ে আবার অন্য রকমও তো বলা হয়েছে। তাতে তুরস্কের আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলের মধ্যবর্তী (আঙ্কারা থেকে সড়ক পথে প্রায় ২২৫ কি. মি. দূরে আনাতোলিয়া [أناضول] প্রান্তরের মাঝে অবস্থিত) কোরুম (corum/جوروم/تشوروم) অঞ্চলকে ভূভাগের কেন্দ্র বলা হয়েছে। নেটে تشوروم শিরোনামে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। আবার এ ব্যাপারেও সবার বক্তব্য সমান নয়। যেমন: ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিয়োর্নিয়ার শানডিয়াগোতে পদার্থবিদ এন্ড্রু গিহ (Andrew Gih) হিসাব-নিকাশ করে দাবি করেন যে, পৃথিবীর এ কেন্দ্রটি আঙ্কারা থেকে ১৫০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। (বরাত: শায়খ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ-এর আরবি প্রবন্ধ। নেটে দ্রষ্টব্য) তাহলে দেখা গেল এ ব্যাপারেও হিসাব-নিকাশ এক রকম নয়। অতএব বিষয়টা নিশ্চিত বা অকাট্য হল না।

সারকথা হচ্ছে– কা'বা শরীফ বা মক্কা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র– এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে সুস্পষ্ট ও সহীহ কোন দলীল নেই। কিছু ইশারা-ইংগিত পাওয়া গেলেও তা নিশ্চিত বা অকাট্য নয়। কেননা, সে ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাখ্যা বা ভিন্ন মতামতও রয়েছে। ভৌগোলিক বিচারে কা'বা শরীফ বা মক্কা শরীফ পৃথিবীর কেন্দ্র– এ ব্যাপারেও যারা যা বলেছেন তাও নিশ্চিত বা অকাট্য নয়। কেননা, সে ব্যাপারেও ভিন্ন ব্যাখ্যা বা ভিন্ন মতামত রয়েছে।

মদীনা মুনাওওয়ারা-র ভূগোল-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

১. মসজিদে নববী

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আসার পর এখানে (১ হি./৬২২ খৃ.) ৭০ হাত দৈর্ঘ ও ৬০ হাত প্রস্থের একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর ভিত্তি ছিল পাথরের, দেয়াল ছিল ইটের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের আর ছাদ ছিল খেজুর পাতার। উচ্চতা ছিল ৫ হাত। ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদটিতে দৈর্ঘের দিকে ৩০ হাত ও প্রস্থের দিকে ৪০ হাত বর্ধিত করেন। ফলে মসজিদটি দৈর্ঘ-প্রস্থে সমান (১০০ হাত × ১০০ হাত = ১০০০ বর্গহাত/৫০০ বর্গগজ।) হয়ে দাঁড়ায়। এসময় ছাদকে উঁচু করে ৭ হাত করা হয়। রসূলের মিম্বরের পশ্চিম দিকে ৫ম পিলারের উপর সাইডে, (আর উত্তর দিকের ১০ম পিলারের উপর সাইডে) আরবিতে লেখা রয়েছে 'হদ্দু মসজিদিন নবী আলাইহিস্ সালাম' অর্থাৎ, নবী আলাইহিস্ সালামের মসজিদের সীমানা। এর পর যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে মসজিদে নববী সম্প্রসারিত হয়েছে, যার একটা তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

যার আমলে	সন	সম্প্রসারণের দিক
১ নবী কারীম (সা.)	৭ হি./৬২৮ খৃ.	উত্তর ও পশ্চিম দিক
২ হযরত ওমর (রা.)	১৭ হি./৬৩৮ খৃ.	দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর
৩ হযরত উছমান (রা.)	২৯ হি./৬৪৯ খৃ.	দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর
৪ ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক	৯১ হি./৭১০ খৃ.	পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর
৫ মাহ্দী আব্বাসী	১৬৫ হি. উত্তর	
৬ আশরাফ ক্বায়তাবী	৮৮৮ হি./১৪৮৩ খৃ.	উত্তর (সোয়া ২ হাত)
৭ আব্দুল মজীদ উছমানী	১২৭৭ হি./১৮৬১ খৃ.	উত্তর
৮ বাদশাহ আব্দুল আযীয	১৩৭৫ হি./১৯৫৫ খৃ.	উত্তর ও পূর্ব
৯ বাদশাহ ফাহাদ	১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.	উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম

সর্বশেষ সম্প্রসারণের পর বর্তমানে মসজিদের উভয় তলা ও চতুর্দিকের আঙ্গিনায় একসঙ্গে প্রায় ৭ লক্ষ মুসল্লীর স্থান সংকুলান হয়। (المساجد الأثرية و تاريخ المدينة المنورة و بيوت الصحابة)

চিত্র নং ১২৮ – বর্তমান মসজিদে নববী

২. মসজিদে নববী সংলগ্ন কিছু জিনিস

● **রিয়াযুল জান্নাত:** রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুজ্‌রা (যেখানে রসূল [সা.]-এর রওযা মোবারক অবস্থিত) এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু 'রিয়াযুল জান্নাত' বা বেহেশতের বাগান নামে পরিচিত। রিয়াজুল জান্নাত–এর সীমানা হল পূর্বে হুজরা শরীফ থেকে পশ্চিমে মিম্বার শরীফ পর্যন্ত। আর হুজরা শরীফের দক্ষিণ পশ্চিম কোণা বরাবর পিলার থেকে উত্তর দিকে পঞ্চম পিলার পর্যন্ত। বর্তমানে রিয়াজুল জান্নাত স্থানটুকুতে সবুজ ডিজাইন বিশিষ্ট সাদা কার্পেট বিছানো থাকে।

এ স্থান সম্বন্ধে বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝখানটুকু জান্নাতের এক বাগান। (صحيح البخاري حديث رقم ١١٩٥ وصحيح مسلم حديث رقم ١٣٩١)

হতে পারে এ স্থানটুকুকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে এই অর্থে যে, কেয়ামতের দিন এ স্থানটুকুকে জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে। কিংবা হতে পারে এ অর্থে যে, কেউ এখানে ইবাদত

করলে সে জান্নাতের একটা বাগান লাভ করবে। কিংবা এ অর্থে যে, এ স্থানটুকু ইল্‌ম, আমল ও ইবাদতের পরিবেশ হওয়ায় যেন জান্নাতের বাগান।

চিত্র নং ১২৯ – রিয়াজুল জান্নাত

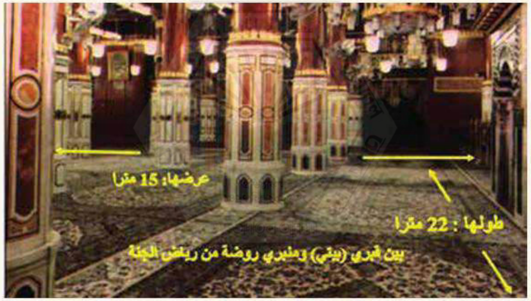

চিত্র নং ১৩০ – রিয়াজুল জান্নাত

● **রিয়াযুল জান্নাতে বিশেষ কয়েকটি স্তম্ভ:** রিয়াযুল জান্নাত অংশের মধ্যে সাতটি স্তম্ভ বা উস্তুওয়ানা রয়েছে, এগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বলা হয়। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে এগুলোর পাশে নফল নামায পড়া উত্তম। উস্তুওয়ানা সাতটি এই:

১। **উস্তুওয়ানা ছারীর:** এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ'তেকাফ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর খাট (খেজুর গাছের উপকরণ দিয়ে তৈরী খাট) এখানে স্থাপন করা হত। এ স্তম্ভটি হুজ্‌রা শরীফের পশ্চিম পাশে জালি মোবারকের সঙ্গে রয়েছে। কখনও কখনও এতেকাফের সময় উস্তুওয়ানা আবূ লুবাবার সামনে কেবলার দিকে তাঁর খাট স্থাপন করা হত। (معالم دار الهجرة والدر الثمين)

২। **উস্তুওয়ানা হার্‌ছ:** রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুজ্‌রা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন কোন না কোন সাহাবী পাহারার জন্য এখানে বসতেন। এটিকে 'উস্তুওয়ানা আলী'ও বলা হয়। কারণ, হযরত আলী (রা.)ও এখানে পাহারায় বসতেন। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারকের সঙ্গে উস্তুওয়ানা ছারীরের উত্তর পাশে রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ দিয়েই হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরা থেকে বের হয়ে রিয়াজুল জান্নাতে প্রবেশ করতেন। (معالم دار الهجرة والدر الثمين)

৩। **উস্তুওয়ানা উফূদ:** বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধি দল এখানে বসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে এখানেই বসে কথা বলতেন। এখানেই বনু তামীম গোত্রের প্রতিনিধিরা জোর আওয়াজে নবীকে ডাক দেওয়ায় সূরা হুজুরাতের ৪ ও ৫ নং আয়াতদ্বয় নাযেল হয়েছিল, যাতে বলা হয়েছে, যারা হুজরার বার থেকে তোমাকে ডাক দেয়, তাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি নেই (নতুবা এমন দুঃসাহস করত না।) যদি তারা তাদের নিকট তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করত, তবে তাদের জন্য উত্তম হত। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারকের সঙ্গে উস্তুওয়ানা হার্‌ছের উত্তর পাশে রয়েছে। (معالم دار الهجرة والدر الثمين)

৪। **উস্তুওয়ানা আবূ লুবাবা (রা.):** রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনূ কুরাইযাকে অবরোধ করার পর তারা হযরত আবূ লুবাবা আনসারী (রা.)কে ডেকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা মুহাম্মাদের কথামত দূর্গ থেকে নেমে আসব কি না? হযরত আবূ লুবাবা তখন বলেন, হাঁ। সেই সঙ্গে তিনি হাত দিয়ে গলার দিকে ইশারাও করেন। এভাবে তিনি বোঝান যে, তোমাদের গলা কাটা হবে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝতে পারেন যে, এটা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে খেয়ানত হয়েছে। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না এসে সোজা মসজিদে নববীতে এসে নিজেকে এই স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তওবা কবূল না হবে কিংবা মরে না যাব ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সঙ্গে বাঁধা থাকব। এভাবে দীর্ঘ ৯ দিন থাকার পর হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর তওবা কবূল হল। (এই ৯ দিন তার কন্যা এসে নামায ও হাজত পূরণ করার জন্য তাকে মুক্ত করে দিত আবার পরে সেখানেই বেঁধে দিত।) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তওবা কবূল হওয়ার কথা বলার পর লোকেরা তার বাঁধন খুলে দিতে এলে তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল ব্যতীত আর কেউ এ বাঁধন খুলবে না। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দেন। এটি উস্তুওয়ানা ছারীরের পশ্চিম পাশে এবং উস্তুওয়ানা আয়েশার পূর্ব পাশে রিয়াজুল জান্নাতের ভিতর অবস্থিত। উস্তুওয়ানা আবী লুবাবাকে 'উস্তুওয়ানাতুত্তাওবা' তথা তওবার স্তম্ভও বলা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্তম্ভের পাশে নফল নামায পড়েছেন। কখনও কখনও এতেকাফের সময় এই স্তম্ভের সামনে কেবলার দিকে তাঁর খাট স্থাপন করা হত, আর তিনি এর সঙ্গে হেলান দিয়ে বসতেন। (تاريخ المدينة المنورة والدر الثمين ومعالم دار الهجرة)

৫। **উস্তুওয়ানা আয়েশা (রা.):** তাবারানীর এক রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার মসজিদে এমন একটি জায়গা রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে নামায পড়ার ফযীলত জানত, তবে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারীর প্রয়োজন দেখা দিত। (مجمع الزوائد ١٠/٤ عن الطبراني في الأوسط) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর ভাগ্নে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্তম্ভ। এটি উস্তুওয়ানা আবূ লুবাবার পশ্চিম পাশে রিয়াজুল জান্নাতের ভিতর অবস্থিত। এটিকে 'উস্তুওয়ানাতুল কুর্‌আহ' (অর্থ– লটারীর স্তম্ভ)ও বলা হয়। কেবলার হুকুম পরিবর্তনের পর কয়েক মাস এটির পাশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামায পড়িয়েছেন। (تاريخ المدينة المنورة والدر الثمين ومعالم دار الهجرة)

৬। উস্তুওয়ানা মুখাল্লাক্বাহ: মিম্বরে নববীর ডান (পূর্ব) পাশে অবস্থিত খেজুর বৃক্ষের গুড়ির স্থানে নির্মিত স্তম্ভটি। যে গুড়িটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বার (দ্রষ্টব্য) স্থানান্তরের সময় উঁচু স্বরে কেঁদেছিল। সাহাবায়ে কেরামও এ কান্না শুনেছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুড়িটিকে শান্ত্বনা দিয়েছিলেন। মুখাল্লাক্বাহ শব্দের অর্থ খালূকযুক্ত। খালূক বলা হত যাফরান ও আরও কয়েকটি সুগন্ধির সমন্বয়ে তৈরীকৃত মিশ্রিত এক ধরনের সুগন্ধিকে। এরূপ নামকরণের কারণ হল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্তম্ভের উপর নাকের শিকনি লাগানো দেখে অপছন্দ করায় এক সাহাবী উঠে সেই শিকনি অপসারণ করেন এবং সেই স্থানে খালূক সুগন্ধি লাগিয়ে দেন। এ স্তম্ভটিকে 'উস্তুওয়ানা হান্নানাহ'ও বলা হয়। 'হান্নানাহ' শব্দের অর্থ দুঃখ বা আনন্দে জোরে শব্দ করা। স্তম্ভটি যে গুড়ির স্থানে নির্মিত সেটি দুঃখে কেঁদেছিল বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে। (تاريخ المدينة المنورة والدر الثمين و معلم الحجاج)

৭। উস্তুওয়ানা জিব্রীল (আ.): হযরত জিব্রীল (আ.) যখনই হযরত দেহ্ইয়া কাল্‌বী (রা.)-এর আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেত। এটি রওযা শরীফের জালির ভিতরে পড়েছে। ফলে বাইরে থেকে এটি দেখা যায় না। (معلم الحجاج)

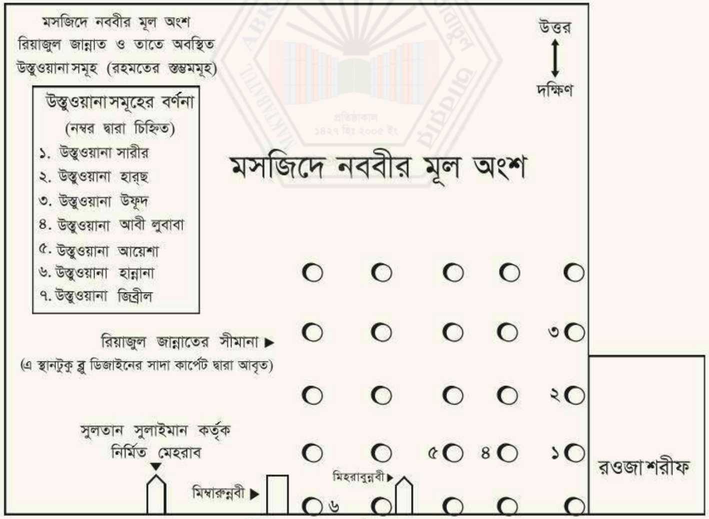
মসজিদে নববীর মূল অংশ
রিয়াজুল জান্নাত ও তাতে অবস্থিত
উস্তুওয়ানাসমূহ (রহমতের স্তম্ভসমূহ)
উত্তর
দক্ষিণ
উস্তুওয়ানাসমূহের বর্ণনা
(নম্বর দ্বারা চিহ্নিত)
১. উস্তুওয়ানা সারীর
২. উস্তুওয়ানা হার্‌ছ
৩. উস্তুওয়ানা উফূদ
৪. উস্তুওয়ানা আবী লুবাবা
৫. উস্তুওয়ানা আয়েশা
৬. উস্তুওয়ানা হান্নানা
৭. উস্তুওয়ানা জিব্রীল
মসজিদে নববীর মূল অংশ
রিয়াজুল জান্নাতের সীমানা ▶
(এ স্থানটুকু ব্লু ডিজাইনের সাদা কার্পেট দ্বারা আবৃত)
৩
২
সুলতান সুলাইমান কর্তৃক
নির্মিত মেহরাব
৫
৪
১
রওজা শরীফ
মিহরাবুন্নবী ▶
মিম্বারুন্নবী ▶
৬

চিত্র নং ১৩১ – উস্তুওয়ানাসমূহ

● **মিম্বারুন্নবী:** শুরুর দিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর খুতবা দিতেন কোন কিছুতে হেলান না দিয়ে। পরে দীর্ঘ দাঁড়ানো হলে মসজিদের একটি খেজুর গাছের গুড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। এই গুড়িটি ছিল বর্তমান মিম্বারের স্থান ও মিহরাবের মাঝে উস্তুওয়ানা হান্নানা (উস্তুওয়ানা মুখাল্লাকাহ)-এর নিকটবর্তী। পরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গাবাহ (মদীনার উত্তর দিকে ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী জঙ্গল এলাকা, যার বর্তমান নাম খুলাইল)-এর ঝাউ গাছের কাঠ দিয়ে তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বার বানানো হয় এবং মিম্বারটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশক্রমে বর্তমান স্থানে স্থাপন করা হয়। তখন থেকে সেখানেই মিম্বর রয়েছে। এটিকেই বলা হয় মিম্বারুন্নবী তথা নবীর মিম্বার। মিম্বারটি ছিল ২ হাত ১ বিঘত ৩ আঙ্গুল দৈর্ঘ এবং ১ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট। (الدر الثمين ومعالم دار الهجرة)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বারের বিশেষ ফযীলত রয়েছে, বোখারী মুসলিমের রেওয়ায়েতে এসেছে– আমার মিম্বার আমার হাউযে (কাউছারে)র উপর স্থাপিত। (صحيح البخاري حديث رقم ١١٩٥ وصحيح مسلم حديث رقم ١٣٩١)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের উপরের ধাপে বসতেন এবং কদম মুবারক রাখতেন দ্বিতীয় ধাপে। পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আদব রক্ষার্থে দ্বিতীয় ধাপে বসতেন এবং পা রাখতেন তৃতীয় ধাপে। হযরত ওমর (রা.) তৃতীয় ধাপে বসে মাটিতে পা রাখতেন। হযরত উছমান (রা.) ৬ বৎসর তৃতীয় ধাপে বসেন, তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধাপে বসতেন সেই ধাপে বসতে আরম্ভ করেন।

হযরত মুআবিয়া (রা.) তাঁর শাসনামলে মিম্বারে আরও ৬টি সিড়ি যোগ করেন, ফলে মিম্বার মোট ৯ ধাপ বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। তখন সপ্তম সিড়িতে বসা হত। ৬৫৪ হিজরিতে মসজিদে নববীতে আগুণ লাগায় মিম্বারটি জ্বলে যায়। তখন যা অবশিষ্ট ছিল তা খেজুর গাছের গুড়িটির কাছে সিন্দুকে ভরে দাফন করে দেয়া হয়। তার পর ইয়ামানের বাদশাহ মুজাফফার নির্মিত একটি মিম্বার ব্যবহার করা হয়, তার পর আরও কয়েকজনের তৈরী মিম্বার ব্যবহার করা হয়। অবশেষে আশরাফ ক্বায়তবাই ৮৮৮ হিজরিতে একটি মিম্বার তৈরি করেন। অবশেষে সুলতান মুরাদ উছমানী তৃতীয় ৯৯৮ হিজরিতে একটি মিম্বার হাদিয়া পাঠান। তখন সেই মিম্বারটি স্থাপন করা হয় এবং আশরাফ ক্বায়তবাই নির্মিত মিম্বারটি মসজিদে কুবায় প্রেরণ করা হয়, যা আজ পর্যন্ত মসজিদে কুবায় রয়েছে। সুলতান মুরাদ উছমানী প্রেরিত সেই মিম্বারটিই অদ্যাবধি মসজিদে নববীতে রয়েছে। এ মিম্বারটি ১২ ধাপ বিশিষ্ট, যার ৩টি ধাপ দরজার বাইরে আর ৯টি দরজার ভিতরে। (الدر الثمين ومعالم دار الهجرة)

উল্লেখ্য, মিম্বারুন্নবী ও মিহরাবুন্নবী বলতে একই জিনিসকে বোঝানো হয় না। বরং উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। সামনে মিহরাবুন্নবী সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

চিত্র নং ১৩২ – মিম্বারুন্নবী

● **মিহ্রাবুন্নবী:** রিয়াজুল জান্নাতের মধ্যে মিম্বারুন্নবীর পূর্ব দিকে একটি মিহরাব রয়েছে, এটি মিহরাবুন্নবী তথা নবীর মিহরাব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বা এর কাছে নামায পড়তেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় এখানে কোনো মিহরাব বানানো ছিল না। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরুতে এটি বানানো হয়। (معالم دار الهجرة)

চিত্র নং ১৩৩ – মিহরাবুন্নবী

● **মিহ্রাবে সুলাইমানী:** মিম্বারুন্নবীর পশ্চিম দিকে একটি মিহরাব দেখা যায়, এটা মিহরাবে সুলাইমানী নামে পরিচিত। মিহরাবটার পিঠে অংকিত লেখা অনুযায়ী ৯০৮ হিজরীতে সুলতান সুলাইমান শাহ ইবনে সালীম খান ইবনে বায়েজীদ খান এটি নির্মাণ করেন। 'আদ্দুররুছ্ছামীন' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী এই মিহরাবটা নির্মাণের কারণ হল তখন মেহরাবুন্নবীতে ইমামত করত একজন বেদআতী ইমাম, যার পিছনে অনেকে এক্তেদা করতে চাইত না। তাই সুলতান সুলাইমান উছমানী এই মিহরাবটা নির্মাণ করান। মিহরাবটাকে 'আল-মিহরাবুল হানাফী'ও বলা হয়। "মা'আলিমু দারিল হিজরা" গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী মিহরাবটার মূল নির্মাতা হলেন তুগান শায়খ। ৮৬০ হিজরীর পর এটা নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে সুলতান সুলাইমান উছমানী এটাকে সাদা কাল মার্বেল পাথরে সজ্জিত করেন। (الدر الثمين ومعالم دار الهجرة)

চিত্র নং ১৩৪ – মিহরাবে সুলাইমানী (পেছন দিক)

● **মিহ্রাবে তাহাজ্জুদ:** রওযায়ে আতহার বর্তমানে যে দেয়ালঘেরা ঘরটির মধ্যে অবস্থিত, এই ঘরটির দক্ষিণ পাশের অংশ ছিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরা। মূলত এই হুজরার মধ্যেই রওযায়ে আতহার অবস্থিত। আর এই দেয়ালঘেরা ঘরটির উত্তরের অংশ ছিল হযরত ফাতেমা (রা.)-এর হুজরা। এই ফাতেমার হুজরার উত্তর পাশে মিহরাবে তাহাজ্জুদ। বলা হয়, এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। যদিও সুবিদিত হল রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায ঘরে পড়তেন। বস্তুত এই মিহরাবে তাহাজ্জুদ বর্তমানে একটু উঁচু প্লাটফরমের মত। সুলতান আব্দুল মজীদের আমলে এটিকে সংস্কার করা হয় এবং সামনে উপরে ঘরের দেয়ালে তাহাজ্জুদের নির্দেশ সংক্রান্ত সূরা বানী ইসরাঈলের এই আয়াত (৭৯ নং আয়াত) লিখে দেয়া হয়[১]–

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.

---

[১] তথ্যসূত্র: معالم دار الهجرة

চিত্র নং ১৩৫ – মিহরাবে তাহাজ্জুদ

● **আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র স্থান:** তখনকার মসজিদে নববীর পিছন দিকে ছায়া ঘেরা একটু স্থানের ব্যবস্থা ছিল, যেখানে সহায় সম্বলহীন ও আনসারীদের মধ্যে পরিচিত কেউ নেই– এমন সাহাবায়ে কেরাম থাকতেন। তাদেরকে বলা হত 'আহ্‌লে সুফ্‌ফা'। তারা সর্বক্ষণ ইল্‌ম শেখায় ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন, জেহাদেও যেতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার পর শিক্ষক হয়ে নিজ দেশে ফিরে যেতেন। আহ্‌লে সুফ্‌ফা–র সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে কম বেশ হত। সাধারণত ৭০ জনের মত ছিল। কোন কোন সময় শত পার হয়ে যেত, যখন মেহমান ও প্রতিনিধিদল বেশি হত। আবার আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র কারও বিয়ে-শাদী বা মৃত্যু হলে সংখ্যা কমেও যেত। আহ্‌লে সুফ্‌ফা–র মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন হযরত আবূ হুরাইরা, বেলাল, ছুহায়েব, সালমান ফার্সী, আবূ যর গিফারী, হানজালা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম মাওলা আবী হুযাইফা, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ।

আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র স্থান কোনটা তা নিয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতবিরোধ ছিল না। পরবর্তী ও সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ এটা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের অনেকে মনে করেন বাবে জিব্রীল দিয়ে প্রবেশ করে হুজরা শরীফের বরাবর এলে ডান পাশে যে উঁচু স্থানটা দেখা যায় এটাই আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র স্থান। এটাকে 'দুক্কাতুল আগওয়াত' (دكة الأغوات)ও বলা হয়। দুক্কাত বলা হয় খোলা জায়গায় নির্মিত বসার স্থানকে। আর তুর্কী ভাষায় আগওয়াত শব্দের অর্থ হল নেতা, শায়খ। অতএব দুক্কাতুল আগওয়াত অর্থ মাশায়েখ ও নেতাদের বসার উন্মুক্ত স্থান। এখানে দুক্কাতুল আগওয়াত বলে বুঝানো হয়েছে পাহারাদার ও খেদমতগারদের স্থান। হুজরা শরীফের পাহারাদার ও মসজিদের খাদেমগণ এখানে বসতেন। এর ৪ মিটার উত্তরে ছিল মিহরাবু মাশাইখিল হারাম। কাযী ইয়ায, যাহাবী ও ইবনে হাজার প্রমুখের মতে কেবলার হুকুম পরিবর্তনের পর কেবলা হয়ে যায় উত্তর দিকের পরিবর্তে দক্ষিণ দিক। তখন মসজিদের এই উত্তর দিকের যে দেয়াল ছিল ঐ দেয়ালের পাশেই থাকতেন আহ্‌লে সুফফা। নবী (আ.)-এর নির্দেশে এটাকেই ছাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এটাই হল

আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র স্থান। এই মতানুসারে বর্তমান দুক্কাতুল আগওয়াতের পশ্চিমে ছিল আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র স্থান। এই আহলে সুফফার স্থান বানানো হয়েছিল কেবলার হুকুম পরিবর্তনের পরে। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের পর মসজিদ সম্প্রসারিত হলে আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র স্থান আরও উত্তরে চলে যায়। (بيوت الصحابة والدر الثمين وآثار المدينة المنورة)

বস্তুত দুক্কাতুল আগ্‌ওয়াত আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র স্থান নয়। কারণ, এ স্থানটুকু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরও বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, এটা আহ্‌লে সুফ্‌ফা-র স্থান ছিল না। বরং সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী ও পরবর্তীতে তার অনুসরণে অনেক বাদশাহ এখানে বেতনভুক্ত পাহারাদারদের থাকার ব্যবস্থা করেন। (بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف)

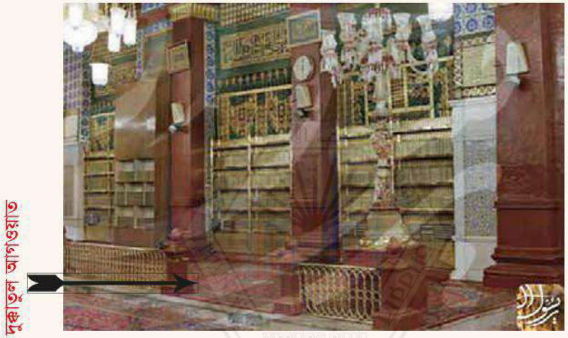

চিত্র নং ১৩৬ – দুক্কাতুল আগওয়াত

● **মসজিদে নববীর কারুকার্যতা:** সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে কারুকার্যতা আনেন ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক (৮৮ হি./৭০৭ খৃ.–৯১ হি./৭১০ খৃ.)। তিনিই সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে চারটি মিনারা বানান। তারপর সুলতান আব্দুল মজীদ উছমানী (১২৬৫ হি./১৮৪৮ খৃ.– ১২৭৭ হি./১৮৬১ খৃ.) মসজিদে নববীর গোটা ছাদকে গম্বুজবিশিষ্ট ছাদে পরিণত করেন, যা সীসা দিয়ে ঘেরা। তার পর আব্দুল্লাহ যুহদী আফিন্দী এই গম্বুজগুলোর ভিতর দিকে, দেয়ালে, স্তম্ভে ও মেহরাবগুলোতে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ খোদাই করে লেখেন। সৌদী সরকারের আমলে এ লেখা ও কারুকার্যগুলোকে পুনরায় স্বর্ণের পানি দিয়ে মণ্ডিত করা হয়। (معالم دار الهجرة والمساجد الأثرية)

● **মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ:** সর্বপ্রথম হুজরা শরীফের উপর গম্বুজ নির্মাণ করেন সুলতান মানসূর ৬৭৮ সনে। যা নিচের দিকে ছিল চতুর্ভূজ এবং উপর দিকে অষ্টভূজ। এর পূর্বে হুজরা শরীফের উপর কোন গম্বুজ নির্মাণ করা হয়নি। বরং তখন হুজরা শরীফ ছিল কমর পর্যন্ত উঁচু ইটের দেয়ালঘেরা সাদামাটা অবস্থানে। সুলতান মানসূর নির্মিত এই গম্বুজটি ছিল কাঠের, যার উপর সীসার পাত দিয়ে ঘেরা ছিল, যাতে হুজরার মধ্যে বৃষ্টির পানি যেতে না পারে। এরপর সুলতান নাসির হাসান ইবনে

মুহাম্মাদ এটি পুনঃনির্মাণ করেন। তার পর আশরাফ ক্বায়তবাই এটিকে পাথর দিয়ে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ হতে হতে অবশেষে ১২৩৩ হিজরীতে গম্বুজে ফাটল দেখা দিলে সুলতান মাহমূদ খান উছমানী (দ্বিতীয়) গম্বুজটি গোড়া থেকে ভেঙ্গে মজবূত করে পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি এটিকে সবুজ রঙে রঙ্গিন করেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সেই গম্বুজটিই রয়েছে, যার উপর সবুজ রঙ লাগানো হয়ে থাকে। এই সবুজ রঙ লাগানো গম্বুজকে আরবিতে বলা হয় আল-কুব্বাতুল খাদ্‌রা'। ফার্সী ও উর্দূতে বলা হয় 'গুম্বুদে খাদ্‌রা'। (معالم دار الهجرة و آثار المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৩৭ – গুম্বুদে খাদ্‌রা

● **মুসল্লাল জানায়েযঃ** বর্তমান মসজিদে নববীর 'বাবুল বাকী' নামক দরজা দিয়ে বের হলে বাম দিকে অর্থাৎ, দরজাটির উত্তর দিকে যে ঘেরা-দেওয়া জায়গাটা রয়েছে, এটাই হল মুসল্লাল জানায়েয (مصلي الجنائز) তথা জানাযা নামাযের স্থান। এর পশ্চিম দিকের কিছু অংশ মসজিদের দেয়ালের ভেতর (হুজরা শরীফ পর্যন্ত) পড়েছে। আর অবশিষ্ট অংশ মসজিদের দেয়ালের বাইরে রয়েছে। বাইরের অংশটুকুকে তুর্কী উছমানীরা ঘেরা দিয়ে রেখেছিল। সেভাবেই এখনও (২০১৯ সাল পর্যন্ত) ঘেরা-দেয়া অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে এর মধ্যে মসজিদের জরুরী কিছু সামানপত্র রাখা হয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা শরীফের পূর্ব পাশে উত্তর দক্ষিণে লম্বা এই স্থানটুকু খালি রেখেছিলেন তখনকার হাবশা গলি ও বাকী' গলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য। এটাকেই জানাযার নামাযের জন্যও ব্যবহার করা হত। উল্লেখ্য, হাবশা গলি (زقاق الحبشة) ছিল বর্তমান মসজিদে নববীর বাবুল বাকী' নামক দরজা দিয়ে বের হলে ডান দিকে মসজিদ সংলগ্ন যে হল রয়েছে, (যেটাকে 'দক্ষিণের হল' বলা হয়) এই হলের দক্ষিণ পূর্ব কোণা থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত যে গলি ছিল সেই গলিকে। এই গলির মুখেই ছিল হযরত আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা.)-এর বাড়ি। (بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف)

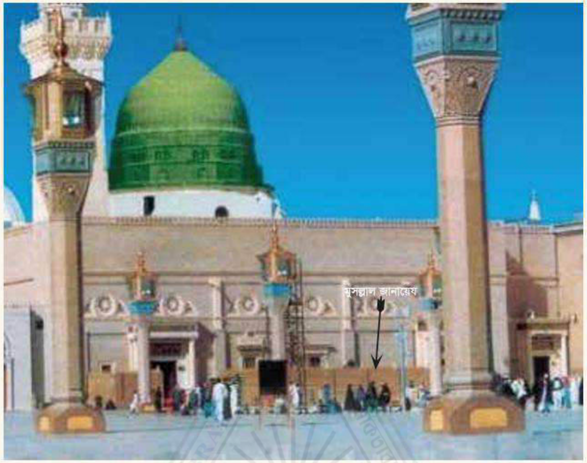

চিত্র নং ১৩৮ – মুসল্লাল জানায়েয

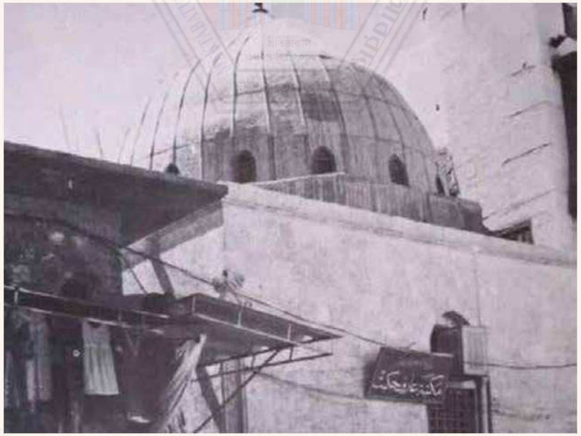

ছবি নং ১৩৯ – এক সময়ের আবূ আইয়্যূব আনসারী (রা.)-এর বাড়ির ছবি

● **রসূল (সা.)-এর বিবিদের হুজরাসমূহের স্থান:** রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর বিবিদের হুজরাগুলো ছিল তখনকার মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব কোণ থেকে শুরু করে পুরো পূর্ব দিক এবং পূরো উত্তর দিক বাবে রহমত (উত্তর পশ্চিম কোণ) পর্যন্ত। শুধু হযরত হাফসা (রা.)-এর হুজরা ছিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরার দক্ষিণ পাশে যেখানে দাঁড়িয়ে এখন রওজায়ে আতহারের মুখোমুখী হয়ে সালাম পেশ করা হয়। কারও কারও মতে বিবিদের সব হুজরা শুধু পূর্ব দিকেই ছিল, উত্তর দিকে কোনো হুজরা ছিল না। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ জানার জন্য দ্রষ্টব্য بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف ।

বাদশাহ ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিকের যুগে (৮৮ হি./ ৭০৭ খৃ.- ৯১ হি./৭১০ খৃ.) যখন বিবিদের কেউ জীবিত ছিলেন না, তখন পূর্ব দিকে মসজিদ প্রশস্ত করার সময় বিবিদের হুজরাসমূহ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। (الدر الثمين وبيوت الصحابة)

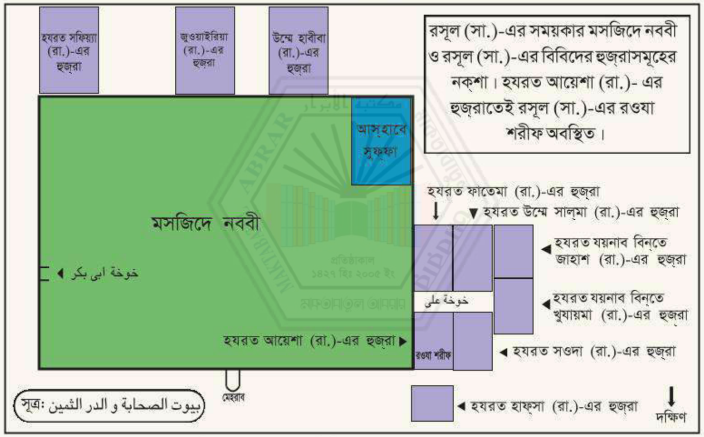
হযরত সফিয়্যা (রা.)-এর হুজরা
জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর হুজরা
উম্মে হাবীবা (রা.)-এর হুজরা
রসূল (সা.)-এর সময়কার মসজিদে নববী ও রসূল (সা.)-এর বিবিদের হুজরাসমূহের নক্শা। হযরত আয়েশা (রা.)- এর হুজ্রাতেই রসূল (সা.)-এর রওযা শরীফ অবস্থিত।
আস্হাবে সুফ্ফা
হযরত ফাতেমা (রা.)-এর হুজ্রা
হযরত উম্মে সাল্মা (রা.)-এর হুজ্রা
মসজিদে নববী
হযরত যয়নাব বিন্তে জাহাশ (রা.)-এর হুজ্রা
خوخة ابى بكر
خوخة على
হযরত যয়নাব বিন্তে খুযায়মা (রা.)-এর হুজ্রা
হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজ্রা
রওযা শরীফ
হযরত সওদা (রা.)-এর হুজ্রা
মেহরাব
হযরত হাফ্সা (রা.)-এর হুজ্রা
দক্ষিণ

সূত্র: بيوت الصحابة و الدر الثمين

চিত্র নং ১৪০ – বিবিদের হুজরাসমূহের স্থান

● **ছাক্বীফায়ে বনু সায়েদা:** 'ছাকীফা' অর্থ আশ্রয়কেন্দ্র, ছাউনী। ছাক্বীফায়ে বনু সায়েদা ছিল বনু সায়েদা গোত্রের এরূপ একটা স্থান। এই গোত্রের বসবাস ছিল মসজিদে নববীর উত্তর পশ্চিম দিকে। বর্তমান মসজিদে নববীর উত্তর পশ্চিম আঙ্গিনার কোণে ২০৬ মিটার দূরে এখনও ছাক্বীফায়ে বনু সায়েদার কিছু স্থান গাছ-ঘেরা অবস্থায় রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাক্বীফায়ে বনু সায়েদায় বসেছেন, নামায পড়েছেন। বহু হাদীছে ছাক্বীফায়ে বনু সায়েদার কথা উল্লেখিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর খলীফা নির্ধারণের বিষয়ে মুহাজির ও আনসারীদের মধ্যে এখানেই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল। (بيوت الصحابة وتاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৪১ – ছাক্বীফায়ে বনু সায়েদার স্থান

মদীনার কয়েকটি ঐতিহাসিক মসজিদ

১. মসজিদে কুবা

যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখন প্রথমে তিনি কুবা এলাকায় বনূ আম্র ইবনে আউফ গোত্রের কুলছুম ইবনুল হাদ্মের গৃহে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উট বাঁধার স্থানটা নেন এবং নিজ হাতে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই হল কুবার মসজিদ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে নির্মাণ করা মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। এই কুবা এলাকা ছিল বনু আম্র ইবনে আউফ গোত্রের বাসস্থান।

মসজিদে কুবা মসজিদে নববী থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৩.২ কি. মি. দূরে অবস্থিত। সর্বশেষ ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ. সম্প্রসারণের পর বর্তমানে (২০১৯ সাল পর্যন্ত) মসজিদটিতে একসঙ্গে ২০ হাজার মুসল্লী নামায আদায় করতে পারেন। সর্বশেষ সম্প্রসারণকালে কুলছুম ইবনুল হাদ্মের গৃহটাও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বর্তমান মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ছিল তার গৃহ। (تاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৪২ – মসজিদে কুবা

মসজিদে যিরার-এর স্থান

মসজিদে কুবার কেবলার দিকের বামদিকে নিকটেই ছিল মসজিদে যিরার। যদিও এই মসজিদের স্থান চেনার মধ্যে বা সেখানে যাওয়ার মধ্যে কোনো বরকত নেই, তবে শুধু ইতিহাস জানার পিপাসা নিবারণের জন্যই এ সম্বন্ধে কিছু কথা লিখে দেয়া হল।

মসজিদটা ছা'লাবা ইবনে হাতিব ও মুআত্তিব ইবনে কুশায়ের প্রমুখ ১২ জন মুনাফেক মিলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমালোচনা, তাঁর নিন্দা, মুসলমানদের ক্ষতিসাধন ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ঘাটি স্বরূপ তৈরি করেছিল। তাদের নেতা আবূ আমের শাম থেকে খবর পাঠিয়েছিল যে, তোমরা আমার জন্য একটা ঘাটি তৈরী কর, আমি মুহাম্মাদকে বহিষ্কার করার জন্য আসছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূকের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন সময় তারা এসে বলেছিল, আমরা অসুস্থ্য ও দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য এবং প্রচণ্ড শীতের সময়ে যখন মসজিদে কুবায় যাওয়া সম্ভব হবে না সে সময়ের জন্য এ মসজিদটি নির্মাণ করেছি। আমরা চাই আপনি এসে এখানে নামায পড়ে যাবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আমি এখন সফরের প্রস্তুতিতে রয়েছি, আল্লাহ চান তো ফিরে আসার পর তোমাদের সঙ্গে ওখানে নামায আদায় করব। এরপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফেরার পথে মদীনার কাছে 'যী-আওয়ান' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন তিনি ওহী মারফত মসজিদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পান। (তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার ১০৭ থেকে ১০৯ মোট ৩টা দীর্ঘ আয়াত নাযেল হয়। এ আয়াতগুলোর মধ্যে তাদের অসদুদ্দেশ্য এবং খারাপ পরিণতির কথা জানানো হয়েছে।) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিক ইবনে দুখ্শুম ও মা'ন ইবনে আদী বা তার ভাই আসেম ইবনে আদীকে বলেন, তোমরা এই (তথাকথিত) মসজিদে যাও, এর অধিবাসীরা অপরাধী। ঐ মসজিদকে গুড়িয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও। তারা দুজন দ্রুত গিয়ে মসজিদটা জ্বালিয়ে দেন। ভিন্ন বর্ণনায় যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্যে ওয়াহ্শী (রা.)সহ আরও অনেকে ছিলেন। তাফসীরে মাজহারীর বর্ণনামতে পরবর্তীতে এখানে অনেকে বসবাস করেছেন, কিন্তু তাদের কারও সন্তান-সন্তুতি হয়নি বা হলেও বেঁচে থাকেনি। এমনকি ঐতিহাসিকরা লিখেছেন এখানে কোনো প্রাণী বা পাখী থাকলে তারাও সন্তান দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। (وفاء الوفاء و آثار المدينة المنورة لابن النجار ও তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন)

২. মসজিদে জুমুআ

হিজরত করে মদীনায় আসার পর প্রথম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবা এলাকায় কয়েকদিন (এক বর্ণনামতে ৪ দিন) থাকেন। তার পর তিনি মদীনার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হন। মসজিদে কুবা থেকে ৮০০ মিটার উত্তরে অগ্রসর হয়ে বনু সালেম গোত্রের এলাকায় পৌঁছেন। এখানেই তিনি সর্বপ্রথম জুমুআর নামায আদায় করেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটিই হল মসজিদে জুমুআ। মসজিদে নববী থেকে এটির দূরত্ব প্রায় ২.৫ কি. মি.। সর্বশেষ ১৪১২ হিজরীতে বাদশাহ ফাহদের আমলে এটির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে (২০১৯ সাল পর্যন্ত) এখানে একসঙ্গে ৬৫০ জন মুসল্লী নামায আদায় করতে পারেন। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية والقاموس المحيط)

চিত্র নং ১৪৩ – মসজিদে জুমুআ

৩. মসজিদে ইতবান ইবনে মালিক

বনু সালেম গোত্রের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত ইতবান ইবনে মালিক (রা.) শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এবং বাড়ি ও মহল্লার মসজিদের মাঝে পানি প্রবাহিত হওয়ার উপত্যকা থাকার কারণে যখন মহল্লার মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়েন, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেন তিনি যেন তার বাড়িতে গিয়ে এক স্থানে নামায আদায় করেন। তাহলে সেই স্থান বরকতময় হবে আর তিনি ঘরের সেই স্থানকে নামাযের স্থান বানাবেন এবং সেখানে নামায আদায় করবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গৃহে গিয়ে তার আবেদনমত তার গৃহের একস্থানে নামায আদায় করেন। পরবর্তীতে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল যার নাম মসজিদে ইতবান ইবনে মালিক। বর্তমানে এ মসজিদটি নেই। তবে এর স্থান হল মসজিদে জুমুআর একটু উত্তরে দেয়াল-ঘেরা স্থানের মধ্যে। (صحيح البخاري وتاريخ المدينة المنورة)

৪. মসজিদুল ফাযীখ

বনূ নাযীর গোত্রকে অবরোধের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে নিয়ে এখানে নামায পড়তেন। এ কারণে এটিকে 'মসজিদে বনূ নাযীর' বলা হয়। এটিকে 'মসজিদে ফাযীখ'ও বলা হয়। কারণ, এই অবরোধকালেই শরাব হারাম হওয়ার আয়াত নাযেল হয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম শরাবপাত্রের মুখ খুলে খুলে সমস্ত শরাব প্রবাহিত করে দেন। 'ফাযীখ' শব্দের অর্থ হল আধাপাকা খেজুর-নির্মিত শরাব। এটিকে 'মসজিদে শাম্স'-ও বলা হয়। শাম্স শব্দের অর্থ সূর্য। এ স্থানটি উঁচু হওয়ায় অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখান থেকে সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়া আগে দেখা যেত বিধায় এরূপ নামকরণ হয়েছে। মসজিদটি মসজিদে নববী থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে আওয়ালী নামক এলাকায় অবস্থিত। মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩.৫ কি. মি. এবং মসজিদে কুবা থেকে ১ কি. মি.। (المساجد الأثرية وتاريخ المدينة المنورة ومعلم الحجاج)

চিত্র নং ১৪৪ – মসজিদুল ফাযীখ

৫. মসজিদে বনূ কুরাইযা

বনু কুরায়যা গোত্রকে অবরোধের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে নামায পড়তেন। মসজিদটি আওয়ালী নামক এলাকাতে মসজিদে ফযীখ থেকে পূর্বে মুছতাশ্‌ফা ঝাহ্‌রা ও মুছতাশ্‌ফা ওয়াতানী-র মাঝে একটা রাস্তার ভিতরের দিকে ছিল। ১৪২২ হিজরীতে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। (تاريخ المدينة المنورة)

৬. মসজিদে কেবলাতাইন

এ মসজিদটি জাবালে সাল্‌'-এর পশ্চিম দিকে এবং মসজিদে নববী থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে ওয়াদিল আক্বীক্ব-এর কাছে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সড়কে অবস্থিত। মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩.৫ কি. মি.। এখানে ছিল বনু সালামা গোত্রের বসবাস। হিজরতের ১৬/১৭ মাস পরের ঘটনা– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে বিশ্‌র ইবনে বারা' ইবনে মা'রূর (রা.)-এর গৃহে এসেছিলেন। ইত্যবসরে জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে জোহরের নামায আদায় করছিলেন। নামাযের মধ্যে সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াত নাযেল হয়, যাতে বায়তুল মুক্বাদাসের দিক থেকে কা'বা শরীফের দিকে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসে। তৎক্ষণাত নামাযের মধ্যেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসল্লীগণ কা'বা শরীফের দিকে ফিরে যান। একই নামাযে দুই কেবলার দিকে ফেরার কারণে এটাকে মসজিদে কেবলাতাইন (দুই কেবলার মসজিদ) বলা হয়। এ মসজিদটির সর্বশেষ সংস্কার হয় বাদশাহ ফাহদের আমলে ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খৃ.। (تاريخ المدينة المنورة وفتح الباري وفضل الباري)

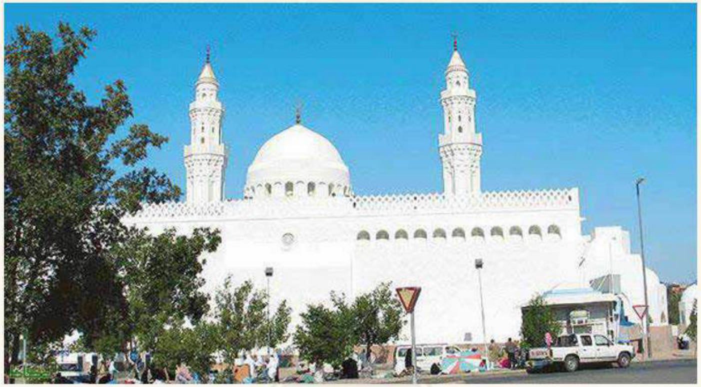

চিত্র নং ১৪৫ – মসজিদে কেবলাতাইন

উল্লেখ্য, মসজিদে কেবলাতাইনে পূর্বে (মসজদি আকসার দিকে কেবলা থাকা অবস্থায়) যেখানে মেহরাব ছিল (বর্তমান মেহরাবের বিপরীত দিকে) সেই বরাবর উপরে একটি মুসল্লার চিত্র বানিয়ে রাখা হয়েছে। তার নিচে খোলা গেট। দেখুন নিচের চিত্র।

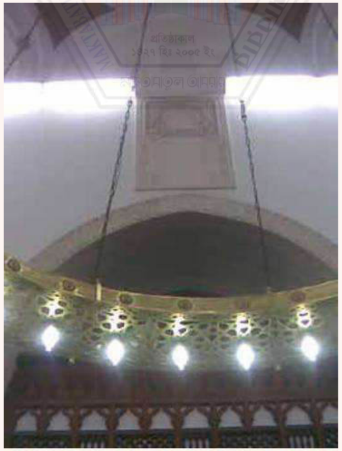

চিত্র নং ১৪৬ – মসজিদে কেবলাতাইনে পূর্বের মেহরাবের স্থান

৭. মাসাজিদে ফাতাহ/মাসাজিদে সাবআ

'মাসাজিদে ফাতাহ' অর্থ বিজয়ের স্থানের মসজিদসমূহ। সাল্' পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে এ মসজিদগুলো অবস্থিত। এ মসজিদগুলোকে আগের যুগে মাসাজিদে ফাতাহ বলা হত। হিজরী চতুর্দশ শতক থেকে এগুলোকে 'মাসাজিদে সাবআ' বা সাত মসজিদ বলা হয়। যদিও মসজিদে ফাতাহসহ মোট মসজিদ ছিল ৬টি। সম্ভবত চতুর্দশ শতকে এই এলাকার পাশেই মসজিদে বনী হারাম (দ্রষ্টব্য) পুনঃনির্মিত হওয়ায় সেটিকে সহই সাত মসজিদ একসঙ্গে গণনা করে মাসাজিদে সাবআ বা সাত মসজিদ বলা শুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যিয়ারতকারীগণ এই ছয় মসজিদের সঙ্গে মসজিদে কেবলাতাইনও যিয়ারত করে থাকেন বিধায় সেটিসহ ৭ মসজিদ বলা শুরু হয়েছে।

এই ছয় মসজিদের মধ্যে একটি হল মসজিদে ফাতাহ। এই মসজিদের নিকটেই পাশাপাশি মসজিদে সালমান ফার্সী, মসজিদে ওমর, মসজিদে আলী, মসজিদে আবী বকর ও মসজিদে সাআদ ইব্‌নে মুআয নামক মসজিদসমূহ ছিল। বর্তমানে (২০০৯ ইং সালে) রয়েছে মাত্র তিনটি (মসজিদে ফাতাহ, মসজিদে সালমান ফার্সী ও মসজিদে সা'দ ইব্‌নে মুআয)। ১৪২৪ হিজরীতে মসজিদে ওমর ও আবূ বকর ভেঙ্গে সে স্থলে একটা বড় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, যাকে 'মসজিদুল খন্দক' বা 'জামিউল খন্দক' (جامع الخندق) বলা হয়। (চিত্র পরে আসছে।) যিয়ারতের গাড়ী হাজীদেরকে সাধারণত এসব মসজিদের স্থানে নিয়ে যেয়ে থাকে। নিম্নে ছয়টি মসজিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হল।

মসজিদগুলো সম্বন্ধে জানার পূর্বে 'খন্দক' সম্বন্ধে কিছু কথা বলে নেয়া যাক।

● **খন্দক প্রসঙ্গ:** খন্দক অর্থ পরীখা। ৫ম হিজরী সনে মক্কার কুরায়েশ ও গাতফানের সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবেলায় হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর পরামর্শে মদীনার উত্তর ও পশ্চিমের বিশাল অংশ জুড়ে খন্দক বা পরীখা খনন করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ১০জন সাহাবীকে ৪০ হাত পরিমাণ স্থান খনন করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। খননকাজে ১৫০০ সাহাবী অংশ নিয়েছিলেন। খননকাজে মোট কতদিন সময় ব্যয় হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় প্রচুর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তবে আদ্দুররুছ ছামীন গ্রন্থকার বলেছেন, এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হল সময় লেগেছিল ৬ দিন। (الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين)

বর্তমানে এই খন্দকের কোনো চিহ্ন নেই। হিজরী ৭ম শতকের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনুন্নাজ্জার (মৃত– ৬৪৩ হিজরী) পরীখার দেয়াল-ভাঙ্গা প্রায়-মিটে-যাওয়া অবস্থায় সামান্য কিছু অংশ দেখার কথা বলেছেন। (تاريخ المدينة المنورة لابن النجار) হিজরী ৮ম শতকের ঐতিহাসিক 'মাতারী' তার যুগে খন্দকের কোনো চিহ্ন না থাকার কথা বলেছেন। বিংশ শতাব্দির গবেষক ঐতিহাসিক আব্দুল কুদ্দূস আনসারীও (মদীনার বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে এবং তদন্ত সাপেক্ষে) অনুরূপ বলেছেন।

গবেষক ঐতিহাসিকগণ খন্দক সম্বন্ধে মোটামুটি এরূপ তথ্য উদঘাটন করেছেন– খন্দকের পরিধি ছিল উত্তরে মসজিদুল মুস্তারাহ (দ্রষ্টব্য– শিরোনাম 'মসজিদুল মুস্তারাহ') থেকে শুরু হয়ে জাবালে যুবাব (দ্রষ্টব্য: 'জাবালে যুবাব/জাবালুর রায়াহ')-এর পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে জাবালে সাল্' (جَبَل سَلْع)-এর পাদদেশে মাসাজিদে সাবআ-এর সম্মুখ (জাবালে আবী উবায়দ) পর্যন্ত। বলা যায় এটা ছিল অর্ধবৃত্তাকার। খন্দকের দৈর্ঘ ছিল ২.৫০ কি. মি., (মতান্তরে ২.৭৫ কি. মি.) প্রস্থ ৪ মিটার আর গভীরতা ৩ মিটার। (تاريخ المدينة المنورة وآثار المدينة المنورة)

● **মসজিদে ফাতাহ:** এটি জাবালে সাল্' (جَبَل سَلْع)-এর পশ্চিম পাশের ঢালে একটু উঁচুতে অবস্থিত। মসজিদটি ভূমি থেকে প্রায় সাড়ে চার মিটার উঁচু। খন্দক যুদ্ধের সময় পরিদর্শনের সুবিধের জন্য এই স্থানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি এখানে তিন দিন– সোম, মঙ্গল ও বুধবার দুআ করেছিলেন, আল্লাহ পাক দুআ কবূল করেন এবং মুসলমানগণ বিজয়ী হন। এজন্যই এ স্থানে নির্মিত মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে মসজিদে ফাতাহ তথা বিজয়ের মসজিদ। এর আর একটি নাম হল 'মসজিদুল আহযাব'। এর আর এক নাম হল 'আল-মসজিদুল আ'লা'। সর্বপ্রথম হযরত ওমর ইব্‌নে আব্দুল আজীজ (রহ.) এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। পরে ৫৭৫ হিজরীতে আমীর সাইফুদ্দীন এটির সংস্কার করেন। সুলতান আব্দুল মজীদের আমলেও (১২৭০ হি./১৮৫৩ খৃ.) এটি পুনঃনির্মিত হয়। সর্বশেষ বাদশাহ ফাহাদের আমলে ১৪১১ হিজরীতে এটির সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ হয়। বর্তমানে এটি পূর্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ ১৭ হাত এবং প্রস্থ ৭ হাত। (معالم دار الهجرة والمساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৪৭ – মসজিদে ফাতাহ

● **মসজিদে সালমান ফার্সী:** এটি মসজিদে ফাতাহ থেকে দক্ষিণে নিচে অবস্থিত। খন্দক যুদ্ধের খন্দকের পরিকল্পনাকারী সাহাবী হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-এর নামে মসজিদটির নামকরণ করা হয়। খন্দক যুদ্ধের সময় এখানেও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েছেন। এ মসজিদটিও সর্বপ্রথম হযরত ওমর ইব্‌নে আব্দুল আজীজ (রহ.) নির্মাণ করেন। তারপর ৫৭৭ হিজরীতে আমীর সাইফুদ্দীন এটির সংস্কার করেন। (معالم دار الهجرة والمساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৪৮ – মসজিদে সালমান ফার্সী

● **মসজিদে আলী:** মসজিদে সালমান ফার্সী থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। মদীনার আমীর যাইনুদ্দীন ৮৭৬ হিজরীতে এটির সংস্কার করেন। সর্বশেষ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১২৬৮ হি./ ১৮৫১ খৃ. সুলতান আব্দুল মজীদ (১ম) এ মসজিদটির সংস্কার করেছিলেন। এ মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত হত। ১৪১৪ হিজরীতে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। (معالم دار الهجرة والمساجد الأثرية)

● **মসজিদে আবূ বকর:** এ মসজিদটি মাসাজিদে সাবআ এলাকার সর্বদক্ষিণে একটু উঁচু অংশে অবস্থিত। অনেকগুলো সিড়ি ঘেটে উপরে উঠতে হয়। কেউ কেউ এটাকে মসজিদে আলী নামে অভিহিত করে থাকেন, (এবং মানুষের মাঝে তা প্রসিদ্ধি লাভ করে।) কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়। (المساجد الأثرية) ঐতিহাসিক ইবনুন্নাজ্জার (মৃত. ৬৪৩ হি.) তার যুগে মসজিদটি বিধ্বস্ত দেখার কথা বলেছেন।

● **মসজিদে ওমর:** এটি মসজিদে সালমান ফার্সী থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এ মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত হয়। সম্ভবত মসজিদটি ১৩০৩ হি./১৮৮৫ খৃ.–এর পর নির্মিত হয়েছে। (المساجد الأثرية)

● **মসজিদে সা'দ ইব্নে মুআয:** এটি মসজিদে ওমর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। মসজিদে ওমর-এর ন্যায় এ মসজিদটিও ১৩০৩ হি./১৮৮৫ খৃ.-এর পর নির্মিত হয়েছে।

কেউ কেউ মসজিদে সা'দ ইবনে মুআযকে মসজিদে ফাতেমা নামে অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবে সঠিক নয়। (المساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৪৯ – মাসাজিদে সাবআর প্রাচীন চিত্র

চিত্র নং ১৫০ – জামিউল খন্দক

৮. মসজিদে বনী হারাম

সাল্‌' পাহাড়ের পশ্চিমে ছিল বনু হারাম গোত্রের বাসস্থান ও সেই পার্বত্য গুহা যাতে খন্দক খননকালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্র যাপন করতেন এবং ভোরে নেমে আসতেন। (গুহাটি সাল্‌' পাহাড়ের গুহা, এটি বনু হারামের ঘরবাড়ির কাছে ছিল।) সাহাবায়ে কেরামের যুগেই এখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, যা "মসজিদে বনী হারাম" নামে পরিচিত। এই বনু হারাম গোত্রেরই লোক ছিলেন হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), যিনি খন্দক খননকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেটে পাথর বাঁধা দেখে ছোট একটি বকরী যবাই করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সঙ্গে দুই একজনকে দাওয়াত দেন, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুহাজির ও আনসারী সাহাবীদের নিঁয়ে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ–র বাড়িতে উপস্থিত হন এবং মুজিযা স্বরূপ সেই স্বল্প খাবার সকলেই তৃপ্তি ভরে খাওয়ার পরও কিছু অবশিষ্ট থেকে যায়।

মসজিদে বনী হারাম সাল্‌' পাহাড়ের পশ্চিমে এবং এখানকার ছয় মসজিদের পূর্বে অবস্থিত।

বাদশাহ ফাহাদের আমলে মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। মসজিদটি ১৬×১২.৫=২০০ মিটার বিস্তৃত। (تاريخ المدينة المنورة) জাবালে যুবাব (দ্রষ্টব্য)-এর পাশ দিয়ে মসজিদে বনী হারামে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে।

চিত্র নং ১৫১ – মসজিদে বনী হারাম

৯. মসজিদুর রায়া

এটাকে 'মসজিদে যুবাব'-ও বলা হয়। এ মসজিদটি যুবাব নামক একটি ছোট্ট পাহাড়ের উপর অবস্থিত, (পাহাড়টি বর্তমানে [২০০৬ সালে] প্রায় বিলুপ্ত।) যে পাহাড়ে খন্দক খননের কাজ পরিদর্শনের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল এবং তিনি এখানে নামাযও পড়েছেন। পাহাড়টাকে 'জাবালুর রায়া'ও বলা হয়। খন্দক খননের সময় এই পাহাড়েরই উত্তর দিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক একটা বিরাট পাথরের চাঁই ভাঙ্গার মু'জিযা ঘটে। যে পাথরের চাঁইতে আঘাত করলে গোটা মদীনা আলোকিত হয়ে ওঠে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ শোনান যে, আমার উম্মত পারস্য, রূম ও সান্‌আর রাজপ্রাসাদ দখল করবে। মুসলমানরা এই সুসংবাদে অত্যন্ত আপ্লুত হন। এই জাবালুর রায়া ও মসজিদে যুবাব সাল্' পাহাড়ের ১৫০ মিটার উত্তরে তরীকে উছমান (সাবেক নাম তরীকুল উয়ূন طريق العيون/Al-Woyun street)-এর শুরুতে বাম পাশে অবস্থিত। মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব ১.৪ কি. মি.। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

Photo © R.Chohan

চিত্র নং ১৫২ – মসজিদুর রায়া

১০. মসজিদুল ফাছহ

বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধের পর এখানে যোহরের নামায পড়েছিলেন। এ মসজিদটি এখন (২০০০ ইং) ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এ স্থানটা মাকবারাতুশ শুহাদা-এর উত্তর দিক দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে (যাওয়ার সময় ডান দিকে) অবস্থিত।

এর উত্তরে উহুদ পাহাড়ে কিছুটা উঁচুতে গুহার ন্যায় একটি ফাটল রয়েছে; বলা হয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে এখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে উমদাতুল আখবার গ্রন্থকার বলেছেন, এটা সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ হলেও সহীহ নয়। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية وعمدة الأخبار في مدينة المختار)

Photo © R.Chohan

চিত্র নং ১৫৩ – মসজিদুল ফাছহ (২০০২ সাল)

১১. মসজিদুল মুস্তারাহ/ মসজিদে বনূ হারেছা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এখানে আরাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নামায পড়েছিলেন। 'মুস্তারাহ' শব্দের অর্থ যেখানে আরাম গ্রহণ করা হয়, আর এস্তেরাহা অর্থ আরাম গ্রহণ করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে আরাম গ্রহণ করেছিলেন বিধায় এটাকে মসজিদুল মুস্তারাহ বা মসজিদুল এস্তেরাহা বলা হয়। পূর্বে এটাকে 'মসজিদে বনূ হারেছা' বলা হত। কারণ, বনূ হারেছা নামক আনছারী গোত্র এ মসজিদের আশপাশেই বসবাস করত। খন্দকের যুদ্ধে যে খন্দক বা পরীখা খনন করা হয়েছিল তার শুরু এখান থেকে। মসজিদটি গাড়ীতে উহুদ পাহাড় থেকে আসার সময় উহুদ পাহাড়ের কিছু পরেই (সাইয়্যিদুশ শুহাদা) সড়কের ডান পাশে সড়ক সংলগ্ন অবস্থিত। বাদশাহ ফাহদের আমলে মসজিদটির পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ হয়। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)।

Photo © Marufgs

চিত্র নং ১৫৪ – মসজিদুল মুস্তারাহ/মসজিদে বনূ হারেছা

১২. মসজিদুশ শায়খাইন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে গমনকালে শুক্রবার আসর, মাগরিব ও ইশার নামায এখানে আদায় করেন এবং রাত যাপন করে শনিবার সকালে এখান থেকে উহুদ-প্রান্তরে গমন করেন। এখানেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈনিক নির্বাচন করেন এবং ছোট সাহাবীদেরকে ফেরত পাঠান। এ মসজিদটি মসজিদুল-মুছতারাহ থেকে ৩০০ মিটার দক্ষিণে চৌরাস্তা থেকে ২০ মিটার পূর্বে অবস্থিত। এ মসজিদকে মসজিদুল উদ্ওয়া (مسجد العُدْوة), মসজিদুল বাদায়ে’ (مسجد البدائع), মসজিদুদ্দির্‌য়ে (مسجد الدِّرْع) প্রভৃতি নামেও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। মসজিদটির বর্তমান ইমারত (২০০৩ ইং) তুর্কী আমলের। বাদশাহ ফাহদের যুগে (১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.) সাইয়্যিদ আলী বাবতীন এটির সংস্কার করেন। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

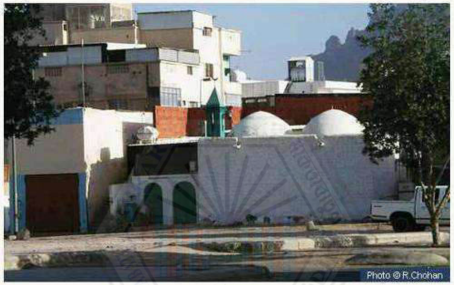

চিত্র নং ১৫৫ – মসজিদুশ শায়খাইন

১৩. মসজিদে হাম্‌যা

এটি শুহাদায়ে উহুদের কবরস্তানের সামান্য পূর্বে অবস্থিত। সাইয়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা.)–এর শহীদ হওয়ার স্থানে এটি নির্মিত হয়েছে। এর দক্ষিণে জাবালুর রুমাত। মাঝখানে ছিল ওয়াদী কানাতের একটি শাখা। (দেখুন শিরোনাম ‘জাবালুর রুমাত’।)

চিত্র নং ১৫৬ – মসজিদে হাম্‌যা

১৪. মসজিদে গামামাহ

মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটা ময়দানের নাম হল মুনাখা। এখানে মদীনার বাজার বসত বলে একে ‘সূকুল মদীনা’ (মদীনার বাজার)ও বলা হত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ময়দানের বিভিন্ন স্থানে দুই ঈদের নামায আদায় করেছেন। এখানেই তিনি ইস্তেস্কার নামায পড়েছেন, এখানেই হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছেন। এসব কারণে এ ময়দানকে মুসল্লা (مصلى/নামাযের স্থান)ও বলা হয়।

এই ময়দানেই রয়েছে ৪টি মসজিদ। তার মধ্যে একটির নাম মসজিদে গামামাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতস্থানে নামায পড়েছেন, সেইসব স্থানের নিদর্শন রাখার জন্য সেসব স্থানে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনার আওতায় হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) এ মসজিদটি নির্মাণ করেন (৭৮–৯৩ হিজরী)। এটাকে ‘মসজিদুল মুসল্লা’ও বলা হয়। বর্তমান ইমারত সুলতান আব্দুল মজীদ উছমানীর তৈরিকৃত। এটির সর্বশেষ সংস্কার হয় ১৪১১ হিজরীতে বাদশাহ ফাহদের আমলে। মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩০৫ মিটার। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৫৭ – মসজিদে গামামাহ

১৫. মসজিদে আবূ বকর

এটি মসজিদে গামামা-র উত্তর পশ্চিম দিকে ৪০ মিটার দূরে অবস্থিত। মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব ৩৩৫ মিটার। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এখানে ঈদের নামায আদায় করেছিলেন বিধায় এর নাম মসজিদে আবূ বকর হয়ে থাকবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এখানে ঈদের নামায আদায় করেছেন। সম্ভবত এ মসজিদটিও সর্বপ্রথম হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) নির্মাণ করেন। বর্তমান ইমারত সুলতান মাহমূদ খান উছমানী (মৃত–১২৫৫ হি./১৮৩৯ খৃ.) কর্তৃক তৈরিকৃত। এটির সর্বশেষ সংস্কার হয় ১৪১১ হিজরিতে বাদশাহ ফাহাদের আমলে। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৫৮ – মসজিদে আবূ বকর

১৬. মসজিদে ওমর

এই মসজিদও মসজিদে গামামাহ-র নিকট মসজিদে গামামাহ থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মসজিদে গামামাহ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৩৩ মিটার এবং মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব ৪৫৫ মিটার। এখানে হযরত ওমর (রা.) কখনও কখনও নামায পড়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এখানে ঈদের নামায পড়েছেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। হিজরী ৯ম শতকে এটি নির্মাণ করা হয়। এটির সর্বশেষ সংস্কার হয় ১৪১১ হিজরীতে বাদশাহ ফাহদের আমলে। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

উল্লেখ্য, 'মসজিদে উছমান' নামক আর একটি মসজিদ রয়েছে, এটি কোন ঐতিহাসিক মসজিদ নয়। এটি মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে ৪৬০ মিটার দূরে এবং সূকুত্তামার (খেজুর মার্কেট)-এর দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত। তদ্রূপ এই মসজিদে উছমান থেকে কিছুটা দক্ষিণপূর্ব দিকে 'মসজিদে বেলাল' নামক একটি মসজিদ রয়েছে, এটিও কোন ঐতিহাসিক মসজিদ নয়। যদিও উছমান ও বেলাল নাম দেখে মসজিদ দুটোকে ঐতিহাসিক মসজিদ বলে ভ্রম হয়ে থাকে।

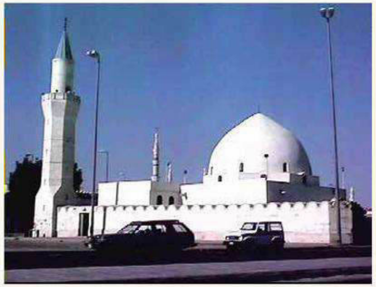

চিত্র নং ১৫৯ – মসজিদে ওমর

চিত্র নং ১৬০ – মসজিদে উছমান

চিত্র নং ১৬১ – মসজিদে বেলাল

১৭. মসজিদে আলী

এই মসজিদও মসজিদে গামামাহ-র নিকট অবস্থিত। এটি মসজিদে আবূ বকর থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। মসজিদে গামামাহ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১২২ মিটার এবং মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব ২৯০ মিটার। হযরত উছমান (রা.) যখন গৃহে অন্তরীণ ছিলেন, তখন হযরত আলী (রা.) এখানে ঈদের নামায আদায় করেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই এর নাম হয়ে থাকবে মসজিদে আলী। এক বর্ণনামতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এখানে ঈদের নামায পড়িয়েছেন। এটির সর্বশেষ সংস্কার হয় ১৪১১ হিজরীতে বাদশাহ ফাহদের আমলে। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৬২ – মসজিদে আলী

১৮. মসজিদুস সাজদাহ

রেওয়ায়েতে এসেছে– এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদায়ে শোকর আদায় করেছিলেন। দীর্ঘ সাজদা থেকে মাথা তুলে তিনি উপস্থিত হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌নে আউফ (রা.)কে বলেছিলেন, জিব্রীল (আ.) এসে আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে আমি তার প্রতি রহমত করি, যে ব্যক্তি তোমাকে সালাম করে আমি তাকে সালাম করি। তাই আমি শোকর আদায় করণার্থে সাজদা করলাম। (رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره عليه الذهبي في التلخيص حديث رقم ٢٠٥٧ آخر حديث من كتاب الدعاء)

মসজিদটি বর্তমানে 'মসজিদে আবূ যর' নামে পরিচিত। এ মসজিদটি মসজিদে নববীর পূর্ব পাশ দিয়ে উত্তর দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে তার কিছুটা সামনে গিয়ে চৌরাস্তা পার হয়ে সামনে ডান দিকে রাস্তা মোড় নেয়ার সময় ডান দিকে অবস্থিত। মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৯০০ মিটার। এ মসজিদটির সর্বশেষ সংস্কার হয় বাদশাহ ফাহ্‌দের আমলে ১৪২২ হিজরীতে। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৬৩ – মসজিদুস সাজদা/মসজিদে আবূ যর

১৯. মসজিদুল-ইজাবাহ

'মসজিদুল ইজাবাহ' শব্দের অর্থ দুআ কবূল করার মসজিদ। মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকআত নামায পড়ে তিনটি দুআ করেছিলেন, যার দুটো কবূল হয়। দুআ তিনটি ছিল এই– (এক) আল্লাহ তাআলা যেন এই উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস না করেন। এটি কবূল হয়। (দুই) আল্লাহ তাআলা যেন এই উম্মতকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস না করেন। এটিও কবূল হয়। (তিন) এই উম্মত যেন পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হয়। এটি কবূল হয়নি। (صحيح مسلم باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض حديث رقم ٢٨٩٠) উক্ত হাদীছে এ মসজিদটিকে 'মসজিদে বনু মুআবিয়া' বলা হয়েছে এবং এ নামেই এটি পরিচিত ছিল। কারণ, এখানে আউসের শাখা গোত্র বনু মুআবিয়া-র বসবাস ছিল। মসজিদটি মসজিদে নববীর পূর্ব পাশ এবং জান্নাতুল বাকী'র উত্তর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা পূর্ব দিকে গিয়েছে সে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে জান্নাতুল বাকী'র উত্তর পূর্ব কোণে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে (উত্তর দিকে) তাকালেই দৃষ্টিগোচর হয়। মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব ৫৮৩ মিটারের মত। সর্বশেষ এ মসজিদটির সংস্কার ও সম্প্রসারণ হয়েছে বাদশাহ ফাহদের আমলে ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃ.। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৬৪ – মসজিদুল ইজাবাহ

২০. মসজিদে বনু জফর

বনু জফর আউসের একটি শাখা গোত্র। তাদের এলাকার মসজিদটি মসজিদে বনু জফর। জান্নাতুল বাকী-র পূর্ব পাশে ছিল তাদের আবাসস্থল। এই এলাকা ছিল ইসলামী দাওয়াতের মারকাজ। হযরত উসায়েদ ইবনে হুজায়ের ও সাআদ ইবনে মুআয (রা.) এখানেই হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে মুসলমান হন। বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)কে বলেছিলেন, আমাকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছিলেন, আপনার উপর কুরআন নাযেল হয়েছে আর আমি আপনাকে তেলাওয়াত করে শোনাব? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, অন্যের মুখ থেকে শুনতে আমার ভাল লাগে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সূরা নেছা তেলাওয়াত করে শোনান। যখন ৪১ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন (যার মধ্যে বলা হয়েছে, ঐ সময় কী অবস্থা হবে যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে এক একজন সাক্ষী উপস্থিত করব আর তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?) তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করে। (صحيح البخاري حديث رقم ٤٥٨٢) বর্ণিত আছে এঘটনাটি বনু জফর এলাকায় সংঘটিত হয়। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আরও কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।

এ মসজিদটি ছিল জান্নাতুল বাকী-এর উত্তর দিকে মালিক আব্দুল আযীয সড়কের পাশে هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -এর নিকটে। এ মসজিদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েছেন বলে বর্ণিত আছে। মসজিদটির আর এক নাম ছিল 'মসজিদুল বাগ্‌লাহ'। বাগলাহ শব্দের অর্থ হল খচ্চর। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চর বাঁধা হয়েছিল আর তার খুরের দাগ পাথরের উপর পড়েছিল বিধায় এমন নামকরণ হয়ে থাকবে। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

২১. মসজিদুস্‌ সাবাক্ব

'সাবাক্ব' শব্দের অর্থ দৌড়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে জেহাদের জন্য প্রস্তুত করার নিমিত্তে ঘোড়ার দৌড়-প্রতিযোগিতা করা হত। এই মসজিদের পাশেই ছিল একটা স্থান যাকে ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' (শামিয়া)[১] বলা হত। এখান থেকে বনু যুরায়ক্ব-এর এলাকা (মসজিদে গামামার দক্ষিণ-পশ্চিমের এলাকা)-এর মসজিদ পর্যন্ত (প্রায় ১ মাইল) বা হাফ্‌ইয়া (উহুদ পাহাড়ের পশ্চিমে একটা স্থান) পর্যন্ত দৌড় হত।

মসজিদুস সাবাক্ব মসজিদে নববী থেকে ৫২০ মিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। হিজরী নবম শতকে মসজিদটি নির্মিত হয়। বাদশাহ ফয়সাল বিন আব্দুল আযীয এর পুনঃনির্মাণ করেন। (تاريخ المدينة المنورة والمساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৬৫ – মসজিদুস সাবাক্ব

২২. মসজিদুস্‌ সুক্বয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, পথিমধ্যে সুক্বয়া নামক স্থানে এসে সৈনিক নির্বাচন করেন। তিনি এখানে মদীনাবাসীদের জন্য বরকতের দুআ করেন। মদীনার হারামের সীমানা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সর্বশেষ ১৪২৩–২৪ হিজরীতে মসজিদটির সংস্কার করা হয়। বর্তমানে এটি ৩ গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ। আম্বারিয়া রেলষ্টেশনের দেয়াল-ঘেরা স্থানের মধ্যে মসজিদটি অবস্থিত। এখানেই হযরত ওমর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর ওসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করেছিলেন। (تاريخ المدينة المنورة)

---

[১] দ্রষ্টব্য ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' শিরোনামের আলোচনা।

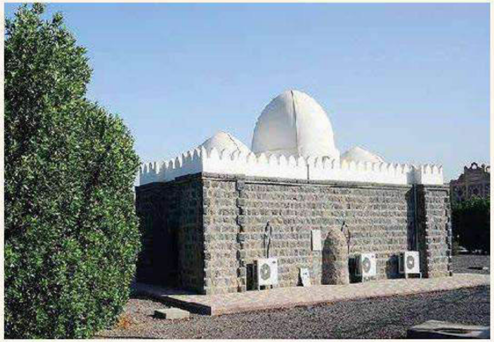

চিত্র নং ১৬৬ – মসজিদুস সুক্বয়া

২৩. মসজিদুল মীক্বাত

এটি মদীনার মীক্বাত যুলহুলাইফা (বর্তমান নাম আবইয়ারে আলী/বীরে আলী)–তে অবস্থিত। এ কারণেই এটিকে মসজিদুল মীকাত তথা মীকাতের মসজিদ বলা হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় সফরে যাওয়া এবং সেখান থেকে ফেরার পথে এখানে অবতরণ করতেন এবং এখানে নামায পড়তেন। এ মসজিদটিকে 'মসজিদুশ শাজারাহ' এবং 'মসজিদে যুল হুলাইফা'ও বলা হয়। এটি মসজিদে নববী থেকে ১২ কি. মি. দূরে। সর্বশেষ বাদশাহ ফাহাদের আমলে মসজিদটি পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে (২০১৯ সাল পর্যন্ত) এতে একসঙ্গে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মুসল্লী নামায আদায় করতে পারেন। (تاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৬৭ – মসজিদুল মীকাত

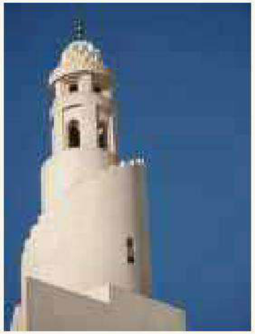

চিত্র নং ১৬৮ – মসজিদুল মীকাতের মিনারা

মদীনার কয়েকটা ঐতিহাসিক কবরস্তান

১. জান্নাতুল বাকী'

মদীনা শরীফের কবরস্থানের নাম 'বাকীউল গারক্বাদ' (بقيع الغرقد)। বাকী' শব্দের অর্থ যেখানে বহু রকম গাছের মূল রয়েছে। আর গারক্বাদ হল বিশেষ এক ধরনের কাঁটাদার বৃক্ষ। এ স্থানকে কবরস্তান বানানোর পূর্বে এখানে এমনসব বৃক্ষ ছিল। সাধারণ্যে এ কবরস্তানটা 'জান্নাতুল বাকী' নামে প্রসিদ্ধ। মসজিদে নববীর সন্নিকটে মসজিদে নববীর সামনের অংশের পূর্ব দিকে অবস্থিত। সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে তাবেঈন, আহ্‌লে বায়ত (নবী [সা.]-এর পরিবার), আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত (নবী [সা.]-এর স্ত্রীগণ খাদীজা ও মায়মূনা ব্যতীত), শোহাদা, আইম্মায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে কেরাম এই কবরস্থানে সমাধিস্থ রয়েছেন

এক বর্ণনামতে এই কবরস্তানে প্রায় দশ হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে। কবরস্থানটা কয়েকবার সম্প্রসারিত হওয়ার পর বর্তমানে এর আয়তন ১৭৪৯৬২ বর্গমিটার। (بيوت الصحابة وتاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৬৯ – জান্নাতুল বাকী'

২. মাক্ববারাতুশ শুহাদা

এটা উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে একটা কবরস্থান। সাধারণ্যে ‘শুহাদায়ে উহুদ’ নামে পরিচিত। উহুদের যুদ্ধে যেসব সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন এখানে তাদের কবর রয়েছে। সত্তরজন শহীদ সাহাবায়ে কেরাম এখানে সমাধিস্থ রয়েছেন। এক এক কবরে দুই তিন জন করে দাফন করা হয়েছিল। কবরস্তানের দক্ষিণে রয়েছে জাবালুর রুমাত। জাবালুর রুমাতের উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক থেকে ওয়াদী ক্বানাতের পানি চলার পথ ছিল। উত্তর দিকের পানি চলার পথের পাশে ছিল হযরত হামযা (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর কবর। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে প্রচণ্ড পানির চাপে ওয়াদী ক্বানাতের দু'কূল ছেপে পানি প্রবাহিত হয়। তখন আশংকা দেখা দেওয়ায় উক্ত সাহাবীদ্বয়ের লাশ মোবারক বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। সৌদী শাসনামলে পানি চলার উত্তর দিকের উক্ত পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। (تاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৭০ – মাক্ববারাতুশ শুহাদা

৩. মাশরবাহ উম্মে ইব্রাহীম

এখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহীমের মাতা মারিয়া কিব্তিয়া বসবাস করতেন। মাশরবাহ বলা হয় বাগান ও উঁচু স্থানকে। এরূপ একটা স্থানেই মারিয়া কিবতিয়াকে তথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহীমের মাতাকে রাখা হয়েছিল বলে এ স্থানকে মাশরাবাহ উম্মে ইবরাহীম বলা হয়। এখানেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে যাতায়াত করতেন এবং বিবিদের সঙ্গে ঈলা করার সময় দীর্ঘ একমাস এখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, যাকে ‘মসজিদে মাশরাবাহ উম্মে ইবরাহীম’ বলা হত। বর্তমানে এখানে কোন মসজিদ নেই। একটা কবরস্থান রয়েছে। যা আওয়ালী নামক এলাকাতে মুছতাশ্ফা ঝাহ্রা ও মুছতাশ্ফা ওয়াতানী-র মাঝে অবস্থিত। (المساجد الأثرية)

চিত্র নং ১৭১ – মাশরবাহ উম্মে ইব্রাহীম

মদীনার কয়েকটা ঐতিহাসিক পাহাড়

১. জাবালে উহুদ

জাবালে উহুদ বা উহুদ পাহাড় মদীনার সর্ববৃহৎ পাহাড়। মসজিদে নববী থেকে ৪ কি. মি. উত্তরে পাহাড়টা অবস্থিত। পাহাড়টা পূর্ব-পশ্চিমে ৭ কি. মি. দৈর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩ কি. মি. প্রস্থ বিশিষ্ট। ভূপৃষ্ঠ হতে এর সর্বোচ্চ উচ্চতা ৩০০ মিটার এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ১ কি. মি.। (تاريخ المدينة المنورة)

এ পাহাড় সম্বন্ধে বোখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উহুদ এমন একটা পাহাড় যা আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি। (صحيح البخاري برقم ٤٠٨٣ وصحيح مسلم برقم ١٣٩٣) বোখারী শরীফের আর এক রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত উছমান (রা.) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন। তখন পাহাড়টা তাদেরকেসহ কেঁপে ওঠে। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, স্থির হও উহুদ! তোমার উপর তো আরোহিত আছেন একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ। (صحيح البخاري برقم ٣٦٧٥)

উহুদ পাহাড়ের পূর্ব-পশ্চিমের মাঝামাঝি স্থানের দক্ষিণ ঢালে সংঘটিত হয় উহুদ যুদ্ধ। এখন যেখানে মাকবারাতুশ শুহাদা অবস্থিত, তার কিছুটা পশ্চিমে ছিল যুদ্ধের ময়দান। মুসলমানরা অবস্থান নিয়েছিলেন কবরস্তানের কাছে কিছুটা পশ্চিমে, আর কাফেররা অবস্থান নিয়েছিল তার চেয়ে আর কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে যুগাবা নামক স্থানে। এখন যেখানে মসজিদে হামযা রয়েছে, সেখানেই হযরত হামযা (রা.) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। (تاريخ المدينة المنورة وآثار المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৭২ – জাবালে উহুদ

২. জাবালে রুমাত

জাবালে রুমাত মাকবারাতুশ শুহাদা ও মসজিদে হামযার দক্ষিণ পাশে লাল বর্ণের একটি ছোট পাহাড়। মাকবারাতুশ শুহাদা থেকে এটার দূরত্ব ৫৫ মিটার এবং উহুদ পাহাড় থেকে এটির দূরত্ব ১ কি. মি.। এ পাহাড়টির দৈর্ঘ ১৭৫ মিটার ও প্রস্থ ৫৫ মিটার। উচ্চতা মাত্র ২০ মিটার। 'রুমাত' শব্দের অর্থ তীরন্দাজগণ। উহুদ যুদ্ধের সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজের একটা জামাতকে এই পাহাড়ে নিয়োজিত রেখেছিলেন এজন্য যে, কাফেররা কোনো অবস্থাতেই যেন মুসলমানদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে। পাহাড়টিকে 'জাবালুল আইনাইন'ও বলা হয়। (تاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৭৩ – জাবালে রুমাত

৩. জাবালে ছওর

"ছওর" (ثَور) পাহাড় হল মদীনার হারামের উত্তরের সীমানা। এটি উহুদ পাহাড়ের উত্তরে লাল বর্ণের একটি ছোট্ট গোলাকার পাহাড়। মসজিদে নববী থেকে এ পাহাড়টির দূরত্ব ৮ কি. মি.। (تاريخ المدينة المنورة) উল্লেখ্য, মক্কা মুকাররমায়ও জাবালে ছাওর নামে একটি পাহাড় রয়েছে, যে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

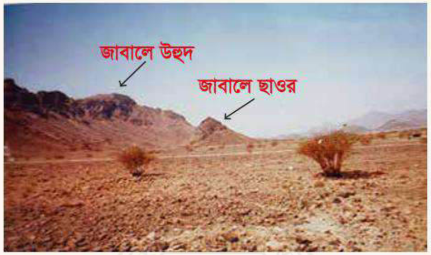

চিত্র নং ১৭৪ – জাবালে ছাওর

৪. জাবালে 'আইর

'আইর' (عَير) পাহাড় হল মদীনার হারামের দক্ষিণের সীমানা। এটা উহুদ পাহাড়ের পর মদীনার সবচেয়ে বড় পাহাড়। মসজিদে নববী থেকে ৮.৫ কি. মি. দূরে। পাহাড়টি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মিটার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ কি. মি. উঁচু। এর দৈর্ঘ ৬ কি. মি. এবং প্রস্থ ৩.৫ কি. মি.। পাহাড়টা মসজিদে কুবা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। (تاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৭৫ – জাবালে 'আইর

৫. জাবালে সাল্' (جَبل سلْع)

'জাবালে সাল্' (جَبل سلْع)' মসজিদে নববী থেকে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটা বিশাল বিস্তৃত পাহাড়। মসজিদে নববী থেকে এর দূরত্ব ৭০০ মিটার। এ পহাড়টার দৈর্ঘ ১০৫০ মিটার, প্রস্থ ৯২০

মিটার এবং উচ্চতা ১০০ মিটার। খন্দক যুদ্ধের সময় এই পাহাড়ের পশ্চিম পাশে ছিল মুসলমানদের অবস্থান। এই পাহাড়ের পশ্চিম পাশে ঢালুতে রয়েছে মাসাজিদে সাবআ (দ্রষ্টব্য)। (تاريخ المدينة المنورة)

جبل سلع من الجهة الشمالية الغربية ويبدو جزء من مسجد الفتح (مسجد الأحزاب)

চিত্র নং ১৭৬ – জাবালে সাল্'

৬. জাবালে যুবাব/জাবালুর রায়াহ

জাবালে যুবাব/জাবালুর রায়াহ সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন শিরোনাম 'মসজিদুর রায়াহ'। মসজিদুর রায়াহ যে পাহাড়ের উপর অবস্থিত সেটাই জাবালুর রায়াহ বা জাবালে যুবাব।

Photo © R.Chohan

চিত্র নং ১৭৭ – জাবালে যুবাব/জাবালুর রায়াহ

মদীনার কয়েকটা ঐতিহাসিক কুয়া

১. বীরে রূমা/বীরে উছমান

বীর (بئر) শব্দের অর্থ কুয়া। মসজিদে নববী থেকে ৩.৫ কি. মি. ও মসজিদে কেবলাতাইন থেকে ১ কি. মি. দূরে বীরে রূমা/বীরে উছমান-এর অবস্থান। এর পানি এখনও ব্যবহার উপযোগী, যা বর্তমানে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখন এই কুয়া ব্যতীত আর কোন মিষ্ট পানির কুয়া ছিল না। কুয়াটা তখন ছিল এক ইয়াহূদীর। সে মূল্য ব্যতীত কাউকে পানি দিত না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, কে আছ বীরে রূমা ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দিবে, বিনিময়ে সে জান্নাতে উত্তম বদলা পাবে? অতঃপর উছমান (রা.) উক্ত ইয়াহূদী থেকে প্রথমে (পূর্ণ বিক্রি করতে রাজী না হওয়ায়) অর্ধেক ক্রয় করে নেন। তখন হযরত উছমান (রা.)-এর পালার দিন মুসলমানরা দুই দিনের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার মত পানি তুলে নিত। ফলে উক্ত ইয়াহূদী হযরত উছমান (রা.)কে বলল, তুমি তো আমার কুয়াটাই ধ্বংস করে দিলে! তখন হযরত উছমান (রা.) অবশিষ্ট অর্ধেকও ক্রয় করে নেন এবং ধনী গরীব মুসাফির নির্বিশেষে সকলের জন্য পানি উন্মুক্ত করে দেন। (تاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৭৮ – বীরে উছমান

২. বীরে বুযাআ

বীরে বুযা'আ মুহাদ্দিছীনে কেরামের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। কারণ, হাদীছে এই কুয়া সম্বন্ধে এমন কিছু কথা এসেছে যা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কুয়ার পানি পান করেছেন, এ থেকে উযূ করেছেন। এই বীরে বুযা'আটা ছিল বনু সায়েদা গোত্রের মহল্লায় ছাক্বীফায়ে বনু সায়েদার উত্তরে। (দ্রষ্টব্য ছাক্বীফায়ে বনু সায়েদা) الدر الثمين গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী এ কুয়াটি ছিল 'বীরু হা' (দ্রষ্টব্য) থেকে প্রায় ৩০০ মিটার উত্তর পশ্চিমে। (تاريخ المدينة المنورة وبيوت الصحابة والدر الثمين) বর্তমানে এ স্থানটি মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত। স্থানটি মহিলাদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট।

৩. বীরে আরীছ

এ কুয়াটি ছিল মসজিদে কুবার পশ্চিম দিকে ৩৮ মিটার দূরে। হিজরী চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে এদিকে সড়ক সম্প্রসারণকালে কুয়াটাকে মিটিয়ে দেওয়া হয়। (تاريخ المدينة المنورة و آثار المدينة المنورة)

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে এসেছে– একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এই কুয়ার পাশে বসা ছিলেন। পা মুবারক দুটো কুয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) ছিলেন দারোয়ান। ইত্যবসরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এসে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ মূসা আশআরী (রা.)কে বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) প্রবেশ করলেন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডান পাশে বসে পা দুটো কুয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) এসে অনুমতি চাইলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ মূসা আশআরী (রা.)কে বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। হযরত ওমর (রা.) প্রবেশ করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাম পাশে বসে পা দু'টো কুয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত উছমান (রা.) এসে অনুমতি চাইলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ মূসা আশআরী (রা.)কে বললেন, তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও, তবে কিছু মুসীবতসহ। হযরত উছমান (রা.) তাঁদের সম্মুখে বসলেন। (صحيح مسلم حديث رقم ٢٤٠٣)

বীরে আরীছকে 'বীরে খাতাম'ও বলা হয়। খাতাম শব্দের অর্থ আংটি। এই কুয়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি পড়ে গিয়েছিল বিধায় এরূপ নামকরণ হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ– মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রুপার আংটি বানিয়েছিলেন। জীবদ্দশায় আংটিটি তাঁর হাত মুবারকে ছিল। তার পর সেটি আবূ বকর (রা.)-এর হাতে ছিল। তার পর সেটি ওমর (রা.)-এর হাতে ছিল। তার পর উছমান (রা.)-এর হাতে ছিল। উছমান (রা.)-এর হাত থেকে সেটি বীরে আরীছের মধ্যে পড়ে যায়। আংটিটিতে খোদাই করে লেখা ছিল 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। (صحيح مسلم حديث رقم ٢٠٩١)

بئر الخاتم
(أريس)
مسجد قباء

চিত্র নং ১৭৯ – বীরে আরীছের প্রাচীন ছবি

৪. বীরে আযাক্ব

এ কুয়াটি মসজিদে কুবার পশ্চিম পাশে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন এই কুয়ার কাছে মদীনাবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

চিত্র নং ১৮০ – বীরে আযাক্ব

৫. বীরু হা/বাইরু হা

এ কুয়াটি ছিল মসজিদে নববীর উত্তর দিকে হযরত আবূ তাল্হা আনসারী (রা.)-এর বাগানের মধ্যে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাগানে প্রবেশ করতেন এবং এই কুয়ার পানি পান করতেন। কুয়াটি নিকটবর্তী অতীতেও ছিল। ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ. মসজিদে নববী সম্প্রসারণকালে সেট মিটিয়ে দেয়া হয়। বর্তমান 'বাবুল মালিক ফাহাদ' (গেট নং ২১) দিয়ে প্রবেশ করলে কয়েট মিটার বাম দিকেই ছিল সেটির অবস্থান। (تاريخ المدينة المنورة)

৬. বীরে সুক্বয়া

এটি ছিল হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর জমিতে অবস্থিত একটা কুয়া। সুক্বয়া নামক স্থানে হওয়ায় এটি 'বীরে সুক্বয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মসজিদুস্ সুক্বয়ার (দ্রষ্টব্য) দক্ষিণ পাশে রেলষ্টেশনের দেয়ালের বাইরে ছিল এর অবস্থান। হিজরী চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সড়কের প্রয়োজনে কুয়াটি মিটিয়ে দেওয়া হয়। (تاريخ المدينة المنورة)

৭. বীরে গার্ছ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কুয়া থেকেও পানি পান করেছেন এবং মৃত্যুর পর এই কুয়ার পানি দিয়েই তাকে গোসল দেওয়ার ওসিয়ত করে গেছেন। কুয়াটি মসজিদে কুবা থেকে ১ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি বর্তমানে মা'হাদু দারিল হিজরাহ (معهد دار الهجرة) নামক প্রতিষ্ঠানের পাশে একটা ছাদযুক্ত ঘরের মধ্যে রয়েছে। (تاريخ المدينة المنورة)

চিত্র নং ১৮১ – বীরে গার্ছ

৮. বীরে বুস্‌সা

বীরে বুস্‌সা/বীরে বূসা (بئر البوصة/بئر البصة) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কুয়ার পানি পান করেছেন। এর পানি দিয়ে মাথা ধুয়ে সেই পানি এই কুয়ায় নিক্ষেপ করেছেন। কুয়াটির অবস্থান ছিল জান্নাতুল বাকী থেকে দক্ষিণ দিকে বর্তমান মালিক ফয়সাল সড়কের উত্তর পাশে আল-জাযীরা কমপ্লেক্স (مجمع الجزيرة السكني والتجاري)-এর সামনে।

চিত্র নং ১৮২ – বীর বুস্‌সা-র স্থান

মদীনার আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান

১. ছানিয়্যাতুল ওয়াদা'

ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' (ثنية الوداع/অর্থাৎ, বিদায় প্রদান করার ঘাঁটি) রয়েছে দুটো। একটা হল মদীনা থেকে শামের দিকে তথা উত্তর দিকে। এটাকে বলা হয় ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' শামিয়া। এটা ছিল খায়বার, তাবূক ও শাম দেশে গমনকারীদের যাতায়াতের পথে। ঐদিকে গমনকারীদেরকে এখান থেকে বিদায় জ্ঞাপন করা হত। এখানে মসজিদে ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' নামে একটি মসজিদ ছিল। হিজরী পঞ্চদশ শতকের শুরুতে সড়ক প্রশস্ত করার প্রয়োজনে এই ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' অপসারণ করা হয়। বর্তমানে এ জায়গার অবস্থান হল সাইয়্যেদুশ শুহাদা সড়ক ও আবূ বকর সড়ক (যার পূর্বের নাম ছিল শারে' সুলতানা)-এর সম্মিলনস্থল। আল-মুনাখা সুড়ং পথ থেকে বের হওয়া ব্যক্তির ডান দিকে। মসজিদে নববীর উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে এস্থানের দূরত্ব ৭৫০ মিটার। আর একটা ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' হল মক্কার পথে অবস্থিত। এটা ছিল যারা কুবার পথ হয়ে মক্কায় গমন করতে চাইত তাদের যাতায়াত স্থল। সাধারণত এ পথে হজ্জে গমনকারীদেরকে এখান থেকে বিদায় জ্ঞাপন করা হত। এই ছানিয়্যাতুল ওয়াদা'-র মোটামুটি অবস্থান হল মসজিদে জুমুআর সন্নিকটস্থ 'কিল্লা কুবা'-এর উত্তর পূর্ব দিকে।

২. কা'বা ইবনে আশরাফের দূর্গ (حصن كعب بن الأشرف)

এটা ছিল ইয়াহুদী সর্দার ধনকুবের কা'ব ইবনে আশরাফ-এর দূর্গসদৃশ প্রাসাদ। এটাকে কা'ব ইবনে আশরাফের দূর্গ (حصن كعب بن الأشرف)ও বলা হয় আবার কা'ব ইবনে আশরাফের প্রাসাদ (قصر كعب بن الأشرف)ও বলা হয়। কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী। বদর যুদ্ধে মক্কার বড় বড় সর্দারদের সকলেই নিহত হয়েছে শুনে সে শোক প্রকাশ করতে মক্কা রওয়ানা হল। সে নিহত কাফের নেতাদের শোক প্রকাশক কবিতা লিখে তা মক্কার সকলকে পড়ে শোনাতে লাগল। এভাবে সে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে নানা ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলে বলে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। এমনিভাবে উত্তেজিত করতে কুরাইশের লোকজনকে হারাম শরীফ এলাকায় নিয়ে এল। সকলের হাতে পবিত্র কা'বার গেলাফ ধরিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কসম খাওয়াল। এর কিছুদিন পর মদীনায় ফিরে এসে মুসলমান মহিলাদের নামে প্রেমের কুৎসিত কবিতা বলতে লাগল। (যুরকানী, ২য় খণ্ড, ৯ পৃষ্ঠা; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা) সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুৎসামাখা কবিতা রচনা করত। সে কবিতা মারফত কাফেরদরেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করত। মুসলমানদেরকে এভাবে ও নানাভাবে কষ্ট প্রদান করত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অত্যাচারের জবাবে নীরবে ধৈর্যধারণ ও নীরবতা অবলম্বনের আদেশ দিতেন। কিন্তু যখন তার দুষ্টামির মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায় এবং ধৈর্যধারণের সীমা অতিক্রম করে যায়, এমনকি সে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার উদ্যোগও নেয়। সে দাওয়াতের বাহানায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের বাড়িতে ডেকে আনে। সে পূর্ব থেকেই কিছু লোককে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিল। যখন তিনি (হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়িতে ঢুকবেন তারা তাঁকে অতর্কিতে হামলা করে মেরে ফেলবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে এসে বসা মাত্রই হযরত জিবরাঈল (আ) এসে কা'বের পরিকল্পনা সম্পর্কে নবীজীকে অবহিত করেন। তিনি শোনামাত্রই উঠে দাঁড়ান এবং হযরত জিবরাঈল (আ)-এর পাখার নিরাপদ আশ্রয়ে বাইরে বের হয়ে যান। এ অবস্থায় তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ফাতহুল বারী, কা'ব ইবনে আশরাফ অধ্যায়) হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ (রা) কৌশলে এই দূর্গের অভ্যন্তরেই কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করেন। ১৪ রবিউল আউয়াল, ৩য় হিজরী, রাতের বেলা তাকে হত্যা করা হয়।

তার দূর্গসদৃশ এ প্রাসাদের কিছু ধ্বংশাবশেষ এখনও রয়ে গেছে।

চিত্র নং ১৮৩ – কা'ব ইবনে আশরাফের দূর্গ

কা'ব ইবনে আশরাফের উপরোক্ত দূর্গটি মদীনার দক্ষিণ দিকে মসজিদে কুবা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে আব্দুল মুহসিন ইবনে আব্দুল আযীয সড়ক হয়ে কিং আব্দুল্লাহ রিং রোড পার হয়ে আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে সড়কের ডান দিকে কিছু ভেতরে অবস্থিত।

২. সালমান ফার্সীর খেজুর বাগানের স্থান ও বীরুল ফকীর

হযরত সালমান ফার্সী (রা.) গোলাম থাকা অবস্থায় মুসলমান হন। এক পর্যায়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুনিবের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে আযাদ হওয়ার চুক্তি করার জন্য পরামর্শ দেন। তার মুনিব শর্ত দিল ৪০ উকিয়া স্বর্ণ দিতে হবে এবং ৩০০ খেজুর গাছের চারা লাগাতে হবে, সেগুলো ফল দেয়া শুরু করবে, তখন আযাদী পাবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে ৩০০ খেজুর গাছের চারা রোপন করেন। অস্বাভাবিকভাবে এক বছরের মধ্যেই সেগুলোতে ফল আসে। মাত্র একটি গাছে ফল আসেনি। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল সে গাছটি হযরত ওমর (রা.) রোপন করেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সেখানে আর একটি চারা লাগান। সেটি-তও সে বছরেই ফল আসে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে লাগানো এই খেজুর গাছগুলো শত শত বছর জীবিত ছিল। বর্তমানে সেগুলো জীবিত নেই, তবে সেখানে এখনও খেজুর বাগান রয়েছে এবং রয়েছে অতি প্রাচীন একটি পানির কুয়া। বলা হয়, এই কুয়া থেকেই হযরত সালমান ফার্সী (রা.) তার খেজুর বাগানে পানি সেচ করতেন। কুয়াটিকে বীরু সায়্যিদিনা সালমান আল-ফার্সী (بئر سيدنا سلمان الفارسي) বীরুল ফক্বীর (بئر الفقير) ইত্যাদি নামে পরিচয় দেয়া হয়। এক সময় কুয়ার পাশে নির্মাণ করা হয় মসজিদুল ফক্বীর নামক একটি মসজিদ। এই কুয়া, বাগান ও মসজিদুল ফক্বীরের স্থান এখনও চিহ্নিত রয়েছে। মদীনার আওয়ালী এলাকায় মসজিদে কুবা থেকে কিছু পূর্বে অবস্থিত। মাযরাআতু সালমান আল-ফারসী বা বীরুল ফক্বীর বললে গাড়ীওয়ালাগণ সহজে চিনতে পারেন। এর পাশে ثانوية الأمير محمد بن عبد العزيز নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

চিত্র নং ১৮৪ – সালমান ফার্সীর খেজুর বাগানের স্থান

অষ্টম অধ্যায়

(বিশিষ্ট স্থান ও গোত্রসমূহের বাসস্থান প্রসঙ্গ)

বিশিষ্ট কয়েকজন নবী যেসব এলাকায় ও যাদের নিকট প্রেরিত হন তার বর্ণনা

হিজায (الحجاز)

এখানে প্রেরিত হন হযরত আদম আ., হযরত শীষ আ. ও হযরত ইসমাঈল আ.। হেজায বলা হয় বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা, মদীনা, আল-বাহা ও তাবূক– এই চার প্রদেশ (محافظة)কে। অর্থাৎ, বর্তমান সৌদি আরবের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হচ্ছে হিজায।

আল-জাযীরা (الجزيرة)

আল-জাযীরা হচ্ছে দাজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এখানে প্রেরিত হন হযরত নূহ আ.। তাঁর সম্প্রদায় কওমে নূহ নামে পরিচিত। দাজলা নদী তুরস্কের মধ্য দিয়ে, সিরিয়ার সামান্য অংশ হয়ে ইরাকের মধ্য দিয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। আর ফুরাত নদী তুরস্কের মধ্য দিয়ে, সিরিয়ার মধ্য দিয়ে, ইরাকের মধ্য দিয়ে ইরাকের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে এসে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। অতএব আল-জাযীরা অঞ্চল হচ্ছে বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বের অঞ্চল, সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও ইরাকের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল।

আহকাফ (الأحقاف)

এখানে প্রেরিত হন হযরত হূদ আ.। তিনি আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হন। আদ সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বাস করত তার কেন্দ্র ছিল আহকাফ।

আহকাফ-এর বিবরণ : ওমান, বাহরাইন, সৌদি আরবের ইয়ামামাহ (বর্তমান নাম আরিদ), নাজরান, বর্তমান ইয়ামানের হাদরামাওত ও পশ্চিম ইয়ামানের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় আর-রাবউল খালী (الربع الخالي)। এরই একটা অংশ ছিল আহকাফ। আর-রাবউল খালী-এর গোটা অঞ্চল বসবাসের উপযোগী না হলেও কিছু কিছু স্থান বসবাসের উপযোগী। বিশেষত হাদরামাওত ও নাজরানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বর্তমানে বসবাস না থাকলেও প্রাচীন যুগে এ অঞ্চল বসবাসের উপযোগী ছিল এবং এখানেই ছিল আহকাফ। এখানেই বসবাস করত আদ সম্প্রদায় (আদে ইরাম)।

ওয়াদিল কুরা ও হিজ্‌র

এখানে প্রেরিত হন হযরত সালেহ আ.। তিনি ছামূদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হন। ছামূদ সম্প্রদায় ওয়াদিল কুরা (وادي القرى)ও হিজ্‌র (الحجر) এলাকাসহ শামের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করত। ওয়াদিল কুরা ও হিজ্‌র হচ্ছে মদীনা প্রদেশের দুটি এলাকা। মদীনার কেন্দ্র থেকে উত্তর-পশ্চিমে ওয়াদিল কুরা অবস্থিত। ওয়াদিল কুরার কেন্দ্রীয় শহর হচ্ছে 'আল-উলা' (২৬.৫৮ উ:,৩৭.৯৪পূ:)। আল-উলা মদীনার কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০ কি. মি. দূরে। আর হিজ্‌র ওয়াদিল কুরারই অন্তর্গত একটি এলাকা। হিজ্‌র আল-উলা থেকে উত্তর-পূর্বে ২২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। হিজ্‌র (২৬.৪৭ উ: ৩৭.৫৩ পূ:)-এর বর্তমান নাম 'মাদাইনে সালেহ' (مدائن صالح)।

শাম দেশ (بلاد الشام)

এখানে প্রেরিত হন হযরত দাউদ আ. ও হযরত সুলাইমান আ.। ঐতিহাসিক শাম দেশ (بلاد الشام) ছিল বর্তমান অনেক রাষ্ট্র ও অনেক রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত এক বিশাল দেশ। বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ইরাকের মুসেল এলাকা, ঐতিহাসিক ফিলিস্তীন (বর্তমান পশ্চিম তীরসহ ভূমধ্য সাগরের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত), সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চল (আল-জাওফ প্রদেশ পর্যন্ত) ও মিসরের সিনাই এলাকা সবই শাম দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারও কারও মতে পশ্চিমে সাইপ্রাস (قبرص) ও পূর্বে আল-জাযীরা এলাকাও শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উর ও আল-খালীল

উর (أور) নামক জনপদটি বর্তমান ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে তিল্লুল মুকাইয়্যার (تل المقير) নামক এলাকায় অবস্থিত। এটি বসরার ১০০ কিলেমিটার উত্তরে, নাসিরিয়া শহরের কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই উর নামক জনপদে হযরত ইবরাহীম আ.-এর জন্ম। তিনি এতদাঞ্চলে নবী হিসেবে প্রেরিত হন। পরে তিনি শামে হিজরত করেন। তৎকালীন শামের অন্তর্গত ফিলিস্তীনের যে এলাকায় তিনি বসবাস করতেন পরবর্তীতে সে এলাকার নামকরণ করা হয় আল-খলীল(৩১.৫৩] (الخليل উ:,৩৫.০৯ পূ:]। এখনও আল-খলীল নামে সে শহরটি বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে এ শহরটি পশ্চিম তীর-এর সবচেয়ে বড় শহর হিসেবে পরিগণিত। শহরটি আল-কুদ্‌স থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। আল-খালীল নামকরণের পূর্বে এ শহরের নাম ছিল হেবরণ (Hebron)। এখনও হেবরণ নাম বলা হয়ে থাকে। এ শহরের মাঝে রয়েছে আল-মাসজিদুল ইবরাহীমী বা আল-হারামুল ইবরাহীমী, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী সারা, হযরত ইসহাক (আ.) ও তার স্ত্রী রিফ্‌ক্বা (رفقة)এবং হযরত ইয়াকূব (আ.) ও তাঁর স্ত্রী লিয়া (ليئة/ليا)-এর আবাসস্থল ঘিরে নির্মিত হয়েছে। মসজিদের তলে একটি গুহায় তাদের কবরসমূহ বিদ্যমান। কোন কোন বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ (আ.) এবং হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পুত্র সাম-এর কবরও এখানে রয়েছে।

কিনআন (كنعان)

এখানে প্রেরিত হন হযরত ইসহাক (আ.) ও হযরত ইয়া'কূব (আ.)। হযরত ইউশা' (আ.) প্রথমে মিসরে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি কিনআনে হিজরত করেন। তিনি বনী ইসরাঈল প্রভৃতি জাতির নিকট প্রেরিত হন। কিনআন ছিল ফিলিস্তীন, জর্দানের পশ্চিমাঞ্চল, সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ও ফিনিকিয়া রাজ্য-এর সমন্বিত অঞ্চল। আর প্রায় বর্তমান লেবাননই ছিল এককালীন ফিনিকিয়া রাজ্য।

সাদূম (سدوم)

এখানে বাস করত কওমে লূত (হযরত লূত [আ.]-এর সম্প্রদায়)। তাদের নিকট প্রেরিত হন হযরত লূত (আ.)। কওমে লূত যে জনপদগুলোতে বসবাস করত তার কেন্দ্রীয় জনপদের নাম ছিল 'সাদূম'। কওমে লূতের অপকর্মের শাস্তিতে তাদের জনপদগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া হয় এবং সেগুলো সাগরে পরিণত হয়। সাগরটার নাম মৃতসাগর। এখানে কোন প্রাণী বাঁচে না বলে একে মৃতসাগর বলা হয়। জর্ডন নদী ও আশপাশের বিভিন্ন পাহাড়ী ছোট ছোট নদী ও ঝর্ণা থেকে আগত পানির মাধ্যমে মাছ বা অন্য কোন প্রাণী মৃতসাগরে এসে পড়লে সেগুলোও মরে যায়।[1] আল্লাহর গযবেই এমনটি হয়ে থাকবে। এ সাগরের পানি অন্যান্য সাগরের তুলনায় অনেক বেশি লোণা। সাগরটি ৫০ মাইল লম্বা ও ১১ মাইল চওড়া। এ সাগরটার একটা বৈশিষ্ট হল এটা সাধারণ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ ফুট নিচু। এভাবে এ অঞ্চলটা পৃথিবীর সবচেয়ে নিচু অঞ্চল। এর আরেকটা বৈশিষ্ট হল এটা অন্যান্য সাগর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সাগরটাকে ইংরেজিতে Dead see, আরবিতে البحر الميت আর ফার্সী ও উর্দূতে بحر مردار বা بحر لوط বলা হয়। সাগরটি বর্তমান জর্দান এবং ফিলিস্তীন ও ইসরাঈলের মাঝে অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ ইহুদী ঐতিহাসিক জোসেফস (Josephus) লিখেছিলেন যে, লূত সম্প্রদায়ের জনপদগুলো– সাদূম, আমূরা প্রভৃতি মৃত সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। সম্ভবত তার এই বর্ণনার ভিত্তিতে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে একদল প্রাচ্যবিদ লূত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলো কোথায় ছিল তার অনুসন্ধানে বের হয়। তারা গোটা এলাকা সার্ভে শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সেই জনপদগুলোর মধ্যে সাদূম, আমূরা (عَمُوره) ও যা'র (ذَغْر) মৃতসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল। আর অবশিষ্ট জনপদগুলো সাগরের তলে এসে গেছে।[2] তাদের বর্ণনা মোতাবেক তারা সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে খনন করে সেখানে ঐসব জনপদের নিদর্শন দেখতে পান। এরই ভিত্তিতে শেষ যুগের মিসরীয় মুহাক্কিক ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার এই মত প্রকাশ করেছেন যে, লূত সম্প্রদায়ের উপর আযাব স্বরূপ তাদের জনপদগুলো উল্টে যাওয়ার মাধ্যমেই এই সাগর অস্তিত্বে

---

[1] 'জাহানে দীদাহ' বরাত : ব্রিটানিকা মেক্রোপিডিয়া, মুদ্রণ ১৯৮১।

[2] 'জাহানে দীদাহ' বরাত : ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা মুদ্রণ ১৯৮৮।

এসেছে। এর পূর্বে এ সাগর ছিল না। হযরত মাওলানা তাকী উছমানী সাহেব অন্যান্য সাগর থেকে এ সাগরের বিচ্ছিন্নতা, এর পানির স্বাতন্ত্র, এটা সবচেয়ে নিচু অঞ্চল হওয়া (যা জনপদ উল্টে পতিত হওয়ায় ভারত্বের কারণে হতে পারে) ইত্যাদির প্রেক্ষিতে বলেছেন, এগুলো আব্দুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার-এর মতের আনুকূল্য প্রদান করে।

বুস্‌রা ও হাওরান (بُصرى و حَوْران)

হযরত সাইয়্যিদ সুলাইমান নদবী (রহ.) দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন যে, হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর অধিবাস ছিল বুসরা এলাকায় (৩২.৫১ উ: , ৩৬.৪৯ পূ:)। (أرض القرآن) বুসরা (Busra/ بُصرى) হচ্ছে সিরিয়ার দার্‌আ (যার প্রাচীন নাম ছিল আযরুআত) নামক প্রদেশের অন্তর্গত একটি জনপদ। এটাকে শাম দেশের বুসরা (بصرى الشام)ও বলা হয়। আর দারআ হচ্ছে সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে জর্দানের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রদেশ। দারআর কেন্দ্র থেকে বুসরা শহরের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার এবং দামেস্ক থেকে ১৪০ কিলোমিটার। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর অধিবাস ছিল 'হাওরান' (Hauran/حَوْران) এলাকায়। বস্তুত পূর্বোল্লিখিত মতের সঙ্গে এই মতের কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, হাওরান হচ্ছে সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের এক বিস্তৃত সমতল এলাকা (দারআ প্রদেশও যার অন্তর্ভুক্ত)। আর বুসরা অঞ্চলও ভৌগোলিকভাবে হাওরানেরই অংশ। আবার হাওরান, দারআ, বুসরা সব শাম দেশ (দ্রষ্টব্য)-এরই অংশ। এ হিসেবে আইয়্যুব (আ.)-এর অধিবাস ছিল বুসরায়– তা যেমন বলা যায় তেমনি তাঁর অধিবাস ছিল হওরানে তাও বলা যায়। আবার তাঁর অধিবাস ছিল শামে তাও বলা যায়।

হযরত আইয়্যুব (আ.) ছিলেন আউয ইবনে আদওয়াম (عوض بن أدوم)-এর বংশধর। আদওয়াম (أدوم) শব্দটি দুইভাবে লেখা হয়ে থাকে: আদওয়াম ও এডোম। ইংরেজিতে বলা হয় এডোম (Edom)। তার বংশধরের মধ্যে যে রাজত্ব গড়ে ওঠে তার নাম হয় এডোমী রাজ্য, কেউ কেউ তাকে আউয রাজ্যও বলে থাকেন। এ রাজ্য আকাবা পর্যন্ত বিস্তৃত ফিলিস্তীনের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তার অধিবাসীরা হল এডোমী আরব। হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর বাসস্থান ও বংশ পরিচয়কে সামনে রেখে সংগত কারণেই অনেকে বলেন, হযরত আইয়্যুব (আ.) হাওরানবাসীদের নবী ছিলেন। কেউ কেউ আর একটু ব্যাপকতা এনে বলেন, তিনি এডোমীদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হন। আবার হযরত হিফজুর রহমান সিওহারবী কৃত 'কাসাসুল কুরআন'-এর একটি বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় হযরত আইয়্যুব (আ.) শাম থেকে ওমান ও ইয়ামানের হাদরামাউত পর্যন্ত বিস্তৃত আরব এলাকার নবী ছিলেন। এসব এলাকার আরব জাতির নিকট তিনি প্রেরিত হন।

মিসর ও ইউনান (مصر و يونان)

মিসর (Egypt) বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশের একটি প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী দেশ। এখানে প্রেরিত হন হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত মূসা ও হারূন (আ.)। হযরত ইউসুফ (আ.) মিসর ও ফিলিস্তীন এলাকার নবী ছিলেন। আর হযরত মূসা ও হারূন (আ.) প্রেরিত হন বনী ইসরাঈল ও ফিরআউনী সম্প্রদায়ের নিকট। অধিকাংশ মুফাসসিরিনে কেরামের মতে হযরত ইদরীস (আ.) মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই এলাকাতেই নবী হিসেবে প্রেরিত হন। একমতে তিনি বাবেলে জন্মগ্রহণ করেন এবং

সেখান থেকে হিজরত করে মিসরে আসেন। হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী কৃত 'কাসাসুল কুরআন'-এর একটি বর্ণনামতে হযরত ইদরীস (আ.) মিসর ও ইউনান (Grees/يونان) উভয় দেশের নবী ছিলেন। ইউনান বা গ্রীস হচ্ছে ইউরোপের মধ্যভাগের দক্ষিণ দিকস্থ ভূমধ্য সাগরের উপকূলীয় একটি দেশ।

মাদইয়ান (مدين)

মাদইয়ান বর্তমান সৌদি আরবের তাবুক প্রদেশের একটি অঞ্চল। অঞ্চলটি তাবুক প্রদেশের উত্তরের অংশে আকাবা উপসাগরের তীরবর্তী আল-বাদ' (Al-Bad' / 28° 41' N and 35° 18' E) শহরের পাশে অবস্থিত। আল-বাদ' (البدع) শহরটি তাবুক থেকে ১৭০ কিলোমিটার পশ্চিমে, আকাবা উপসাগর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে। এখানে প্রেরিত হন হযরত শুআইব (আ.)।

কারও কারও মতে যে মাদইয়ানে হযরত শুআইব (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন তা জর্দানের মূতা শহর (যেখানে মূতার যুদ্ধ হয়েছিল। এটা আল-কারাক [الكرك/Al-karak] শহর থেকে ১২ কি. মি. দূরে এবং আম্মান থেকে ১৪০ কি. মি. দক্ষিণে।)-এর পাশে অবস্থিত। এখানে 'মাদইয়ান' নামে সাইনবোর্ডও লাগানো রয়েছে। সাধারণ লোকজন সেটাকে 'মাদ্দীন' উচ্চারণ করে থাকে। এই মাদ্দীনেই ওয়াদিয়ে শুআয়ব নামক একটা জায়গায় একটি মাযার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ যে, সেটি হযরত শুআইব (আ.)-এর মাযার। এই মাযার থেকে পচিশ ত্রিশ কদম দূরে একটি কূপ রয়েছে যার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ যে, এটি সেই কূপ যা থেকে হযরত মূসা (আ.) মাদইয়ানে আসার পর হযরত শুআইব (আ.)-এর দুই কন্যার জন্য পানি তুলে দিয়েছিলেন। কুরআনে কারীমের সূরা কাসাসের ২২-২৩ আয়াতদ্বয়ে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

দাওয়ারদান (داوردان)

এখানে প্রেরিত হন হযরত হিযকীল (আ.)। তিনি প্রেরিত হন বনী ইসরাঈলের নিকট। এ এলাকাটি ইরাকের ওয়াছেত (Wasit/الواسط) অঞ্চলের পাশে অবস্থিত। ওয়াছেত অঞ্চলটি বর্তমান ইরাকের মধ্যভাগের পূর্বদিকে অবস্থিত (৩২.৬৯ উ:, ৪৫.৬৮ পূ:)। এর কেন্দ্রীয় শহরের নাম আল-কুত (الكوت)।

নীনাওয়া (نينوى)

এখানে প্রেরিত হন হযরত ইউনুস (আ.)। তার সম্প্রদায় কওমে ইউনুস নামে পরিচিত। নীনাওয়া (৩৬.৩৫ উ:, ৪৩.১৬ পূ:) বর্তমান ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় একটি প্রদেশ। বাগদাদ থেকে ৪৬৫ কিলোমিটার দূরে দাজলা নদীর উত্তর পূর্ব পাশে অবস্থিত। এর কেন্দ্র হচ্ছে মুসেল (الموصل)। তবে মুসেল শহর দাজলার অপরদিকে অবস্থিত।

বা'লবেক (بعلبك)

বা'লবেক (Baalbek) বর্তমান লেবাননের কেন্দ্রীয় একটি শহর (৩৪ উ:, ৩৬.২১পূ:)। রাজধানী বৈরুত থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ৮৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে প্রেরিত হন হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত আল-ইয়াছা' (আ.) ও হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ.)। তাঁরা তিনজনই বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হন।

ফিলিস্তীন (فلسطين/ Palestine)

ঐতিহাসিক ফিলিস্তীন বলতে বুঝায় পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর, পশ্চিম-দক্ষিণে সিনাই ও আকাবার মধ্যবর্তী ব্যবধানকারী সীমানা, দক্ষিণে আকাবা উপসাগরের মাথা, পূর্বে মৃতসাগর ও জর্ডন নদী এবং উত্তরে তাবারিয়া হ্রদ (بحيرة طبريا/Lake Tiberias, Sea of Galilee)-এর উত্তর প্রান্ত। এখানে প্রেরিত হন হযরত শামউইল (আ.)। তিনি বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হন।

জেরুজালেম (jerusalem)

জেরুজালেমকে আরবিতে বলা হয় بيت المقدس (বাইতুল মুকাদ্দাস/বাইতুল মাকদিস) বা القدس (আল-কুদস)। আব্বাসী খালীফা মামুন ২১৭ হিজরিতে সর্বপ্রথম 'আল-কুদস' নাম ব্যবহার করেন। বাইতুল মুকাদ্দাস অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিশেষ একটি মসজিদকে বলা হয় আল-মাসজিদুল আক্সা। ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস অঞ্চল বলতে বুঝায় ঐতিহাসিক ফিলিস্তীনের সিংহভাগ অঞ্চল ও জর্দানের কিছু অংশকে (মূতা ও আল-কারাক [الكرك/Al-karak] পর্যন্ত)। এই বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকায় প্রেরিত হন হযরত যাকারিয়া (আ.), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)। তাঁরা সকলে বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হন।

বাবেল (بابل)

বাবেল (Babylon) এক সময় ছিল ব্যবিলনয়ীদের রাজধানি। এটি দাজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী একটি ঐতিহাসিক শহর। বর্তমান ইরাকের রাজধানী বাগদাদের দক্ষিণে অবস্থিত (৩২.৪৫ উ:, ৪৪.৫৯ পূ:)। বাগদাদ থেকে সড়ক পথে বাবেলের দূরত্ব ১১২ কিলোমিটার। এখানে প্রেরিত হন হযরত ইয়ারমিয়া (আ.)। তিনি প্রথমে বাবেলে থাকেন, পরবর্তীতে জেরুজালেম হিজরত করেন। তিনি বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হন। হযরত উযায়র (আ.)ও বাবেল এলাকার নবী ছিলেন। তিনিও বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হন। হযরত ইবরাহীম (আ.)ও কিছুকাল বাবেলে নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি শামে হিজরত করেন।

এক নজরে বিভিন্ন নবীর নাম, তাঁদের গোত্র ও গোত্রের বাসস্থান

ক্র. ন.	নবীদের নাম	যাদের নিকট প্রেরিত হন	তাদের বসবাস যে অঞ্চলে ছিল
১	হযরত আদম (আ.)		হেজায (মক্কা, মাদীনা ও আছীর)
২	হযরত শীষ (আ.)		হেজায (মক্কা, মাদীনা ও আছীর)
৩	হযরত নূহ (আ.)	কওমে নূহ	আল-জাযীরা (দাজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল)
৪	হযরত ইদরীস (আ.)		মিসর। একমতে তিনি বাবেল থেকে হিজরত করে মিসরে আসেন।
৫	হযরত হূদ (আ.)	কওমে আদ	'আহকাফ' ছিল তাদের কেন্দ্রস্থল
৬	হযরত সালেহ (আ.)	কওমে ছামূদ	ওয়াদিল কুরা ও হিজ্র (মদীনা প্রদেশের দুটি এলাকা)সহ শামের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল
৭	হযরত ইবরাহীম (আ.)		জন্মস্থান উর। (বর্তমান নাম তিল্লুল মুকাইয়্যার– ইরাক) শামে হিজরত করেন। শাম, আরব উপদ্বীপ ও মিসর এলাকায় নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেন।
৮	হযরত ইসমাঈল (আ.)	আরব জাতি	হেজায
৯	হযরত ইসহাক (আ.)	কিনআনী	কিনআন
১০	হযরত লূত (আ.)	কওমে লূত	সাদূম প্রভৃতি জনপদ
১১	হযরত ইয়া'কূব (আ.)	কিনআনী	কিনআন
১২	হযরত ইউসুফ (আ.)	মিসর ও ফিলিস্তীনের জাতিসমূহ	মিসর ও ফিলিস্তীন
১৩	হযরত আইয়্যুব (আ.)	আরব জাতি	হাওরান/এডোমী রাজ্য/শাম থেকে ওমান ও হাদরামাউত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ আরব এলাকা
১৪	হযরত শুআইব (আ.)	বনী কাতূরা	মাদইয়ান (সৌদি আরব, মতান্তরে জর্দান)
১৫	হযরত মূসা (আ.)	বনী ইসরাঈল	মিসর
১৬	হযরত হারূন (আ.)	বনী ইসরাঈল	মিসর
১৭	হযরত ইউশা' (আ.)	বনী ইসরাঈল প্রভৃতি	প্রথমে মিসর পরে কিনআন
১৮	হযরত হিযকীল (আ.)	বনী ইসরাঈল	দাওয়ারদান (ইরাকের ওয়াছেত অঞ্চলের পাশে)
১৯	হযরত ইউনুস (আ.)	কওমে ইউনুস	নীনাওয়া (ইরাকের উত্তর অঞ্চলে)
২০	হযরত ইলিয়াস (আ.)	বনী ইসরাঈল	বা'লবেক (লেবাননের একটি শহর)
২১	হযরত আল-ইয়াছা' (আ.)	বনী ইসরাঈল	বা'লবেক (লেবাননের একটি শহর)
২২	হযরত যুল-কিফ্ল (আ.)	বনী ইসরাঈল	বা'লবেক (লেবাননের একটি শহর) ও শামের কিছু অঞ্চল।
২৩	হযরত শামউইল (আ.)	বনী ইসরাঈল	ফিলিস্তীন
২৪	হযরত দাউদ (আ.)	বনী ইসরাঈল	শাম
২৫	হযরত সুলাইমান (আ.)	বনী ইসরাঈল	শাম
২৬	হযরত ইয়ারমিয়া (আ.)	বনী ইসরাঈল	প্রথমে বাবেল পরে জেরুজালেম
২৭	হযরত উযায়র (আ.)	বনী ইসরাঈল	বাবেল
২৯	হযরত যাকারিয়া (আ.)	বনী ইসরাঈল	জেরুজালেম
২৯	হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)	বনী ইসরাঈল	জেরুজালেম
৩০	হযরত ঈসা (আ.)	বনী ইসরাঈল ও ফিলিস্তীনীদের নিকট	জেরুজালেম
৩১	হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	সমগ্র মানব জাতি	সারা বিশ্ব

নবম অধ্যায়

(কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহের পরিচিতি প্রসঙ্গ)

কুরআনে বর্ণিত স্থানসমূহের পরিচিতি

মক্কা ও বাক্কা (مكة و بكة)

কুরআনে কারীমে 'মক্কা' ও 'বাক্কা' উভয় শব্দের উল্লেখ এসেছে। মক্কা মুকাররমা সকলের কাছেই সুপরিচিত, আর 'বাক্কা' 'মক্কা'-রই আর এক নাম। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ.

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ.

ইয়াছরিব (يثرب)

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে 'ইয়াছরিব' শব্দের উল্লেখ এসেছে। বর্ণিত হয়েছে,

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا الآية.

ইয়াছরিব মদীনারই একটি প্রাচীন নাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে ইয়াছরিবে তাশরীফ আনার পর ইয়াছরিবের নামকরণ হয় মদীনাতুর রসূল (অর্থ : রসূলের শহর)। সংক্ষেপে বলা হয় 'মদীনা'।

মিস্‌র (مصر)

এ সম্বন্ধে পূর্বে 'বিশিষ্ট কয়েকজন নবী যেসব এলাকায় ও যাদের নিকট প্রেরিত হন তার বর্ণনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলের সমুদ্র পার হওয়ার স্থান

যেখানে আল্লাহর কুদরতে পানি ফাঁক হয়ে যায় এবং হযরত মূসা (আ.) বনী ইরসাঈলসহ পার হয়ে যান আর ফেরআউন তার দলবলসহ নিমজ্জিত হয় সে স্থানটি কোথায় এবং সেটা কি সমুদ্র না নদী এ নিয়ে মুফাসসিরীনে কেরামের দুই রকম মত দেখা যায়। কেউ কেউ বলেছেন, সেটা হচ্ছে নীল নদ (نهر النيل) আর কেউ কেউ বলেছেন, সেটা লোহিত সাগর (بحر القلزم/البحر الأحمر)। প্রথম মতটি সহীহ নয়। তাফসীরে রূহুল মাআনীতে البحر কিতাবের বরাতে বলা হয়েছে, "এটি ভুল"।

এ মতটি যে ভুল তার চারটা কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল–

১. হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল যে নীল নদ পার হননি তার একটি প্রমাণ হল কুরআনে কারীমের বর্ণনা। কুরআনে কারীমে এ ঘটনা বলতে গিয়ে বহু আয়াতে البحر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর البحر শব্দটি যদিও কেউ কেউ নদী অর্থেও ব্যবহার করেছেন তবে সাধারণত এর প্রয়োগ নদী অর্থে নয় বরং সমুদ্র অর্থেই হয়ে থাকে। যাহোক হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ الآية.

অর্থাৎ, আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। (সূরা আ'রাফ : ১৩৮)

এ আয়াতে 'সমুদ্র' শব্দের উল্লেখ এসেছে।

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ.

অর্থাৎ, অতঃপর আমি মূসার নিকট ওহী প্রেরণ করলাম যে, তুমি তোমার লাটি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে তা (সমুদ্র) বিদীর্ণ হয়ে গেল। বস্তুত প্রত্যেক ভাগ বিশাল উঁচু পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। (সূরা শুআরা : ৬৩)

এ আয়াতেও লক্ষণীয় যে, 'সমুদ্র' কথাটির উল্লেখ এসেছে। তদুপরি এ আয়াতে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল পানি ফাঁক হয়ে দুই পাশের দৃশ্য কেমন হয়েছিল তা বুঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ভাগ বিশাল উঁচু পর্বত সদৃশ হয়ে গেল।" তাহলে এটা সমুদ্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সমুদ্রের পানি ফাঁক হয়ে রাস্তা বের হলে সেখানেই দুই পাশের পানি বিশাল উঁচু পর্বত সদৃশ হয়ে দাঁড়ায়। নদীর ক্ষেত্রে এমন হতে পারে না। বিশেষত যে নীল নদের কথা কেউ কেউ বলেছেন, সেই নীল নদের গড় গভীরতা সাড়ে নয় মিটার। অতএব সেখানে পানি ফাঁক হলে দুই পাশে পানির উচ্চতা সাড়ে নয় মিটার বা তার কাছাকাছি হবে। এতটুকু উচ্চতার পানির স্তুপকে 'বিশাল উঁচু পর্বত সদৃশ' বলা যায় না।

উল্লেখ্য, ফেরআউন ও তার দলবল নিমজ্জিত হওয়ার বর্ণনায় একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (সূরা তাহা : ৭৮) এখানে الْيَمّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফেরআউন ও দলবলকে নিমজ্জিত করার বর্ণনা সম্বলিত আরও কয়েকটি আয়াতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ শব্দটি সমুদ্র ও নদী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ফেরআউন ও দলবলকে নিমজ্জিত করার বর্ণনায় ব্যবহৃত এ শব্দটিকে নদী অর্থে গ্রহণ করা যাবে না এ কারণে যে, তাহলে অন্য অনেকগুলো আয়াতে বর্ণিত সমুদ্র কথাটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে। সমুদ্র শব্দ ব্যবহৃত হওয়া আয়াতগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার প্রয়োজনে এখানেও الْيَمّ শব্দটিকে সমুদ্র অর্থেই গ্রহণ করতে হবে।

সেমতে আয়াতের অর্থ হবে– অতঃপর ফেরআউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করল। তখন সমুদ্রের যে (ভয়াল) জিনিস তাদেরকে আচ্ছন্ন করার তা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিল।

২. হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল যে নীল নদ পার হননি তার আর একটি প্রমাণ হল– ফেরআউন ও বনী ইসরাঈলের বসবাস ছিল মিসরের লুকসুর (لقصر/Loxur) অঞ্চলে (৩৫.২৫ উ: ৩৩.৩২ পূ:)। একে উকসুর (أقصر)ও বলা হয়, আবার আরবিতে মা'রিফা (معرفہ) প্রয়োগে আল-উকসুর (الأقصر)ও লেখা হয়। এ অঞ্চলটি মিসরের রাজধানী কায়রো (قاهره) থেকে ৬৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং আসওয়ান (أسوان) প্রদেশ থেকে ২২০ কিলোমিটার উত্তরে নীল নদের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল এখান থেকেই রওয়ানা হয়েছিলেন। গন্তব্য ছিল বনী ইসরাঈলের আদি নিবাস শাম দেশ। আর লুকসুর থেকে উত্তর দিকে সিনাই এলাকা পার হয়ে শাম দেশ। আর লুকসুর থেকে সিনাই এলাকার মধ্যে নীল নদের অন্তরায় নেই। তাই নীল নদ পার হওয়ার প্রশ্ন আসে না। পশ্চিম দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্য থাকলে নীল নদ পার হওয়ার প্রশ্ন ছিল।

৩. কুরআনে কারীমের বর্ণনা মোতাবেক (দ্র. সূরা শুআরা : ৫২) হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের বেলায় রওয়ানা হয়েছিলেন। আর ফেরআউন পরবর্তী সকালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল এবং পার হওয়ার আগেই ফেরআউন তার দলবলসহ তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল (দ্র. সূরা শুআরা : ৬০–৬১)। আবার ফেরআউনের প্রাসাদ ছিল নীল নদেরই পূর্ব তীরে নদীর একেবারেই নদী সংলগ্ন, (যা কুরআনে কারীমের সূরা যুখরুফের ৫১ নং দ্বারা প্রমাণিত) আর এরই আশে পাশে ছিল বনী ইসরাঈলের অবস্থান। তাহলে এখন নীল নদই যদি পার হওয়ার ছিল তাহলে তো সকালের অনেক আগেই পার হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কেননা তাদের বসবাস তো ছিল নীল নদেরই উপকূলে। তাহলে পার হওয়ার আগেই ফেরআউনের দলবলসহ সেখানে পৌছার কথা ছিল না।

৪. কুরআনে কারীমের সূরা আ'রাফের ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর এক সম্প্রদায়কে মূর্তি-পূজায় রত দেখে তাদের জন্য সেরূপ মূর্তি নির্ধারণ করে দেয়ার আবেদন করেছিল। বর্ণনায় বুঝা যায় এরূপ মূর্তি সম্বন্ধে পূর্বে তারা অবগত ছিল না। নতুন ধরনের মূর্তি দেখেই তাদের মনে সেরূপ মূর্তি-উপাসনার খাহেশ জেগেছিল। এখন যদি নীল নদ পার হয়েই বিষয়টি ঘটে থাকবে তাহলে নতুন মূর্তি দেখার প্রশ্নই উঠে না, তারা তো এই নদীরই অপর পারে বসবাস করেছিল, তাহলে এপারের মূর্তি সম্বন্ধে তাদের পূর্বেই অবগত থাকার কথা।

যাহোক হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল নীল নদ নয় বরং লোহিত সাগর পার হয়েছিলেন। এখন রয়ে গেল লোহিত সাগরের কোন্ স্থান দিয়ে পার হয়েছিলেন? এর সহজ সমাধান হল যেহেতু তারা পার হয়ে সিনাই এলাকায় পৌছেছিলেন, তাই মিসর ও সিনাইয়ের মাঝে লোহিত সাগরের যে অঞ্চল পড়ে সেখান থেকেই পার হয়েছিলেন। আর সেটা হল লোহিত সাগরেরই অংশ সুয়েজ উপসাগর (خليج سويس)। এই সুয়েজ উপসাগরেরই যে কোন একটি স্থান দিয়ে তারা পার হয়েছিলেন। আর নির্দিষ্ট করে বলা যে, সুয়েজ উপসাগরের ঠিক কোন্ স্থানটি দিয়ে পার হয়েছিলেন, সেটা বলা কঠিন। প্রাচীন মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীন থেকে এ ব্যাপারে তেমন বক্তব্য পাওয়া যায় না। আধুনিক কালের মিসরীয় গবেষণগণ এ ব্যাপারে গবেষণা ও তদন্ত করে কিছু বলার চেষ্টা করছেন, তবে তাদের বক্তব্যেও পরস্পর বিরোধ রয়েছে। কেউ বলছেন, মিসরের লোহিত সাগরের উপকূলীয় 'আল-বাহরুল আহমার' গভর্ণরেটের রা'স গারেব (رأس غارب/Ras Ghareb) বরাবর স্থান দিয়ে পার হয়েছিলেন। তারা বলছেন, আধুনিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বরাবর সাগরের তলে প্রচুর সংখ্যক মানুষের মাথার খুলি ও অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংশাবশেষ পাওয়া গেছে, যা এখানে ফেরআউনের সশস্ত্র বাহিনীর ডুবে মরার প্রমাণ বহন করে। কেউ কেউ সুয়েজ শহর থেকেও উত্তর দিকের কোন স্থান দিয়ে (যেখানে এখন সুয়েজ সাগর নেই) পার হওয়ার কথা বলছেন। তাহলে ফেরআইনের ডুবে মরার সে যুগে সে পর্যন্ত সুয়েজ সাগরের অংশ প্রলম্বিত ছিল বলতে হয়। এই মতের প্রবক্তাগণ তেমনই বলেছেন। যাহোক এ ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

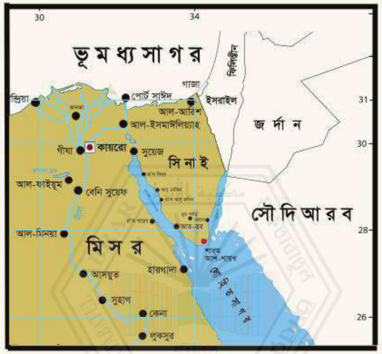

চিত্র নং ১৮৫ - শার্‌ম আশ-শায়খ

সিনাই ও তূর

সিনাই মিসরের উত্তর-পূর্বের একটি উপদ্বীপ। বাংলা ও ইংরেজিতে বলা হয় সিনাই আর আরবিতে বলা হয় সাইনা' (سَيناء/Sinai)। এই উপদ্বীপের উত্তরে ভূমধ্য সাগর, দক্ষিণে লোহিত সাগর, পূর্বে ফিলিস্তীনের গায্‌যা ও আকাবা উপসাগর এবং পশ্চিমে সুয়েজ উপসাগর ও সুয়েজ খাল।

এক সময় সিনাই জনবসতীহীন মরু অঞ্চল থাকলেও বর্তমানে (২০১৮ সালে) সিনাই এলাকায় ২৪ লক্ষ লোকের বসবাস রয়েছে। এবং গোটা সিনাই এলাকা প্রশাসনিকভাবে কয়েক প্রদেশে বিভক্ত। সিনাই এক বিশাল বিস্তৃত অঞ্চল। অঞ্চলটিকে প্রশাসনিকভাবে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে তূর পর্বত যে এলাকায় অবস্থিত সে এলাকাটির নাম সেন্ট ক্যাথরিন (Saint Catherine)। আরবি উচ্চারণে বলা হয় সান্‌ত্ কাত্‌রিন (سانت كاترين)। এই সেন্ট ক্যাথরিন এলাকাটি দক্ষিণ সিনাইয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। সেন্ট ক্যাথরিন অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬০০ মিটার উঁচু বড় বড় পর্বত ঘেরা একটি অঞ্চল। তূর পর্বত থেকে দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে কিছুদূরে সেন্ট ক্যাথরিন নামে একটি পর্বত (جبل سانت كاترين) রয়েছে। এ পর্বতটির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৬২৯ মিটার। এটি সিনাই এলাকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত। এই পর্বতের নামেই গোটা এলাকার নামকরণ হয়েছে সেন্ট ক্যাথরিন। তূর পর্বতের পাদদেশে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি নামে একটি মঠ বা আশ্রমও রয়েছে, যার

উল্লেখ পরে আসছে। উল্লেখ্য, অনেকেই সেন্ট ক্যাথরিন, সেন্ট ক্যাথরিন পর্বত ও সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি–এই তিনটির মাঝে পার্থক্য করতে না পেরে সব ঘুলিয়ে ফেলেন।

তূর (طور/El-tur) হচ্ছে দক্ষিণ সিনাই-এর একটি গভর্ণরেট (গভর্ণর শাসিত অঞ্চল/محافظة جنوب سيناء)-এর রাজধানী। ঐতিহাসিক তূর পাহাড়ের নামে এর নামকরণ হয়ে থাকবে। এ শহরটি সুয়েজ খাল থেকে ২৭৫ কিলোমিটার এবং 'শার্‌ম আশ-শায়খ' (شرم الشيخ) থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই শহরের কেন্দ্র থেকে উত্তর-পূর্বে ঐতিহাসিক তূর পাহাড় অবস্থিত। শহরের কেন্দ্র থেকে খুব দূরে না হলেও গাড়ি পথে অনেক ঘুরে যেতে হয় বলে দূরত্ব হয় ১৬৫ কিলোমটার। সোজা পথ হলে আনুমানিক ৫০/৫৫ কিলোমিটার দূরত্ব হত। তূর পর্বতকে আরবিতে বলা হয় জাবালুত তূর (جبل الطور) বা জাবালে মূসা (Jabal mousa/جبل موسى) বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় Mount sinai বা Mount Musa। তূর পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২৮৫ মিটার।

তূর পর্বত খোলা জায়গায় একটি একক পর্বত– এমন নয়। বরং বহুসংখ্যক ঘন সন্নিবিষ্ট পর্বতরাজির মাঝে একটি পর্বত। ফলে চূড়া ব্যতীত গোটা তূরকে যেমন স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায় না তেমনি গোটা তূরের স্বতন্ত্র ছবিও তোলা যায় না। একমাত্র উপর থেকে অর্থাৎ, হেলিকপ্টার বা প্লেন থেকে পুরো চূড়ার ছবি তোলা সম্ভব। অনেক পর্বতের মাঝে হওয়ার কারণে অনেক পর্বতের আশপাশ ঘুরে ঘুরে তূর পর্বতে আরোহণ করতে হয়।

উল্লেখ্য, কুরআনে কারীমে তূরে সাইনা'-এর পাশাপাশি 'তূরে সীনীন' শব্দেরও উল্লেখ এসেছে (وطور سينين)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কা'ব আহবার প্রমুখের মতে সিনাই আর সীনীন এক কথা। অতএব তূরে সীনীন দ্বারা জাবালে মূসাই উদ্দেশ্য। হযরত ইকরিমা বলেছেন, 'তূরে সীনীন'-এর 'তূর' দ্বারা পাহাড়ই উদ্দেশ্য, আর সীনীন অর্থ সুন্দর। কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদের মতে তূরে সীনীন দ্বারা মসজিদে মূসা উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য, 'মসজিদে মূসা' (قرية مسجد موسي/Moussa village mosque) মিসরের একটি নগরী, যা আল-জীযা প্রদেশের অন্তর্গত, নীল নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত।

চিত্র নং ১৮৬ – তূর পর্বত

পবিত্র তুওয়া উপত্যকা ও উল্লিকা বৃক্ষ

তূর পর্বতে আরোহণের পথ রয়েছে দুই দিক থেকে। সহজ পথ যেটি দিয়ে সাধারণত সকলে তূরে আরোহণ করেন সেটি হল তূর পর্বতের উত্তর দিকের পথ। হযরত হারূন (আ.)-এর কথিত কবরকে বাম হাতে রেখে কিছুদূর দক্ষিণে অগ্রসর হলে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি। এর পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে ধীরে ধীরে উপরে অগ্রসর হয়ে তূরে আরোহণের যে পথ সেটিই হচ্ছে উত্তর দিকের পথ। যেখান থেকে তূরের উদ্দেশ্যে উপর দিকে আরোহণ শুরু হয়, সে জায়গাটি দুই দিকের পর্বতের মাঝে একটি উপত্যকা। এখানে তূরের দিকে (দক্ষিণ দিকে) মুখ করে দাঁড়ালে ডান দিক হল কুরআনে উল্লেখিত সেই ডান দিকের উপত্যকা (الوادى الأيمن)– পবিত্র তুওয়া উপত্যকা (الوادى المقدس طوى)। সেখানে বর্তমানে রয়েছে সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি। (دَيْر سانت كاترين/Saint Catherine's Monastery)। মন্যাস্টারি বলা হয় সন্ন্যাসীদের মঠ বা সন্ন্যাসীদের আশ্রমকে। এই মন্যাস্টারির মধ্যে একটি গাছ রয়েছে। গাছটি লতা জাতীয় গাছের ন্যায়। গাছটিকে বলা হয় আশ-শাজারাতুল উল্লিক্বা (الشجرة العليقة) বা আশ-শাজারাতুল উল্লাইক্বা, যার অর্থ করা যায় ঝুলন্ত গাছ। গাছটির গোড়া গির্জার মধ্যে আর লতার ন্যায় শাখা-প্রশাখা গির্জার বাইরে। ফলে বাইরের অংশ ঝুলন্তই মনে হয়। বাইরের অংশ নিচের দিকে দেয়াল দিয়ে বেষ্টনী করে রাখা হয়েছে। বলা হয় এটি সেই গাছ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বিবিসহ মাদইয়ান থেকে মিসরে আসার পথে যেখানে আগুন দেখে জ্বলন্ত অঙ্গার সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন আর নিকটে আসার পর এই গাছ থেকেই আল্লাহ তাআলা তাকে ডেকে বলেন, হে মূসা! আমি আল্লাহ, জগৎসমূহের প্রতিপালক ...। হাজার হাজার বছর পার হওয়া সত্ত্বেও এই গাছটি এখনও জীবিত। গোটা সিনাই এলাকায় এরকম আর একটি গাছও পাওয়া যায় না। এর পাতাও ঝরে পড়ে না। এই গাছ থেকে এরকম গাছও আর বানানো সম্ভব হয় না। খ্রিস্টানরা বিভিন্ন দেশে এর শাখা নিয়ে এরকম আরও গাছ বানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সিনাই অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে গবেষণা ও তার তাত্ত্বিক প্রচার প্রসারের লক্ষে গঠিত সংস্থা (البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء)-এর প্রধান ডক্টর আব্দুর রহীম রায়হান তদন্ত সাপেক্ষে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এটিই কুরআনে উল্লেখিত সেই বৃক্ষ। অতএব এই স্থানটিই হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত সেই ডান দিকের উপত্যকা (الوادى الأيمن)– পবিত্র তুওয়া উপত্যকা (الوادى المقدس طوى)। এ ব্যাপারে কুরআনের সূরা ক্বাসাসের বর্ণনা নিম্নরূপ–

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي
آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي
الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠)

অর্থাৎ, অতঃপর মূসা যখন সে মেয়াদ (শুআয়ব [আ.]-এর কাছে থাকার মেয়াদ) পূর্ণ করল এবং সে তাঁর পরিবার নিয়ে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিক থেকে এক প্রকার আগুন (-এর মত আলো) দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি এক প্রকার আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো সংবাদ অথবা আগুনের একটা জ্বলন্ত কয়লা আনতে পারি। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (২৯) অতঃপর যখন সে (মূসা) তার

(আগুনের) কাছে পৌঁছল, তখন সেই উপত্যকার ডান দিক থেকে সেই বরকতময় স্থানে এক বৃক্ষ থেকে আহবান করা হল যে, হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, সমগ্র জগতের প্রতিপালক। (২০)

চিত্র নং ১৮৭ – সেন্ট ক্যাথরিন মন্যাস্টারি

চিত্র নং ১৮৮ – উল্লিকা বৃক্ষ

মাজমাউল বাহরাইন (مجمع البحرين)

মাজমাউল বাইরাইন অর্থ দুই সাগরের সংগমস্থল। এই মাজমাউল বাহরাইন তথা দুই সাগরের সংগমস্থলে হযরত মূসা (আ.) ও খিযির (আ.)-এর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরআনে কারীমে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। স্থানটি কোথায় তা নিয়ে অনেক মত রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি মত নিম্নরূপ:

১. অধিকাংশ তাফসীরের কিতাবে প্রাচীন মুফাসসিরগণের উক্তি এই বর্ণিত হয়েছে যে, মাজমাউল বাহরাইন তথা দুই সাগরের সংগমস্থল বলে পারস্য উপসাগর (بحر فارس) ও রূম সাগর (بحر الروم) তথা ভূমধ্য সাগর-এর সংগমস্থলকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এই সংগম কোথায় কীভাবে হয়েছে তা বোধগম্য নয়। উল্লেখ্য, আরবিতে ভূমধ্য সাগরকে রূম সাগর (بحر الروم) বলা হয়। আবার البحر الأبيض المتوسط ও বলা হয়।

২. একমতে মাজমাউল বাইরাইন তথা দুই সাগরের সংগমস্থল বলে ইরাকের দক্ষিণ-পূর্বে ফুরাত নদী ও পারস্য উপসাগরের সংগমস্থলকে বুঝানো হয়েছে। এমতটিও দু'টো কারণে সঠিক নয়। (এক) কেননা, এখানে নদী ও সাগরের সংগম হয়েছে, অথচ মাজমাউল বাইরাইন অর্থ দুই সাগরের সংগমস্থল। (দুই) হাদীছের বর্ণনা (বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হচ্ছে) থেকে বুঝা যায় এক রাত ও ১ দিনের দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই ছিল মাজমাউল বাহরাইন। আর সেখানেই হযরত খিযর (আ.)-এর সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাত হয়। আর হযরত মূসা (আ.) রওনা দিয়েছিলেন সিনাই এলাকা থেকে। তাহলে সাক্ষাতের স্থান ফুরাত নদী ও পারস্য উপসাগরের সংগমস্থল কীভাবে হতে পারে? সীনাই এলাকা থেকে ফুরাত নদী ও পারস্য উপসাগরের সংগমস্থল পর্যন্ত দুই হাজার কিলোমিটারের উপরে দূরত্ব, এক রাত এক দিনে কি এত পথ (দুই হাজার কিলোমিটারের উপর পথ) অতিক্রম করা যায়? পূর্বে উল্লেখিত হাদীছের বর্ণনা লক্ষ করুন। বোখারী শরীফে ৪৭২৪ নং হাদীছে উল্লেখ হয়েছে,

فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ... فَقَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ ...

অর্থাৎ, তারা উভয়ে (পাথরের চাঁইয়ের কাছে বিশ্রাম নেয়ার পর) তাদের এক রাত ও এক ি দিনের অবশিষ্টটুকু সামনে অগ্রসর হল। পরবর্তী দিন সকালে মূসা তার যুবক খাদেমকে বলল, নাস্তা আন, এই সফরে আমরা বেশ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। ... খাদেম বলল, আচ্ছা দেখুন তো ঐ বিরাট প্রস্তরখণ্ডের কাছে যখন বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে রাস্তা করে নিয়ে তা দিয়ে চলে যায়, কিন্তু আমি আপনাকে তা বলতে ভুলে যাই। শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তখন মূসা বলল, আমরা তো ঐ স্থানটিরই তালাশে ছিলাম। অতঃপর তারা উভয়ে তাদের পায়ের নিশানা

অনুসরণ করে উল্টো দিকে ফিরে গেল। অবশেষে সেই পাথরটির নিকট পৌছে গেল। (সেখানেই খিযরের সাক্ষাৎ পেল।) এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যেখানে তারা খিযরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সেটা এক রাত ও এক দিনের চেয়ে কম দূরত্বের পথ ছিল। অতএব সিনাই থেকে এক রাত ও ১ দিনের দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই ছিল মাজমাউল বাহরাইন। তাহলে দাজলা ফুরাত ও পারস্য উপসাগরের সংগমস্থল যা দুই হাজার কিলোমিটারের চেয়ে দূরত্বে তা কীকরে মাজমাউল বাহরাইন হতে পারে? এক রাত ও এক দিনে কি দুই হাজার কিলোমিটারের চেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করা যায়? যদি কেউ বলেন, হতে পারে সাধারণভাবে পায়ে হেঁটে নয় বরং অলৌকিকভাবে তারা অল্প সময়ে সেখানে পৌছেছিলেন, তাহলে বলব, সেটা কুরআন বিরোধী বক্তব্য। কেননা কুরআনে উল্লেখ আছে- মূসা (আ.) বলেছিলেন, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا অর্থাৎ, এই সফরে আমরা বেশ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি। আর স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে গেলেই তো কষ্ট হতে পারে, অলৌকিকভাবে গেলে তো কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তারা যখন কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন, বুঝা গেল যাওয়াটা স্বাভাবিকভাবে হেঁটেই সম্পন্ন হয়েছিল।

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.)-এর মতে আইলা বা বর্তমান আকাবাই হল সেই স্থান। (এটিকে বর্তমানে 'আইলাত'ও বলা হয়।) তাহলে মেনে নিতে হবে অতীতে আকাবার সংগে ভূমধ্য সাগরের কোন সংযোগ ছিল। নতুবা 'দুই সাগরের সংগমস্থল' কথাটি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু অতীতে কখনও এমন সংযোগ থাকার বিষয়টা পরিজ্ঞাত নয়।

৪. বিংশ শতাব্দির মাঝের দিকে মিসরের সিনাই এলাকার ঐতিহাসিক বিষয়াদি অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষে গঠিত সংস্থা (البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء)-এর প্রধান ডক্টর আব্দুর রহীম রাইহান (الدكتور عبد الرحيم ريحان) তার সংস্থার অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা বলেছেন যে, সিনাই এলাকার দক্ষিণে রা'সু মুহাম্মাদ (رأس محمد) নামক এলাকার পাশে 'শার্‌ম আশ-শায়েখ' (Sharm El Sheikh/شرم الشيخ) নামক শহর অবস্থিত। এ শহরটি সিনাইয়ের দক্ষিণে লোহিত সাগরের কূলে অবস্থিত। এই শহরেরই সমুদ্র উপকূলে সুয়েজ উপসাগর ও আকাবা উপসাগরের সংগমস্থল রয়েছে। এটিই কুরআনে বর্ণিত মাজমাউল বাহরাইন তথা দুই সাগরের সংগমস্থল। ডক্টর আব্দুর রহীম রাইহান স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্থানটি চিহ্নিত হওয়ার দাবি করেছেন এবং বলেছেন, সেখানে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে একটা বিশাল পাথরখণ্ডের সন্ধানও মিলেছে। উল্লেখ্য, কুরআনে কারীমে হযরত খিযিরের সাক্ষাতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের নিকট আরাম গ্রহণের কথা এবং সেখানে মূসা (আ.)-এর খাদেম (ইউশা'। যিনি পরবর্তীতে নবুয়ত লাভ করেন)–এর নিকট রক্ষিত থলে থেকে মাছ বের হয়ে সমুদ্রে সুড়ং পথ করে চলে যাওয়ার কথা এবং সেখানে হযরত খিয্‌রের সাক্ষাত পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : সূরা কাহফের ৬০–৬৫ আয়াতসমূহ-এর তর্জমা ও ব্যাখ্যা।)

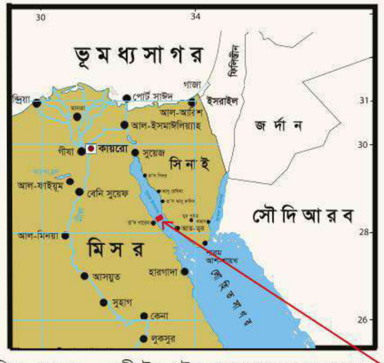

চিত্র নং ১৮৯ – বনী ইসরাঈলের সম্ভাব্য পার হওয়ার স্থান

জূদী (الجودي/ Mount Judi)

কুরআনে কারীমের বর্ণমামতে হযরত নূহ (আ.)–এর নৌকা তুফান শেষে জূদীতে থেমেছিল। সূরা হূদের ৪৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ.

অর্থাৎ, বলা হল, হে ভূমি! তুমি তোমার পানি গিলে নাও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও। আর পানি অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং বিষয়ের নিষ্পত্তি ঘটল এবং নৌকা জূদী পর্বতে স্থির হল।

এই জূদী হচ্ছে তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে শিরনাক (Sırnak /شرناق) নামক প্রদেশের একটি পর্বত। এ প্রদেশটি ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তের নিকটবর্তী। এ পর্বতটি তুরস্কের জাযীরা ইবনে ওমর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ পর্বতটি আরারাত (أرارات) পর্বতমালারই অংশ। তাওরাতের বর্ণনা থেকে এমনটিই প্রতিপন্ন হয়। তাওরাতে বলা হয়েছে, নূহের কিশতী যেখানে থেমেছে সেটা আরারাত পর্বতমালা। অবশ্য কেউ কেউ জূদী পর্বতকে আরারাত পর্বতমালার অংশ নয় বরং ভিন্ন পর্বত গণ্য করে থাকেন। জূদী পর্বতকে ইরানীরা বলে জাবালে নূহ, আর্মেনীয়রা বলে মাসীস (ماسيس), তুর্কীরা বলে কিরদাগ (كرداغ), কোন কোন এলাকার লোক বলে এগরিদাগ (اغرى داغ)।

জূদী পর্বত কোথায় তা নিয়ে প্রাচীন লেখকদের যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো শব্দগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকম মনে হলেও বাস্তবে উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। যেমন: কেউ বলেছেন, জূদী পর্বত শাম দেশের পাশে। তা শাম দেশ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর সিরিয়ার উত্তরেই তুরস্ক। কেউ বলেছেন, জূদী পর্বত মুসেল শহরের উত্তরে। তা বাস্তবেও ইরাকের

মুসেল শহরের উত্তরেই তুরস্কের শারনাক প্রদেশ। কেউ বলেছেন, জূদী পর্বত আর্মেনিয়ার দক্ষিণে। তা বাস্তবেও তুরস্কের শারনাক প্রদেশ আর্মেনিয়ার দক্ষিণ দিকেই অবস্থিত।

উল্লেখ্য, বর্তমানে নেটে জূদী পর্বতের পাশে মাটিতে দেবে থাকা একটি বড় আকারের নৌকার ছবি প্রদর্শন করে বলা হয় এটি নূহ (আ.)-এর নৌকা এবং বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কেউই পূর্ণাঙ্গ নৌকার এমন চিত্র বা অবস্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূগোলবিদ, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কেউ কেউ স্যাটেলাইটের মাধ্যমেও দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউই স্পষ্টত এমন নৌকা দেখেছেন তা বলেননি। কেউ কেউ মাটির তলে নৌকার ভগ্নাবশেষ বা ভাংগা ভাংগা কিছু কাঠের টুকরো থাকার বা পাওয়ার দাবি করলেও এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সম্ভাব্য নূহ (আ.)-এর যুগের হওয়ার দাবি করলেও অন্য অনেকে তা অস্বীকার করেছেন। বস্তুত নেটে প্রদর্শিত নূহ (আ.)-এর নৌকার পূর্ণাঙ্গ ছবি কাল্পনিক এবং কৃত্রিমভাবে বানানো ছবি।

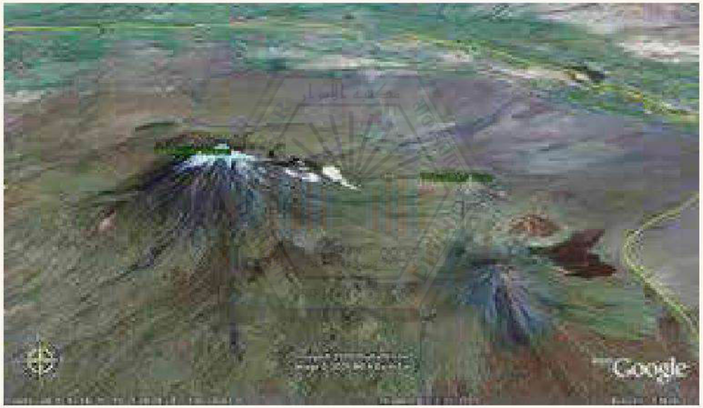

চিত্র নং ১৮০ – আরারাত পর্বতমালা

রাকীম ও আসহাবে কাহাফের গুহা (الرقيم وغار أصحاب الكهف)

এখানে আমরা দু'টো বিষয়ে আলোচনা করব। এক. রাকীম কি। দুই. আসহাবে কাহাফের গুহা কোথায়?

'রাকীম' কি এ নিয়ে অনেক মত রয়েছে। যেমন:

১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত– রাকীম হচ্ছে আইলা (বর্তমান আকাবা)-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। আতিয়্যাহ আল-আওফী ও কাতাদার অভিমতও তাই।

২. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আর এক সূত্রে বর্ণিত– যে পাহাড়ের গুহায় আসহাবে কাহাফ ছিল সেই পাহাড়ের নাম রাকীম।

৩. দাহ্হাক বলেন, যে উপত্যকায় আসহাবে কাহাফের গুহা ছিল রাকীম হচ্ছে সেই উপত্যকার নাম।

৪. মুফাসসির যায়দ ইবনে আসলাম ও ইবনে জারীর বলেন, গুহার মুখে যে ফলকে আসহাবে কাহাফের নাম লেখা ছিল রাকীম হচ্ছে সেই ফলক।

৫. শেষ যুগের মুহাক্কিক আলেম সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী 'আর্দুল কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন, "রাকীম হচ্ছে জর্দানের একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর, রোমান সাম্রাজ্য যার নাম পরিবর্তন করে নাম রাখে পেট্রা।" উল্লেখ্য, 'পেট্রা' (بترا/Petra) জর্দানের রাজধানী আম্মান থেকে ২১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে মাআন (مَعان/Ma'an) প্রদেশের অন্তর্গত একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক শহর।

৬. সর্বশেষ জর্দানের মুহাক্কিক আলেম তাইসীর জবইয়ান (১৯০১–১৯৭৮ খৃ.) ১৯৫৩ সনে আবিষ্কার করেন যে, জর্দানের রাজধানী আম্মানের ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে রাজীব (الرجيب) নামক গ্রামটিই হচ্ছে রাকীম। ওখানকার পল্লিবাসীরা প্রায়সই ক্বাফকে জীম এবং মীমকে বা দ্বারা পরিবর্তন করে থাকে। সেভাবেই রাকীম শব্দটি রাজীব হয়ে গিয়ে থাকবে। জর্দানের প্রত্নতত্ব বিশারদ রফীক রজানীও তদন্ত শেষে ঘোষণা দেন যে, এটিই সেই রাকীম। ১৯৬১ সনে জর্দানের প্রত্নতত্ব বিভাগ সেখানে খনন কার্য চালিয়ে বিষয়টির অনুকূল প্রচুর তত্ত্ব-উপাত্ত খুঁজে পায়। অবশেষে সে দেশের সরকার সরকারীভাবে সেই জনপদটির নাম রাকীম ঘোষণা করে।

আসহাবে কাহাফের গুহা কোথায়– এ নিয়েও অনেক মত রয়েছে। যেমন:

১. ইবনে আতিয়্যাহ বলেছেন, আসহাবে কাহাফের গুহা শাম দেশে।

২. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত– রাকীম হচ্ছে আইলা (বর্তমান আকাবা)-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। সেখানেই আসহাবে কাহাফের গুহা।

৩. আসহাবে কাহাফের গুহা জর্দানে। প্রসিদ্ধ ভূগোল বিশারদ আবূ আব্দিল্লাহ আল-মাকদিসী আহসানুত্তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আক্বালীম (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) গ্রন্থে লিখেছেন, রাকীম জর্দানের পূর্বাঞ্চলে আম্মানের নিকবর্তী একটি জনপদ। সেখানে একটি গুহার সন্ধান মিলেছে, যাতে কিছু মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, যেগুলো খুব পুরাতন নয়। (موقع أصحاب الكهف)

৪. আসহাবে কাহাফের গুহা রূমে।

৫. আসহাবে কাহাফের গুহা তুরস্কের আফসুস/ইফ্সুস নগরীতে। গ্রীক ভাষায় একে বলে আফসুস/ইফ্সুস। আর তুরস্কে একে বলা হয় ইফিস (Efes/إيفيس)। এ নগরীটি তুরস্কের আনাতোলিয়া (Anatolia /أناضول) অঞ্চলের পশ্চিমে ইজমীর (İzmir /إزمير) অঞ্চল (৩৮.৪২ উ:, ২৭.১৪ পূ:)-এর একটি নগরী। এর পশ্চিমে এজিয়ান সাগর (Aegean See/إيجة)। তুরস্কের আরও দুটি জায়গায় আসহাবে কাহাফের গুহা থাকার কথা প্রসিদ্ধ আছে। একটি হচ্ছে দেশটির দক্ষিণে কাহরামান মারআশ (Kahraman maras/قهرمان مرعش) নামক অঞ্চল-এর আফশীন (Afsin/أفشين) নামক জায়গা (৩৮.২৪ উ:, ৩৬.৯১ পূ:)। এখানে আসহাবে কাহাফের নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় (كلية أصحاب الكهف)ও রয়েছে। অপরটি হচ্ছে দেশটির দক্ষিণে মারসিন (Mersin/مرسين) প্রদেশের তারসুস (Tarsus /طرسوس) নামক এলাকা (৩৬.৯১ উ:,

৩৪.৮৯ পূ:)। তারসুস এলাকাটি মারসিন শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার, আদানা (Adana/أضنة) শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার এবং তূরূস (طوروس) পর্বতমালা থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

৬. আসহাবে কাহাফের গুহা স্পেনে। স্পেন ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের একটি দেশ।

৭. সম্প্রতি ইয়ামানের একজন গবেষক আসহাবে কাহাফের গুহা ইয়ামানে বলে দাবি করেছেন। এ ছাড়াও আরও অনেকে অনেক দেশে আসহাবে কাহাফের গুহা থাকার দাবি করেছেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জর্দানের মুহাক্কিক আলেম তাইসীর জবইয়ান (১৯০১–১৯৭৮ খৃ.) ১৯৫৩ সনে আবিষ্কার করেন যে, জর্দানের রাজধানী আম্মানের ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে রাজীব (الرجيب) নামক গ্রামটিই হচ্ছে রাকীম। রাকীম শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে রাজীব হয়েছে। এই রাজিব গ্রামের একশ মিটার দূরে আসহাবে কাহাফের গুহা অবস্থিত।

হযরত তাকী উছমানী সাহেব বলেছেন, আসহাবে কাহাফের গুহা কোথায় তা নিয়ে প্রচুর মত রয়েছে। একশত ভাগ নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, গুহাটি কোথায় অবস্থিত। যত জায়গার ব্যাপারে আসহাবে কাহাফের গুহা থাকার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে তাইসীর জবইয়ানের বক্তব্যের অনুকূলে দলীল-প্রমাণ বেশি। মুফতী শফী সাহেব ও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতের ঝোঁকও এদিকে যে, আসহাবে কাহাফের গুহা জর্দানেই। তাইসীর জবইয়ান সাহেব 'মাওকাউ আসহাবিল কাহ্ফি' (موقع أصحاب الكهف) নামক একটি গ্রন্থও লিখে গেছেন, যাতে বিস্তারিতভাবে তার দাবির অনুকূলে সব দলীল-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ জানার জন্য উক্ত গ্রন্থ পাঠ করা যেতে পারে। হযরত তাকী উছমানী সাহেব 'জাহানে দীদাহ' গ্রন্থে সংক্ষেপে সেসব দলীল-প্রমাণের কয়েকটি উদ্ধৃত করেছেন। আমরা নিম্নে এরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি যা তাইসীর জবইয়ান সাহেবের তাহকীকের আনুকূল্য প্রমাণিত করে।

১. ঐ গুহার মুখ দক্ষিণ দিকে এবং তার ভিতরে কখনও রোদ প্রবেশ করে না অথচ আলো প্রবেশ করে। এটা কুরআনের বর্ণনার অনুকূল। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال الآية.

২. ঐ গুহার উপর একটি মসজিদ রয়েছে। কুরআনে কারীমেও গুহার উপর মসজিদ নির্মাণের কথা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.

৩. আধুনিক অনেক মুহাক্কিকের তাহকীক হল যে মূর্তিপূজক বাদশাহর জুলুম নির্যাতন থেকে বেঁচে নিজেদের ঈমান রক্ষার জন্য আসহাবে কাহাফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই বাদশাহর নাম ছিল ট্রাজান (Trajan)[১]। যার শাসনকাল ছিল ৯৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১১৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তার ব্যাপারে

---

[১] মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মোতাবেক সে রাজার নাম ছিল দাক্বইয়ানুস (دقيانوس/داقينوس) আর প্রসিদ্ধ খৃস্টান ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন-এর বর্ণনা মোতাবেক তার নাম ছিল ডোসিস।

প্রসিদ্ধ এই যে, সে মূর্তি-পূজা অস্বীকারকারীদের প্রতি জুলুম নির্যাতন চালাত। ইতিহাস দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, ট্রাজান ১০৬ খৃস্টাব্দে জর্দানের পূর্বাঞ্চল দখল করেছিল। আম্মানে একটা স্টেডিয়ামও সে তৈরি করেছিল। আর যে বাদশাহর আমলে আসহাবে কাহাফ জাগ্রত হয়েছিলেন তার নাম থিওডোসিস (Theodosius)। যার শাসনামল ছিল পঞ্চম শতাব্দির শুরুর দিকে।[১]

৪. এই গুহায় ট্রাজানের আমলের কিছু মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে।

সর্বশেষ আর একটি বিষয় হল– তাইসীর জবইয়ান (تيسير ظَبيان) সাহেবের তাহকীক অনুসারে আসহাবে কাহাফের গুহা রাজীবে মেনে নিলে এ ব্যাপারে অন্য অনেকের উক্তির সাথে সমন্বয়ও করা সম্ভব। যেমন প্রথম উক্তিতে বলা হয়েছে, আসহাবে কাহাফের গুহা শাম দেশে। তা জর্দান তৎকালীন শাম দেশেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তখন শাম দেশ বলতে বর্তমান জর্দান, ফিলিস্তীন, লেবানন ও সিরিয়া– এই বিশাল অঞ্চলকে বোঝাতো। অতএব রাজীবও শামেরই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় উক্তিতে বলা হয়েছে, রাকীম হচ্ছে আইলা (বর্তমান আকাবা)-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। সেখানেই আসহাবে কাহাফের গুহা। তা রাজীব আকাবার সড়ক থেকে মাত্র তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। এটাকে আকাবার কাছেই বলা চলে। ভৌগোলিক বর্ণনায় এতটুকু দূরত্বকে কাছেরই বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় উক্তিতে তো আসহাবে কাহাফের গুহা জর্দানেই বলা হয়েছে। চতুর্থ উক্তিতে আসহাবে কাহাফের গুহা রূমে বলা হয়েছে। তো রূম সাম্রাজ্য (পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য)-এর পূর্ব সীমানা তখন পূর্ব দিকে তুরস্কের মধ্য দিয়ে, সিরিয়ার মধ্য দিয়ে, জর্দানের রাজধানী আম্মানের পূর্ব দিয়ে, সৌদি আরবের তাবূক প্রদেশের মধ্য দিয়ে মিসরের মধ্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব রাজীব অঞ্চলও তখন রূম সাম্রাজ্যেরই অন্তভূক্ত ছিল। এভাবে অনেকের উক্তির সঙ্গেই তাইসীর জবইয়ান সাহেবের তাহকীকের সমন্বয় হতে পারে। রয়ে গেল আসহাবে কাহাফের গুহা তুরস্কের তিন অঞ্চলের কোন অঞ্চলে বা স্পেনে কিংবা ইয়ামানে থাকার দাবি– তা এ ব্যাপারে বলা যায় যেমন অনেকেই বলেছেন যে, সে যুগে গুহায় গুহায় সন্নাসী জীবন কাটানোর অনেক ঘটনাই ঘটেছে, সেমতে অনেক স্থানের গুহাতেই কঙ্কাল বা কবরের সন্ধান মিলতে পারে, তাই কোন গুহায় কঙ্কাল বা কবরের সন্ধান পাওয়া গেলেই সেটা আসহাবে কাহাফেরই গুহা হওয়ার কোন দলীল নয়। সঠিক আল্লাহই অবগত আছেন।

যুল-কারনাইনের ঘটনায় বর্ণিত পঙ্কিল জলধি (عين حمئة)

কুরআনে কারীমে যুল-কারনাইন-এর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে,

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا.

অর্থাৎ, অবশেষে যখন সে সূর্যের অস্তগমনস্থলে পৌঁছল, তখন সে তাকে (সূর্যকে) এক পঙ্কিল জলধিতে অস্তগমন করতে দেখতে পেল এবং দেখতে পেল সেখানে একটি সম্প্রদায়কে। আমি বললাম, হে যুল-কারনাইন! হয় তুমি (তাদেরকে) শাস্তি দিবে নতুবা তাদের ব্যাপারে তুমি সদয়ভাব গ্রহণ করবে। (সূরা কাহফ: ৮৬)

এই পঙ্কিল জলধি কোথায় এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণ স্পষ্ট করে কিছু বলে যাননি। কেউ কেউ শুধু এতটুকু বলেছেন সমুদ্র। কেউ বলেছেন মহাসমুদ্র। কিন্তু কোন্ সমুদ্র বা কোন্ মহাসমুদ্র

---

[১] তবে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় তার শাসনামল ছিল ৩৭৯ থেকে ৩৯৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত।

তা স্পষ্ট করে বলেননি। কেউ বলেছেন, ভূভাগের পশ্চিম প্রান্তে। কেউ বলেছেন জনবসতির পশ্চিম প্রান্তে। কেউ বলেছেন কোনো মহাসাগরের প্রান্তে। এভাবে অনেকেই বিষয়টাকে অস্পষ্টভাবে বলেছেন। কুরতুবী সুহাইলী-র বরাত দিয়ে কিছুটা স্পষ্ট করে বলেছেন, এলাকাটির নাম জাবর্‌স (جابرس)। সুরিয়ানী (Syriac) ভাষায় যাকে বলা হয় জারজীসা (Jarjeesa /جرجيسا)। এটা হচ্ছে সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমের একটি গ্রাম। এ বর্ণনা অনুসারে যেখানে সূর্য অস্ত যেতে দেখা গিয়েছিল সেটা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের কূল। তাহলে ধরে নিতে হবে যুল-কারনাইন পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে সিরিয়ার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আইছারুত্তাফাসীরে বলা হয়েছে, আটলান্টিক মহাসাগরের কূলে। তাহলে ধরে নিতে হবে যুল-কারনাইন পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে কিংবা আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী (রহ.) 'কাসাসুল কুরআন' গ্রন্থে যা বলেছেন, সেটিই সবচেয়ে সঠিক বলে মনে হয়। তিনি যা বলেছেন তার সারকথা হল– যুলকারনাইন যেহেতু খোরাস বা সাইরাস-২।[১] (যার জন্ম খৃ. পূ. ৬০০ সনে, আর মৃত্যু খৃ. পূ. ৫৩০ সনে। যিনি ছিলেন পারস্যের সম্রাট। যার রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান ইরানের হামাদান।) আর কুরআনের বর্ণনামতে তার তিনটি অভিযান হয়েছিল। একটি পশ্চিম দিকে, একটি পূর্ব দিকে, আর একটি উত্তর দিকে। তার পশ্চিম দিকের অভিযান ছিল এশিয়া মাইনরের[২] বাদশাহ করডেলিস-এর বিরুদ্ধে[৩]। আর এশিয়া মাইনরের তথা তুরস্কের পশ্চিমে হল ইজিয়ান সাগর (Aegean See/بحر إيجة)। এই ইজিয়ান সাগরের তীরের পানি উপসাগর হওয়ার কারণে, তদুপরি তীরবর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্বীপ থাকার কারণে অত্যন্ত ঘোলা থাকে এবং সন্ধাবেলায় সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়ে এরূপ মনে হয় যেন একটি ঘোলা পানির হাউযে সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। অতএব 'পঙ্কিল জলধি' দ্বারা ইজিয়ান সাগরের এই তীরবর্তী অঞ্চলই উদ্দেশ্য। والله أعلم بالصواب

যুল-কারনাইনের প্রাচীর (سد ذي القرنين)

কুরআনে কারীমে উল্লেখিত যুল-কারনাইন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর কোথায় তা নিয়ে গবেষক ও ঐতিহাসিকদের কেউই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। সে প্রাচীর কোথায় তা নিয়ে রয়েছে অনেক মত। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি মত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাসহ উল্লেখ করা হল।

১. প্রাচীরটি চীনে। চীনের মহা প্রাচীর বুঝানো উদ্দেশ্য। এ মতটি সঠিক নয় এ কারণে যে, কুরআনের বর্ণনামতে যুল-কারনাইনের প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল লোহা ও তামার সংমিশ্রণে। পক্ষান্তরে চীনের মহা প্রাচীর তৈরি করা হয় পাথর ও মাটি দ্বারা।

---

[১] যুলকারনাইন কে তা নিয়ে অনেক মতামত থাকলেও তিনি ছিলেন খোরাস বা সাইরাস-২– এমতটিই দলীল-প্রমাণের বিচারে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত।

[২] প্রায় বর্তমান তুরস্কই ছিল এক সময়ের এশিয়া মাইনর।

[৩] করডেলিসের পিতার সঙ্গে সাইরাসের সন্ধি ছিল। মূলত করডেলিসের পিতা সাইরাসের মাতামহ এস্টিয়াগিসের সঙ্গে সন্ধি করেছিল। সেই সূত্রে সাইরাসের সঙ্গেও সন্ধি ছিল। কিন্তু সাইরাস যখন মিদয়াতকে পারস্যের সঙ্গে একত্র করে একটি একক রাজত্বের ঘোষণা করেন এবং একটি সুদৃঢ় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, করডেলিস তা সহ্য করতে না পেরে সন্ধি ভঙ্গ করে মিদয়াত আক্রমণ করে বসে।'মিদয়াত' (Midyat/مديات) হল বর্তমান তুরস্কের মারদীন প্রদেশের একটি শহর। শহরটি বর্তমান সিরিয়ার উত্তর দিকের সীমান্তের নিকটবর্তী।

২. কেউ কেই আযারবাইজানের উত্তরে বর্তমান রাশিয়ার অঞ্চলে কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরবর্তী বাবুল আবওয়াব (প্রাচীন নাম দরবান্দ) নামক এলাকার প্রাচীরকে যুলকারইনাইনের প্রাচীর আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এ প্রাচীর পাথর দ্বারা নির্মিত। পক্ষান্তরে কুরআনের বর্ণনামতে যুল-কারনাইনের প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল লোহা ও তামার সংমিশ্রণে। তদুপরি বাবুল আবওয়াব-এর প্রাচীর যুল-কারনাইন নয় বরং বাদশাহ নওশেরওয়া কর্তৃক নির্মিত। কেউ কেউ একে আলেকজান্ডার নির্মিতও বলেছেন। উল্লেখ্য, বোখারা ও তিরমিযের নিকটেও দারবান্দ নামক একটি জনপদ রয়েছে, এখানে সে দারবান্দ উদ্দেশ্য নয়।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, যুলকারনাইনের প্রাচীর আর্মেনিয়ার দারিয়াল উপত্যকা বা দারিয়াল গিরিপথে (وادی داریال)-নির্মিত হয়েছিল। একে 'কোহেকাফের দেয়াল'ও বলা হয়। বাবুল আবওয়াব থেকে কিছুদূর পশ্চিমে ককেশিয়া পর্বতমালার অতিশয় উঁচু অংশে এই দারিয়াল গিরিপথ অবস্থিত। কিন্তু দারিয়াল গিরিপথে যুলকারনাইনের প্রাচীর অবস্থিত হওয়ার মতটি সহীহ নয় এ কারণে যে, দারিয়াল গিরিপথের প্রাচীর শুধু লোহা দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, আফগানিস্তানের বলখ এবং উজবেকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকা তিরমিযের মাঝে এই প্রাচীরটি ছিল, যা লোহার টুকরো ও গলিত তামা দ্বারা নির্মিত ছিল। কিন্তু এ মতটি সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

৫. কুরতুবী ও তাবারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রাচীরটি আর্মেনিয়া ও আযারবাইজানের পাশে তুর্কি রাজ্যে।

৬. কেউ কেউ বলেছেন, প্রাচীরটি আর্মেনিয়া ও আযারবাইজানের পাশে ককেশিয়া/কোহেকাফ (جبال القوقاز/جبال القفقاس) পর্বতমালার মাঝে।

৭. মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেছেন, কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী দারবান্দে নয় বরং তার থেকে আরও উপরে কোহেকাফের শেষ প্রান্তের একটি গিরিপথে অবস্থিত ছিল যুলকারনাইনের প্রাচীর। মাওলানা আবুল কালাম আযাদও তাই বলেছেন, তবে তিনি এটাকেই দারিয়াল গিরিপথ আখ্যায়িত করেছেন।

যাহোক শেষোক্ত তিনটি মতের মধ্যে মূলত বিরোধ নেই বরং সেগুলোর মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব। উল্লেখ্য, যুল-কারনাইনের প্রাচীর কোথায় ছিল এ নিয়ে উল্লেখিত মতামতগুলো ছাড়াও আরও বহু মত পাওয়া যায়। সম্প্রতি আরব গবেষকদের অনেকে আরও নতুন নতুন অনেক মত ব্যাক্ত করছেন। কিন্তু কোনটিই দ্ব্যথহীনভাবে মেনে নেয়ার মত নয়। বস্তুত যুল-কারনাইনের প্রাচীরের অবস্থান কোথায় ছিল তা এখনও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এ রহস্য নিশ্চিতভাবে উদঘাটন হবে না, যতক্ষণ না ইয়াজূজ মা'জূজ কারা এবং তাদের বসবাস তখন কোথায় ছিল তা নিশ্চিতভাবে উদঘাটিত হয়। আর ইয়াজূজ মা'জূজ কারা এবং তাদের বসবাস কোথায় ছিল তা এখনও অনেকটা অনুদঘাটিতই রয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, যুল-কারনাইনের প্রাচীর সম্বন্ধে সম্ভাব্য সহীহ সবগুলো মত সামনে রেখে এভাবে বলা যেতে পারে যে, পূর্ব তুরস্ক থেকে শুরু করে আর্মেনিয়া, আযারবাইজান হয়ে উজবেকিস্তান আফগানিস্তান পর্যন্ত– এই বেল্টের কোথাও প্রাচীরটি ছিল।

বাবেল (بابل)

এ সম্বন্ধে পূর্বে 'বিশিষ্ট কয়েকজন নবী যেসব এলাকায় ও যাদের নিকট প্রেরিত হন তার বর্ণনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

হযরত উযায়র আ.-এর ঘটনায় বর্ণিত নগরী

সূরা বাকারার ২৫৯ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থাৎ, অথবা (তুমি কি দেখনি) যেমন ঐই ব্যক্তি যে এমন এক নগরীতে উপনীত হয়েছিল যা(–র ঘরগুলো) স্বীয় ছাদের উপর পতিত হয়েছিল। সে বলল, আল্লাহ একে কীভাবে জীবিত করবেন তার মৃত্যুর পর? অতঃপর আল্লাহ তাকে একশত বছর মৃত রাখলেন। পরে পুনর্জীবিত করলেন। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তুমি কতদিন (এখানে) অবস্থান করলে? সে বলল, একদিন বা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, (না,) বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। সেমতে তোমার খাদ্যসামগ্রী এবং তোমার পানীয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, তা বিকৃত হয়নি। আর তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর (তা পঁচে-গলে বিকৃত হয়ে গেছে।) এবং (আমি তোমাকে মৃত্যু দিয়ে আবার জীবিত করেছি এ জন্য যে,) আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন বানাতে চাই। আর হাড়গুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে সেগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দেই, তারপর তাতে গোশত পরিয়ে দেই। অনন্তর যখন এসব অবস্থা তার কাছে সুস্পষ্ট হল, তখন সে বলে উঠল, আমি জানি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারা: ২৫৯)

কাতাদাহ, ইকরিমা, দাহহাক, সুদ্দী প্রমুখ মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এ আয়াতে হযরত উযায়ের (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর আয়াতে যে নগরীর কথা বলা হয়েছে, তা কোন্ নগরী সেটা নিয়ে মুফাসসিরীনে কেরামের বহু উক্তি রয়েছে, তবে প্রসিদ্ধ হল যা ইকরিমা, রবী ইবনে আনাস ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেছেন যে, সেটা হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকা। বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকা বলতে কোন্ এলাকা বুঝায় তা পূর্বে 'জেরুজালেম (jerusalem)' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত হিযকীল আ.-এর ঘটনায় বর্ণিত নগরী

হযরত হিযকীল (حزقيل) আ.-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সূরা বাকারার ২৪৩ নং আয়াতে। ইরশাদ হয়েছে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.

অর্থাৎ, তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, আর তারা (সংখ্যায়) ছিল হাজার হাজার? অতঃপর আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা মরে যাও, তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরগোজারী করে না। (সূরা বাকারা: ২৪৩)

তাফসীর গ্রন্থ আল-বাহরুল মাদীদ ও কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এরা ছিল দাওয়ারদান (داوردان) এলাকার অধিবাসী। দাওয়ারদান সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাফসীরে ইবনে আবী হাতিমে বলা হয়েছে, তারা ছিল আযরুআত-এর অধিবাসী। আযরুআত সম্বন্ধে সামনে দু'টো পরিচ্ছেদ পরেই আলোচনা আসছে।

তালূতের ঘটনায় বর্ণিত নহর/নদী (জর্ডান নদী)

কুরআনে কারীমে বাদশাহ তালুতের নেতৃত্বে বনী ইসরাইলের যে জেহাদের বর্ণনা এসেছে সেখানে বর্ণিত হয়েছে,

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ الآية.

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তালূত তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা দিল, সে বলল, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নহর তথা নদী দ্বারা পরীক্ষা নিবেন। ... (সূরা বাকারা : ২৪৯)

এ আয়াতে বর্ণিত নহর বা নদী দ্বারা কোন্ নদী উদ্দেশ্য তা নিয়ে দুই রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ বলেছেন, নদীটি জর্দান ও ফিলিস্তীনের মাঝে। সুদ্দী বলেছেন, সেটি ফিলিস্তীনের নদী। বস্তুত এই দুই ধরনের উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। জর্দান ও ফিলিস্তীনের মাঝে যে নদী সেটির নাম হল জর্ডান নদী (Jordan River/نهر الأردن)। এটি জর্দানের পশ্চিমে এবং ফিলিস্তীনের পূর্বে অবস্থিত। নদীটির কিছু অংশ ফিলিস্তীনের অভ্যন্তর দিয়েও গিয়েছে। ফিলিস্তীনের লাগোয়া এবং ফিলিস্তীনের কিছু অংশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে বিধায় এটিকে ফিলিস্তীনের নদীও বলা যেতে পারে। তাই মুফাসসিরীনে কেরামের উক্তি দুই রকম মনে হলেও বস্তুত উদ্দেশ্য একই বলে মনে হয়। উদ্দেশ্য যে একই তার একটি প্রমাণ হল হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে নদীটি জর্দান ও ফিলিস্তীনের মাঝে, আবার তার থেকেই আর এক বর্ণনায় এসেছে সেটি হচ্ছে ফিলিস্তীনের নদী।

أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ-এর 'কারইয়াহ' (আন্তাকিয়া)

কুরআনে কারীমে সূরা ইয়াছীনের ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.

অর্থাৎ, তাদের কাছে সেই নগরবাসীদের উপমা তুলে ধর, যখন তাদের কাছে এসেছিল প্রেরিতগণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমা, বুরাইদাহসহ মুফাসসিরীনে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে এ আয়াতে উল্লেখিত নগর (الْقَرْيَةِ) দ্বারা উদ্দেশ্য আন্তাকিয়া নগর (৩৬.১৯° উ: ৩৬.১৬° পূ:)। আন্তাকিয়া (Antakya/انطاكيا) নগরীটি বর্তমানে (২০১৮ ইং) তুরস্কের হাতাই (Hatay/هاتاي) প্রদেশের একটি নগরী। এটি তুরস্কের সর্বদক্ষিণাংশে এবং সিরিয়ার উত্তরাংশের পশ্চিমে আসী নদী (Assi/نهر العاصي)-এর তীরে এবং ভূমধ্য সাগর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আসী নদীকে ইংরেজিতে Orontes Riverও বলা হয়।

বুস্‌রা ও আযরুআত

কুরআনে কারীমে সূরা রূমের শুরুতে বলা হয়েছে,

الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ الآية.

অর্থাৎ, আলিফ লাম মীম। রূম পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী ভূমিতে। তারা তাদের পরাজিত হওয়ার পর অচিরেই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যে। ...। এখানে 'নিকটবর্তী ভূমি' বলে বুস্‌রা ও আযরুআতের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। বুস্‌রা (Busra/بُصرى) হচ্ছে সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি জনপদ (৩২.৫১ উ:, ৩৬.৪৯ পূ:)। এটাকে শাম দেশের বুসরা (بصرى الشام)ও বলা হয়। বুস্‌রা জনপদটি দার্‌আ (Daraa/درعا) নামক প্রদেশের অন্তর্গত একটি জনপদ। এই দার্‌আ-এরই প্রাচীন নাম ছিল আযরুআত (أذرعات)। দার্‌আ সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে জর্দানের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি প্রদেশ। দারআর কেন্দ্র থেকে বুস্‌রা শহরের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার।

আহকাফ (الأحقاف)

এ সম্বন্ধে পূর্বে 'বিশিষ্ট কয়েকজন নবী যেসব এলাকায় ও যাদের নিকট প্রেরিত হন তার বর্ণনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

মাদইয়ান (مدين)

এ সম্বন্ধে পূর্বে 'বিশিষ্ট কয়েকজন নবী যেসব এলাকায় ও যাদের নিকট প্রেরিত হন তার বর্ণনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

ওয়াদিল কুরা (وادي القرى)

এ সম্বন্ধে পূর্বে 'বিশিষ্ট কয়েকজন নবী যেসব এলাকায় ও যাদের নিকট প্রেরিত হন তার বর্ণনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

হুনায়ন (حنين)

হুনায়ন একটি উপত্যকার নাম, যেখানে ৮ম হিজরির শাউয়াল মাসে মুসলমান এবং হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রের কাফেরদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। উপত্যকাটি মক্কা মুকাররমা ও তায়েফের মাঝে (২১°৩১´ উ: ৪০°০২´ পূ:) অবস্থিত।

কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে হুনায়নের কথা উল্লেখিত হয়েছে,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ.

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ বহু স্থানে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, এবং হুনায়নের দিনও। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে মুগ্ধ করেছিল। ফলে সেটা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তোমাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে গেছে, তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গেছ। (সূরা তাওবা : ২৫)

দশম অধ্যায়

(মানচিত্রাবলি)

এ অধ্যায়ে কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত বিশেষ স্থানসমূহ যেসব দেশে বা যেসব অঞ্চলে অবস্থিত সেসব দেশ ও সেসব অঞ্চলের মানচিত্রাবলি পেশ করা হয়েছে।

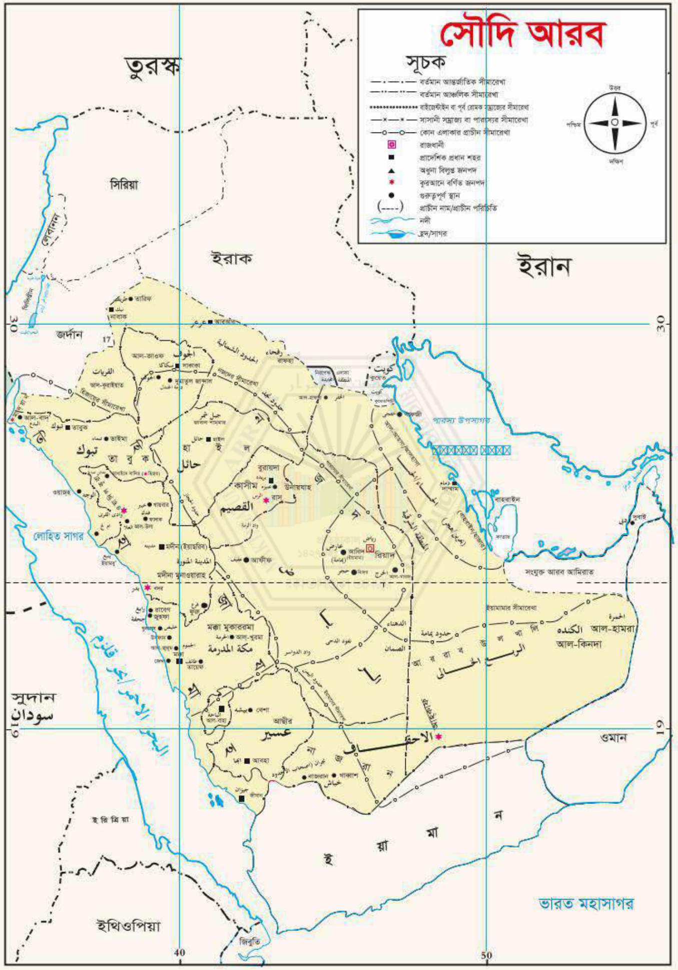
সৌদি আরব
সূচক
বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমারেখা
বর্তমান আঞ্চলিক সীমারেখা
বাইজেন্টাইন বা পূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের সীমারেখা
সাসানী সাম্রাজ্য বা পারস্যের সীমারেখা
কোন এলাকার প্রাচীন সীমারেখা
রাজধানী
প্রাদেশিক প্রধান শহর
অধুনা বিলুপ্ত জনপদ
কুরআনে বর্ণিত জনপদ
গুরুত্বপূর্ণ স্থান
(----) প্রাচীন নাম/প্রাচীন পরিচিতি
নদী
হ্রদ/সাগর
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
তুরস্ক
সিরিয়া
লেবানন
ইরাক
ইরান
জর্দান
কুয়েত
পারস্য উপসাগর
বাহরাইন
কাতার
সংযুক্ত আরব আমিরাত
দুবাই
ওমান
লোহিত সাগর
البحر الأحمر / بحر قلزم
সুদান
سودان
ইথিওপিয়া
জিবুতি
ইয়ামান
ভারত মহাসাগর
তাবুক
تبوك
হায়েল
حائل
কাসীম
القصيم
বুরায়দা
উনায়যাহ
রিয়াদ
মদীনা মুনাওয়ারাহ
المدينة المنورة
মক্কা মুকাররমা
مكة المكرمة
আসীর
عسير
الأحقاف
আল-হামরা
আল-কিনদা
الكندة
الربع الخالي
আর রাবউল খালী
নাজরান
30
30
40
50
19
19

মক্কা মুকাররমাহ

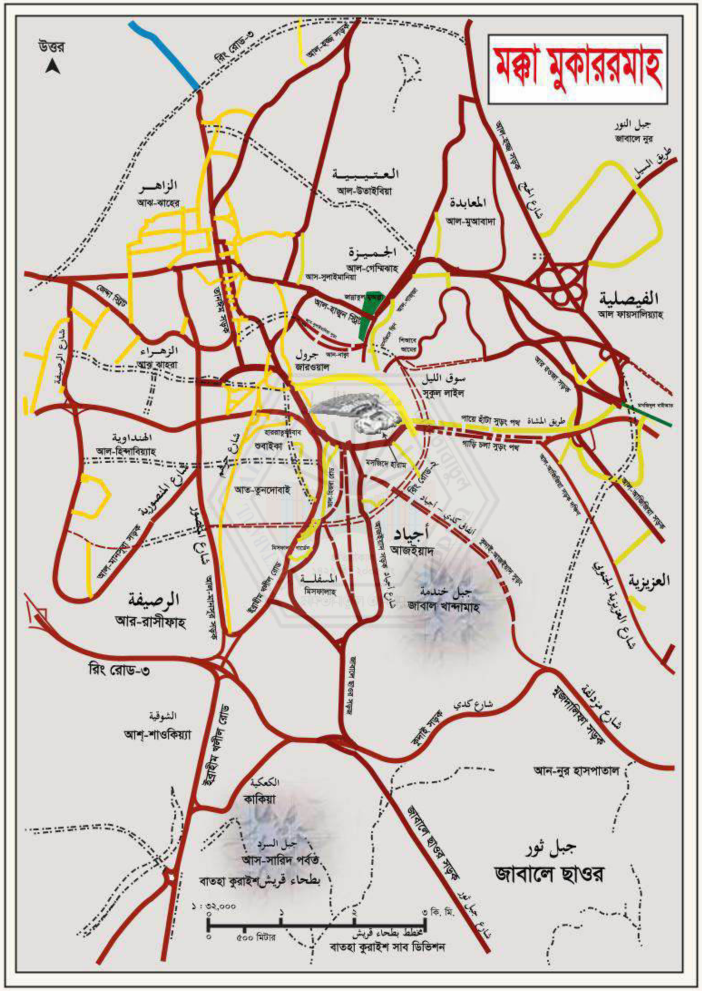
উত্তর
রিং রোড-৩
আল-হজ্জ সড়ক
الزاهــر
আঝ-ঝাহের
العتـيـبـيـة
আল-উতাইবিয়া
المعابدة
আল-মুআবাদা
شارع الحج
আল-হজ্জ সড়ক
جبل النور
জাবালে নুর
طريق السيل
الجميـزة
আল-গেম্মিঝাহ
আস-সুলাইমানিয়া
জান্নাতুল মুআল্লা
আল-হাজুন স্ট্রিট
জেদ্দা স্ট্রিট
شارع الرصيفة
الفيصلية
আল ফায়সালিয়্যাহ
الزهـراء
আয্ ঝাহরা
جرول
জারওয়াল
আল-দাক্কা
শিআবে আমের
سوق الليل
সুকুল লাইল
আর রওজা সড়ক
মসজিদুল বাইআত
পায়ে হাঁটা সুড়ং পথ
طريق المشاة
গাড়ি চলা সুড়ং পথ
الهنداوية
আল-হিন্দাবিয়্যাহ
হারামাতুল্ বাব
শুবাইকা
شارع الحج
মসজিদে হারাম
আত-তুনদোবাই
شارع المنصورية
شارع المنصور
আল-হিজরা রোড
রিং রোড-২
আজইয়াদ সড়ক
أجياد
আজইয়াদ
انفاق كدي - أجياد
কুদাই-আজইয়াদ সড়ক
আল-আজিজিয়া সড়ক
আল-আজিজিয়া সড়ক দক্ষিণ
العزيزية
شارع العزيزية الجنوبي
আল-মানসুরা সড়ক
মিসফালাহ পার্কিং
المسفلـة
মিসফালাহ
ইব্রাহীম খলীল রোড
شارع أجياد
جبل خندمة
জাবাল খান্দামাহ
الرصيفة
আর-রাসীফাহ
রিং রোড-৩
জাবালে ছাওর সড়ক
شارع كدي
কুদাই সড়ক
মুজদালিফা সড়ক
شارع مزدلفة
الشوقية
আশ্-শাওকিয়্যা
ইব্রাহীম খলীল রোড
আন-নুর হাসপাতাল
الكعكية
কাকিয়া
جبل السرد
আস-সারিদ পর্বত
বাতহা কুরাইশ بطحاء قريش
জাবালে ছাওর সড়ক
شارع جبل ثور
جبل ثور
জাবালে ছাওর
১ : ৩২,০০০
০
১
২
৩ কি. মি.
০
৫০০ মিটার
مخطط بطحاء قريش
বাতহা কুরাইশ সাব ডিভিশন

মিনা ও মুয্‌দালিফা

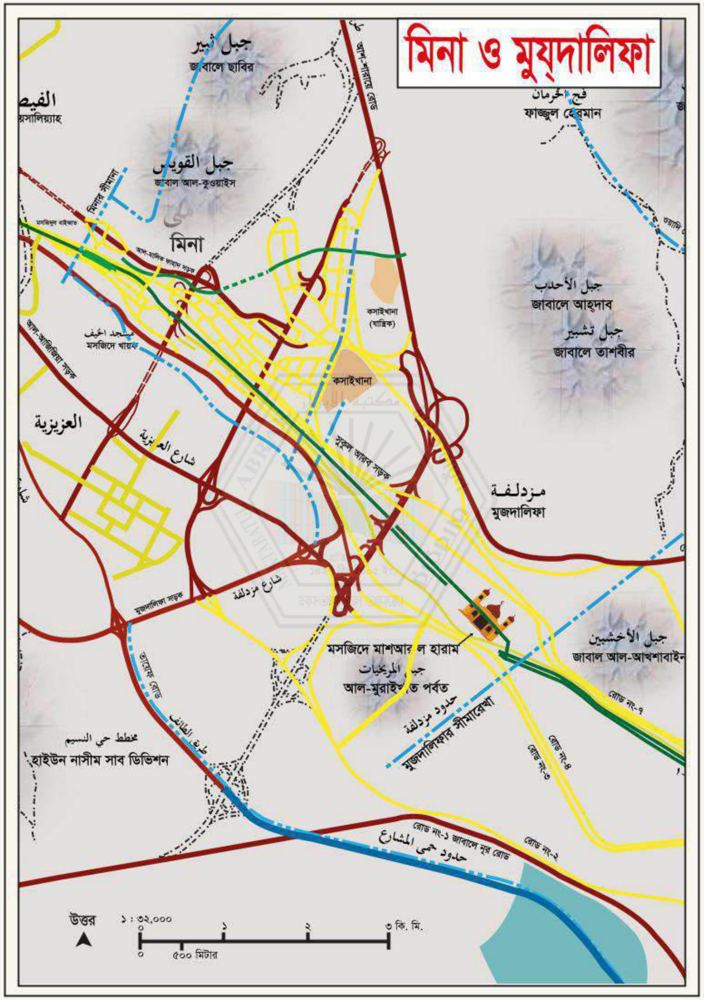
جبل ثبير
জাবালে ছাবির
আল-শারায়ে রোড
الفيصلية
আল ফায়সালিয়্যাহ
فج الحرمان
ফাজ্জুল হেরমান
جبل القويس
জাবাল আল-কুওয়াইস
মিনার সীমানা
মসজিদুল বাইআত
منى
মিনা
আল-মালিক ফাহাদ সড়ক
কসাইখানা
(যান্ত্রিক)
جبل الأحدب
জাবালে আহ্‌দাব
جبل تشبير
জাবালে তাশবীর
مسجد الخيف
মসজিদে খায়ফ
আল-আজিজিয়া সড়ক
কসাইখানা
العزيزية
شارع العزيزية
সুকুল আরব সড়ক
مـزدلـفـة
মুজদালিফা
شارع مزدلفة
মুজদালিফা সড়ক
তায়েফ রোড
মসজিদে মাশআরুল হারাম
جبل المريخيات
আল-মুরাইখাত পর্বত
جبل الأخشبين
জাবাল আল-আখশাবাইন
حدود مزدلفة
মুজদালিফার সীমারেখা
রোড নং-৭
রোড নং-৪
রোড নং-৩
طريق الطائف
مخطط حي النسيم
হাইউন নাসীম সাব ডিভিশন
রোড নং-১ জাবালে নূর রোড
حدود حي المشاعر
রোড নং-২
উত্তর
১ : ৩২,০০০
০
১
২
৩ কি. মি.
০
৫০০ মিটার

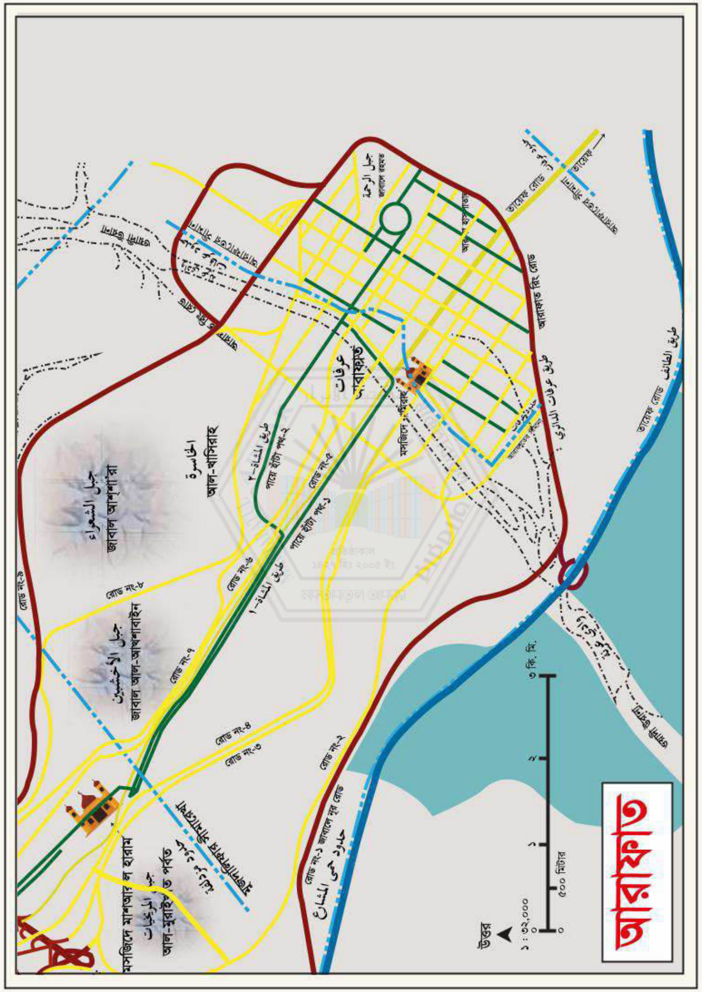
আরাফাত
উত্তর
১ : ৩৫,০০০
৫০০ মিটার
১ কি. মি.
জাবাল আশ্‌শারা
আল-খাসিরাহ
জাবাল আল-আখশাবাইন
আরাফাত
রোড নং-২
রোড নং-৩
রোড নং-৪
রোড নং-৫
রোড নং-৭
রোড নং-৮
তায়েফ রোড
আরাফাত রিং রোড

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদীনা মুনাওওয়ারা

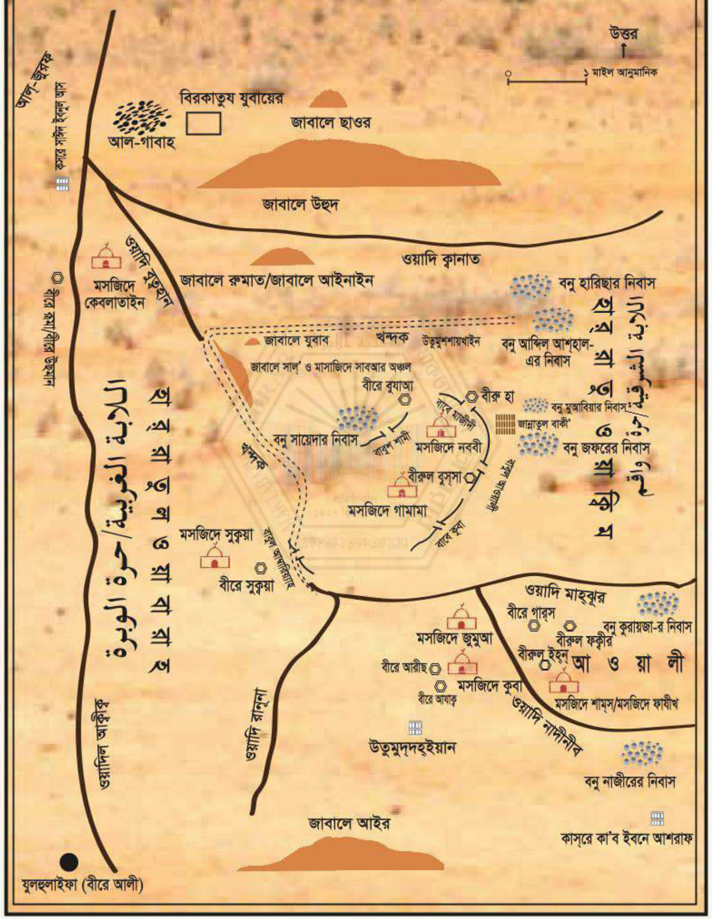
উত্তর
মাইল আনুমানিক
আল-জুরুফ
বিরকাতুয যুবায়ের
আল-গাবাহ
জাবালে ছাওর
জাবালে উহুদ
ওয়াদি ক্বানাত
মসজিদে কেবলাতাইন
জাবালে রুমাত/জাবালে আইনাইন
বনু হারিছার নিবাস
জাবালে যুবাব
খন্দক
উতুমুশশায়খাইন
বনু আব্দিল আশহাল-এর নিবাস
জাবালে সাল' ও মাসাজিদে সাবআর অঞ্চল
বীরে বুযাআ
বীরু হা
বনু মুআবিয়ার নিবাস
জান্নাতুল বাকী'
বনু সায়েদার নিবাস
মসজিদে নববী
বনু জফরের নিবাস
বীরুল বুসসা
মসজিদে গামামা
মসজিদে সুকুয়া
বীরে সুকুয়া
ওয়াদি মাহযূর
বীরে গারস
বনু কুরায়জা-র নিবাস
বীরুল ফক্কীর
মসজিদে জুমুআ
বীরুল ইহন
আ ও য়া লী
বীরে আরীছ
মসজিদে কুবা
বীরে আযাক
মসজিদে শামস/মসজিদে ফাযীখ
ওয়াদি নাদীনাব
উতুমুদ্দহ্‌ইয়ান
ওয়াদি রানুনা
ওয়াদিল আকীক
বনু নাজীরের নিবাস
জাবালে আইর
কাসরে কা'ব ইবনে আশরাফ
যুলহুলাইফা (বীরে আলী)
اللابة الغربية/ حرة الوبرة
اللابة الشرقية/ حرة واقم

বর্তমান মদীনা মুনাওওয়ারাহ

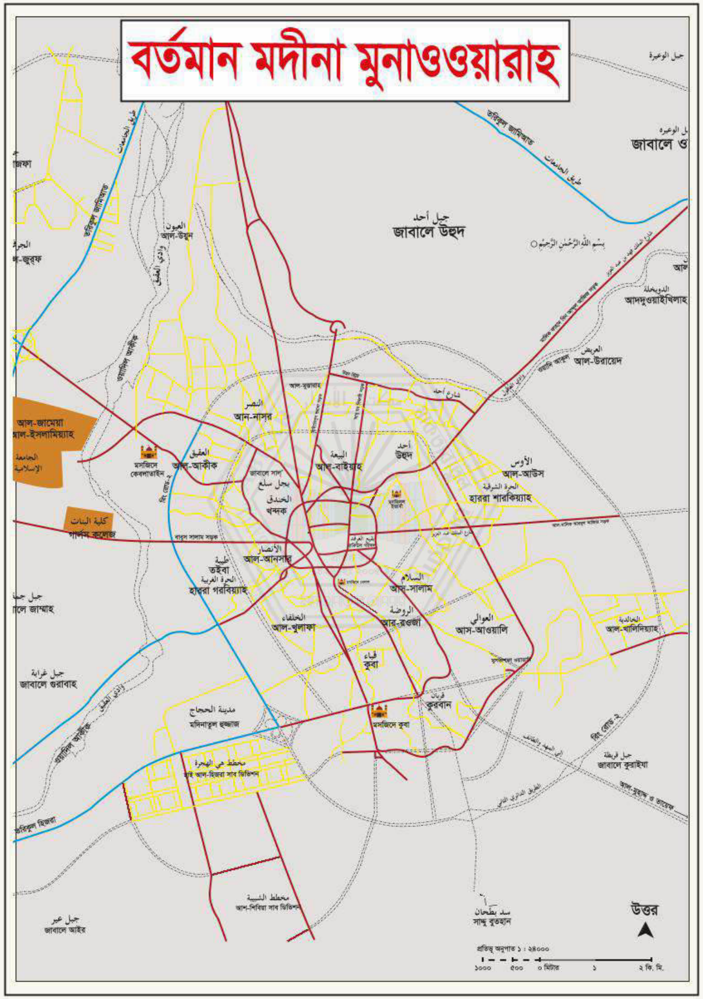
জাবালে উহুদ
জাবালে ও
আদদুওয়াইখিলাহ
আল-উরায়েদ
আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়্যাহ
মসজিদে কেবলাতাইন
আল-আকীক
আন-নাসর
আল-বাইয়াহ
উহুদ
আল-আউস
হাররা শারকিয়্যাহ
খন্দক
আল-আনসার
তাইবা
হাররা গরবিয়্যাহ
আস-সালাম
আর-রওজা
আল-খুলাফা
কুবা
আস-আওয়ালি
আল-খালিদিয়্যাহ
কুরবান
মসজিদে কুবা
গার্লস কলেজ
জাবালে জামআহ
জাবালে গুরাবাহ
মদিনাতুল হুজ্জাজ
জাবালে কুরাইযা
সাদ্দু বুতহান
জাবালে আইর
উত্তর
প্রতিভূ অনুপাত ১ : ২৪০০০

ইয়ামান, ওমান ও সৌদি আরবের কিছু অংশ

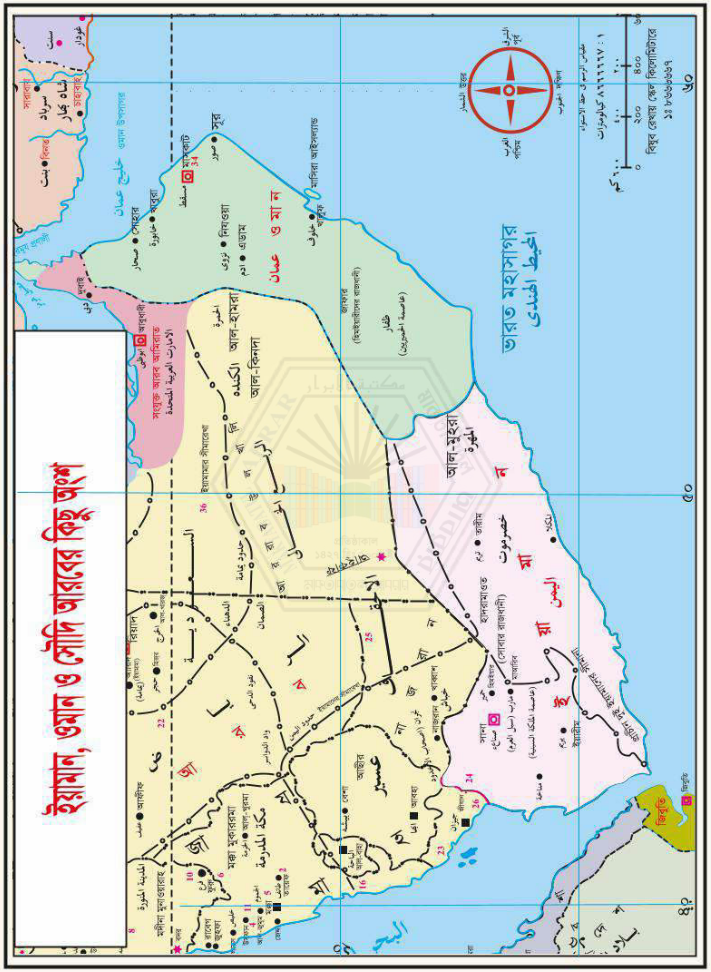
ভারত মহাসাগর
ওমান
মাসকাট
সূর
আল-মুকাল্লা
হাদরামাওত
হাদরামাওত
সানা
আল-হামরা
আল-কিনদা
সংযুক্ত আরব আমিরাত
আল-মুহরা
সৌদি আরব
ইয়ামান
রিয়াদ
মক্কা মুকাররমা
মদীনা মুনাওয়ারাহ
জিবুতি
উত্তর
দক্ষিণ
পূর্ব
পশ্চিম

ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়া

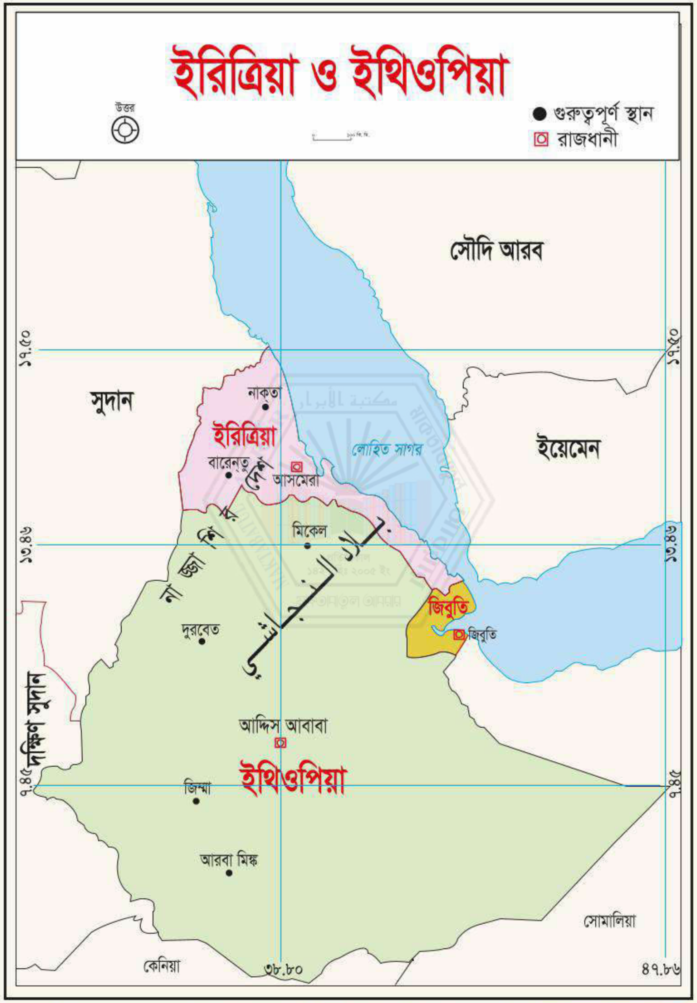
উত্তর
● গুরুত্বপূর্ণ স্থান
◘ রাজধানী
সৌদি আরব
সুদান
ইরিত্রিয়া
নাকুতা
বারেনতু
আসমেরা
লোহিত সাগর
ইয়েমেন
মিকেল
নাজ্জাশির দেশ
بلاد النجاشي
জিবুতি
জিবুতি
দুরবেত
দক্ষিণ সুদান
আদ্দিস আবাবা
ইথিওপিয়া
জিম্মা
আরবা মিঙ্ক
সোমালিয়া
কেনিয়া
১৭.৫০
১৩.৪৬
৭.৪৫
৩৮.৮০
৪৭.৮৬

মিসর

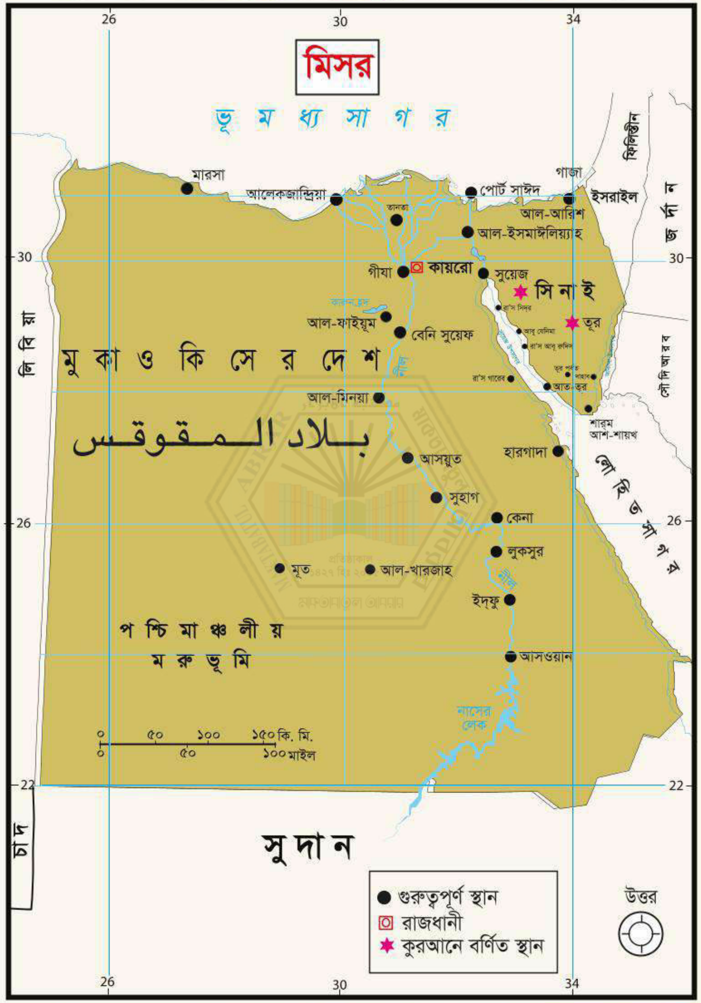
26
30
34
ভূমধ্যসাগর
মারসা
আলেকজান্দ্রিয়া
তানতা
পোর্ট সাঈদ
গাজা
ইসরাইল
ফিলিস্তীন
জর্দান
আল-আরিশ
আল-ইসমাঈলিয়্যাহ
গীযা
কায়রো
সুয়েজ
সিনাই
তূর
কারুন হ্রদ
আল-ফাইয়ূম
বেনি সুয়েফ
রা'স সিদর
আবু যেনিমা
রা'স আবু রুদিস
তূর পর্বত
দাহাব
রা'স গারেব
আত-তূর
শারম আশ-শায়খ
সৌদি আরব
লিবিয়া
মুকাওকিসের দেশ
بلاد المقوقس
আল-মিনয়া
আসয়ুত
হারগাদা
লোহিত সাগর
সুহাগ
কেনা
লুকসুর
মূত
আল-খারজাহ
নীল
ইদফু
পশ্চিমাঞ্চলীয় মরুভূমি
আসওয়ান
নাসের লেক
০ ৫০ ১০০ ১৫০ কি. মি.
০ ৫০ ১০০ মাইল
22
চাদ
সুদান
● গুরুত্বপূর্ণ স্থান
◘ রাজধানী
✱ কুরআনে বর্ণিত স্থান
উত্তর

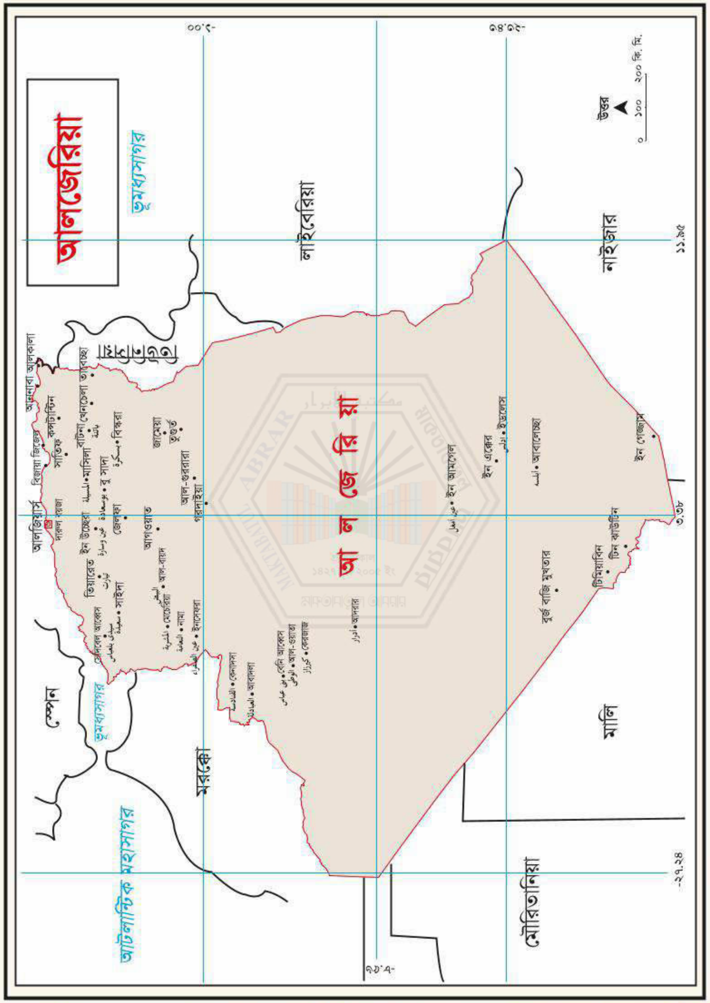
আলজেরিয়া
আ ল জে রি য়া
ভূমধ্যসাগর
লাইবেরিয়া
তিউনিসিয়া
নাইজার
মালি
মৌরিতানিয়া
মরক্কো
স্পেন
আটলান্টিক মহাসাগর
আলজিয়ার্স
উত্তর
০ ১০০ ২০০ কি. মি.

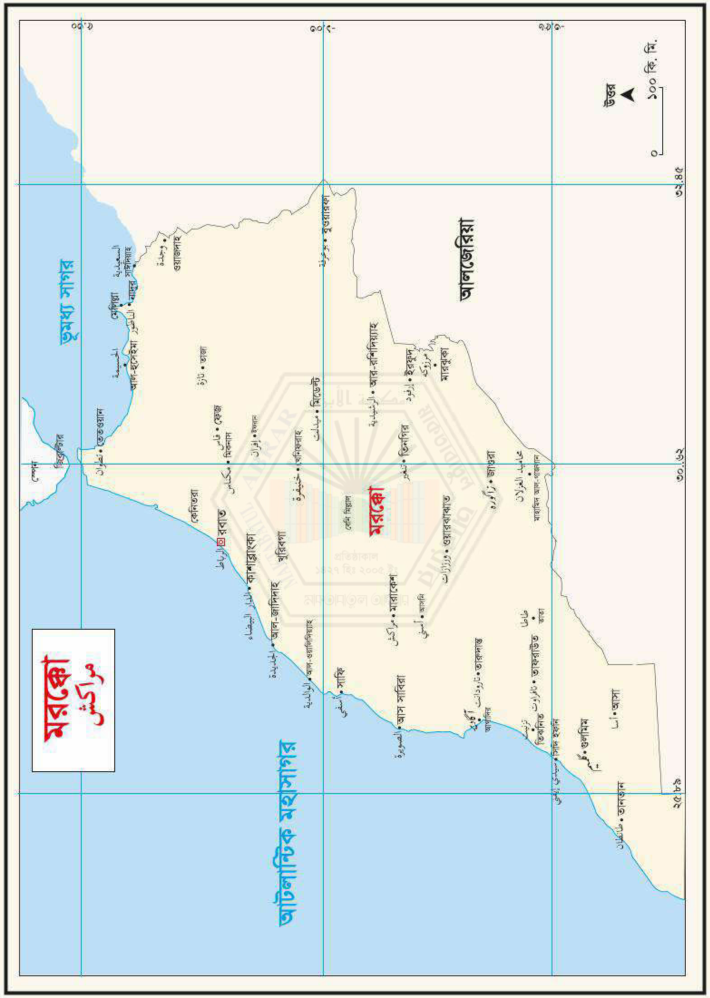
মরক্কো
مراكش
ভূমধ্য সাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
আলজেরিয়া
স্পেন
রাবাত
কাসাব্লাঙ্কা
মারাকেশ
উত্তর
০ ১০০ কি. মি.

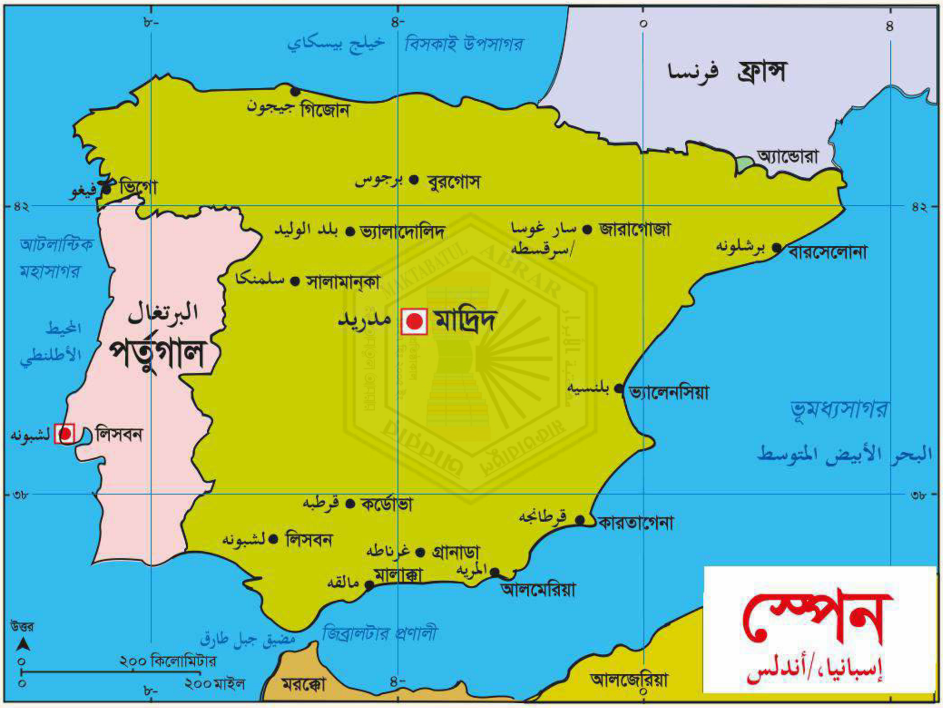
স্পেন
إسبانيا، أندلس
ফ্রান্স فرنسا
অ্যান্ডোরা
বিসকাই উপসাগর
خليج بيسكاي
গিজোন جيجون
ভিগো
فيغو
বুরগোস برجوس
ভ্যালাদোলিদ بلد الوليد
জারাগোজা سار غوسا /سرقسطة
বারসেলোনা برشلونه
সালামানকা سلمنكا
মাদ্রিদ مدريد
ভ্যালেনসিয়া بلنسيه
কর্ডোভা قرطبه
লিসবন لشبونه
গ্রানাডা غرناطه
মালাক্কা مالقه
কারতাগেনা قرطاجه
আলমেরিয়া المريه
আটলান্টিক মহাসাগর
المحيط الأطلنطي
পর্তুগাল البرتغال
লিসবন لشبونه
ভূমধ্যসাগর
البحر الأبيض المتوسط
জিব্রালটার প্রণালী
مضيق جبل طارق
মরক্কো
আলজেরিয়া
উত্তর
২০০ কিলোমিটার
২০০মাইল
৮-
৪-
০
৪
৪২
৩৮

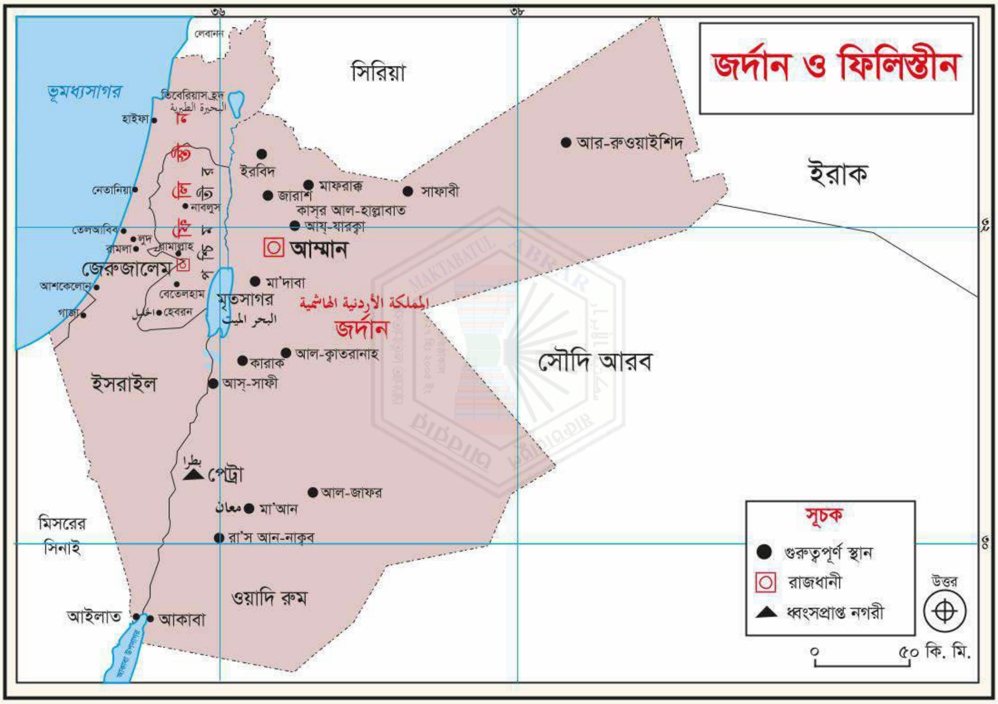
জর্দান ও ফিলিস্তীন
লেবানন
সিরিয়া
ইরাক
ভূমধ্যসাগর
তিবেরিয়াস হ্রদ
البحيرة الطبرية
হাইফা
নেতানিয়া
তেলআবিব
লুদ
রামলা
রামাল্লাহ
জেরুজালেম
আশকেলোন
গাজা
বেতেলহাম
হেবরন الخليل
নাবলুস
ফিলিস্তীন
পশ্চিম তীর
মৃতসাগর
البحر الميت
ইরবিদ
জারাশ
মাফরাক্ব
সাফাবী
আর-রুওয়াইশিদ
কাস্‌র আল-হাল্লাবাত
আয্‌-যারক্বা
আম্মান
মা'দাবা
المملكة الأردنية الهاشمية
জর্দান
আল-ক্বাতরানাহ
কারাক
আস্‌-সাফী
সৌদি আরব
ইসরাইল
পেট্রা بطرا
আল-জাফর
মা'আন معان
রা'স আন-নাকব
ওয়াদি রুম
মিসরের সিনাই
আইলাত
আকাবা
৩৬
৩৮
৩২
৩০
সূচক
● গুরুত্বপূর্ণ স্থান
▣ রাজধানী
▲ ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী
উত্তর
০
৫০ কি. মি.

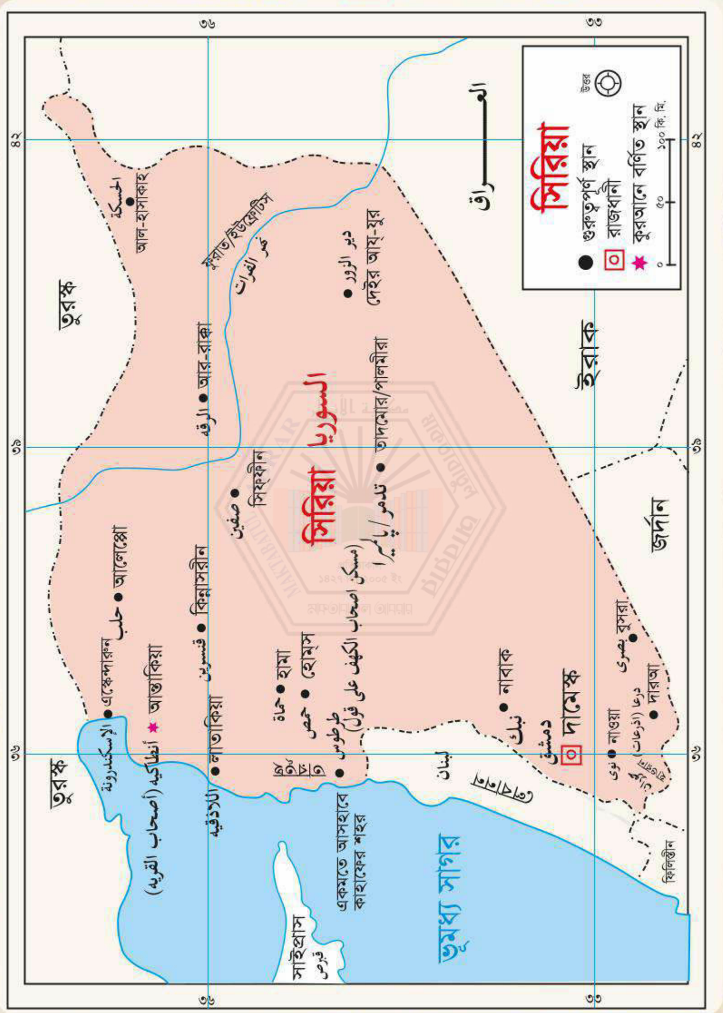
সিরিয়া
السوريا
● গুরুত্বপূর্ণ স্থান
◻ রাজধানী
★ কুরআনে বর্ণিত স্থান
উত্তর
তুরস্ক
ইরাক
العراق
জর্দান
লেবানন
ফিলিস্তিন
সাইপ্রাস
ভূমধ্য সাগর
দামেস্ক
دمشق
আলেপ্পো
حلب
আন্তাকিয়া
انطاكية (اصحاب القرية)
লাতাকিয়া
اللاذقية
কিন্নাসরীন
قنسرين
হামা
حماة
হোমস
حمص
তারতুস
طرطوس
একমতে আসহাবে কাহাফের শহর
নাবাক
نبك
নাওয়া
نوى
দারআ
درعا
বুসরা
بصرى
তাদমুর/পালমিরা
تدمر/پالميرا
সিফফীন
صفين
আর-রাক্কা
الرقة
দেইর আয্‌-যুর
دير الزور
আল-হাসাকাহ
الحسكة
ফুরাত/ইউফ্রেটিস
نهر الفرات
আলেকজান্দ্রেটা
الإسكندرونة

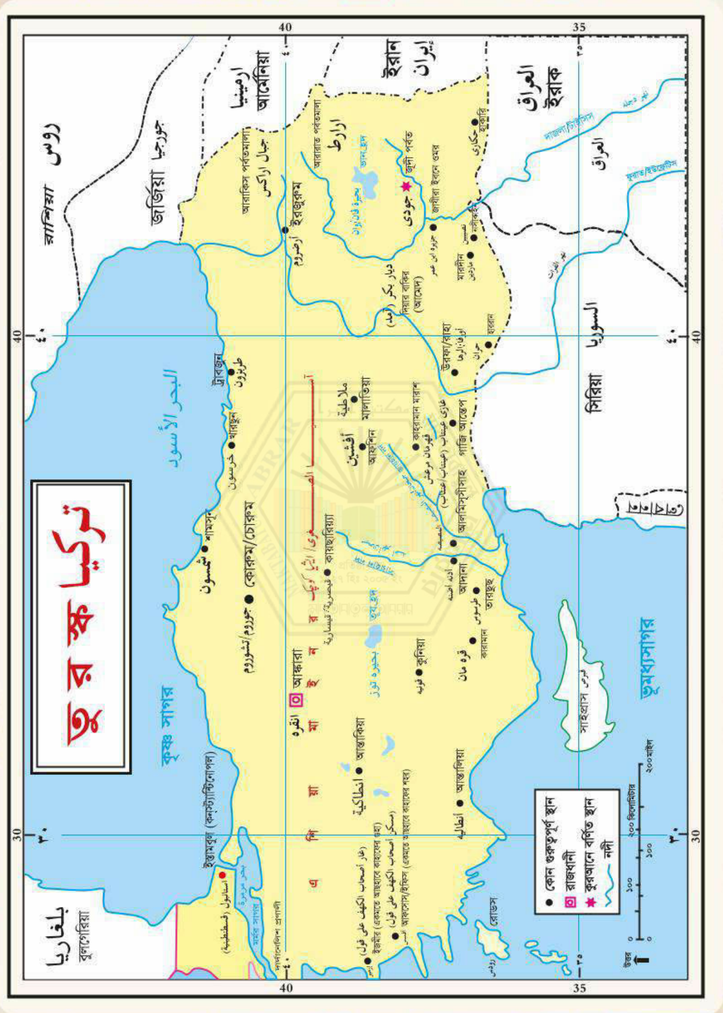
তুরস্ক
ترکیا
● কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান
◻ রাজধানী
★ কুরআনে বর্ণিত স্থান
নদী
উত্তর
কৃষ্ণ সাগর
البحر الأسود
ভূমধ্যসাগর
রাশিয়া
روس
জর্জিয়া
جورجيا
আর্মেনিয়া
ارمينيا
ইরান
ايران
ইরাক
العراق
সিরিয়া
السوريا
বুলগেরিয়া
بلغاريا
সাইপ্রাস
আঙ্কারা
انقرة
ইস্তাম্বুল (কনস্টান্টিনোপল)
আন্তাকিয়া
আন্তালিয়া
কুনিয়া
আদানা
তারসুস
মালাতিয়া
আরারাত পর্বতমালা
জুদী পর্বত
جودي
দিয়ার বকর
উরফা/রুহা
মারদীন
সামসুন
তারাবজন
ইরজুরুম
হাক্কারী
রোডস

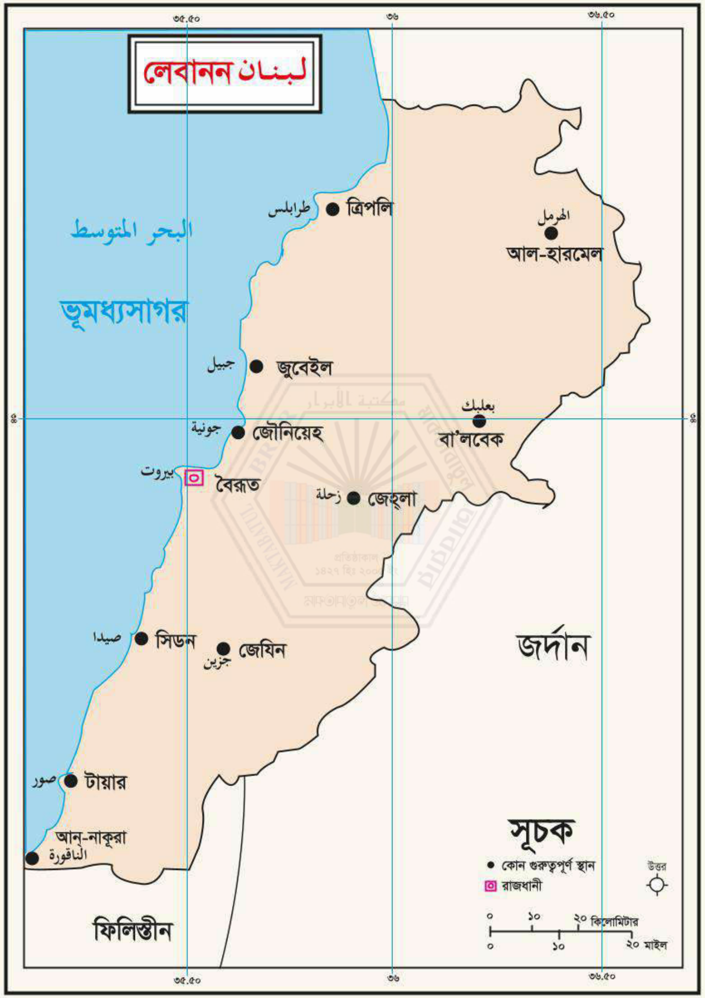
লেবানন لبنان
৩৫.৫০
৩৬
৩৬.৫০
৩৪
البحر المتوسط
ভূমধ্যসাগর
طرابلس ত্রিপলি
الهرمل
আল-হারমেল
جبيل জুবেইল
جونية জৌনিয়েহ
بعلبك
বা'লবেক
بيروت
বৈরূত
زحلة জেহ্‌লা
صيدا সিডন
জেযিন
جزين
জর্দান
صور টায়ার
আন্‌-নাকুরা
الناقورة
ফিলিস্তীন
সূচক
● কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান
রাজধানী
উত্তর
০ ১০ ২০ কিলোমিটার
০ ১০ ২০ মাইল

www.maktabulabrar.com

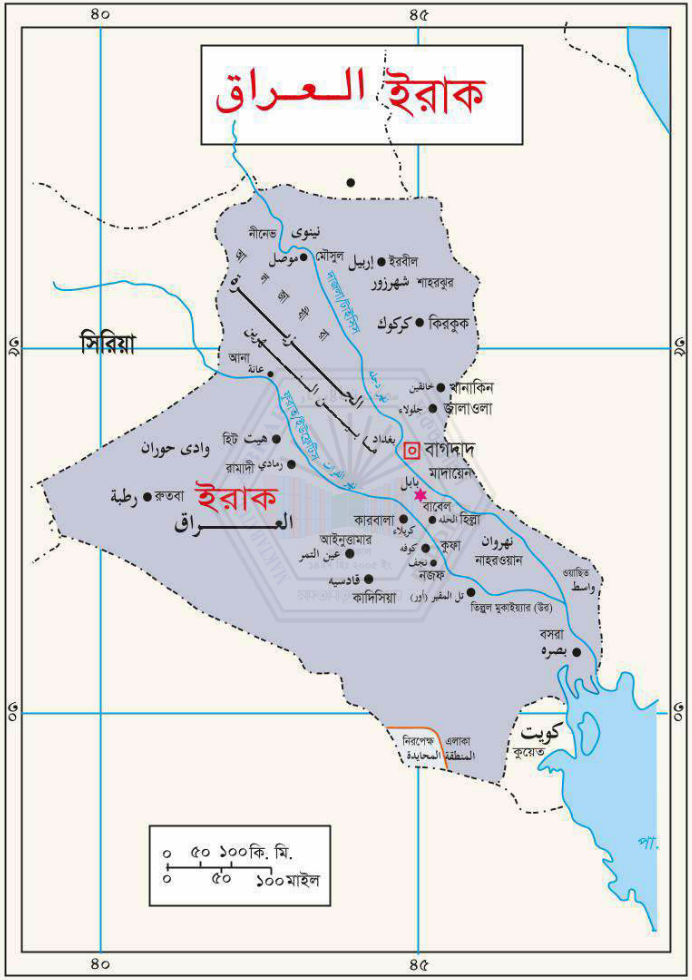
৪০
৪৫
৩৫
৩০
العراق ইরাক
নীনেভ نينوى
موصل মৌসুল
اربيل ইরবীল
شهرزور শাহরঝুর
كركوك কিরকুক
দাজলা/টাইগ্রিস
নহরে দাজলা
ফুরাত/ইউফ্রেটিস
نهر الفرات
সিরিয়া
আনা
عانة
خانقين খানাকিন
جلولاء জালাওলা
بغداد
বাগদাদ
মাদায়েন
هيت হিট
وادى حوران
রামাদী رمادي
بابل
বাবেল
রুতবা رطبة
ইরাক
العــــراق
কারবালা
كربلاء
الحلة হিল্লা
আইনুত্তামার
عين التمر
كوفه কুফা
نجف
নজফ
نهروان
নাহরওয়ান
قادسيه
কাদিসিয়া
تل المقير (أور)
তিল্লুল মুকাইয়্যার (উর)
ওয়াছিত
واسط
বসরা
بصره
নিরপেক্ষ এলাকা
المنطقة المحايدة
كويت
কুয়েত
পা.
০ ৫০ ১০০কি. মি.
০ ৫০ ১০০মাইল

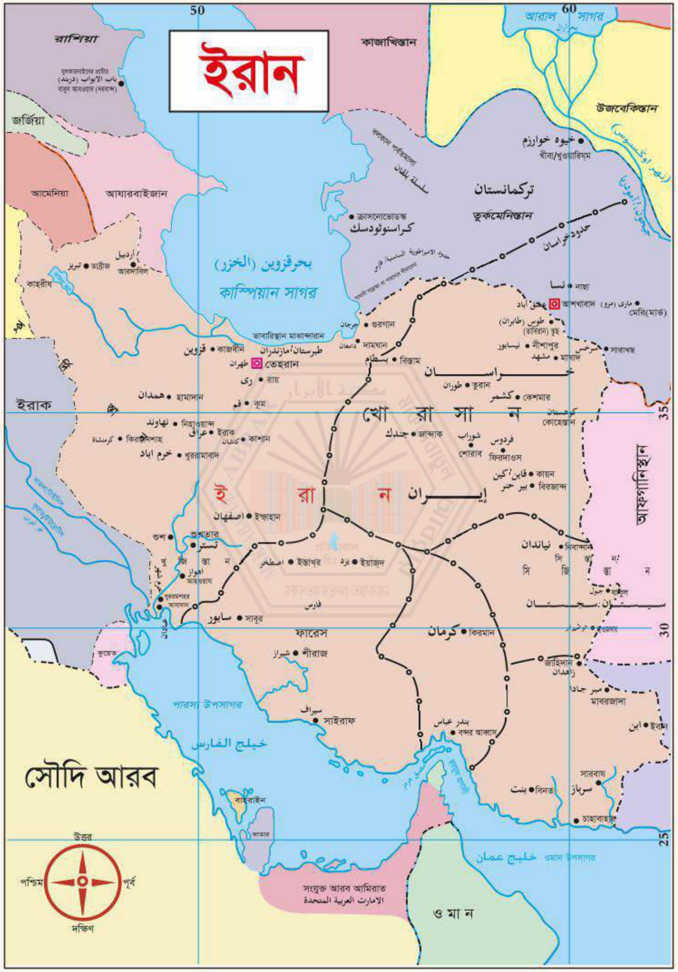
ইরান
রাশিয়া
কাজাখিস্তান
জর্জিয়া
আর্মেনিয়া
আযারবাইজান
উজবেকিস্তান
تركمانستان
তুর্কমেনিস্তান
بحرقزوين (الخزر)
কাস্পিয়ান সাগর
আরাল সাগর
ইরাক
তেহরান
খো রা সা ন
ই রা ন
ایـــــران
আফগানিস্তান
ফারেস
কিরমান
শীরাজ
সাইরাফ
ইস্পাহান
হামদান
নিশাপুর
মাশহাদ
আশখাবাদ
পারস্য উপসাগর
خليج الفارس
কুয়েত
বাহরাইন
কাতার
সৌদি আরব
সংযুক্ত আরব আমিরাত
الامارات العربية المتحدة
ও মা ন
خليج عمان
ওমান উপসাগর
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
50
60
35
30
25

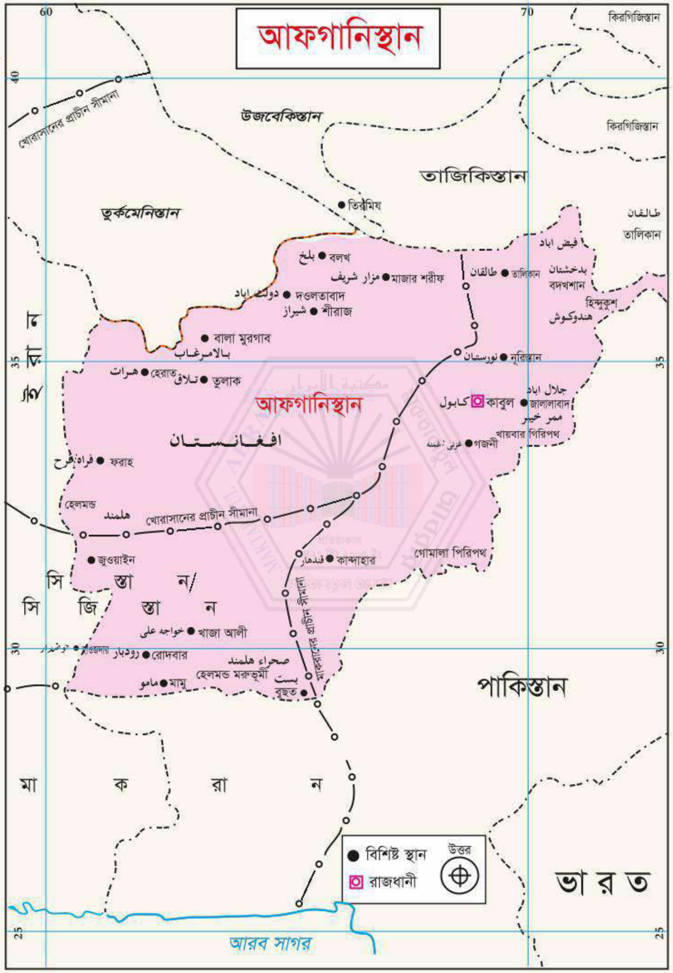
আফগানিস্থান
উজবেকিস্তান
তাজিকিস্তান
কিরগিজিস্তান
তুর্কমেনিস্তান
খোরাসানের প্রাচীন সীমানা
তিরমিয
বলখ
মাজার শরীফ
দওলতাবাদ
শীরাজ
বালা মুরগাব
হেরাত
তুলাক
আফগানিস্থান
افغـانـسـتـان
কাবুল
জালালাবাদ
খায়বার গিরিপথ
গজনী
ফরাহ
হেলমন্দ
কান্দাহার
গোমালা গিরিপথ
সি স্তা ন
খাজা আলী
রোদবার
হেলমন্দ মরুভূমি
বুস্ত
মামু
নূরিস্তান
বদখশান
হিন্দুকুশ
তালিকান
ফয়েজ আবাদ
পাকিস্তান
মা ক রা ন
ভা র ত
আরব সাগর
● বিশিষ্ট স্থান
◘ রাজধানী
উত্তর
60
70
40
35
30
25

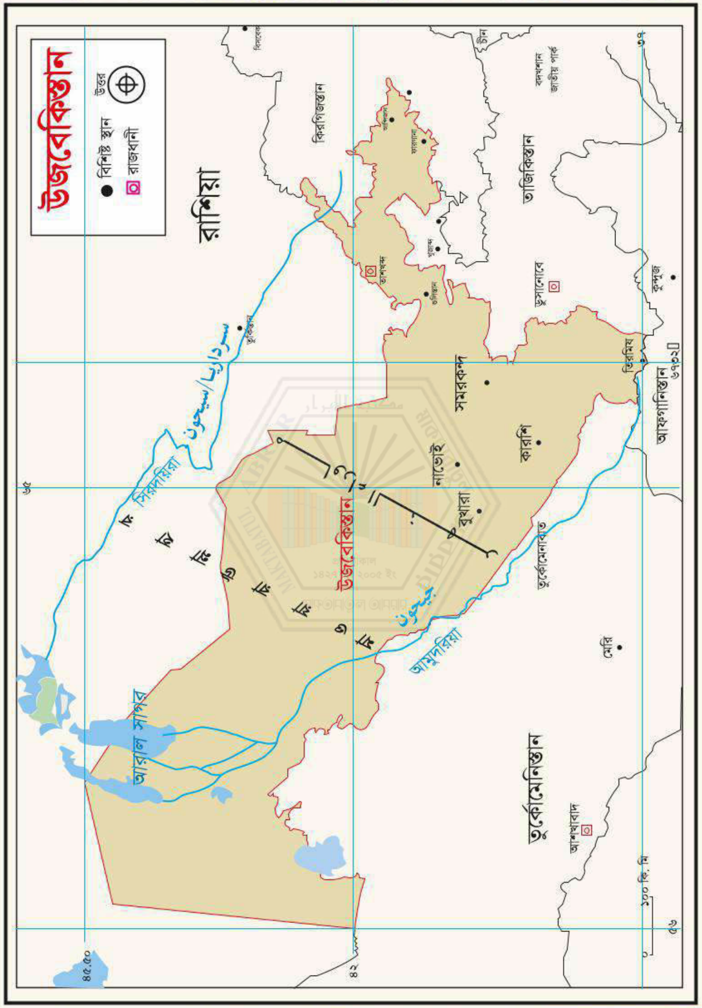
উজবেকিস্তান
বিশিষ্ট স্থান
রাজধানী
উত্তর
রাশিয়া
কিরগিজস্তান
তাজিকিস্তান
তুর্কমেনিস্তান
আফগানিস্তান
উজবেকিস্তান
সমরকন্দ
বুখারা
নাভোই
কারশি
তিরমিয
আরাল সাগর
সিরদরিয়া
আমুদরিয়া
দুশানবে
আশখাবাদ
তুর্কমেনাবাত
মেরি
১০০ কি. মি.

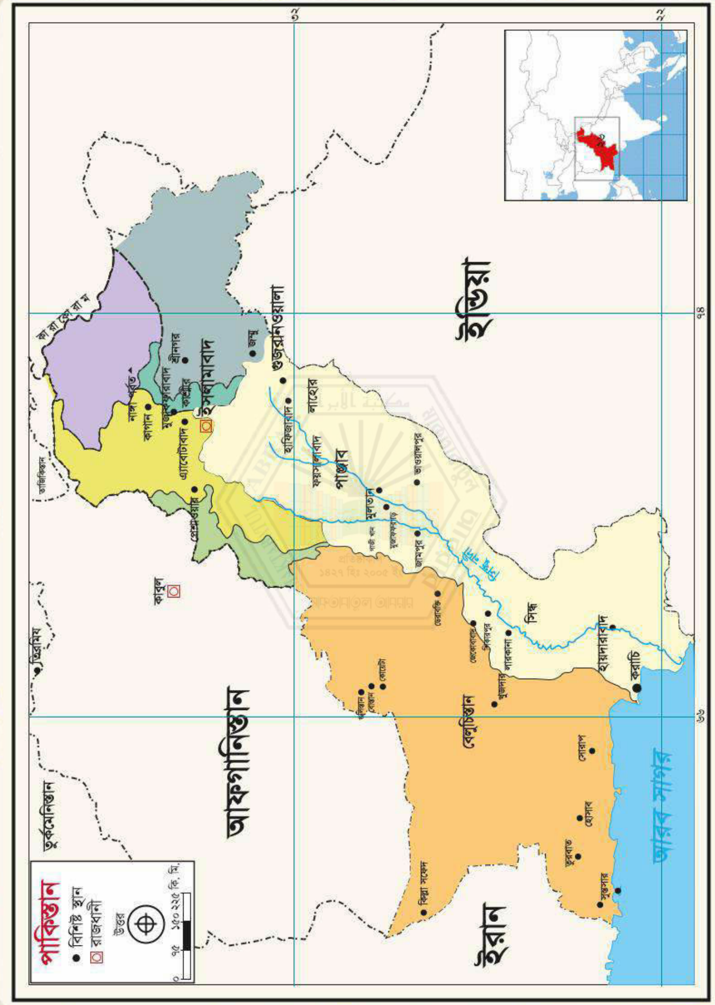
পাকিস্তান
বিশিষ্ট স্থান
রাজধানী
উত্তর
আফগানিস্তান
ইন্ডিয়া
ইরান
আরব সাগর
তুর্কমেনিস্তান
তাজিকিস্তান
কাবুল
ইসলামাবাদ
লাহোর
পাঞ্জাব
মুলতান
বেলুচিস্তান
সিন্ধু
করাচি
হায়দারাবাদ
গুজরানওয়ালা
জম্মু
শ্রীনগর
কারাকোরাম

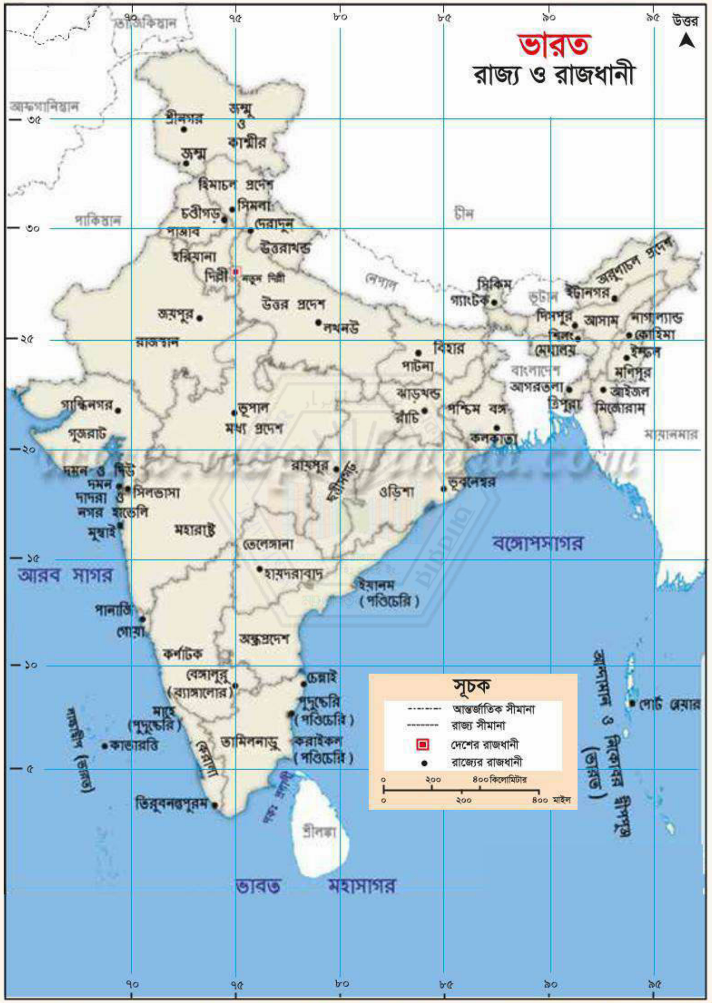
ভারত
রাজ্য ও রাজধানী
উত্তর
তাজিকিস্তান
আফগানিস্তান
পাকিস্তান
চীন
নেপাল
ভুটান
বাংলাদেশ
মায়ানমার
শ্রীলঙ্কা
জম্মু ও কাশ্মীর
শ্রীনগর
জম্মু
হিমাচল প্রদেশ
সিমলা
চণ্ডীগড়
পাঞ্জাব
হরিয়ানা
দেরাদুন
উত্তরাখণ্ড
দিল্লী
নতুন দিল্লী
উত্তর প্রদেশ
লখনউ
জয়পুর
রাজস্থান
সিকিম
গ্যাংটক
অরুণাচল প্রদেশ
ইটানগর
দিসপুর
আসাম
নাগাল্যান্ড
কোহিমা
শিলং
মেঘালয়
ইম্ফল
মণিপুর
আগরতলা
ত্রিপুরা
আইজল
মিজোরাম
বিহার
পাটনা
ঝাড়খণ্ড
রাঁচি
পশ্চিম বঙ্গ
কলকাতা
গান্ধিনগর
গুজরাট
ভূপাল
মধ্য প্রদেশ
রায়পুর
ছত্তিশগড়
ওড়িশা
ভুবনেশ্বর
দমন ও দিউ
দমন
দাদরা ও নগর হাভেলি
সিলভাসা
মুম্বাই
মহারাষ্ট্র
তেলেঙ্গানা
হায়দরাবাদ
ইয়ানম (পণ্ডিচেরি)
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
পানাজি
গোয়া
কর্ণাটক
অন্ধ্রপ্রদেশ
বেঙ্গালুরু (ব্যাঙ্গালোর)
চেন্নাই
মাহে (পুদুচেরি)
পুদুচেরি (পণ্ডিচেরি)
করাইকল (পণ্ডিচেরি)
তামিলনাডু
কেরালা
লাক্ষাদ্বীপ (ভারত)
কাভারত্তি
তিরুবনন্তপুরম
পক প্রণালী
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ভারত)
পোর্ট ব্লেয়ার
ভারত মহাসাগর
৭০ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৯০ ৯৫
৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫
সূচক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্য সীমানা
দেশের রাজধানী
রাজ্যের রাজধানী
০ ২০০ ৪০০ কিলোমিটার
০ ২০০ ৪০০ মাইল

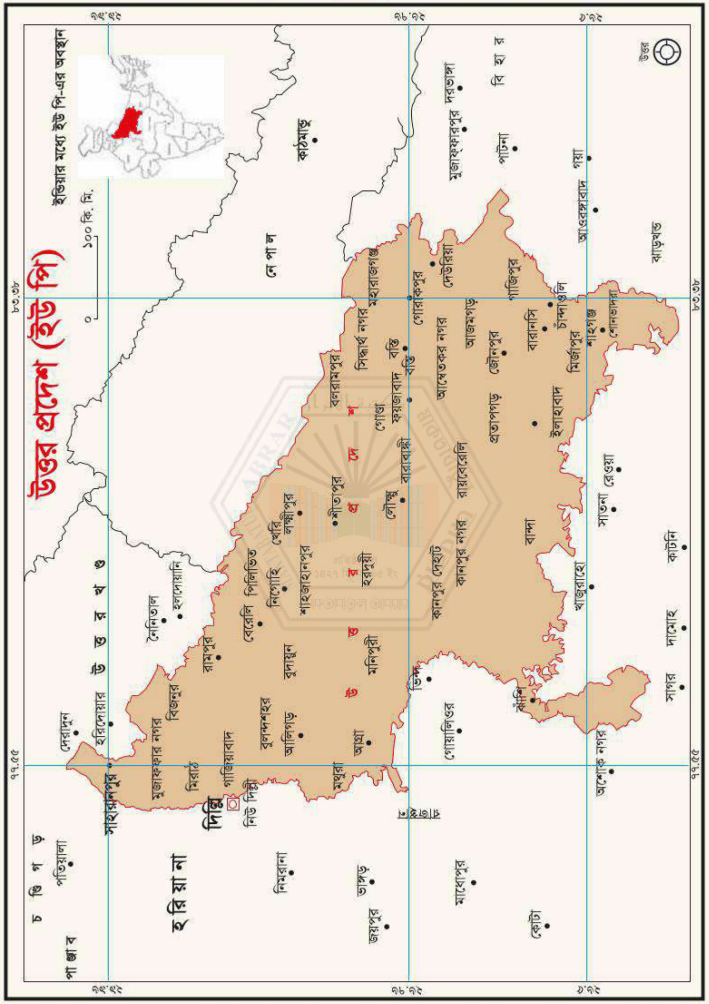
উত্তর প্রদেশ (ইউ পি)
ইন্ডিয়ার মধ্যে ইউ পি-এর অবস্থান
০ ১০০ কি. মি.
উত্তর
নেপাল
বিহার
হরিয়ানা
উত্তরাখণ্ড
পাঞ্জাব
মধ্য প্রদেশ
দিল্লি
নিউ দিল্লী
দেরাদুন
হরিদ্বার
সাহারানপুর
মুজাফফর নগর
বিজনৌর
মিরাট
গাজিয়াবাদ
বুলন্দশহর
আলিগড়
মথুরা
আগ্রা
নৈনিতাল
হলদোয়ানি
রামপুর
বেরেলি
পিলিভিত
বুদায়ুন
শাহজাহানপুর
লক্ষ্মীপুর
হরদোই
সীতাপুর
লখনৌ
বারাবাঙ্কি
মৈনপুরী
কানপুর দেহাত
কানপুর নগর
রায়বেরেলি
প্রতাপগড়
ইলাহাবাদ
বান্দা
ঝাঁসি
ফয়জাবাদ
গোন্ডা
বহরাইচ
বলরামপুর
সিদ্ধার্থ নগর
বস্তি
মহারাজগঞ্জ
গোরখপুর
দেওরিয়া
আজমগড়
জৌনপুর
বারাণসী
গাজিপুর
চান্দাউলি
মির্জাপুর
সোনভদ্র
কাঠমান্ডু
মুজাফফরপুর
দরভাঙ্গা
পাটনা
গয়া
আওরঙ্গাবাদ
ঝাড়খণ্ড
সাতনা
রেওয়া
খাজুরাহো
কাটনি
দামোহ
সাগর
অশোক নগর
গোয়ালিয়র
ভিন্ড
কোটা
মাধোপুর
জয়পুর
আলওয়ার
সিমরালা
পাতিয়ালা
রাজস্থান
৭৫°৫৫ ৭৮°৭৫ ৮২°৮

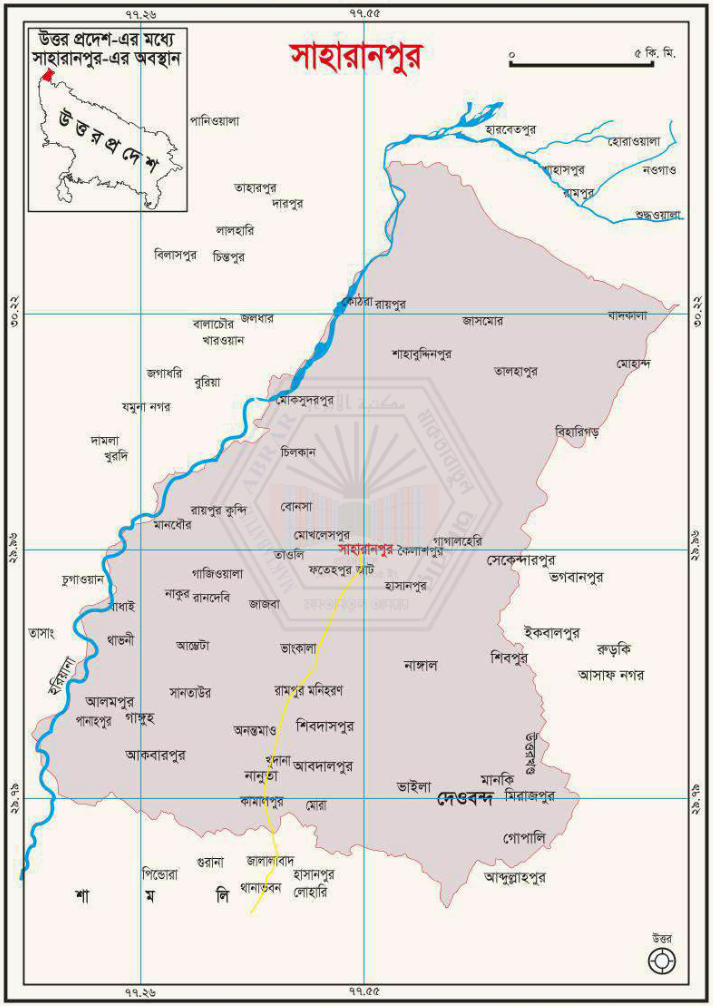
সাহারানপুর
উত্তর প্রদেশ-এর মধ্যে সাহারানপুর-এর অবস্থান
উত্তরপ্রদেশ
০
৫ কি. মি.
৭৭.২৬
৭৭.৫৫
৩০.২২
পানিওয়ালা
হারবেতপুর
হোরাওয়ালা
শাহাসপুর
নওগাও
রামপুর
শুদ্ধওয়ালা
তাহারপুর
দারপুর
লালহারি
বিলাসপুর
চিন্তপুর
কোঠারা রায়পুর
জাসমোর
বাদকালা
বালাচৌর
জলধার
খারওয়ান
শাহাবুদ্দিনপুর
তালহাপুর
মোহান্দ
জগাধরি
বুরিয়া
যমুনা নগর
মোকসুদরপুর
বিহারিগড়
দামলা
খুরদি
চিলকান
রায়পুর কুন্দি
বোনসা
মানধৌর
মোখলেসপুর
গাগালহেরি
তাওলি
সাহারানপুর
কৈলাশপুর
সেকেন্দারপুর
গাজিওয়ালা
ফতেহপুর ভাট
হাসানপুর
ভগবানপুর
চুগাওয়ান
নাকুর
রানদেবি
জাজবা
বাধাই
ইকবালপুর
তাসাং
থাভনী
আম্বেটা
ভাংকালা
রুড়কি
শিবপুর
নাঙ্গাল
আসাফ নগর
হরিয়ানা
আলমপুর
সানতাউর
রামপুর মনিহরণ
পানাহপুর
গাঙ্গুহ
অনন্তমাও
শিবদাসপুর
আকবারপুর
খুদানা
আবদালপুর
নানুতা
উত্তরাখণ্ড
মানকি
ভাইলা
দেওবন্দ
মিরাজপুর
কামালপুর
মোরা
গোপালি
গুরানা
জালালাবাদ
পিন্ডোরা
হাসানপুর
থানাভবন
লোহারি
আব্দুল্লাহপুর
শা ম লি
উত্তর

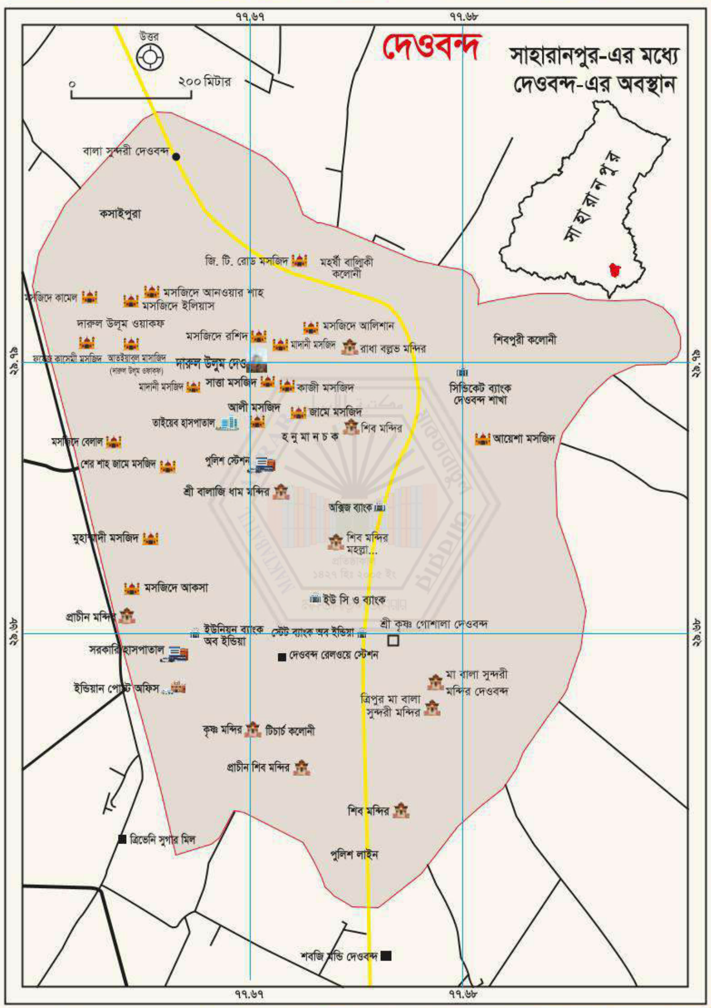
দেওবন্দ
উত্তর
০
২০০ মিটার
সাহারানপুর-এর মধ্যে দেওবন্দ-এর অবস্থান
সাহারানপুর
৭৭.৬৭
৭৭.৬৮
বালা সুন্দরী দেওবন্দ
কসাইপুরা
জি. টি. রোড মসজিদ
মহর্ষী বাল্মিকী কলোনী
মসজিদে কামেল
মসজিদে আনওয়ার শাহ
মসজিদে ইলিয়াস
দারুল উলূম ওয়াকফ
মসজিদে রশিদ
মসজিদে আলিশান
মাদানী মসজিদ
রাধা বল্লভ মন্দির
শিবপুরী কলোনী
জামেয়া কাসেমী মসজিদ
আতইয়াবুল মসজিদ (দারুল উলূম ওয়াকফ)
দারুল উলূম দেওবন্দ
মাদানী মসজিদ
সাত্তা মসজিদ
কাজী মসজিদ
সিন্ডিকেট ব্যাংক দেওবন্দ শাখা
আলী মসজিদ
জামে মসজিদ
তাইয়েব হাসপাতাল
শিব মন্দির
হনুমান চক
মসজিদে বেলাল
আয়েশা মসজিদ
পুলিশ স্টেশন
শের শাহ জামে মসজিদ
শ্রী বালাজি ধাম মন্দির
অক্সিস ব্যাংক
মুহাম্মদী মসজিদ
শিব মন্দির মহল্লা...
মসজিদে আকসা
ইউ সি ও ব্যাংক
প্রাচীন মন্দির
ইউনিয়ন ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
শ্রী কৃষ্ণ গোশালা দেওবন্দ
সরকারি হাসপাতাল
দেওবন্দ রেলওয়ে স্টেশন
মা বালা সুন্দরী মন্দির দেওবন্দ
ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিস
ত্রিপুর মা বালা সুন্দরী মন্দির
কৃষ্ণ মন্দির
টিচার্স কলোনী
প্রাচীন শিব মন্দির
শিব মন্দির
ত্রিভেনি সুগার মিল
পুলিশ লাইন
শবজি মন্ডি দেওবন্দ

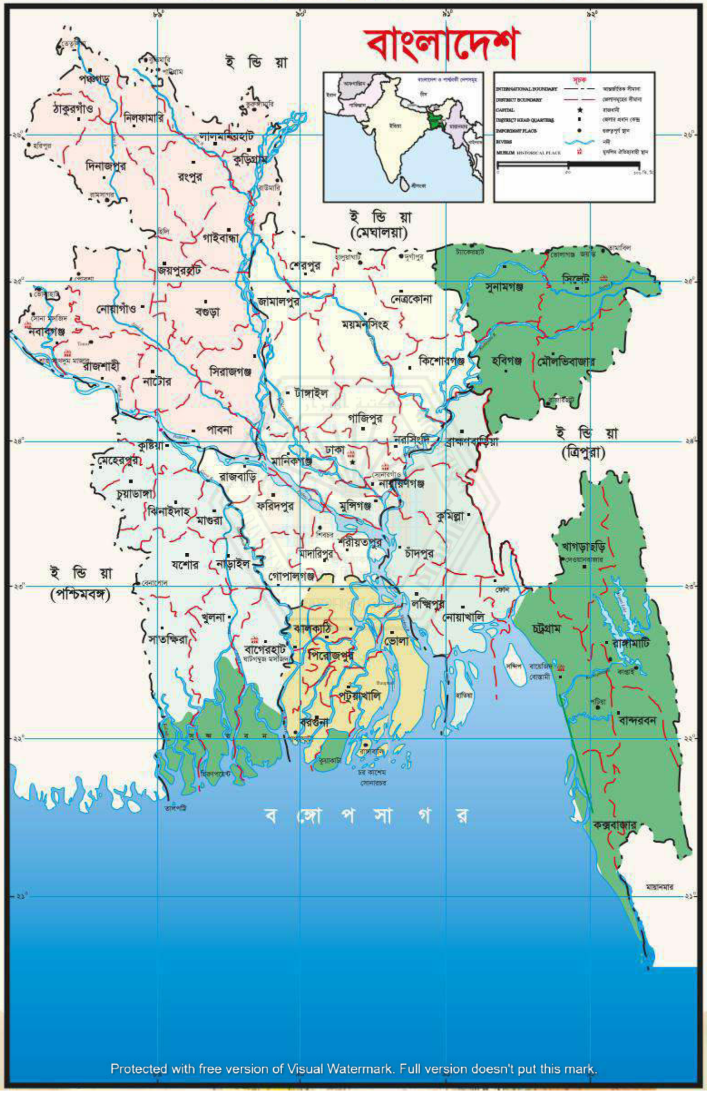
বাংলাদেশ
ই ন্ডি য়া
ই ন্ডি য়া
(মেঘালয়)
ই ন্ডি য়া
(ত্রিপুরা)
ই ন্ডি য়া
(পশ্চিমবঙ্গ)
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
নিলফামারি
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
রংপুর
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
নওগাঁও
বগুড়া
নবাবগঞ্জ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদাহ
মাগুরা
রাজবাড়ি
ফরিদপুর
যশোর
নাড়াইল
সাতক্ষিরা
খুলনা
বাগেরহাট
গোপালগঞ্জ
মাদারিপুর
শরীয়তপুর
ঝালকাঠি
পিরোজপুর
ভোলা
পটুয়াখালি
বরগুনা
শেরপুর
জামালপুর
ময়মনসিংহ
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
মৌলভিবাজার
টাঙ্গাইল
গাজিপুর
নরসিংদী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জ
কুমিল্লা
চাঁদপুর
লক্ষিপুর
নোয়াখালি
ফেনী
খাগড়াছড়ি
চট্টগ্রাম
রাঙ্গামাটি
বান্দরবন
কক্সবাজার
ব ঙ্গো প সা গ র

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থের নাম	লেখক	প্রকাশনা
القرآن الكريم		
كتب التفسير		
كتب الحديث		
آپ کے مسائل اور انکا حل	مولانا محمد يوسف لدهيانوى	نعيميه بك دپو ديوبند
إتحاف السادة المتقين	مرتضى الزبيدي	دار الكتب العلمية، بيروت
آثار المدينة المنورة	عبد القدوس الأنصاري	المكتبة العلمية التجارية، المدينة المنورة
احسن الفتاوی	مفتی رشید احمد صاحب	زکریا بکڈپو ، سہارنپور (یوپی)
احکام اسلام عقل کی نظر میں	اشرف علی تھانوی	مکتبۂ تھانوی ، دیوبند
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار	أبو الوليد الأزرقي	مطابع دار الثقافة ، مكة المكرمة
اسلامی ماہ اور رویت ہلال		مجلس تحقیقات شرعیہ ، .برطانیہ
ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ	মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন	মাকতাবাতুল আবরার বাংলাবাজার, ঢাকা
أطلس المملكة العربية السعودية	دكتور محمد صبحي عبد الحكيم	مكتبة لبنان، بيروت
আকাশ-ভরা সূর্য-তারা	এ এম হারুন অর রশীদ	আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা
কুরআন ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র	মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন	মাকতাবাতুল আবরার, বাংলাবাজার, ঢাকা
بيوت الصحابة حول المسجد النبوي الشريف	محمد إلياس عبد الغني	مركز طيبة للطباعة في المدينة المنورة
ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	ঢাকা নাফিস আহমদ	বাংলা একাডেমী
ভূমণ্ডল	(নবম-দশম শ্রেণী)	
প্রাকৃতিক পরিবেশ	ড. কাজী আব্দুর রউফ	সুজনেষু প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রাকৃতিক ভূগোল পরিচিতি	ড. কাজী আব্দুর রউফ	সুজনেষু প্রকাশনী, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
	Faisal publications, Deoband, India	تاریخ اِرض القرآن سید سلیمان ندوی
تاریخ اسلام	اکبر شاہ خان نجیب آبادی	تاج عثمانی اینڈ سنز دیوبند
تاريخ المدينة المنورةمحمد إلياس عبد الغني		مطابع الرشيد، المدينة المنورة
تاريخ المدينة المنورةابن النجار		مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة
تاریخ مکہ مکرمہ	ڈاکٹر محمد الیاس عبد الغنی	مطابع الرشيد، المدينة المنورة
تسہیل الفلکیات	پروفیسر عبد اللطیف	مکتبۂ خالد وعابد ناظم آباد کراچی
র্দপশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পষ	দে কামিনীকুমার	তারামণ্ডল পরিচয় ও বিশ্বের বিশালতা

The Oxford school Atlas	OXFORD UNIVERSITI PRESS	DELHI
The penguin map of the world	Michael Middieditch	Michael Graham publications Ltd
TOURIST MAP OF TURKEY		
الجغرافيا الفلكية	أنور عبد الغني العقاد	دار المريخ للنشر ، الرياض
جہان دیدہ	تقی عثمانی	فرید بکڈپو لمیٹیڈ ، دہلی
خريطة مكة المكرمة	زكي محمد على فارسى	سمارك التركية العربية السعودية
خريطة ودليل زائر المدينة المنورة	زكي محمد على فارسى	سمارك التركية العربية السعودية
خريطة مصر (خريطة سياحية)		
نقشۂ سیاحتی جمہوری اسلامی ایران		
الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين	غالي محمد الأمين الشنقيطي	مؤسسة علوم القرآن ، بيروت
সূর্যের বন্দী	ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত	বেস্টবুক্স্ কলিকাতা
সৌরজগত	এফ. আ. সরকার	বিজ্ঞান একাডেমী, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
علوم القرآن	تقی عثمانی	کتبۂ دار العلوم کراچی
عمدة الأخبار في مدينة المختار	الشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسي	المكتبة العلمية المدينة المنورة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري	العلامة بدر الدين العيني	
الفتاوى العالمغيرية		مکتبۂ زکریا بکڈپو ،سہارنپور
فتح الباري شرح صحيح البخاري	ابن حجر العسقلاني	
فتح الملهم شرح الصحيح لمسلم	شبير أحمد عثماني	
فضل الباري شرح صحيح البخاري	شبير أحمد عثماني	
فلکیات جدیدہ	مولانا محمد موسی روحانی بازی	إدارۂ تصنیف وادب پاکستان
فہم الفلکیات	سید شبیراحمد کاکاخیل	مکتبۂ دار العلوم کراچی
وزارة الإعلام المملكة العربية السعودية		في خدمة ضيوف الرحمن
ফলিত ও ব্যবহারিক ভূগোল	কাজী আব্দুর রউফ ও কাজী আবুল মাহমুদ	সুজনেষু প্রকাশনী ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
القاموس المحيط	مجد الدين الفيرآبادي	دار الغد الجديد، قاهرة، مصر
قصص القرآن	حفظ الرحمٰن سیوھاری	
Google map		
গ্রাফোসম্যানের নতুন ভূচিত্রাবলী	আশরাফ আলী প্রমুখ	গ্রাফোসম্যান, ৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা

المساجد الأثرية في المدينة المنورة	محمد إلياس عبد الغني	طبع من المدينة المنورة
معالم دار الهجرة	يوسف عبد الرزاق	المكتبة العلمية بالمدينة المنورة
معجم البلدان	ياقوت الحَمَوى	دار إحياء التراث العربى، بيروت
معلم الحجاج	حضرت مولانا قاری سعید احمد	ناظم کتبخانہ اشاعۃ العلوم سہارنپور
المقاصد الحسنة	الإمام السخاوي	دار الكتب العلمية، بيروت
مناسك ملا علي القاري	ملا علي القاري	إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان
المورد (عربي ـ انكليزي)	الدكتور روحي البعلبكي	دار العلم للملايين، بيروت
المورد (انكليزي ـ عربي)	منير البعلبكي	دار العلم للملايين، بيروت
الموسوعة الفقهية		
النجوم النشطى شرح الهيئة الوسطى	محمد موسى الروحاني البازي	إدارۂ تصنیف وادب پاکستان
وصف الكعبة المشرفة	أحمد جاد دار الغد الجديد، المنصورة مصر	
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى	نور الدي السمهودي	دار الكتب العلمية، بيروت
উইকিপিডিয়া: মুক্ত বিশ্বকোষ		নেট দ্রষ্টব্য
Wikipedia		নেট দ্রষ্টব্য
		নেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট
ہندوستان سے دیار حرم تک	مولانا محمد ناظم ندوی	صفہ اکیڈمی مانک مئو سہارنپور (یوپی)
الهيئة الصغرى	محمد موسى الروحاني البازي	إدارة التصنيف والأدب ، باكستان
الهيئة الوسطى	محمد موسى الروحاني البازي	إدارۂ تصنیف وادب پاکستان

পাঠকের নোট-এর পাতা

লেখকের আরও কয়েকটি গ্রন্থ

১. আহকামে যিন্দেগী

জীবনের সব ধরনের মাসআলা-মাসায়েলের জন্য। নারী পুরুষ সকলের জন্য। নির্ভরযোগ্য ফেকাহ ও ফতুয়ার কিতাব থেকে সংকলিত এবং সর্বস্তরের উলামা ও সাধারণ লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য সুবিদিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ।

২. ফিকহুন নিছা

নারী জীবনের সব ধরনের মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য। শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য বিশেষ উপযোগী এক অনবদ্য গ্রন্থ।

৩. ফাযায়েলে যিন্দেগী

নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও কুরআনের আলোকে রচিত জীবনের সব বিষয়ের ফাযায়েল সম্বলিত। ঘরে মসজিদে ও মজলিসে তালীমের উপযোগী। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন হাদীছ এ গ্রন্থে আনা হয়নি।

৪. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ রয়েছে। এবং এসব আকীদা থেকে বিচ্যুত দেশী বিদেশী, নতুন পুরাতন সব ধরনের সমুদয় বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

৫. বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবালিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন। সাধারণ লোকেরাও এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

৬. আহকামে হজ্জ

এ গ্রন্থে হজ্জ, উমরা ও যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের পেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারতের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের সর্বশেষ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। সে স্থানসমূহের মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যারা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যের পীপাসু গ্রন্থটি তাদের পীপাসা নিবরারণ করবে ইনশা আল্লাহ।

৭. ইসলামী মনোবিজ্ঞান

এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত।

৮. কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র

এটি এক পৃষ্ঠার মানচিত্রাবলী। এতে কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের অবস্থান, বর্তমান ও প্রাচীন নাম এবং বর্তমান ও প্রাচীন সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

---

৯. হজ্জ ও যিয়ারতের মানচিত্র

এতে মক্কা মুকাররমাহ ও মদীনা মুনাওওয়ারার হজ্জ ও যিয়ারত সংশ্লিষ্ট এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহ চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

১০. মিসরে কয়েক দিন

এটি মিসরের সফরনামা। মিসর ও মিসরে ভ্রমণ সম্পর্কিত যত বিষয়ে জানার ঔৎসুক্য থাকতে পাবে সব সম্বন্ধেই এতে কমবেশ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

১১. ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ

এতে রচনার নিয়ম-নীতি ও অনুবাদের নিয়ম-নীতিসহ লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহীদের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

১২. যদি জীবন গড়তে চান

এতে শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধদের জীবন গড়ার পদ্ধতিসহ সবশ্রেণীর লোকদের সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি।

১৩. চশমার আয়না যেমন

পৃথিবীতে মতবাদ ও মত মতান্তরের অন্ত নেই। কোন একটা বিষয় নিয়ে বিরোধের অন্ত নেই। এই মত বিভিন্নতা বা বিরোধের মূলে রয়েছে কে কোন্ বিষয়কে কোন্ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন বা কোন্ দৃষ্টিভংগিতে বিচার করছেন সেটা। যার চশমার আয়না যেমন, তিনি সবকিছুকে দেখছেন তেমন। এ বিষয়টার উপরই একটি রম্য রচনার প্রয়াস হল "চশমার আয়না যেমন"।

১৪. কথা সত্য মতলব খারাপ

এটি মূলত রম্যরচনামূলক একটি পুস্তক। এটি রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতা এবং সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বদ মতলব সিদ্ধি করা ও প্রতারণা করার অপপ্রয়াসের সমালোচনা।

১৫. নফ্স ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

এতে নফ্সের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে যত ধরনের কুট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১৬. চিন্তা-চেতনার ভুল

এ গ্রন্থে চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি, চিন্তা-চেতনার গলদ এবং সেগুলো দোরস্ত করার গুরুত্ব ও উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

১৭. الاستفادة بشرح سنن ابن ماجه

এটি আরবিতে রচিত সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। এ শরাহর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ:

● بيان من أخرج الحديث مُسندا غير ابن ماجة. ● كلام مُوجَزٌ حول أحوال الحديث ورواته. ● شرح المفردات.● الشرح الإجمالي للحديث لِيُقَرِّب معني الحديثِ وغرضَه ألي الأذهان. ● بيان المباحث المتعلقة للحديث علي المنهج التدريسي.● بيان ما يستفاد من الحجيث مُوْجَزًا. ● بيان مطابقةِ الحديث للترجمة.

উল্লেখ্য, শরাহটির বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

বি. দ্র. লেখকের সমস্ত গ্রন্থ মাকতাবাতুল আবরার, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার ঢাকা ও আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, কিতাবমার্কেট যাত্রাবাড়ি, ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা যায়।